মাসিক পত্র ও সমালোচনা।

শ্রীসুরেনচণ্ডী দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

সূচী।

কলিকাতা,

১২নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর ইলেকট্রিক মেসিন প্রেস" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

... মূল্য ২৯ টাকা। ... মূল্য ৵০ দুই আনা।

অবসর।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

নবম খণ্ড।

শ্রী সুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৯২ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, "অবসর পুস্তকালয়" হইতে

শ্রীপঞ্চানন মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত।

সূচী পত্র।

অবসর—

ধনুকে বিষাক্ত তীর সংযোজনা করিয়া মিনিয়াকে লক্ষ্য করিল।

দেবীগড়—৩৪ পৃষ্ঠা।

অবসর।

১৩১৯ সাল। ৯ম বর্ষ। | ভাদ্র। | ১ম সংখ্যা।

সম্পাদকীয় নিবেদন।

শ্রীভগবানের করুণায় আজি অবসর নবম বৎসরে উপস্থিত হইল। ইহা অবসর পরিচালকগণের অসীম আনন্দের কথা বলিতে হইবে। যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে কত মাসিক-কুসুম প্রস্ফুটিত না হইতে হইতে ঝরিয়া যাইতেছে, সে ক্ষেত্রে যে অবসর আজি নয় বৎসর কাল জীবিত রহিয়াছে, ইহাতে আনন্দ হয় বৈ কি! কিন্তু কেবল জীবিত আছে বলিয়াই আনন্দ নহে—অবসর সাহিত্য-সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। অবসর গ্রাহক-গণের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া প্রভূত সম্পদ্-গৌরব লাভ করিয়াছে, এক কথায় অবসরের প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি সুদৃঢ়।

আমি এক বৎসর কাল অবসর পরিচালনা করিলাম,—পূর্ব্ব কয়েক বৎসর আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব ইহার সম্পাদন করিয়াছিলেন। অকৃতী আমি—নবব্রতী আমি; জানি না, আমার দ্বারা পূর্ব্ব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ আছে কি না,—তবে কৃপালু গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ যে, আমাকে উৎসাহ দিয়াছেন, তাহাতে আমি প্রাণভরা আশা লইয়া নববর্ষের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম।

গত বৎসরে যে আমাদের কোন ত্রুটী হয় নাই, একথা বলিতে পারি না। তবে যে ত্রুটী বুঝিয়াছি,—যাহা অনিচ্ছাসত্ত্বে ঘটিয়া গিয়াছে, এবারে তাহার সংশোধনের বন্দোবস্ত করিয়াছি—এ নব-বর্ষের বন্দোবস্ত এবং প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন মনের মত হইবে বলিয়াই বিশেষ ভরসা করি।

যে সকল প্রতিভাশালী সাহিত্য-সেবিগণ অবসরে প্রবন্ধ প্রদান করিয়া, পরিচালন বিষয়ে উপদেশ দিয়া ইহাকে গৌরবান্বিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন, তাঁহারা ত নিয়মিত লিখিবেনই,—তদ্ভিন্ন এবার আরও কয়জন সাহিত্যিক ইহাতে নিয়মিত প্রবন্ধ প্রদান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। কাজেই আশা করিতে পারি, এখন হইতে অবসর আরও উৎকৃষ্ট, আরও গৌরবান্বিত হইবে। যাঁহারা অবসরের জন্য নিয়মিত প্রবন্ধ প্রদানে কৃপাবান্ হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ভূতপূর্ব্ব বঙ্গবাসী, বসুমতী ও হিতবাদী-সম্পাদক এবং বর্ত্তমান নায়ক-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব বসুমতী, হিতবাদী ও সুলভ সমাচার-সম্পাদক বিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত জলধর সেন, শ্রীমন্ত সওদাগর ও লক্ষ্মী-সরস্বতী সম্পাদক বিখ্যাত ব্যবসায়ী বাণিজ্য বিষয়ের সুলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, আর্য্যাবর্ত্ত প্রভৃতি মাসিক পত্রের লেখক প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, নাট্য-কলাকুশল উদীয়মান লেখক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস-লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে প্রভৃতি মহাশয়গণের নাম করিতে পারি। তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে অনেকেই প্রবন্ধ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বঙ্গবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বেহারিলাল সরকার মহাশয়ের এবং কবি-রবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নূতন নূতন গান অবসরে প্রকাশ হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষে উপহারের যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহাতে যে প্রত্যেক গ্রাহকই সন্তুষ্ট হইবেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

গত বর্ষে ইচ্ছা সত্বেও অবসরে আমরা অধিক ছবি প্রকাশ করিতে পারি নাই—এবারে সে বন্দোবস্তও করিয়াছি।

এত অল্পমূল্যে এত বড় কাগজ—বিনামূল্যে প্রকাণ্ড এবং সারবান্ ও সম্পূর্ণ নূতন পুস্তক উপহার অন্যত্র নাই। তদুপরি এবার হইতে বাণী-বরপুত্র-সকল-মানসকুসুম-পরাগে সমস্ত কাগজ পরিপূর্ণ থাকিবে। মাসিক সাহিত্যে এ ব্যাপার নূতন—অতএব দীনের প্রার্থনা, রাজার প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র অবসর সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

প্রাচীন ভারতে শাসন-প্রথা। *

কাহারও কাহারও অভিমত এই যে, আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহাদের সামকালিক কোন বৃত্তান্তই লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আর্য্যদিগের লিখিত ইতিহাস ছিল, কিন্তু মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন সেগুলির অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভূপৃষ্ঠের ভার বর্দ্ধনের অনাবশ্যকতা দেখিলেন, তখন তিনি সেগুলি প্রজ্বলিত অনলে ভস্মীভূত করিবার আদেশ প্রচার করেন। আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এই শ্রেণীস্থ অনুকূল প্রতিকূলবাদীদিগকে পরস্পরের অভিমতের সত্যতা প্রতিদান করিতে সময় প্রদান করতঃ আমাদের প্রাচ্য-শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া প্রাচীন ভারতের শাসন প্রথা সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

বৈদিকযুগে ভারতীয় শাসন-প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা অবগত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। আর্য্যজাতি যখন মধ্য এশিয়া হইতে পাঞ্জাবে আগমন করতঃ উপনিবেশ স্থাপন করেন, তখন তাঁহাদের স্বকীয় বৃহৎ সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত করেন এবং এক একজন সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের নায়ক হইয়া স্বাধীনভাবে কালাতিপাত করেন। ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্ত পাঠে জানা যায় যে, সে সময়ে দুষ্টপ্রকৃতির লোক শাসিত ও সৎপ্রকৃতির লোক পুরস্কৃত হইত। তবে নিরপরাধী অনার্য্যদিগের প্রতি যে তাঁহারা একেবারেই অত্যাচার শূন্য ছিলেন, একথা কোন মতেই বলা চলে না; তবে ইহা সত্য যে আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের ঔপনিবেশিকগণ তত্রত্য আদিম অধিবাসীদিগের প্রতি যেরূপ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিলেন, আর্য্যেরা অনার্য্যদিগের উপর তাদৃশ অত্যাচার করেন নাই। যদি করিতেন, তবে বোধ হয় উক্ত মহাদেশ সমূহের আদিম অধিবাসীদিগের ন্যায় অনার্য্যদিগের চিহ্ন ভারতের পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইত এবং বোধ হয় কোল, ভীল, সাঁওতাল প্রভৃতি অনার্য্যজাতির বংশধরগণকে আজ আমরা দেখিতে পাইতাম না।

* গত ১৯১২ সালের জানুয়ারী মাসের The Calcutta university magazine এ "The administrative System in ancient India" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সেই ইংরাজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। লেখক প্রবন্ধটি ভাষান্তরিত করিবার অনুমতি দেওয়ায় তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। অনুবাদক।

ইহার পরবর্ত্তীকালে আমরা দেখিতে পাই যে, আর্য্য ও অনার্য্যে সমরানল অপেক্ষাকৃত প্রশমিত এবং দেশবাসী স্বস্ব জীবন-ব্রত সাধনে ব্রত-পরায়ণ। উপনিষদ গুরু-গম্ভীর নিনাদ সহকারে বিচারের পথ নির্দ্দেশ করিতেছে এবং শাস্ত্রের বলে অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিও সবল ব্যক্তিকে শাসনাধীনে রাখিতেছে। *

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দুরা সমগ্র উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতের কিয়দংশে বিস্তৃত হন। তখন মহাপরাক্রান্ত চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করিতেছিলেন। পাটলীপুত্র বা বর্ত্তমান পাটনা তাহার রাজধানী ছিল। গ্রীক্‌দেশীয় দূত মেগাস্থিনিশ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা তদানীন্তন ভারতের শাসন-প্রণালী বহুল পরিমাণে জানিতে পারি। তিনি বলেন, তখন সহরের মিউনিসিপালিটীর কর্ম্মচারিগণ ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণকে দেশীয় শিল্পকলার উন্নতি, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণকে বৈদেশিক আগন্তুক বা অতিথির সংবর্দ্ধনা, তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণকে জন্ম-মৃত্যুর তালিকা, চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণকে ব্যবসায় ও বাণিজ্য, পঞ্চম শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণকে উৎপন্ন শিল্পকলা এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর কর্ম্মচারিগণকে আমদানী ও রপ্তানীর তালিকা দেখিতে হইত। ইহা ব্যতীত সৈনিক কর্ম্মচারী ছিল, তাহারাও ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের উপর যুদ্ধ সম্বন্ধীয় নানা কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল।

মেগাস্থিনিশ রাজার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধেও বড় সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন, রাজা প্রতিদিন রাজ-সভায় উপস্থিত হইতেন এবং স্বয়ং সমগ্র রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। কখন কখন তিনি রমণীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়ায় গমন করিতেন।

যুদ্ধ সংক্রান্ত আইন বড় উদার ছিল। ভীত, সুরাপায়ী, নিরস্ত্র, স্ত্রীলোক, শিশু, বয়োবৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণগণকে হত্যা করা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। রাজা প্রজার প্রতি অতি সদয় ব্যবহার করিতেন, তিনি কেবল প্রজারই কল্যাণ-হেতু সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন। বশিষ্ঠের মতে রাজার পক্ষে এই কয়েকটি কার্য্য নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। যথা,—জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমস্ত প্রকৃতিপুঞ্জের রক্ষণ, কৃতাপরাধীর দণ্ডদান, ফলবান্ তরু কর্ত্তন না করন ইত্যাদি। বশিষ্ঠের এই অনুশাসন হইতে আমরা স্পষ্টতই

* বৃহদারণ্যক ১—৪—১৪।

বুঝিতে পারিতেছি যে, রাজা কেবল মাত্র প্রজারই জন্য "রাজা" নাম গ্রহণ করিতেন।

কৃষকদিগকে উৎপন্ন দ্রব্যের কেবলমাত্র ষষ্ঠাংশ করস্বরূপে দিতে হইত। প্রত্যেক শিল্পীকে বিনা পারিশ্রমিকে রাজ-সরকারে একদিন কার্য্য করিতে হইত।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আর্য্য ও অনার্য্যদিগের মধ্যে আইনের পার্থক্য ছিল। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যেরা তিনটী জাতিতে বিভক্ত হইলেন। যথা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য। যে সমস্ত অনার্য্য হিন্দু-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল তাহাদিগকে "শূদ্র" নামে অভিহিত করা হইল।

যদি কোন ব্রাহ্মণ অন্য কোন ব্রাহ্মণকে হত্যা করিতেন, অন্য কোন ব্রাহ্মণের কোন দ্রব্য চুরী করিতেন অথবা মদ্যপান করিতেন, তবে তাহার ললাটে উত্তপ্ত লৌহ শলাকাগ্রভাগ দিয়া চিহ্ন প্রদান করতঃ তাহাকে রাজ্য হইতে বিদূরিত করিয়া দেওয়া হইত। যদি কোন নিম্নশ্রেণীস্থ লোক উল্লি-খিত প্রকারের দোষে দুষ্ট হইত, তবে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত এবং তাহার সমস্ত স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইত। যদি কোন ব্রাহ্মণ কোন শূদ্রকে হত্যা করিত, তবে তাহাকে অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত, বলা বাহুল্য সেই অর্থের দ্বারা দরিদ্র লোকদিগকে ভোজন করান হইত।

কিন্তু আমার বিশ্বাস আর্য্য-শাস্ত্র-প্রণেতৃগণ নিজেরা প্রকৃতপক্ষে যাহা না ছিলেন, তদপেক্ষা অধিকভাবে আপনাদিগকে অঙ্কিত করিয়াছেন। যদি প্রকৃতপক্ষেই তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি এতাদৃশ অত্যাচার করিতেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ এত মুক্তকণ্ঠে আর্য্য-দিগের প্রশংসা-গীত গাহিতেন না।

মৃত্যু অথবা শারীরিক দণ্ড কেবল চৌর্য্যাপরাধেই বিহিত হইত।

তাহার পর বৌদ্ধযুগ। এ যুগের জ্ঞাতব্য তথ্য অশোকের খোদিত বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। অশোক চতুর্দ্দশটী মহামূল্য কথা ভারতের বিভিন্ন পর্ব্বত, গুহা বা শিলাখণ্ডে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন, কাজেই তাঁহার উপদেশ ও তদনুরূপ ছিল।

ফাহিয়ান ৪০০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে আমরা দেশের তদানীন্তন অবস্থা অনেক পরিজ্ঞাত হইতে পারি।

কাহিয়ান বলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম-প্লাবনে সমগ্র দেশ প্লাবিত ছিল, কাজেই গৌতম বুদ্ধের উপদেশের সহিত রাজকৃত আইনের প্রগাঢ় সম্বন্ধ ছিল। রাজা তখন শারীরিক শাস্তিপ্রদান না করিয়া দেশ শাসন করিতেন, দোষীরা দোষের লঘুতা ও দীর্ঘতা ভেদে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইত। কেহ বারংবার রাজদ্রোহিতা করিলে তাহাদের দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তন করা হইত। রাজার কর্ত্তব্য ছিল প্রজার পালন, তিনি নিরপেক্ষ বিচার করিতেন এবং অন্যায় কার্য্যকারীর শাস্তি দিতেন। রাজার পক্ষে মদ্যপান, অক্ষক্রীড়া, রমণী-সংসর্গ এবং পশু-শিকার অত্যন্ত গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য ছিল। রাজা প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিতেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্ব্বক রাজ-সভায় প্রবেশ করিতেন। রাজসভায় তিনি যাবতীয় কার্য্য স্বচক্ষে পরিদর্শন পূর্ব্বক পরামর্শা-গারে যাইয়া মন্ত্রীদিগের সহিত সুগূঢ় পরামর্শ করিতেন। তৎপর রাজা শারীরিক, অঙ্গ পরিচালন, স্নান ও আহারাদি করিতেন। অপরাহ্নে তিনি পুনরায় রাজপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সৈনিকদল পরিদর্শন করিতেন। তৎপর, তিনি ডিটেক্‌টিভগণকে পরামর্শ দিতেন। রাত্রে তিনি রথারোহণে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক শয়ন করিতেন; এইরূপই আমাদের পূর্ব্বতন রাজাদিগের দৈনিক কার্য্য-বিবরণী ছিল।

রাজা রাজ্যশাসন কল্পে সদ্বংশজাত সাত আটজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পরা-মর্শ গ্রহণ করিতেন। কর সংগ্রহ, খনি খনন এবং শিল্প কলার উন্নতি কল্পে যোগ্য লোক নিযুক্ত হইত। মনুসংহিতায় দেখিতে পাই, তখন গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ ছিল, তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা নিরপেক্ষভাবে মীমাংসা করিতেন। এই পঞ্চায়েতী প্রথা ব্রিটীশ শাসনের পূর্ব্বপর্য্যন্তও ভারতে বিদ্যমান ছিল।

তখন Representative System of Government ছিল। রাজা প্রকৃতিপুঞ্জের পরামর্শ ব্যতীত কোন বৃহৎ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত কোশলের রাজা পশানদ। পশানদ বুদ্ধের তনয়ের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দানের জন্য মন্ত্রিসভা (পার্লামেণ্ট) আহ্বান করিয়া-ছিলেন। কিরূপে এই বিবাহ-ব্যাপার সম্পাদিত হইবে, সমবেত প্রজামণ্ডলীর মধ্যে যখন এ বিষয়ের মীমাংসা চলিতে ছিল তখন আনন্দ সভামধ্যে বুদ্ধের দেহত্যাগের সংবাদ লইয়া উপস্থিত হন।

এই যুগের পরই পৌরাণিক যুগ। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই এ যুগের আরম্ভ। প্রবল পরাক্রান্ত বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরূঢ়। হুয়েন

সাংয়ের লিখিত বৃত্তান্তে প্রকাশ যে, বিক্রমাদিত্য স্বচক্ষে দরিদ্রপ্রজাগণের অবস্থা নিরীক্ষণ করিবার জন্য ছদ্মবেশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেন।

এই ভাবে যতই মন্বাদি শাস্ত্রগ্রন্থ ও বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করি, ততই দেখিতে পাই প্রাচীন ভারতেও অতি সুসভ্য, উদার, সর্ব্বজন প্রশংসিত শাসন-প্রথা বিদ্যমান ছিল।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

ভাদুরে নদী।

১

তোমার সেদিন ছিল শীর্ণকায়া,
স্বচ্ছ শীতল জল;
শিহরিতে পেয়ে বায়ুর
পরশ সুকোমল।
সাদা বালুর শয্যা পাতি',
থাকৃতে শুয়ে দিবা রাতি,
উঠত প্রাণে মধুর স্বপন,
শুনে নিঝুম নিশির গান;
তোমার চ'খের নিদ্রা মুছে দিত,
উষার আঁচল খান।

২

তোমার সেদিন এখন চ'লে গেছে,
তাই কি এত জাঁক?
কাদাগোলা জলে এখন
কেবল ঘূর্ণীপাক্!
প্রবল তুফান উঠ্‌লো প্রাণে,
কূল ভেঙে ধাও অকূলপানে;
উচ্চ আশায় তোমার এখন
হ'ল তুচ্ছ জগৎ সবি;
তোমার রঙ্গ দেখে অবাক্ হ'ল,
তোমার ভক্ত কবি।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

খুন না আত্মহত্যা ?

১

ভাদ্র মাস ! আকাশ সমেঘ। সর্ব্বদা ধারাপাত, তথাপি অসহ্য গ্রীষ্ম ; প্রকৃতির আনন্দ-দুলাল পবন আজ বেগতিক দেখিয়া বিশ্রাম উপভোগ করিতেছে, আর নরলোক "কর্ম্মভোগে" গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছে—বিশেষতঃ এই কলিকাতা সহরে। নিদারুণ গুমট এমন কি—নিঃশ্বাস লইতেও কষ্ট বোধ হইতেছে। আজ ভাদ্রমাস যথোপযুক্তভাবে তাহার 'পচা' বিশেষণটি পরিগ্রহ করিয়া অতীব গম্ভীর মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন—সহর সশঙ্ক।

শরতের ছদ্মবেশী গ্রীষ্মের এই নিদারুণ অপরাহ্ন আমি গোবিন্দরামের এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে অতিবাহিত করিতেছিলাম। গোবিন্দরাম একখানি কৌচে তাহার দেহভার ন্যস্ত করিয়াছেন এবং একখানি তালবৃন্ত লইয়া পঙ্গু পবনকে স্বার্থবশে একটু নাড়া-চাড়া দিতেছেন। পঞ্জাবে আমি অনেকদিন কাটাইয়াছি ; সুতরাং এই গ্রীষ্মাতিশয্য আমাকে তেমন জখম করিতে পারে নাই। আমি একখানা খবরের কাগজ পড়িতেছিলাম।

আমার ইচ্ছা ছিল, এই সময়টা সহর ত্যাগ করিয়া কোন স্থানে বেড়াইতে যাইব ; কিন্তু বন্ধু গোবিন্দরাম তাহাতে একবারেই নারাজ। কাজ ভিন্ন সখের খাতিরে কখনও তিনি কলিকাতা ত্যাগ করিতে চাহিতেন না, সুতরাং উভয়ে নির্ব্বিবাদে নিরন্তর ঘর্ম্মস্নাত হইয়া অভদ্র ভাদ্রের অমোঘ প্রতাপ সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছি।

প্রথমে একখানা পত্র একবার দুইবার তিনবার নয়—দশবার পড়িয়া গোবিন্দরাম সেই-যে চিন্তামগ্ন হইয়াছেন—মুখে আর কথা নাই ; আর সে সময়ে তাঁহার সহিত কথা কহাও অসম্ভব—ধাক্কা দিলেও তিনি হাঁ 'হুঁ' শব্দ করিবেন না, ক্ষণপরে আমি হাতের সংবাদ পত্রখানা গৃহতলে নিক্ষেপ করিয়া দেখা-দেখি বন্ধুবরের ন্যায় চিন্তামগ্ন হইলাম।

সহসা আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, "ঠিক কথা ডাক্তার, এইরূপ কাটাকাটি করিয়া শান্তি স্থাপন—বিশ্রী ব্যাপার !"

আমি বলিয়া উঠিলাম, "বিশ্রী ব্যাপার ?" আমি তখনই বুঝিলাম, তিনি আমার হৃদয়ের গভীরতম চিন্তা টানিয়া বাহির করিয়াছেন। আমি উঠিয়া

বসিয়া অতি বিস্মিতভাবে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "একি! ইহা আমার কল্পনার বহির্ভূত!"

তিনি আমাকে বিস্ময়-বিহ্বল দেখিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আমি তোমায় বলিয়াছিলাম যে, যদি কাহারও বিবেচনা শক্তি তীক্ষ্ণ থাকে, তাহা হইলে সে অনায়াসে অপরের চিন্তাও জানিতে পারে; ইহার দৃষ্টান্তও দিয়াছিলাম। তুমি তাহা বিশ্বাস কর নাই। আমি যখন বলিয়াছিলাম যে, আমি এ কাজ প্রায়ই করিয়া থাকি, তখন তাহাও তুমি তত বিশ্বাস কর নাই।"

"না—না—আমি সর্ব্বদাই তোমার কথা বিশ্বাস করি।"

"হইতে পারে কেবল এই বিষয়টায় নহে। তুমি মুখে অবিশ্বাস করি না বলিলেও তোমার ভ্রু দুটি সে কথা যে বলে না, তাহা আমি বুঝিতে পারি। সেইজন্যই যখন তুমি খবরের কাগজখানা ছুড়িয়া ফেলিয়া চিন্তামগ্ন হইলে, তখন আমি তোমার সেই চিন্তা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম, এ সুবিধা লইয়া আমার সন্দেহই হইয়াছিল, কারণ আমি এবার তোমার এ সম্বন্ধে সন্দেহ সম্পূর্ণই দূর করিতে পারিব।"

আমি বলিলাম, "তুমি সে দিন যাহার বিষয় বলিয়াছিলে, সে ব্যক্তি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, তাহার পর সে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তাহা হইতে তাহার মনে যে কথা উঠিয়াছিল, অপরে তাহাই পাঠ করিয়াছিল। কিন্তু এখানে আমি স্থির ভাবে বসিয়া আছি, সুতরাং কি সূত্র ধরিয়া তুমি আমার মনের কথা জানিলে?"

"ডাক্তার, মুখের চেহারা মানুষের মনের আয়না। মুখের চেহারায় মনের ভাব অনায়াসে জানিতে পারা যায়।"

"তাহা হইলে তুমি আমার মুখের ভাব হইতে মনের ভাব জানিতে পারিয়াছিলে?"

"হাঁ, মুখের ভাব—বিশেষতঃ তোমার চোখের ভাব হইতে অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি। বোধ হয় তুমি নিজেই এখন মনে করিতে পারিবে না যে, তোমার চিন্তা প্রথমে কিরূপে আরম্ভ হইয়াছিল?"

"হাঁ—সে কথা ঠিক।"

"আচ্ছা, তাহা হইলে আমিই বলিতেছি। কাগজখানা ফেলিয়া দিয়া তুমি মুহূর্ত্তের জন্য শূন্যমনে চাহিয়া রহিলে। এই কাগজ ছুড়িয়া ফেলাতেই তোমার দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার পর তুমি ঘরের দেওয়ালে

ঐ মহারাণীর বড় ছবিখানার দিকে চাহিলে; তাহাতে আমি বুঝিলাম, তোমার মনে একটা চিন্তা উঠিয়াছে। কিন্তু এ চিন্তা অধিকদূর অগ্রসর হইল না। তুমি তখন ঐ ছবির পার্শ্বে যে ফ্রেমশূন্য লর্ড রবার্টের ছবি রহিয়াছে. তাহার দিকে চাহিলে। তাহার পর দেওয়ালটা দেখিলে, তুমি কি ভাবিতেছ তখন তাহা স্পষ্ট আমি জানিতে পারিলাম। তুমি ভাবিতেছিলে, লর্ড রবার্টের ছবি-খানায় ফ্রেম লাগাইলে দেওয়ালে দুইখানা ছবি বেশ মানাইবে, নয় কি?"

আমি বিস্মিতভাবে বলিলাম, "নিশ্চয়ই—যথার্থই আমি এইরূপ ভাবিয়াছিলাম।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমি জানিলাম, ইহাতে আমার ভুল হয় নাই। তাহার পর আমি দেখিলাম যে, তুমি লর্ড রবার্টের ছবিখানা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিলে; লর্ড রবার্টের সৈন্যের সঙ্গেই তুমি কাবুল-যুদ্ধে গিয়াছিলে, সুতরাং তুমি যে সেই যুদ্ধের বিষয় স্বভাবতই ভাবিবে, তাহা নিশ্চিত। যখন দেখিলাম, তোমার মুখ রক্তিমাভ হইয়া পরক্ষণেই অপ্রসন্ন-ভাব ধারণ করিল, চক্ষু উজ্জ্বল ও হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল, তখন আমি বুঝিলাম, সেই যুদ্ধে উভয়পক্ষ যে বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তুমি তাহাই ভাবিতেছ। ক্ষণপরে তোমার মুখ বিষণ্ণ হইল; তুমি অপ্রসন্নভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলে, তখন আমি বুঝিলাম, তুমি এই সকল রক্তপাত এবং যুদ্ধের ন্যায় ভয়াবহ ব্যাপার ভাবিয়া মনে মনে দুঃখিত হইতেছ। তুমি মনে মনে ভাবিতেছ, মানুষ শান্তি-স্থাপনের জন্য এইরূপ লোমহর্ষণ ভয়াবহ উপায় অবলম্বন করে, এত কাটাকাটি মারামারি—কি বিশ্রী ব্যাপার! এই সময়ে তোমার মনের চিন্তা যে সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি, তাহাই তোমাকে জানাই-বার জন্য তোমার মনের 'বিশ্রী ব্যাপারটা' না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সবই ভ্রম—ডাক্তার, এ জগতে সুশ্রী-বিশ্রী বলিয়া কিছু নাই—তুমি যে যুদ্ধের কথা ভাবিতেছিলে, ইহাতে একটু তন্দ্রার সমাবেশ হইলে দেখিতে পাইতে ঐ সব সত্যই হইতেছে-এমন কি একটা গুলি তোমার দিকেই ছুটিয়াছে—গুলি মাথায় বিঁধিল—ব্যস্,—স্বপ্ন ভাঙ্গিলে তখন নিশ্চিন্ত। এত দেখিয়া-শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছ না ডাক্তার, এ জগৎটা একটা লম্বা রকমের স্বপ্ন। দুদিনের খেলা হাসিমুখে খেলিয়া যাও-সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাক্—এখন বল দেখি, তোমার মনের কথা আমি ঠিক বলিতে পারিয়াছি কি না?"

আমি বলিলাম, "সত্যই তুমি বই পড়িবার ন্যায় আমার মনের সকল

কথাই পড়িয়াছ—আমি তোমার কথা শুনিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিস্মিত হইলাম।”

“ডাক্তার, এ যাহা বলিলাম,—ইহা সামান্য মাত্র, ইহাপেক্ষাও আরও অধিক হইতে পারে, তুমি সে দিন বিশ্বাস কর নাই—সেজন্য একটু নমুনা দেখাইলাম মাত্র। চল; এইবার বৃষ্টি থামিয়াছে, একটু বেড়াইয়া আসা যাক্,—ঘরের মধ্যে পচিয়া মরিতে হইতেছে।”

প্রায় দুই-তিন ঘণ্টা আমরা উভয়ে রাস্তায় রাস্তায় হাওয়ায় ঘুরিলাম। রাজপথের জনতা দেখিতে গোবিন্দরাম বড়ই ভালবাসিতেন। ইহা তাঁহার ‘নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি’ ছিল। পথে গোবিন্দরাম নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে লাগিলেন, নাটক কাব্য সাহিত্য দর্শন কত কি—সকল বিষয়েই তাঁহার পূর্ণাধিকার। তাঁহার কাছে কিছুই ফেলা যায় না; এক একটা যুক্তি প্রয়োগে ক্ষণে ক্ষণে আমাকে তিনি মহাবিস্মিত করিয়া তুলিতেছিলেন, অদ্ভুত লোক! আমাদের বাড়ীতে ফিরিতে রাত্রি নয়টা হইল; বাটীর সম্মুখে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, একখানা ‘ব্রুহাম’ গাড়ী দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে।

গাড়ী দেখিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন, “দেখিতেছি, কোন ডাক্তার, বেশী দিন ডাক্তারী আরম্ভ করেন নাই; তবে পসার মন্দ হয় নাই। আমাদের সঙ্গে কোন বিষয়ে পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন। সৌভাগ্যের বিষয় আমরা এখনই ফিরিয়াছি।”

এমন অসময়ে একজন ডাক্তার কেন আসিয়াছেন, তাহা আমি না বুঝিতে পারিয়া চিন্তিত হইলাম। গোবিন্দরাম এ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, তাহাতে আমার বিস্মিত হইবার কিছুই ছিল না; আমি তাঁহার অনুমান ও সিদ্ধান্তের প্রথা বিশেষ অবগত ছিলাম। গাড়ীতে কয়েকটা ডাক্তারী যন্ত্র পড়িয়াছিল।

২

আমরা দুইজনে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে এক দীর্ঘ কৃশ যুবক উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার বয়স ত্রিশের উর্দ্ধ নহে। তবে তাঁহার মুখ দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সাংসারিক নানা দুর্য্যোগে তাঁহার বয়স অপেক্ষা তিনি কিছু অধিক মাত্রায় বার্দ্ধক্য লাভ করিয়াছেন। তাহার পরিধানে সাদা পেণ্টলুন, কাল কোট ও মাথায় কাল বনাতের গোলটুপী।

গোবিন্দরাম বলিলেন, "আসুন, ডাক্তারবাবু, আপনাকে যে আমাদের জন্য অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই, ইহাতে সন্তুষ্ট হইলাম।"

তিনি বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি আমার কোচ্‌ম্যানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ?"

"না, আপনার গাড়ীই আমাকে সব বলিয়া দিয়াছে। বসুন, এখন আপনার জন্য কি করিতে পারি, বলুন।"

"আমার নাম অখিলচন্দ্র রায়, আমি শ্যামবাজারে থাকি।"

আমি বলিলাম, "আপনিই না "স্নায়ু-শৃঙ্খলা" নামে একখানা পুস্তক রচনা করিয়াছেন ?"

তাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমি জানিতাম, আমার পুস্তকখানি বিস্মৃতির গভীর সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। প্রকাশকেরা বলিয়াছেন, প্রায় আদৌ বিক্রয় হয় নাই। আপনিও একজন ডাক্তার ?"

"হাঁ, সৈন্যদলে ছিলাম, এখন পেন্সন লইয়াছি।"

"স্নায়ু-তত্ত্বই আমার বড় প্রিয় ছিল ; কিন্তু অবস্থা তত ভাল না থাকায় সে সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে পারি নাই। যাহা হউক, গোবিন্দরাম বাবু, আমি জানি, আপনার সময় অতি মূল্যবান্, সুতরাং অনর্থক আপনার সময় নষ্ট করিব না। কথা এই, কতকগুলি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে ; আজ সেইগুলি মিশিয়া গিয়া এমনই এক গুরুতর ভাবে পরিণত হইয়াছে যে, আপনার নিকটে না আসিয়া আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনার পরামর্শ ও সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য আসিয়াছি।"

গোবিন্দরাম চুরুট ধরাইয়া বলিলেন, "বলুন, আমি আনন্দের সহিত উভয় কার্য্যেই প্রস্তুত আছি। সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বলুন ?"

আগন্তুক ডাক্তার বলিলেন, "দুই একটা বিষয় এমনই তুচ্ছ ও সামান্য যে, আমি প্রকৃতই সেগুলি আপনাকে বলিতে লজ্জিত হইতেছি। কিন্তু ব্যাপারটি এতই রহস্যজড়িত যে, আমি সব কথাই আপনাকে বলিতেছি। কোন্‌টা প্রয়োজনীয়, কোন্‌টা অপ্রয়োজনীয়, তাহা আপনি তাহার ভিতর হইতে বাছিয়া লইবেন।"

"আমি কলেজে বিশেষ প্রশংসার সহিত পাশ করিয়াছিলাম ; স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিব, ইহাই আমার মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ; কিন্তু পয়সার

অভাবে তাহা করিতে পারিলাম না। সব ব্যবসাতেই পয়সার প্রয়োজন, ডাক্তারীতেও। অপেক্ষাকৃত ভাল বাড়ী, একখানা গাড়ী, কাটাকুটির যন্ত্রাদি এ সকল সংগ্রহ না হইলে স্বাধীনভাবে ডাক্তারী আরম্ভ করিয়া পশার করা সম্পূর্ণই অসম্ভব। এত পয়সা আমার ছিল না, সেজন্য মনে করিলাম, কিছু দিন চাকরী করিয়া কিছু অর্থ জমাইয়া পরে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা আরম্ভ করিব, এই ভাবিয়া একটা চাকরীও সংগ্রহ করিলাম। সেই চাকরীই করিতে-ছিলাম, কিন্তু এই সময়ে সহসা আমার জীবনের এক ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিল। একদিন ভবানীবাবু নামে এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। তিনি একেবারেই কাজের কথা তুলিলেন।"

"তিনি বলিলেন, 'আপনার নাম অখিলবাবু, আপনিই স্নায়ু সম্বন্ধে একখানা বই লিখিয়াছিলেন না? কলেজেও মেডেল পাইয়াছিলেন।'

"আমি মস্তক অবনত করিয়া 'হাঁ' বলিলাম।"

"তিনি বলিলেন, 'আমি যাহা বলিতেছি, তাহার সাদাসিদে উত্তর দেওয়ায় আপনার স্বার্থ আছে। দেখিতেছি, আপনার বেশ বিচক্ষণত্ব আছে, তবে ব্যবসায় বুদ্ধি কেমন?'

"আমি বিরক্ত হইব কি না, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, মৃদু হাস্য করিলাম। বলিলাম, 'বোধ হয় একটু ব্যবসায় বুদ্ধিও আছে।'

'কোন বদ্ অভ্যাস আছে কি? মদের দিকে ঝোঁকটা কেমন?'

"আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'আপনি যাহা মুখে আসিতেছে, তাহাই বলিতেছেন?'

"তিনি বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিলেন, 'ভাল ভাল, আমি ঠিক ইহাই চাহি, এই সব গুণ থাকিতেও আপনি স্বাধীনভাবে ডাক্তারী করিতে-ছেন না কেন?'

"আমি কেবল মৃদু হাস্য করিলাম। তিনি বলিলেন, 'বুঝিয়াছি,—সেই পুরাতন কথা,—মাথা আছে, পয়সা নাই! যাহা হউক, আমি টাকা দিয়া যদি আপনাকে ব্যবসায়ে বসাইয়া দিই, তাহা হইলে আপনি কি বলেন?'

"আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। তিনি বলিলেন, 'কতকটা আমার নিজের স্বার্থের জন্য আপনাকে এ প্রস্তাব করিতেছি। আমি সকল কথাই আপনাকে খুলিয়া বলিতেছি, শুনুন। আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েন, তবে আমিও আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইব।

আমার কিছু টাকা আছে, আমি আপনার ব্যবসায়ে সে টাকা ফেলিতে প্রস্তুত আছি।'

"আমি অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, 'কেন?'

"কেন? অন্য ব্যবসাও যাহা, ইহাও তাহাই। বরং অন্য ব্যবসায়ে লোকসান হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহাতে লোকসানের সম্ভাবনা কম, আপনি কি বলেন, আমার কথা ঠিক নয় কি? বলিয়া ভবানীবাবু আমার মুখের দিকে জিজ্ঞাসমান নেত্রে চাহিলেন। আমি বলিলাম, 'আমাকে আপনি কি করিতে বলেন?'

"সবই খুলিয়া বলিতেছি। আমি একটা বাড়ী ভাড়া লইব, আস্‌বাব-পত্র সমস্ত কিনিব, গাড়ী ঘোড়া রাখিব, উপস্থিত আপনার সমস্ত খরচ চালাইব, আপনি কেবল রোগী দেখিবেন। আপনি যাহা পারিশ্রমিক পাইবেন, তাহার বার আনা আমি লইব, সিকি আপনার থাকিবে।'

"এ অতি অদ্ভুত ও নূতন প্রস্তাব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, গোবিন্দরাম বাবু আপনাকে অনর্থক বাজে কথা বলিয়া বিরক্ত করিব না; অবশেষে আমি ভবানী বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তিনি শীঘ্রই বাড়ী, আস্‌বাব-পত্র, গাড়ী ঘোড়া সমস্তই ঠিক করিলেন। আমি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া স্বাধীনভাবে ডাক্তারী আরম্ভ করিলাম।"

"ভবানী বাবুর শরীর ভাল ছিল না, তিনি আমার সেই ডাক্তারখানার নূতন বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকেও চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম। উপরের ভাল ঘরটি তিনি অধিকার করিয়া বসিলেন। তিনি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতেন না, বাড়ীর বাহিরও প্রায় হইতেন না,—হইলেও রাত্রি নয় টার সময় একটু বেড়াইতে যাইতেন। প্রত্যহ রাত্রে আহারের পূর্ব্বে আমার ঘরে আসিয়া আমি সমস্ত দিনে যাহা উপার্জ্জন করিতাম, তাহার সিকি আমাকে দিয়া বার আনা লইয়া যাইতেন। তাঁহার ঘরে একটা বড় লোহার সিন্দুক ছিল, তিনি সেই সিন্দুকে তাঁহার টাকা-কড়ি বন্ধ করিয়া রাখিতেন।

"তাঁহার টাকা যে তিনি নির্ব্বোধের ন্যায় আমার ব্যবসায়ে ফেলেন নাই, তাহা তিনিও শীঘ্র বুঝিতে পারিলেন। আমার রোগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; প্রকৃতপক্ষে তিনি শীঘ্রই বড় লোক হইয়া উঠিলেন। আমার গত ইতিহাস এই পর্য্যন্ত। এখন যাহা সম্প্রতি ঘটিয়াছে, তাহাই বলি;—

"একদিন ভবানী বাবু অতি বিচলিতভাবে আমার ঘরে আসিলেন। কোথায় একটা বাড়ীতে কি চুরী হইয়াছে, সেই কথা বলিয়া বলিলেন, 'আমাদের এখন আরও সাবধানে থাকা উচিত। আমার টাকা-কড়ি সমস্তই এই বাড়ীতেই আছে।'

"এক সপ্তাহ তিনি সর্ব্বদাই অতিশয় ভীতভাবে কাল কাটাইলেন; মধ্যে মধ্যে চমকিত হইয়া জানালার দিকে চাহিতেন। তিনি যে রাত্রিতে বেড়াইতে বাহির হইতেন, তাহাও বন্ধ করিলেন। আমি তাঁহার এই অনর্থক ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি এতই রাগত হইয়া উঠিলেন যে, আমি আর তাঁহার নিকটে এ কথা উত্থাপন করিলাম না।

"ক্রমে যতই সময় যাইতে লাগিল, তাহার এই অত্যদ্ভুত ভয়ও ক্রমে দূর হইল। কিন্তু সম্প্রতি যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে তিনি ভয়ে প্রায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছেন, এখনও সেই অবস্থায়ই পড়িয়া আছেন।

"যাহা ঘটিয়াছে তাহা এই ;—দুই দিন হইল আমি এই পত্র পাইলাম—

'ডাক্তার বাবু,

পশ্চিমের একজন জমিদার চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছেন, তিনি আপনার নাম শুনিয়া, আপনার চিকিৎসাধীন থাকিতে ইচ্ছা করেন। আজ রাত্রি আটটার সময় তিনি আপনার বাড়ীতে উপস্থিত হইবেন। আশা করি আপনার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইবে। তাঁহার মৃগিরোগ হইয়াছে।' পত্রে নাম তারিখ বা ঠিকানা নাই।

"মৃগিরোগ সম্বন্ধে আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল; সেজন্য এরূপ রোগী ও এরূপ রোগ চিকিৎসা করিতে পারিব বলিয়া আমি বিশেষ উৎসুক হইয়া উঠিলাম। এমন কি আমি সে দিন সন্ধ্যার পর আদৌ বাহির হইলাম না। আমার এই পশ্চিম প্রদেশীয় নূতন রোগীর প্রতীক্ষায় রহিলাম।

"ঠিক আটটার সময়ে আমার ভৃত্য তাঁহাকে আমার ঘরে আনিল। দেখিলাম তাঁহার বয়স হইয়াছে, খুব গম্ভীর, তবে চেহারা দেখিলে জমিদার বা বড়লোক বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সঙ্গে যিনি আসিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। ইঁহার বয়স সাতাশ বৎসরের বেশী নহে, অতি সুপুরুষ, অতি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ যুবক, দেখিলে বোধ হয় কুস্তিতে সিদ্ধহস্ত। তিনি আপনিই হাত ধরিয়া তাঁহাকে অতি সাবধানে ও যত্নে আনিয়া আমার সম্মুখস্থ চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। যুবক ভাঙ্গা ভাঙ্গা

বাঙ্গালায় বলিলেন, 'ইনি আমার পিতা, ইঁহার চিকিৎসার জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছি।'

"আমি বলিলাম, 'আপনার পিতাকে পরীক্ষাকালে আপনি বোধ হয় উপস্থিত থাকিতে ইচ্ছা করেন না!' তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'না, না, আপনাকে বিরক্ত করিব না, আমি বাহিরের ঘরে বসিতেছি, নির্জ্জনে পরীক্ষা করাই ভাল।'

"আমি ইহাতে আপত্তি করিলাম না, তিনি বাহিরের ঘরে গেলেন। আমি রোগীকে রোগের সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। তিনি যাহা যাহা বলিলেন, সমস্তই লিখিয়া লইতে লাগিলাম, সহসা তাঁহার কথা বন্ধ হইল, তিনি সিধা হইয়া বসিলেন। দেখিলাম, তাঁহার দেহ কাঠের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে, চোখে তেজ নাই, চক্ষুর তারা অচঞ্চল স্থির, নিঃশ্বাসও প্রায় বন্ধ। আমার ভয় হইল, আমি একটা ঔষধ আনিতে উপরে ছুটিলাম।

"ফিরিয়া আসিয়া দেখি ঘর শূন্য, আমার রোগী নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। আমি বিস্মিত হইয়া বাহিরের ঘরে গিয়া দেখি, রোগীর পুত্রও নিরুদ্দেশ। তখন ভৃত্যকে ডাকিয়া তাঁহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল 'কই কাহাকেও বাহির হইয়া যাইতে দেখি নাই।'

"এই ভৃত্যকে আমি সম্প্রতি রাখিয়াছি, তাহার মস্তিষ্কে বুদ্ধি নামক পদার্থ যে কিছুমাত্র আছে, তাহা বলিয়া বোধ হয় না। আমি বুঝিলাম, সে নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যাইতেছিল। বলা বাহুল্য, গোবিন্দরাম বাবু, এই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারে আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম। তখন ভবানী বাবু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে কিছুই বলিলাম না। বলা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম না, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত আমি আজ কাল পারতপক্ষে প্রায়ই কোন কথা কহিতাম না।

"আর যে কখনও এই হিন্দুস্থানী জমিদারকে দেখিতে পাইব, তাহা আমি মনে করি নাই। সেই জন্য পর দিন ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তিনি বলিলেন, 'কাল হঠাৎ না বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলাম, ইহার জন্য ক্ষমা করিবেন। আমার মৃগিরোগ জন্মিলে কোন জ্ঞান থাকে না। রোগের অবস্থায় বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলাম।'

"পুত্র বলিলেন, 'বাবাকে ঐরকম ভাবে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া আমিও বাধ্য হইয়া তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম।

"আমি হাসিয়া বলিলাম, 'আপনাদের এরূপভাবে চলিয়া যাওয়ায় আমি বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলাম, সন্দেহ নাই ; তবে তাহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই, আসুন। কাল যে পর্য্যন্ত হইয়াছে, তাহার পর হইতে এখন আরম্ভ করা যাক্।' আমি প্রায় আধঘণ্টা তাঁহার সহিত কথা কহিয়া তাঁহার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।—তখন পিতা পুত্রে উভয়ে আমার বাড়ী হইতে বিদায় হইলেন।

"এই সময়ে প্রায় প্রত্যহ ভবানী বাবু বেড়াইতে যাইতেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে একটু পরেই তিনি ফিরিয়া আসিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। পরমুহূর্ত্তেই তিনি সহসা উন্মত্তের ন্যায় আমার ঘরে প্রবেশ করিলেন। ভয়ে তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি যেন সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে। তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, 'আমার ঘরে কে গিয়াছিল ?'

"আমি বলিলাম, 'কেহ নয় !'

ভবানী বাবু গর্জ্জিয়া বলিলেন, 'মিথ্যাকথা—এস—দেখ।'

"ভয়ে তাঁহাকে একেবারে জ্ঞানশূন্য দেখিয়া, আমি তাহার রূঢ় কথায় কান দিলাম না, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উপরে আসিলাম। তিনি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কতকগুলি পদচিহ্ন দেখাইয়া দিলেন। আমি দেখিলাম, যথার্থই গৃহতলে কাহার পায়ের জুতার দাগ অঙ্কিত হইয়াছে।

"তিনি কম্পিতস্বরে বলিলেন, 'তুমি কি বলিতে চাও যে, এই সকল দাগ আমার পায়ের ?'

"আমি দেখিলাম, যথার্থই সেগুলি ভবানী বাবুর পায়ের দাগ নহে, তাঁহার পা হইতে এই সকল দাগ অনেক বড়। দাগগুলি দেখিয়াই আমার মনে হইল, ইহা সেই জমিদারের ছেলের পায়ের দাগ। কারণ, অন্য আর কেহই সে সময়ে আমার বাড়ীতে আসে নাই। হয় ত যখন আমি তাহার পিতাকে দেখিতেছিলাম, সেই সময়ে সে এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। অথচ গৃহ হইতে কোন জিনিষ হারায় নাই। লোকটি গৃহমধ্যে আসিলেও কোন দ্রব্যে হাত দেয় নাই। সুতরাং এ বিষয় লইয়া ভবানী বাবু এত ভীত ও বিচলিত হইলেন কেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রকৃতপক্ষে ভয়ে লোকটি হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। ভয়ে যে মানুষ এরূপ হইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। বুঝিলাম, ইহার ভিতরে কোন গূঢ় রহস্য আছে, তাহাই ছুটিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। আশা করি, আপনি এ রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন।"

গোবিন্দরাম নীরবে বসিয়া শুনিতেছিলেন। ডাক্তারের কথা শেষ হইলে তিনি আমার দিকে আমার ছড়িটা ছুড়িয়া দিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, এই তোমার ছড়ি—ওঠো।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

রাধাকৃষ্ণ-স্তোত্রং।

নবনীরদ-নিন্দিত কান্তি-যুতং
গিরিরাজ-সুতেশ-বিরিঞ্চিনুতং।
ঘন-পীন-পয়োধর-ভারনতাং
প্রণমামি হরিং বৃকভানুসুতাং ॥ ১ ॥

ধরণীধর-কণ্টকি-রূপধরং
ভবদুস্তর-সাগর-পার-করং।
ব্রজগোপবধূ-সকলৈর্নমিতাং
প্রণমামি হরিং বৃকভানুসুতাং ॥ ২ ॥

মথুরাপতি-কংস-বিনাশকরং
মধুকৈটভনাশক-চক্রধরং।
অপবর্গমহীরুহ-শান্তিলতাং
প্রণমামি হরিং বৃকভানুসুতাং ॥ ৩ ॥

তপনাত্মজভীতি-বিনাশকরং
মুরলীধর-ভূধরধারি-সুরং।
ললিতাদি-সখী-পরিবেষ্টকৃতাং
প্রণমামি হরিং বৃকভানুসুতাং ॥ ৪ ॥

শ্রীবৈদেহীবল্লভ শর্ম্মরায়।

কামাখ্যা-মন্দির।

অসংখ্য পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত কামরূপের প্রধান সহর গৌহাটীর দুই মাইল পশ্চিমে কামাখ্যা পাহাড় অবস্থিত। পবিত্র সলিল প্রবাহী ব্রহ্মপুত্র নদ ইহার দক্ষিণ পাদদেশ ধৌত করিয়া প্রবাহিত। এই পাহাড়ের একটি টিলাতে পূর্ব্বতন আর্য্যরাজাদিগের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া মহামায়া আদ্যাশক্তির মহাপীঠস্থান এবং পীঠাবরক মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরের আকার নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। কারুকার্য্যও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। ইহাই আসামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। এই স্থান ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি-উপাসক-দিগের তীর্থস্থান।

প্রাচীনকালে কামাখ্যা পাহাড়ের নাম ছিল নীলাচল পর্ব্বত। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে, প্রাচীনকালে এই পাহাড়ে নীলবর্ণ বানর বাস করিত। কিন্তু কালিকাপুরাণে পাওয়া যায়,—

> "লীনায়াং যোগনিদ্রায়াং ময়ি পর্ব্বতরূপিণি।
> স নীলবর্ণঃ শৈলোঽভূৎ পতিতে যোনিমণ্ডলে॥"

শিব বলিতেছেন, যখন যোগনিদ্রা-স্বরূপিণী সতী লীন হইয়াছিলেন, তখন মমরূপী পর্ব্বতের উপরে সতীর যোনিমণ্ডল পতিত হওয়াতে পর্ব্বত নীল-বর্ণ হইয়া যায়, সেই জন্য এই পর্ব্বতের নাম নীলাচল হয়। কামাখ্যা নামোৎ-পত্তি সম্বন্ধেও কালিকাপুরাণে উক্ত আছে ;—

> "কামার্থমাগতা যস্মান্ ময়াসার্দ্ধং মহাগিরৌ।
> কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলশৈলে রহোগতা।
> কামদা কামিনী কামা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
> কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে।"

কামাদি চতুর্ব্বর্গ সাধনের জন্য ভগবতী আমার সহিত এই পর্ব্বতে আসিয়া-ছিলেন বলিয়া নীলপর্ব্বতবাসিনীর নাম কামাখ্যা হইয়াছে। কামদা, কামিনী, কামা, কামাঙ্গদায়িনী ও কামাঙ্গনাশিনী বলিয়া এই পর্ব্বতকে কামাখ্যা বলা হয়। সে যাহা হউক শক্তি উপাসকদিগের আরাধ্যা ৺কামাখ্যা-

দেবীর নাম প্রভাবেই এই মন্দিরের এত সমৃদ্ধি ও গৌরব। সেই জন্য এই মন্দিরের নাম মন্দির-নির্ম্মাতার নাম অনুসারে না হইয়া মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী ৺কামাখ্যা দেবীর নাম অনুসারে কামাখ্যা-মন্দির হইয়াছে। কামাখ্যা-মন্দিরের বিষয় জানিবার পূর্ব্বে কামাখ্যাদেবীর সম্বন্ধে আলোচনা বোধ হয় এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কামাখ্যাদেবীর বিষয় জানিতে হইলে পুরাণাদির সাহায্য দরকার। প্রায় সকল তন্ত্র ও পুরাণেই ৺কামাখ্যাদেবীর কথা আছে। কালিকাপুরাণে মহাদেব বেতাল ভৈরবকে বলিয়াছেন ;—

"অথ কালে বহুতিথে ব্যতীতে প্রাণিসর্জ্জনে।
অগৃহ্নং দক্ষতনয়াং ভার্য্যার্থেঽহং বধূবরাং।
সা মেঽভূৎ প্রেয়সী ভার্য্যা প্রাদায় সময়ং পিতুঃ।
অনিষ্টকারী ত্বঞ্চেৎস্যাঃ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যে তদা ত্বহং।
ততো যজ্ঞে সমারব্ধে স চ বব্রে চরা-চরান্।
ন মাং নাপি সতীং বব্রে তদনিষ্টান্ মৃতা তু সা।
ততোমোহং সমাপন্ন স্তামাদায় মৃতামহং।
প্রাপ্তঃ পীঠবরং তন্তু ভ্রমমাণ ইতস্ততঃ।
তস্যাস্ত্বঙ্গানি পর্য্যাগাৎ পতিতানি যতোযতঃ।
তত্তৎ পুণ্যতমং জাতং যোগনিদ্রা-প্রভাবতঃ।
তস্মিংস্ত কুব্জিকাপীঠে সত্যাস্তৎ যোনিমণ্ডলং।
পতিতং তত্র সা দেবী মহামায়া ব্যলীয়ত।"

প্রাণি-সর্জ্জনের বহুকাল পরে যখন আমি দক্ষতনয়া সতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনি তখন আমার প্রেয়সী ভার্য্যা হইয়াছিলেন এবং তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আসিবার সময় পিতাকে বলিয়া আসেন, 'যখন আমাকে অনাদর করিবেন, তখন আমি দেহত্যাগ করিব।' পরে অনেকদিন গত হইলে দক্ষরাজ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। যজ্ঞে আমি ও সতী ব্যতীত সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সতী আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়া বিনা নিমন্ত্রণেই গমন করেন এবং অনাদর প্রাপ্ত ও পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে আমি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করি এবং সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া পাগলের ন্যায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে থাকি। আমার তেজে সতীর দেহ নষ্ট হইয়া যায় নাই। আমার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া দেবতাগণ

সতীর দেহে প্রবিষ্ট হন, তাহাতে সতীর অঙ্গ নষ্ট হইয়া যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থান পুণ্যক্ষেত্র হয়। কুব্জিকাপীঠে সতীর যোনিমণ্ডল পতিত হইয়াছে এবং সত্যই এই যোনিমণ্ডলে কামাখ্যা বাস করেন।

কালিকাপুরাণ ব্যতীত যোগিনীতন্ত্রেও কামাখ্যাদেবীর কথা এইরূপ উক্ত আছে ;—

"ভো ব্রহ্মন্ শৃণু বৎসৈতদ্বচনং মে শুভোদয়ং।
কেশিদৈত্য বধার্থায় যত্র মে পূজনং কৃতং।
যুবাভ্যাং তত্র পশ্যধ্বং জাতং মে যোনিমণ্ডলং।
জানীহি প্রকৃতিং দেব যোনিমেতান্তু মামকীং।
সম্পূজ্য যোনিং দেবেশ সৃষ্টিং কুরু যথার্থতঃ।
সর্ব্বত্রাপি ভয়ং ন স্যাৎ তব ক্বাপি পিতামহ।
অধিষ্ঠানমস্তি মম তত্র পীঠে ন সংশয়ঃ।
জানীহি তদধিষ্ঠাত্রী রূপং মেঽতিসুশোভনং।
নিত্যং পূজয় তদ্রূপং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলে।"

দেবী ব্রহ্মাকে বলিতেছেন, "হে ব্রহ্মন্! আমার এই শুভকর বাক্য শ্রবণ কর। কেশী দৈত্যকে বধ করিবার জন্য যেস্থানে আমার পূজা করিয়াছিলে, তথায় তোমরা অবলোকন কর। সেখানে যোনিমণ্ডল উদ্ভব হইয়াছে, এই যোনিমণ্ডল সর্ব্বসাধারণের উৎপত্তি স্থান, ইহাতে সংশয় নাই। অতএব তোমরা যোনিমণ্ডল পূজা করিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হও। হে পিতামহ! তাহা হইলে তোমার আর কোন স্থানে ভয় হইবে না। সেই পীঠে সর্ব্বদাই আমি অবস্থিতি করিতেছি, ইহাতে অনুমাত্রও সংশয় নাই। সেই বিখ্যাত যোনিমণ্ডলে অধিষ্ঠাত্রীরূপে আমার সুশোভন রূপ সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যোনিমণ্ডলে প্রত্যহ পূজা কর।"

কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রের মতে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। যোগিনী তন্ত্রের মতে কামাখ্যা পীঠের উৎপত্তি প্রাণী সৃষ্টির পূর্ব্বে, আর কালিকাপুরাণে সৃষ্টির সমসাময়িক। এই দুই গ্রন্থই বহু পুরাতন, তাহাদের মধ্যে প্রভেদ থাকা অসম্ভব নহে। অতিরঞ্জিত কথা যতই থাক না কেন, ইহারা ৺কামাখ্যা দেবীর প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে পরিষ্কার রূপে প্রমাণ করিতেছে। পৌরাণিক উপাখ্যান ছাড়িয়া দিলেও ঐতিহাসিক প্রমাণ দুর্ল্লভ নহে।

স্বর্গীয় গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর তাঁহার আসাম বুরুঞ্জীতে * এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ দেওয়া গেল। পূর্ব্বতন আর্য্য ঋষি-গণ যোগাভ্যাসের নিমিত্ত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থান অনুসন্ধান করিয়া মাত্র ৫১টী তপস্যার উপযোগী স্থান পাইয়াছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও নির্জ্জনতার উপযুক্ততা অনুসারে তপস্যার স্থান নিরূপিত হইয়াছে, সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। কামরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে অন্যান্য তীর্থ অপেক্ষা কম নহে। আর কোন এক সময়ে কোন যোগী যে এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন ইহাতে সংশয় নাই। এইরূপ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে পরিশোভিত স্থান মহাপীঠ অর্থাৎ তপস্যার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই প্রদেশের যেখানে সেখানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখা যায়. তাহার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ গৌহাটী। শাস্ত্রে উক্ত আছে 'অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে।' ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে. আসামে আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপনের সময় কামাখ্যা দেবীর উৎপত্তি। খৃষ্ট জন্মিবার বহু বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যজাতি আসাম প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। কামাখ্যা পীঠের উৎপত্তি আর্য্যোপনিবেশ স্থাপনের সম-সাময়িক হইলেও পীঠাবরক মন্দির ইহার বহু পরে নির্ম্মিত হই-য়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। আসামে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপনের বিবরণ পৌরাণিক কল্পনা-ঘনজালে আবৃত। বিশাল সাগরসদৃশ পুরাণশাস্ত্র-সকল মন্থন করিয়া কুহকিনী কল্পনার জাল ছিন্ন করিয়া ঐতিহাসিক রত্ন উদ্ধার করিতে হইলে বহু গবেষণা ও কঠোর পরিশ্রম করিয়া প্রাচীন কামরূপের ইতিহাস আলোচনা করা দরকার।

কামরূপের প্রাচীন নাম ম্লেচ্ছদেশ। যে সময়ে কামরূপে হিন্দুধর্ম্ম ছিল না, জ্ঞানালোক বিকশিত হয় নাই,—অনাচার অনার্য্যধর্ম্ম প্রচলন ছিল, সেই সময় অন্য প্রদেশবাসী আর্য্যগণ কামরূপকে ম্লেচ্ছদেশ বলিত। যে সময়ে ইহার নাম ম্লেচ্ছদেশ ছিল. সে সময় কামাখ্যার নাম গন্ধও ছিল না। যদিও সেই সময় অনার্য্যদিগের মধ্যে দেবদেবীর পূজার চিহ্ন পাওয়া যায়, তথাপি আর্য্যদিগের উপাস্য ৺কামাখ্যাদেবীর পূজা তাহারা করিত বলিয়া বোধ হয় না। কালক্রমে আসামে হিন্দুধর্ম্মের প্রচলন হইল, যখন আসামে আর্য্যগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তখন ম্লেচ্ছদেশ নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া

* বুরুঞ্জী শব্দের অর্থ ইতিবৃত্ত। আহোম "বু" অর্থ অজ্ঞ। "রুণ" অর্থ শিক্ষা দেওয়া এবং "ঞ্জী" অর্থ ভাণ্ডার। অর্থাৎ অজ্ঞ লোকেরা যে ভাণ্ডার হইতে শিক্ষালাভ করে।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌ এবং তাহার রাজধানীর নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর হয়। এই নামকরণ সম্বন্ধে অনেকে মনে করেন প্রাচীনকালে এইস্থানে জ্যোতির্ব্বিদ্যার আলোচনা খুব প্রবল ছিল। ইহার প্রমাণ স্বরূপ চিত্রাচলের নবগ্রহের মন্দির * এবং ত্রিকোণমিতি ও গ্রহের গতিবিধি দেখিবার সুন্দর স্থান ভুবনেশ্বরী † পর্ব্বতের উল্লেখ করেন। ইহা জনশ্রুতি মাত্র। ইহা ব্যতীত কালিকা-পুরাণে আছে, যথা,—

"অস্য মধ্যে স্থিতো ব্রহ্মা প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সসর্জ্জ হ।
তেন প্রাগ্‌জ্যোতিরাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরী সমা।"

ব্রহ্মা পূর্ব্বে এইস্থানে বসিয়া নক্ষত্র সর্জ্জন করেন। সেই জন্য এই স্থানের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌ হইয়াছে এবং এইস্থান ইন্দ্রপুরীর তুল্য ছিল। কিন্তু মনস্বী ব্যক্তিগণ বহু গবেষণা দ্বারা অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষের মধ্যে সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রথমে এইস্থানে পতিত হয়। সেই হইতেই ইহার নাম প্রাগ্‌-জ্যোতিষ্‌ হইয়াছে। এই নামের ইতিহাস যে প্রকারই হউক না কেন, ইহা অত্যন্ত পুরাতন ও ত্রেতাযুগের রামচন্দ্রের সম-সাময়িক। রামচন্দ্রের সময় হিন্দু উপনিবেশ সুদূর লঙ্কা পর্য্যন্ত গিয়াছিল এবং কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে হনুমান রামচন্দ্রকে এই স্থানের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ্‌ বলিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সময়েই কামাখ্যা পীঠের উৎপত্তি-সম্ভব। কারণ রামচন্দ্রের সময়ে অনার্য্য লোকদিগের বানর, ভল্লুক উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। ভগবতীর পীঠ-স্থান প্রথমে নীলবানরের আবাসভূমি বলিয়া উক্ত আছে, আর এই দেশের অনার্য্য মিকিরজাতি তাহাদিগকে বালীর বংশধর বলে। এই কাল্পনিক জন-প্রবাদ দ্বারা এই বুঝা যায় যে, ভগবতী নীলবর্ণ বানর তাড়াইয়া দিয়া কামাখ্যায় অবস্থানের অর্থ আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে তাড়াইয়া দিয়া শক্তিপীঠ বাহির করার রূপান্তর। এই শক্তিপীঠের উৎপত্তি রামচন্দ্রের সমসাময়িক। কিন্তু তখনও এই মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। বোধ হয় তখন ম্লেচ্ছদিগের ভয়ে সঙ্কোচিত হইয়া পীঠস্থানে সামান্যরূপ অরণ্যসুলভ লতাপাতার ঘর ছিল। কালক্রমে এইস্থানে মন্দির স্থাপিত হয়। যখন এই স্থানে মন্দির নির্ম্মিত

* চিত্রাচল পর্ব্বত গৌহাটীর অত্যন্ত নিকটে। এখানে সূর্য্যাদি নবগ্রহের লিঙ্গাকার শিলামূর্ত্তি আছে।

† ভুবনেশ্বরী পর্ব্বত খুব উচ্চ, এখানে একটী মন্দির আছে।

হয় তখন এই স্থানের নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষের স্থানে কামরূপ হয়। কামরূপ নামকরণ সম্বন্ধেও কালিকাপুরাণে আছে, যথা—

"শম্ভোর্নেত্রাগ্নিনির্দ্দগ্ধঃ কামঃ শম্ভোরনুগ্রহাৎ।
তত্র রূপং যতঃ প্রাপ কামরূপ স্ততোমতম্।"

মহাদেবের চক্ষু হইতে বহির্গত অগ্নিদ্বারা কামদেব ভস্মীভূত হইলে, মহাদেবের অনুগ্রহে এই দেশে পুনরায় পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এই দেশের নাম কামরূপ। কিন্তু ৺ গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর আসাম বুরুঞ্জীতে এই বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার অনুবাদ এই—"পূর্ব্বকালে এই স্থানের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকায় লোকের চেহারা (১) অত্যন্ত সুন্দর ছিল, এই কারণ হইতে কামদেবের পুনর্জ্জন্মরূপ অলৌকিক কথায় প্রবর্ত্তিত হয়।" আবার অনেকে বলেন যে, ভগবতীর কামপীঠ থাকার জন্য কামরূপ নাম হইয়াছে। এই কামরূপ নামের ইতিহাস যে প্রকারই হউক না কেন তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। তবে কামরূপ নাম সম্বন্ধে এই স্থির করা যায় যে, এই নাম শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। শ্রীকৃষ্ণের সময় গান্ধার (২) হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে বহুসমৃদ্ধি সম্পন্ন অনেক সহর ছিল। সেই সময় আর্য্য জাতীর সুখ-সৌভাগ্য ও বিদ্যা-বুদ্ধির উজ্জ্বল যোগ। তখন কামাখ্যা-মন্দির স্থাপিত হয় এই কথা বলা যাইতে পারে। সেই সময়ে কামরূপের রাজা নরক (৩) কামাখ্যা মন্দির নির্ম্মাণ করেন বলিয়া আজও প্রবাদ আছে। নরক, যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণ এক সময়ের। সুতরাং কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে কামাখ্যা মন্দির নরককর্ত্তৃক প্রথম নির্ম্মিত হয়। ইহার পর মন্দিরটী ভাঙ্গিয়া যায় কেবল ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

নরকরাজা কে, কেন, কোনসূত্রে ও কিরূপে মন্দির নির্ম্মাণ করেন এই সমস্ত কথা মন্দিরের প্রধান অঙ্গ; সুতরাং নরকরাজা সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা আবশ্যক। নরকরাজা সম্বন্ধে অলৌকিক ও অতিরঞ্জিত অনেক কথা আছে। নরকের রাজত্ব সময়ে কামরূপ চীনপ্রদেশের সীমা হইতে সাগরোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নরকের রাজ্য প্রাচীন কামরূপের একটী অংশ মাত্র। তাহার রাজধানী প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর নামক স্থানে ছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষ্পুর নাম লোপ প্রাপ্ত হইয়া গৌহাটী হইয়াছে। গৌহাটী নাম হইবার কারণ নির্দ্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন; যাহা হউক এই নামটী অত্যন্ত পুরাতন, আসাম রাজার

(১) চেহারা কথিত ভাষা। (২) বর্ত্তমান আফগানিস্থান। (৩) নরকাসুর।

পূর্ব্বেও নাকি ইহার নাম গৌহাটী ছিল। নরকরাজাকে অনেকে অসুর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বোধ হয় নরক অনার্য্য নহেন, কেবল নিজের কুব্যবহারের জন্যই অসুর উপাধি পাইয়াছেন। তন্ত্র, পুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতি হইতে জানা যায়, বরাহরূপী বিষ্ণুর ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে নরকের জন্ম। রাজর্ষি জনক তাহাকে মৃত্তিকা হইতে বাহির করেন। বিষ্ণুর ঔরসে যাহার জন্ম, যাহাকে রাজর্ষি জনক প্রতিপালন করেন, যিনি কামাখ্যার উন্নতি-কল্পে মনোযোগ দিয়াছিলেন, তাঁহাকে অনার্য্য বলা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। তবে নরকরাজা কামরূপে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করতঃ অনার্য্য ধর্ম্মগ্রহণ করেন এবং নিজের উপাস্যা কামাখ্যাদেবীকেও পাপচক্ষে নিরীক্ষণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে এই রাজার নাম আছে. দেখিয়া ইহাঁকে রামচন্দ্রের সমসাময়িক বলিয়া অনেকে মনে করেন। রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠিরের সময়ের এত প্রভেদ যে, এত দিন একজন রাজার পক্ষে রাজত্ব করা অসম্ভব। ইহাতে এই বুঝা যায় যে, নরক নামে অনেক রাজা ছিলেন, অথবা নরক নামে একটা বংশ ছিল। এই অনুমান সত্য বলিয়া ধরিলে কামাখ্যা-মন্দির নির্ম্মিতা নরকরাজা যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। এই নরকরাজা অধার্ম্মিক ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হইয়াছিল। এই অধার্ম্মিক নরক কি জন্যে কামাখ্যা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার একটী প্রবাদ আছে। প্রবাদটী এই—কোন এক সময়ে রাজা নরক কামাখ্যা দেবীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে কামাখ্যাদেবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "যদি এক রাত্রির মধ্যে তুমি আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ও পুষ্করিণী প্রভৃতি বাঁধাইয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।" নরকরাজা কামাখ্যাদেবীর এই কথা শুনিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইলেন এবং তাহাকে এক রাত্রির মধ্যে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিলেন। বিশ্বকর্ম্মা আদেশানুরূপ এক রাত্রিতেই প্রায় সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়াছেন, এমন সময় দেবী মনে মনে প্রমাদ গণিলেন এবং একটী কুক্কুট দ্বারা শব্দ করাইয়া নরককে বলিলেন, তোমার কাজ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই প্রভাত হইয়াছে। ইহাতে নরকরাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সেই কুক্কুটটাকে বধ করিয়াছিলেন। যেস্থানে নরক কুক্কুটটাকে বধ করিয়াছিলেন সেই স্থান এখনও কুক্কুরাকটা (১) নামে অভিহিত। ইহাই কামাখ্যাদেবীর আদি

(১) কুক্কুটকে আসামী ভাষায় কুক্কুরা এবং কাটাকে কটা বলে।

মন্দির। কালক্রমে ইহা ভাঙ্গিয়া গেলে কেবল ভিত্তিমাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই সময় আর্য্য-সৌভাগ্যের উজ্জ্বল যোগ শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক। ইহার পর হইতেই মন্দিরের উন্নতির স্রোতে বাধা পড়ে।

নরকের পর ভগদত্ত রাজা হন। তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু তিনি কামাখ্যাদেবীর ভক্ত ছিলেন না, তিনি মহাদেবের আরাধনা (২) করিয়া মহাশক্তিশালী হইয়াছিলেন। ভগদত্ত রাজা কামাখ্যাদেবীকে পিতৃশত্রু ভাবিয়া তাঁহার উন্নতির চেষ্টা করেন নাই। তাহা হইলেও তিনি কামাখ্যাদেবীর কোন অনিষ্ট করেন নাই এবং বাহিরের অনার্য্য সকলেও কোন অপকার করিতে পারেন নাই। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভগদত্ত রাজার মৃত্যু হয় এবং যুদ্ধের পর হইতে আর্য্যজাতি ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে আর সেই সঙ্গে অনার্য্য বিপ্লবে আসাম-আর্য্যধর্ম্মের কেন্দ্রস্থান কামাখ্যাপীঠের সম্মান ও আর্য্যকীর্ত্তিমন্দির শ্রীহীন হইয়া যায়।

ইহার পর কামাখ্যা দেবীর নাম প্রায় লোপপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গদেশে যদিও অনেকে পুরাণ তন্ত্রাদির সাহায্যে কামাখ্যা-পীঠের নাম জানিতেন, তথাপি পীঠস্থান কোথায় তাহা জানিতেন না। বহুদিন যাবৎ এইরূপ চলিয়া আসিয়াছিল, যাহা হউক পীঠস্থান পুনঃপ্রকাশের বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। এই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে, গল্পটি ৺গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুরের আসাম বুরুঞ্জী হইতে সংগৃহীত। গল্পটি এই—কোন এক সময়ে কোচরাজ বিশ্বসিংহ মৃগয়ার নিমিত্ত বহির্গত হন, দৈবক্রমে তিনি তাহার সৈন্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরিলে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে কামাখ্যা পাহাড়ে উপস্থিত হন। ইহা কামাখ্যা পাহাড় অথবা এখানে কোন গুপ্তপীঠ আছে তাহা তিনি জানিতেন না। মহারাজ বিশ্বসিংহ তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটী মাটীর ঢিপির নিকট একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। তিনি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছিলেন এবং বৃদ্ধার নিকট তাঁহার তৃষ্ণার কথা জ্ঞাপন করায় বৃদ্ধা জলদান করতঃ রাজার তৃষ্ণা নিবারণ করেন। বিশ্বসিংহ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃদ্ধা তদুত্তরে শুধু বলিলেন, এখানে মাটীর নীচে গুপ্ত পীঠস্থান আছে। রাজা বিশ্বসিংহ তাহার কথা পরীক্ষা করিবার মানসে নিজ সৈন্যগণের পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনা করেন; অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার সৈন্য আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলে রাজা পীঠস্থানের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন,

(২) মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব।

ইহার নাম কামাখ্যাপীঠ, তখন তিনি পীঠস্থানে একটী সুবর্ণমন্দির প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কোচরাজ বিশ্বসিংহ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান করতঃ একটি সভা করিলেন এবং যখন সভার পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা উহাই কামাখ্যাদেবীর পীঠস্থান বলিয়া নির্ণীত হইল, তখন তিনি মাটীর ঢিপি খনন করাইয়া রক্ত-পাষাণ-রূপিণী কামাখ্যাদেবীর মহা-পীঠস্থান বাহির করেন এবং তাহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। খননের সময় নরক-নির্ম্মিত মন্দিরের অবশিষ্ট তলভাগটাও পাইয়াছিলেন, সেই ভিত্তির উপরই মন্দির নির্ম্মিত হয় এবং সোণার মন্দিরের পরিবর্ত্তে প্রতি ইষ্টকখণ্ডে একরতি পরিমাণ স্বর্ণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহাই কামাখ্যাদেবীর দ্বিতীয় মন্দির। ৺গুণাভিরাম বরুয়া বাহাদুর লিখিয়াছেন, কোচরাজ বিশ্বসিংহ ১৪৫০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫২৮ অব্দে পরলোক গমন করেন কিন্তু গেইট সাহেব (১) লিখিয়াছেন ১৫৩৪ অব্দে বিশ্বসিংহ পরলোক গমন করেন। ইনি ২৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন সুতরাং যদি তাঁহার মৃত্যু ১৫৩৪ অব্দেই হয় তবে ১৫০৯ অব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। পণ্ডিতমণ্ডলী আহ্বান ও মন্দির নির্ম্মাণ বোধ হয় তাহার রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে হইয়াছিল।

বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নরনারায়ণ সিংহ সিংহাসনে আরো-হণ করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে হিন্দু-দেবতার কালস্বরূপ কালাপাহাড় কর্ত্তৃক কামাখ্যামন্দির ১৫৫৩ অব্দে বিধ্বস্ত হয়। মহারাজ নরনারায়ণ সিংহ পুনরায় এই মন্দির সংস্কার করাইয়া দেন ১৫৫৫ অব্দে মন্দির সংস্কার আরম্ভ হয় এবং ১৫৫৬ অব্দে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরাভ্যন্তরে নরনারায়ণ সিংহ ও তাঁহার সেনাপতি শুক্লধ্বজের প্রস্তর মূর্ত্তিদ্বয় অবস্থিত আছে। নরনারায়ণ সিংহের নির্ম্মিত মন্দিরটী এখনও তাঁহার কীর্ত্তি অপ্রতিহত ভাবে রাখিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী।

---

(১) MR Gait.

স্থায়িত্ব।

কাননে ডাকিয়া পাখী
দূরে চলে যায়,
আবেশের সুরটুকু
বিশ্বে থেকে যায়;
কাননে ফুটিয়া ফুল
ধীরে ঝরে যায়,
মধুর সৌরভ তার
মিশে থাকে বায়;
ক্ষণিক চাঁদের আলো
ক্ষণিকে মিশায়,
পেলব হাসিটী তার
বিশ্ব ভ'রে রয়।
পথিক গাহিয়া গান
কোথা চলে যায়,
সুমধুর সুর তার
ভাসিয়া বেড়ায়।
বরষ বরষ কত
অতীতে মিলায়,
কঠোর আঘাত তার
রাখিয়া ধরায়।
মানব আসিয়া ভবে
মরণে লুকায়,
হৃদয়-বেদনা রাখি
পাষাণের গায়।
সকলি ক্ষণিক হেথা
নিমিষে ফুরায়,
চিরস্থায়ী স্মৃতি শুধু
থাকে এ ধরায়।

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবীগড়।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কৌশল।

সিংহ নিতান্ত অপমানিত হইয়া রাজার নিকটে ফিরিয়া গেল। অধিকন্তু প্রেমের প্রত্যাখ্যানে তাহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইতেছিল,—রূপজমোহে তাহার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল,—কমলাকে লাভ করিবার আশায় সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল। বিশেষতঃ সাধারণ নিয়মই এই যে, যে কার্য্যে মানুষ যত বাধা পায়, তাহাতেই যেন তাহার আসক্তি তত বাড়িয়া যায়। কমলার রূপে সিংহ যত মুগ্ধ হইতেছে,—কমলা তাহার বিবাহ প্রার্থনাকে যত উপেক্ষা করিতেছে,—তাহার আসক্তি তত বাড়িয়া যাইতেছে। সে পণ করিল, কমলাকে লাভ করিবার জন্য মরিতে হয় মরিব,—কিন্তু জীবিত থাকিতে কখনই তাহার আশা পরিত্যাগ করিতে পারিব না।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় রাজা যখন মন্ত্রণা গৃহে ছিলেন, সিংহ সেই সময়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। সিংহকে রাজা একজন মন্ত্রণাকুশল ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন এবং সেই জন্যই তাহার গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত ছিল।

রাজা সিংহকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল আননে উত্তেজিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি গো, যে কার্য্যে গিয়াছিলে, তাহার কি সন্ধান পাইলে ?"

আসন গ্রহণ করিয়া সিংহ বলিল,—"রাজন্! আপনার কার্য্য করিতে গিয়া আমি আপনার সৈন্যগণ কর্ত্তৃক যথেষ্ট অপমানিত হইয়াছি।"

রাজা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন ?"

সিংহ। তোমাদের দেবীর ইঙ্গিতে।

রাজা। দেবীকে বুঝি কিছু বলিয়াছিলে ? তা আমি কি করিব ? দেবীর আজ্ঞায় আমার সৈন্যগণ যদি তোমার মাথা কাটিয়া ফেলে, তাহা হইলেও আমি কিছু বলিতে পারিব না।

সিংহ নীরবে কি চিন্তা করিতে লাগিল। রাজা বলিলেন,—"তোমাকে যে কথা বলিয়াছিলাম,—যে সন্ধান লইতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার কি হইল? কেন দেবী আমাদের দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন?"

সিংহ সুযোগ বুঝিয়া মনে মনে খুব একটা চাতুরীর জাল বিস্তার করিল। মনে মনে স্থির করিল, কমলার পিতা মাতা জীবিত থাকিতে কখনই সে আমাকে বিবাহ করিবে না। কেন না, তাহার আশা আছে, সে তাহার পিতা মাতার সহিত আবার একত্র হইবে—আবার সেই চির-সুখশান্তিময়ী বঙ্গভূমিতে গমন করিবে,—সেই দেশে গিয়া কোন জ্ঞানবান্ যুবকের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সুখী হইবে। কিন্তু উহার পিতা মাতার যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, সে সমুদায় আশাই মুছিয়া যাইবে—বঙ্গদেশে ফিরিবার আশাও লুপ্ত হইবে, এদেশে বাঙ্গালী বলিতে আর নাই,—কাজেই আমাকে বিবাহ করিতে হইবে। সে তাই অতীব হর্ষ-পুলকিত প্রাণে সুযোগ বুঝিয়া এক মতলব আঁটিল এবং রাজাকে বলিল,—"হাঁ, তিনি কিছুতেই আর এদেশে থাকিতে ইচ্ছুক নহেন। যত শীঘ্র হয়, চলিয়া যাইবেন।"

রাজা। তিনি গেলে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান-সৈন্য এদেশে আসিতেছে,—দেবী উপস্থিত থাকিতে তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না,—অতএব দেবী যাহাতে না যান, তাহা করিতেই হইবে। কেন, তাঁহার যাইবার কারণ কি? তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছ কি?

সিংহ। হাঁ, পারিয়াছি।

রাজা। কি কারণ,—বল।

সিংহ। তাঁহার পিতা মাতার নিকটে যাইবেন।

রাজা। কে তাঁহার পিতা মাতা?

সিংহ। সেই বৃদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহার পিতা এবং তাঁহার স্ত্রী উহার মাতা।

রাজা। মিছে কথা,—দেবতার আবার পিতা মাতা কি? উনিই পিতা, উনিই মাতা। তাহারা দেবীর পালক মাত্র—পিতা মাতা হইতেই পারে না। দেবী যেরূপে তাহাদিগের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাত তোমারই মুখে শুনিয়াছিলাম। তাহার পরে দেবী আমার এক সৈন্যকে বিদ্যুৎদ্বারা যেরূপে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা তোমার কথায় প্রত্যয় করিয়াছিলাম। তিনি দেবী—তাঁহার পিতা মাতা নাই, আদি অন্ত নাই, জন্ম মৃত্যু নাই।

সিংহ। সে কথা আমি জানি না। তবে এই মাত্র জানি যে, তিনি একজন রমণী;—আর রমণী মাত্রেরই পিতা মাতা আছে। আর আমি ইহাও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আপনাদের দেবী তাঁহাদিগকে পিতা মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন। যতদিন তাঁহারা জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না।

রাজা। তবে কি তাঁহাদিগের মৃত্যুই আমাদিগের মঙ্গলের হেতু।

সিংহ। নিশ্চয়।

রাজা। কিন্তু তাহাতে যদি দেবী ক্রুদ্ধ হন এবং বজ্র ডাকিয়া সমুদায় দেশকে ভস্মীভূত করিয়া দেন ?

সিংহ। সে সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি, বিদ্যুৎ ডাকিয়া দেশ ভস্মীভূত করিবার ভয়ের চেয়ে তিনি যদি চলিয়া যান, আর মুসলমানদিগকে যদি উত্তেজিত করিয়া, এদেশের পথ ঘাট ও অবস্থার বিষয় বলিয়া তাহাদিগকে যদি পাঠাইয়া দেন, তবে যে দেশের সর্ব্বনাশ অধিক হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজা ভীত হইলেন। তারপরে পার্ষদগণের সহিত ঐ বিষয়ে অনেকক্ষণ পরামর্শ করিয়া অবশেষে বলিলেন,—"এক কাজ করিলে ভাল হয়।

সিংহ। কি ?

রাজা। কৌশল করিয়া সেই ধর্ম্মপ্রচারক ও তাহার পত্নীকে এখানে আনিলে দেবী আর যাইতে চাহিবেন না।

সিংহ। তাহারা আসিবে না।

রাজা। কেন ?

সিংহ। সেখানে মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়াছে।

রাজা। পূর্ব্বে তাহারা এখানে আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু না জানিয়া তখন আমি তাহাদিগকে এখানে আসিতে দেই নাই,—এখন আমার আকাঙ্ক্ষা জানিলে নিশ্চয়ই আসিবে।

সিংহ। হয়ত তাহারা ভাবিবে, তাহাদের কন্যাকে কৌশলে এখানে আনিয়া হত্যা করিয়াছেন এবং তাহাদিগকেও হত্যা করিতে আনিতেছেন।

রাজা। তুমি যখন যাইতেছ,—তোমার কথা অবিশ্বাস করিবে না।

সিংহ। যদি সহজে না আইসে,—বলপ্রকাশে ধরিয়া আনিতে হইবে।

রাজা। তোমার যাহা ইচ্ছা করিয়ো—আমার কোন আপত্তি নাই।

সিংহ। কিন্তু যদি সেকথা শুনিয়া আপনাদের দেবী আমার উপরে ক্রুদ্ধা হন এবং প্রাণদণ্ড করেন।

রাজা। তাহাতে আমার কোন হাত নাই। তাঁহার উপরে কথা কহে, এদেশে এমন কেহ নাই।

সিংহ সে কথায় কি চিন্তা করিল। তারপরে মনে করিল,—কমলা কিছু সত্যই দেবী নহে। ক্রমে বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া আনিলে, আর কোন ক্ষমতাই থাকিবে না। এক মিনিয়ার জন্যই তাহার এদেশ-সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান,—তাহাকে আগেই নিহত করিতে হইবে। সে গেলে, আর কমলার পিতা-মাতাকে নিহত করিতে পারিলে কমলা কাজেই নিরাশ্রয় হইবে,—তখন আমি ব্যতীত আর তাহার কোন গতি থাকিবে না।

রাজা তাহাকে নীরব থাকিতে দেখিয়া বলিলেন,—"তোমাকে শীঘ্রই সেখানে যাইতে হইবে। বিলম্ব করিলে চলিবে না। বিলম্ব করিলে হয়ত দেবী পূর্ব্বেই তথায় গমন করিবেন। তখন আর সেই বৃদ্ধ ও তাঁহার স্ত্রীকে আনয়ন করা অত্যন্ত কঠিন হইবে।"

সিংহ। যখন স্বীকার করিয়াছি, তখন নিশ্চয়ই যাইব। আমার সঙ্গে একশত সৈন্য দিতে হইবে। আমি আগামী কল্যই যাত্রা করিব। কিন্তু আর একটি কথা—

রাজা। কি?

সিংহ। মিনিয়া দেবীর গমনে অত্যন্ত সহায়তা করিতেছে।

রাজা। সে সম্বন্ধে আমি কি করিতে পারি?

সিংহ তখন রাজার কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি কি বলিল। রাজা শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"মন্দ নয়, কিন্তু আমি কতদূর, কি করিতে পারিব, তাহা এরপরে স্থির করিব।"

তখন সিংহ বিদায় হইল। পথে যাইতে যাইতে ভাবিল, রাজা যদি মিনিয়া সম্বন্ধে ঐরূপ কৌশল না করে, তবে আমার কার্য্য উদ্ধার হওয়া বড় কঠিন। ভাল, পরের উপর নির্ভর করিয়াই বা থাকি কেন? একটা গুপ্ত-ঘাতক ডাকিয়া তাহাকে হত্যা করার ব্যবস্থা করাই মঙ্গল।

পথেই এক দস্যুর সহিত সিংহের সাক্ষাৎ হইল। সে দস্যু মিনিয়াকে চিনিত। সিংহ বলিল,—"তোমাকে আধমন হস্তীদন্ত আর এক সের কস্তুরী দিব—তুমি যদি মিনিয়াকে আ'জ কিম্বা কালই হত্যা করিতে পার।"

ঘাতক বলিল,—"তা পারি। কিন্তু দেবী যদি রাগ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করেন ?"

সিংহ অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল—সে ভয় নাই। যখন মিনিয়া পাহাড়ে বেড়াইবে, তখন তুমি খুব দূরে থাকিয়া বিষপূর্ণ তীর ছুড়িয়ো।"

ঘাতক স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জাল-বিস্তার।

সন্ধ্যার পর যখন কমলা ও মিনিয়া বসিয়া প্রেতলোকের বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল, সেই সময় তথায় প্রধান পুরোহিত আগমন করিলেন।

দেবীর চরণ-তলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া পুরোহিত বলিলেন,—"দেবি, রাজা একবার মিনিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান, আমি উহাকে লইতে আসিয়াছি। আপনার অনুমতি প্রার্থনা।"

কমলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন ? মিনিয়াকে রাজার হঠাৎ কি প্রয়োজন ?

প্র-পু। সেকথার উত্তর আমি দিতে পারিব না,—তবে বিশেষ প্রয়োজনের জন্যই পাঠাইয়াছেন।

কমলা। মিনিয়া আমার সহচরী—উহার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিলে আমি সমস্ত দেশ জ্বালাইয়া দিব।

প্র পু। সেকথা আমরা জানি,—রাজাও জানেন। মিনিয়াকে আর কাহারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই,—তবে একটা কি বিশেষ কার্য্য আছে।

মিনিয়ার দিকে ফিরিয়া কমলা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মিনিয়া, তুমি কি সেখানে যাইতে ভয় পাও ?"

মিনিয়া হাসিয়া বলিল,—"না, দেবি ; আমার ভয় কি ? আপনার সহচরী আমি—আমাকে কে কি বলিতে পারে ?"

কমলা। তবে যাও! কিন্তু যত শীঘ্র পার, ফিরিয়া আসিয়ো।

প্র-পু। আ'জ আর আসা হইবে না—যাইতেই রাত্রি হইয়া যাইবে। কা'ল সকালেই—অতি প্রত্যুষেই মিনিয়া আপনার কাছে আসিবে।

কমলা যাইতে অনুজ্ঞা দিল। তখন প্রধান পুরোহিতের সহিত মিনিয়া বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

কমলা সে রাত্রে একা সেই প্রাসাদ-কক্ষে অবস্থান করিল। একেই সে পিতামাতার কাছ হইতে আসিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ মনে দিন কাটাইতেছিল, তাহার উপর একমাত্র সঙ্গিনী মিনিয়া—সেও চলিয়া গেল। কমলা সে রাত্রি বড় কষ্টে অতিবাহিত করিল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে উঠিয়া কমলা পর্ব্বত-নিস্যান্দিনী ক্ষুদ্রকায়া নদীতীরের এক পাষাণ-বেদীর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল,—এক পরিচারিকা সেই বেদীর উপরে একখানা ব্যাঘ্রচর্ম্ম বিছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কমলা সেই বেদীর উপরে আস্তৃত ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি উপবেশন করিল। সে প্রত্যহ প্রত্যুষে এই স্থানে বসিয়া ভগবচ্চিন্তা করিত। স্থানটি অতিশয় মনোহর-দৃশ্য। পাষাণ-বেদীর অনতিদূরে নীল-স্বচ্ছতোয়া পর্ব্বতদুহিতা নদী—উপল-খণ্ডে আছাড় খাইতে খাইতে চলিয়া যাইতেছে। নীল লোহিত শুভ্র ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাজাতীয় মৎস্য সকল দলে দলে জলে ভাসিয়া ভাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল। নৈশফুল্ল বনকুসুমের গন্ধ বহিয়া আনিয়া প্রভাতের বায়ু দিক্ হইতে দিগন্তে চলিয়া যাইতেছিল। শ্যাম সবুজ পত্রবহুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া নানা পাখী নানা স্বরে প্রভাতী গাহিতেছিল।

কমলা নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া ভগবচ্চরণ চিন্তায় মনঃসংযোগ করিল।

ঊষা উদয়ের পূর্ব্বেই মিনিয়া কয়েকজন প্রহরী সমভিব্যাহারে রাজবাড়ী হইতে বহির্গত হইয়াছিল এবং এই সময় পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানিত, কমলা এ সময় গৃহে নাই—উপাসনা করিবার জন্য নদীতীরে গমন করিয়াছেন। সে সেই স্থানেই গমন করিল। একটু দূর হইতে দেখিল, কমলা তখন উপাসনা করিতেছে। সে নিকটে না গিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গের অপেক্ষা করিয়া একটা পাষাণস্তূপের উপরে বসিয়া রহিল।

যে ঘাতককে সিংহ নিযুক্ত করিয়াছিল, সে গতকল্য হইতে সুযোগ অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল,—দূর সু-উচ্চ পাহাড়-স্তূপের পার্শ্ব হইতে সে মিনিয়াকে দেখিতে পাইল এবং উত্তম সুযোগ-অবস্থা জানিয়া ধনুকে বিষাক্ত তীর সংযোজনা করিয়া মিনিয়াকে লক্ষ্য করিল।

কিন্তু তীর ছুড়িতে হইল না,—তাহার পশ্চাতে একটা ভীষণ ব্যাঘ্র ছিল, সেও তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল,—সহসা একলম্ফে আসিয়া ঘাতকের কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল। ঘাতকের হাতের তীর খসিয়া পড়িল।

আরও কয়েকজন লোক দূরে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতেছিল, তাহারা ব্যাঘ্র-লম্ফ দেখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং একটা মনুষ্যকে ধরিয়াছে দেখিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য নানাবিধ শব্দ করিল,—ব্যাঘ্র মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

ঘাতক অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল,—কাষ্ঠ আহরণকারীরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু সে ঘটনার বিন্দুমাত্রও মিনিয়া বা কমলা জানিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ পরে কমলার উপাসনা সমাপ্ত হইল,—সে চক্ষু মেলিয়া চাহিল।

মিনিয়া কমলার ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিয়া তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল,—কমলা চাহিবামাত্র সে উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

তাহার আগমনে কমলা অত্যন্ত প্রীত হইল, জিজ্ঞাসা করিল—"মিনিয়া, তুমি কতক্ষণ আসিয়াছ? রাজা বা রাজকর্ম্মচারিগণ কেহ তোমার উপরে কোন অসদ্ব্যবহার করেন নাইত?"

মিনিয়া বিনীতভাবে বলিল,—"না দেবি, আমার উপরে কেহ কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করে নাই। কিন্তু রাজাদেশে আমাকে কিছুদিনের জন্য কোন দূর স্থানে যাইতে হইবে।"

কমলা বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল—"কেন? তুমি আমার কাছে থাক, ইহা কি রাজার ইচ্ছা নহে?"

মিনিয়া। না, সেরূপ কিছু নহে। রাজার একটি কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্যই আমাকে যাইতে হইবে।

কমলা। সে কোথায়?

মিনিয়া। দেবীগড়ে।

কমলা। দেবীগড়? এনামওত কখনও শুনি নাই। সে কোন্ দেশে?

মিনিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দেবি! আপনি দেবীগড়ের নাম কখনও শুনেন নাই? দাসীকে আর ছলনা কেন?"

কমলা বুঝিল, তাহার দেবীত্বের দাবি করিয়া এই অসভ্যগণ তাহাকে যেরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়-জ্ঞানের আরোপ করিতেছে, ইহাও সেই প্রকার

কিছু একটা। প্রকাশ্যে বলিল,—"সহসা আমার কিছু স্মরণ হইতেছে না। মা-বাপের জন্য আমার মন এখন বড়ই কাতর।"

মিনিয়া। আমিত সেদিন বলিয়াছি দেবি, আপনার আত্মীয়-স্বজনগণ নিহত না হইলে সে আত্মিক দেশের কথা আপনার মনে হইবে না।

কমলা চমকিয়া উঠিল, কিন্তু মনের ভাব সংযত করিয়া বলিল,—"দেবী-গড় কোথায়?"

মিনিয়া। দেবীগড় আপনার বাসস্থান, আপনি যখনই যে দেশে জন্ম-গ্রহণ করেন, তখনই সেখান হইতে আপনার বাসস্থান দেবীগড়ে আগমন করিয়া থাকেন। যখন আপনি ইচ্ছা করিয়া জন্মগ্রহণ করিতে যান, তখন আবার ঐ স্থান শূন্য থাকে।

কমলা। এখন সেখানে কে থাকে?

মিনিয়া। অনেক সন্ন্যাসী মহান্ত আছে,—তাহারা সেবাইত, তাহারাই থাকে। কতলোক মরিয়া যাইতেছে—আবার জন্মিতেছে, আবার আসি-তেছে। একের পরে অন্যে সেবাইত হইতেছে। কিন্তু তাহাদের জ্ঞান অসাধারণ—তাহারা সব বলিতে পারে—সব করিতে পারে। প্রকৃতি তাহা-দের বশীভূত।

কমলা। তুমি সেখানে কেন যাইবে?

মিনিয়া। তাহাদেরই মধ্যে একজন জ্ঞানী পুরুষকে এদেশে আনিবার জন্যে।

কমলা। এখানে আসিয়া কি করিবে?

মিনিয়া। আপনার বিষয়ে এবং আপনি যে সকল কথা রাজাকে বলিয়া-ছেন, সেই সকল বিষয় বিচার করিতে।

কমলা। উদ্দেশ্য?

মিনিয়া। আপনাকে ছাড়িয়া দিবে কি না।

কমলা। তুমি ভিন্ন অপর কেহ যাইতে পারিল না?

মিনিয়া। না দেবি,—সেখানে যাইবার অধিকার সকলের নাই। আমি বহুদিন পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছিলাম,—ধর্ম্ম-ব্যাপারে আমাদের বংশ অতি উন্নত।

কমলার নিকটে এ সকল জটিল প্রহেলিকার ন্যায়ই জ্ঞান হইল। বুঝিল, কুসংস্কারই এই সকল কথার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

মিনিয়া বলিল,—"দেবি, আমাকে যাইতে আজ্ঞা করুন! পাহাড়ের নীচে আমার জন্য সৈন্যাদি অপেক্ষা করিতেছে।"

সজলনয়নে ক্ষুণ্ণ-স্বরে কমলা বলিল,—"মিনিয়া, নির্জ্জন কারাবাসের সঙ্গিনি,—এতদিনে তুমিও ফাঁকি দিলে ?"

মিনিয়ার চক্ষুতেও জল আসিল। সে কমলাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

কমলা ভবিতব্যতার মুখ চাহিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া গেল। যে কার্য্যে কোন হাত নাই, তাহাতে অদৃষ্ট চিন্তা ব্যতীত আর উপায় কি ? (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

নিয়তির চক্র।

নিয়তির গতি রোধ করিতে কেহই সক্ষম নহে! তুমি ধনী হও, আর নির্ধন হও,—বীর হও বা কাপুরুষ হও,—পণ্ডিত হও কি মূর্খ হও,—নিয়তির বিধান সংসাধিত হইবেই। যে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এক একটি যুদ্ধে ইয়োরোপের এক একটি রাজশক্তি বিধ্বস্ত করিয়া আপনার অতুল রণ-পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া সমস্ত জগতকে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন,—তিনি অবশেষে ওয়াটার্লুর গোষ্পদে ডুবিলেন কেন ? কে তখন কল্পনা করিয়াছিল,—সৌভাগ্যদেবীর বরপুত্র, কমলার চরণকমলাশ্রিত সম্রাট বোনাপার্ট সুদূর সেণ্টহেলেনায় নির্ব্বাসিত জীবন অতিবাহিত করিবেন? শুধু নেপোলিয়ন নহে, জগতের আরও অনেকগুলি রাজ্যেশ্বরকে নিয়তির বিধানে নেপোলিয়নের মত দুর্দ্দশাপন্ন হইতে হইয়াছে! যে সকল মুকুটধারী রাজা ও রাজমহিষী নিয়তির অমোঘ বিধানে নির্ব্বাসিত হইয়া নিঃসহায় অবস্থায় যন্ত্রণাময় জীবন বহন করিয়াছেন ও করিতেছেন, আমরা এই প্রবন্ধে তাঁহাদেরই কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

যে সকল নির্ব্বাসিত রাজা বা রাণী ইংলণ্ডে আপনাদের গৌরবহীন অভিশপ্ত জীবন বহন করিতেছেন, তন্মধ্যে ফরাসীরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব রাজ্ঞী ইউজিনের নাম সর্ব্ব প্রথমে উল্লেখযোগ্য। অধুনা ইনি বিলাতের কারণরো নামক স্থানে সামান্যা নারীর ন্যায় কালযাপন করিতেছেন। প্রায় ত্রিশবৎসর হইল তাঁহার এই বিড়ম্বনাময় জীবন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এক সময়ে

সমগ্র ইয়োরোপের মধ্যে তাঁহার ন্যায় ভাগ্যবতী রমণী আর কেহ ছিলেন না। 'ফ্যাসানে'র তিনি রাজ্ঞী ছিলেন। সমাজে তাঁহার কি অসাধারণ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল! রাজ্ঞীর উপযোগী যত গুণ তাহা একাধারে ইউজিনে বর্ত্তমান ছিল; তৃতীয় নেপোলিয়নের মহিষীরূপে যিনি সমগ্র ফরাসীদেশে একদিন পূজিতা হইয়াছিলেন—সমগ্র ফরাসীজাতি একদিন যাঁহার অলৌকিক গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে হৃদয়ের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিল,—সেই সম্রাজ্ঞী ইউজিন—নির্ব্বাসিত অবস্থায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার অতীত গৌরবের শ্মশানভূমি পারিসনগরে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি দেখিয়াছিলেন—ফরাসীজাতি তাঁহার স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিয়াছে; তিনি ফরাসী দেশের আর কেহ নহেন,—গৃহহীনা, পরানুগৃহীতা, বিপন্না, জীবনের সর্ব্বসুখে বঞ্চিতা!—যেখানে তিনি সম্রাজ্ঞী ছিলেন, ভিখারিণীর ন্যায় সেখানে কেন গিয়াছিলেন—তাহা তিনিই বলিতে পারেন!

এই প্রকার দুরদৃষ্টগ্রস্তা আর একটি রমণীর নাম—ইলিয়োকালনী! ইনি হাউয়াই রাজ্যের সিংহাসনচ্যুতা রাজ্ঞী; এক্ষণে আমেরিকার অনুগ্রহ ভিখারিণী। ইনি সমগ্র হাউয়াই রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন—সমগ্র হাউয়াই রাজ্যের সৌভাগ্য-সূত্র ইঁহার করধৃত ছিল, অধুনা ইনি আমেরিকায় শ্রীমতী ডোমিনীস নামে সাধারণের নিকট পরিচিতা মাত্র! এই রাজ্ঞীর সিংহাসন প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গিয়াছে! অভাগিনী রাজ্ঞী এক্ষণে আমেরিকায় সাহিত্য-সেবা-ব্রত গ্রহণ করিয়া দিন গুজরাণ করিতেছেন!

এই নিয়তির নিয়মানুবর্ত্তিনী হইয়াই মাদাগাস্কারের রাজমহিষী রাণাভোলা ফরাসীজাতি কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুতা হইয়া আলজিরিয়ায় নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতেছেন! সেখানে তিনি নজরবন্দী হইয়া আছেন! অভাগিনী রাণাভোলা রাজ্যচ্যুত অবস্থাতেও পারিস নগরীতে বাস করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরাধীনা দুঃখিনীর আগ্রহে কে কর্ণপাত করে?—তাঁহার জীবনের এই মাত্র আশা পূর্ণ হয় নাই—পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনাও নাই!

আফ্রিকা মহাদেশও অধুনা রাজ্যচ্যুত নরপতিদিগের আশ্রয়স্থানে পরিণত হইয়াছে। সাম্বরি, প্রেম্পে, মাওঙ্গা, বেহানজিন প্রভৃতি দশজন স্বাধীন নর-

পতি আফ্রিকার তমসাচ্ছন্ন জনবিরল অংশে বাস করিয়া স্ব স্ব অদৃষ্টকে ধিক্কার প্রদান করিতেছেন! এই সকল নির্ব্বাসিত রাজন্যবর্গের মধ্যে সামরি সর্ব্বপ্রধান এবং অতি অল্পদিন মাত্র তাঁহার দুর্গতি আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টচক্রের পরিবর্ত্তনের ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য। বাল্যকালে তিনি ক্রীতদাস ছিলেন; প্রথম যৌবনে তিনি সৈন্যবিভাগে প্রবেশ লাভ করেন এবং অসাধারণ ক্ষমতাবলে স্বদেশের সিংহাসন পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সমর্থ হন! অবশেষে ফরাসীর হস্তে পরাজিত হইয়া এখন উত্তর পশ্চিম আফ্রিকার কাবিস নামক স্থানে শোচনীয়ভাবে কালাতিপাত করিতেছেন!

পারস্যের মহাশক্তিমান্ সাহ মহম্মদআলি স্বরাজ্যের শক্তিশালী প্রজাগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও বিতাড়িত হইয়া কি ভাবে ওডেসায় রুস-গবর্মেণ্টের অনুগ্রহপ্রার্থী অতিথিরূপে অবস্থান করিতেছেন এবং তুরস্কের মহামান্য সুল-তান---জগদ্বিখ্যাত 'রুমের বাদসাহ' আব্দুল হামিদ সালানিকায় কি অবস্থায় নির্ব্বাসিত জীবন যাপন করিতেছেন,—তাহা কাহারও অবিদিত নহে।

উপসংহারে আমরা একজন আফ্রিকার রাজার উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। এই রাজার নাম---তানা। ইনি আফ্রিকার আক্রা নামক স্থানে বন্দীভাবে কালাতিপাত করিতেছেন। রাজপ্রাসাদের সহস্র প্রকার ভোগবিলাস হইতে বঞ্চিত হইয়া দারিদ্র্যমগ্ন অবস্থায় তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা নাই। যে বৎসর স্বর্গীয়া ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার 'হীরক জুবিলি' উৎসব হয়, সেই বৎসর এই রাজা কন্সলকে একখানি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়কর পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"কন্সল, মনে রাখিয়ো, আমি যে সে লোক নহি; আমি জননী তলুমার সন্তান। আমি নিজের রাজ্য কখনও পরিত্যাগ করি নাই; কিন্তু তোমরা যুদ্ধ-জাহাজ আনিয়া একদিন আমার নগরে আগুন লাগাইয়াছিলে! আমার বিশ্বাস ছিল—আমি একজন ভারি রাজা! আমার রাজ্য প্রকাণ্ড, কাহারও তাহা স্পর্শ করিবার সাধ্য নাই। কিন্তু আমি উত্তম শিক্ষালাভ করিয়াছি! আমার ধনসম্পত্তি ঘরবাড়ী, অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত হারাইয়াছি; আমার রাজধানী এখন বালুকা ও লতাগুল্মে পরিণত হইয়াছে! আমার ভক্ত প্রজাগণ যে কোথায়—তাহা জানি না; আমার পরিবারবর্গের অনেকেই তোমাদের হস্তে নিহত হইয়াছে! আমি শুনিলাম, তোমাদের রাণী সকল রাজা ও রাণী অপেক্ষা বেশী দিন রাজত্ব করিতে পারিয়াছেন বলিয়া এবার তিনি বড় তামাসার আয়ো-

জন করিয়াছেন। এই তামাসার দিনে আমার অনুরোধ—এবার যেন আমার উপর দয়া করা হয়, একটিবার আমি তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করি।" কথাগুলি হতভাগ্য রাজার অন্তরের কথা, বীরত্বব্যঞ্জক নহে বটে, কিন্তু সরল হৃদয়-নিঃসৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই!—মুকুটধারী রাজন্যবর্গকে এইভাবে দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতে দেখিলে স্বতঃই বলিতে হয়—"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে!"

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

"গোপাল কেমন আছে?"

[বসুদেব কর্ত্তৃক নারদের নিকটে গোকুলের তৃণের অবস্থা জিজ্ঞাসা।]

এই উপদেশ-গর্ভ গল্পটী একটী পৌরাণিকী কথা হইলেও দেশের স্ত্রীলোক, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেরই শুনিবার কথা!

একদিন বসুদেব ত্রিভুবন-ভ্রমণকারী নারদ ঋষিকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন - "গোকুলে তৃণের অবস্থা কিরূপ?"

নারদ বলিলেন,—"ভাল"!

বসুদেব তাঁহার সেই প্রশ্নের উত্তয় পাইয়া নীরব রহিলেন, আর কোনও প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বসুদেবকে নীরব দেখিয়া নারদ বলিলেন,—"আমি আসিলেই আপনি অগ্রে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন "আমার পোগাল কেমন আছে"? কিন্তু আজ আপনি আমার গোপালের কোনও কথাইতো জিজ্ঞাসা করিলেন না?

বসুমেব বলিলেন —"আবার কেন"?

নারদ বলিলেন,—"কি আশ্চর্য্য"?

বসুদেব বলিলেম,—"আশ্চর্য্য কি"?

নারদ বলিলেম,—"আশ্চর্য্য নয়"?

বসুদেব তখন নারদকে বিস্ময়াবিষ্ট দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন,—"এক তৃণের প্রশ্নেই আমার সব জানা হইয়াছে"?

নারদ বলিলেন,--"কিরূপে"?

বসুদেব বলিলেন,—"আপনার মুখে জানিতে পারিলাম, গোকুলে তৃণের অবস্থা ভাল—সুতরাং তৃণভক্ষিণী গাভীগণের অবস্থাও ভাল,—যখন গাভী-গণের অবস্থা ভাল,—তখন গাভীগণের দুগ্ধের অবস্থাও ভাল,—সেই সুস্থকায় গাভীগণের উৎকৃষ্ট দুগ্ধ পান করিয়া, আমার গোপালও ভাল আছে, ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি! সুতরাং "আমার গোপাল কেমন আছে" জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক। এ সম্বন্ধে পুনঃ প্রশ্ন করা পূর্ণ কলসীতে জল ঢালা মাত্র!

[মন্তব্য। কি পল্লীতে, কি সহরে, গাভীগণের বহু প্রকার পীড়া জন্মিয়া থাকে। বাজারে প্রায়শই পীড়াগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ বিক্রয় হয়। দুগ্ধবতী গাভী-গণের আহার্য্য তৃণাদির অবস্থা ভাল না হইলেই গাভীগণ অসুস্থ ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সেই পীড়াগ্রস্ত গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া দেশের কত গোপাল যে অকালে প্রাণ-পরিত্যাগ করে, কে তাহার সন্ধান লইয়া থাকেন?]

শ্রীচন্দ্রকিশোর রায় গুণসাগর।

একটী রাজপুত বীরের চিত্র।

রাজপুত-কুলরবি বীরশ্রেষ্ঠ মহারাণা রাজসিংহের নাম ইতিহাস পাঠক-মাত্রেরই বোধ হয় অবিদিত নাই। স্বদেশ-বৎসল স্বার্থত্যাগী মহাত্মা প্রতাপ-সিংহ ইহলোক পরিত্যাগ করিলে পর, শিশোদীয় বীরগণের লীলাভূমি মিবার-রাজ্য ঘোরতর বিষাদ-তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল। বীরকেশরী রাজসিংহ আপ-নার অদ্ভুত ধীশক্তি এবং অমোঘ বীরত্ব-প্রভাবে মিবারের লুপ্তপ্রায় মর্য্যাদা পুনরায় উদ্ধার করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি না থাকিলে প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক কুটবুদ্ধি হিন্দুদ্বেষী মোগল সম্রাট আরঙ্গজেব-কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে আর্য্যজাতি ও সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের অস্তিত্ব চিরতরে বিনষ্ট হইয়া যাইত।

রাণা রাজসিংহের দুই মহিষীর গর্ভে দুইটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুত্রদ্বয়ের নাম ভীমসিংহ ও জয়সিংহ। ভীমসিংহ ভূমিষ্ঠ হইবার অত্যল্পক্ষণ পরেই রাণার অনুরাগপাত্রী প্রিয়তমা মহিষীর গর্ভে তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র জয়-সিংহের জন্ম হয়। ভীমসিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র ন্যায়মতে রাণা রাজসিংহের পরে মিবারের রাজসিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য; কিন্তু তাহা না হইয়া কি কারণে

তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জয়সিংহ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তাহা বর্ণিত হইতেছে।

একই দিবসে রাণা রাজসিংহের উভয় মহিষী সন্তান প্রসব করিলেন। রাজপুতগণের মধ্যে একটী চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে যে, প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে পিতা সূতিকাগৃহে পুত্রমুখ দর্শন করিতে গিয়া নবপ্রসূত কুমারের বাহুতে "অমরধব" নামক এক প্রকার তৃণবলয় পরাইয়া দেন। উক্ত তৃণ-বলয় হস্তে সংলগ্ন থাকিলে স্বাস্থ্যহানির আর কোনরূপ আশঙ্কা থাকে না এবং উহা ভবিষ্যতে পৈতৃক সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিত্বের নিদর্শন স্বরূপ হইয়া থাকে। সংবাদ শ্রবণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রাণা "অমরধব" লইয়া সর্ব্বাগ্রেই প্রিয়তমা মহিষীর সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া, কনিষ্ঠপুত্র জয়সিংহের হস্তে সেই তৃণবলয় পরাইয়া দিলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ভীমসিংহের হস্ত শূন্য রহিল। সকলেই বুঝিলেন, প্রিয়তমা মহিষীর অন্যায় অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া, রাণা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে অর্পণ করিলেন।

অবিমৃষ্যকারিতার বশে এইরূপ অন্যায় পক্ষপাতিত্ব করিয়া রাণা মনে মনে বিশেষ দুঃখিত ও চিন্তান্বিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর মিবারের সিংহাসন লইয়া, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইবে। ভীমসিংহ জ্ঞান হইলে যখন বুঝিবেন যে, তাঁহার পিতা বিনাদোষে তাঁহাকে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ক্রোধোন্মত্ত হইয়া যে কোন উপায়ে হউক আপনার প্রাপ্য সিংহাসন-লাভের জন্য চেষ্টা করিলেন। কনিষ্ঠ জয়সিংহ পিতৃপ্রদত্ত রাজ্যভার জ্যেষ্ঠকে প্রত্য-র্পণ করিতে কোনমতেই সম্মত হইবেন না। দারুণ দুর্ভাবনায় রাণা রাজ-সিংহ অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িলেন।

এদিকে দিন দিন চন্দ্রকলার ন্যায় রাজপুত্রদ্বয় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শৈশব, বাল্য, কৈশোর অতিক্রম করিয়া তাঁহারা যৌবনে উপনীত হইলেন এবং বিদ্যাশিক্ষা, শস্ত্রশিক্ষা, লক্ষ্যভেদ ও অশ্বচালনায় অতি অল্পদিনের মধ্যেই উভয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করি-লেন। পুত্রদ্বয়কে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া রাণা রাজসিংহের মানসিক যন্ত্রণা সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি কি করিবেন কিছুতেই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠপুত্র বর্ত্তমানে কেমন করিয়া কনিষ্ঠ-পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিবেন এই দুর্ভাবনায় তিনি দিবানিশি মনে মনে

ভয়ঙ্কর উৎপীড়িত হইতে লাগিলেন। ভীমসিংহের প্রকৃতি অত্যন্ত ধীর, নম্র এবং উদার ছিল। যদিও তিনি ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিবেন না, তথাপি তিনি একদিনের নিমিত্তও ঈর্ষাকে হৃদয়মধ্যে স্থানদান করেন নাই এবং পিতা, বিমাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্গে একদিনের তরেও কোনরূপ মন্দ ব্যবহার করিতে উদ্‌যোগী হন নাই। ভীমসিংহের অতি শৈশবাবস্থায় জননী-বিয়োগ হয়—সেই কারণে জয়সিংহ অপেক্ষা রাণা রাজসিংহ ভীমকে অন্তরে অন্তরে অধিকতর স্নেহ করিতেন।

একদিন ভীমসিংহকে নিভৃতে আহ্বান পূর্ব্বক রাণা কহিলেন,—"বৎস! দারুণ স্ত্রৈণতার বশবর্ত্তী হইয়া আমি মূর্খের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি, বিনাদোষে তোমার ন্যায় পুত্রের প্রতি ঘোরতর অধর্ম্ম আচরণ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। সিংহাসনের—শাস্ত্রমতে তুমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী। আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়সিংহকে তোমার রাজ্যলাভের পথে বিষম কণ্টক করিয়া স্থাপন করিয়াছি। যদি ভবিষ্যতে রাজ্যলাভের বাসনা থাকে, মিবার রাজ্য যদি ভয়ঙ্কর গৃহ-বিবাদে উৎসন্ন দিতে ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে পিতার মুখ না চাহিয়া, ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী না হইয়া, এই দণ্ডে তীক্ষ্ণ তরবারি হস্তে জয়সিংহের প্রাণবধ করিয়া তোমার সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক কর।"

বুদ্ধিমান ভীমসিংহ বুঝিলেন—যে, পিতা ভীষণ আন্তরিক যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইয়া এরূপ বলিতেছেন। তিনি পিতার এই ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা দূর করাই এবং উভয়-সঙ্কট হইতে উদ্ধার করাই পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিলেন। পিতার এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"পিতঃ! সত্যযুগে রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনের নিমিত্ত স্বেচ্ছায় চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাসে গমন করিয়াছিলেন। আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমা হইতে এ রাজ্যের কোন বিশৃঙ্খলা হইবে না। আমি আপনার পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি—আমি হৃদয়মধ্যে সিংহাসন-লাভের তিলমাত্র অভিলাষ পোষণ করিব না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যই এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইব; আপনি নির্ভাবনায় জয়সিংহকে রাজ্যভার প্রদান করুন। যথার্থ যদি আপনার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যথার্থই যদি পিতৃজ্ঞানে আপনার চরণে আমার দৃঢ়ভক্তি থাকে, তাহা হইলে ইহাও প্রতিজ্ঞা করিলাম—যে, অদ্য হইতে আমি এই দোবারি

গিরিবর্ত্মের মধ্যে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত পান করিব না।" দেব-হৃদয় মহাতেজা ভীমসিংহ ধীর-গম্ভীরভাবে এই কথা বলিয়া পিতার চরণে প্রণাম করিয়া— ভক্তিসহকারে পিতার পদধূলি লইলেন এবং দ্বিরুক্তি না করিয়া, অন্য কাহাকেও এ বিষয়ের বিন্দু-বিসর্গ কিছু জ্ঞাপন না করিয়া অম্লানবদনে উদয়-পুর রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাণা রাজসিংহ পুত্রের এইরূপ মহত্ত্ব দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এমন গুণবান্ উদারহৃদয় পুত্রের নির্ব্বা-সনে হৃদয়ে যে ভয়ঙ্কর শেলাঘাত হইল,—সে দারুণ বেদনা আর ইহ জীবনে উপশম হইল না। গ্রীষ্মকাল—দিবা দ্বি-প্রহর অতীতপ্রায়। দিনদেব মধ্যগগনে অবস্থান পূর্ব্বক প্রখর-কিরণতাপে ধরিত্রীকে বিদগ্ধ করিতেছেন। প্রচণ্ড রৌদ্রে পশু পক্ষী পর্য্যন্ত বাহির হইতেছে না—এমন সময় অশ্বারোহণে ভীমসিংহ একাকী সেই কূটবর্ত্মাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। ভীষণ মার্ত্তণ্ড-তাপে সন্তাপিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদজলে অভিষিক্ত হইল; তাঁহার অশ্বটীও দারুণ ক্ষুৎ-পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িল। সুতরাং আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম না হইয়া, ক্ষণেক বিশ্রামলাভার্থ তত্রস্থ একটী বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের সুস্নিগ্ধ ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। প্রাণ ভরিয়া জন্মের মতন একবার মাতৃভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আকর্ণবিস্তৃত লোচন-যুগল হইতে—অজ্ঞাতভাবে দুই চারি বিন্দু অশ্রুবারি বক্ষে নিপতিত হইল। মিবারের পানে চাহিয়া একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কে বুঝিবে কি মর্ম্মব্যথায় বীরহৃদয় তখন উৎপীড়িত হইতেছিল! কি উচ্ছ্বাসে তাঁহার কোমল হৃদয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল—তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? ভীমসিংহ ভাবিলেন,—"কোথায় যাইতেছি! ভবিষ্যতে যে বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড আমার হস্তে অর্পিত হইত—বিধির বিড়ম্বনায় আজ সেই সাধের জন্মভূমি, সেই মিবার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া—অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে ঘূর্ণায়মান হইতে কোথায় চলিয়াছি।" গভীর দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াও ভীমসিংহের হৃদয়ের দৃঢ়তার তিলমাত্র অভাব ছিল না। মাতৃভূমির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে যদিও তাঁহার বীরহৃদয়ে একবার আঘাত লাগিল বটে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই অসীম ধৈর্য্যগুণে সে বেগ সম্বরণ করিলেন,—মনকে আবার বাঁধিয়া লইলেন। তিনি ইহা স্থির জানিতেন যে, হৃদয়ের দৃঢ়তা ও স্বীয় বাহুবলের সাহায্যে তিনি অসংখ্য বিপদ হইতে নিশ্চয়ই আপনাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন। অসহনীয় গ্রীষ্মতাপে সন্তপ্ত ও পথশ্রমে ক্লান্ত

হইয়া দারুণ পিপাসায় ভীমসিংহের কণ্ঠ শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠিল। অদূরে একটী নির্ঝরিণী দর্শন করিয়া সুশীতল বারিপানের প্রত্যাশায় তথায় গমন করিলেন। পিপাসা শান্তি করিবার আশায় যেমন অঞ্জলিপূর্ণ বারি পান করিতে যাইবেন, অমনি পিতার নিকট প্রতিজ্ঞার কথা স্মৃতিপটে উদয় হইল। বিন্দুমাত্র জলপান না করিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত জল তিনি ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ স্বরূপ মহাপাপ করিতে উদ্যোগী হইতেছিলেন বিবেচনায় তিনি, একলিঙ্গদেবের উদ্দেশে কাতর কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"ভগবন্ অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ভ্রমান্ধতাবশে আমি আত্ম-প্রতিশ্রুতির কথা একেবারে বিস্মৃত হইতেছিলাম। যতক্ষণ এই পাপদেহে জীবন থাকিবে, ততক্ষণ এই দোবারি গিরিবর্ত্মের মধ্যে বিন্দুমাত্র বারিপানের আমার কোন অধিকার নাই।" আর তিলমাত্র সেথায় অপেক্ষা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে, বিবেচনায় তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে সেই পর্ব্বতবর্ত্ম হইতে বিনির্গত হইয়া প্রস্থান করিলেন। এইরূপ বীরহৃদয়ে অলৌকিক মহত্ত্বের উদাহরণ দেখাইয়া ভীমসিংহ জন্মের শোধ মিবার রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন।

কথিত আছে, তিনি মিবার পরিত্যাগ করিয়া মোগল-সম্রাট আরঙ্গজেবের অন্যতম পুত্র বাহাদুর শার নিকটে গিয়া উপস্থিত হন। বাহাদুর শা যথাযোগ্য সম্মানের সহিত ইঁহার অভ্যর্থনা করিয়া একদল অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে মোগল-সেনাপতির সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি, বাহাদুর সার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সিন্ধুনদের পরপারে সুদূর কাবুলরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। ভীমসিংহ একজন প্রশংসনীয় অশ্বারোহী বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। অত্যন্ত দ্রুতবেগে চালিত অশ্বের পৃষ্ঠদেশ হইতে লম্ফ দিয়া, তিনি বৃক্ষশাখা অবলম্বন করিয়া ঝুলিতে পারিতেন। কাবুলে একদিন সকলের সমক্ষে এইরূপ বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখাইতে গিয়া প্রৌঢ়াবস্থার প্রাক্কালেই হতভাগ্য ভীমসিংহের জীবলীলার অবসান হইয়াছিল।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভক্তের জয়। *

ভক্তের জয়, ভক্ত-চরিত-গাথা। অনেক দিন আগে ইহার প্রথম উল্লাস পড়িয়াছিলাম, আর ভাবিয়াছিলাম—যে দেশে এবং যে জাতির মধ্যে ভগবানের এমন ভক্তগণ অবতীর্ণ হন, সে দেশ ধন্য; আর অধিকতর ধন্যবাদের পাত্র যিনি রঙ ফলাইয়া সেই পূত চরিতগুলিকে মানব-সমাজে সন্দর্শন করিতে পারেন। বাঁশী মনোহর স্বর-লহরী বিস্তার করে, কিন্তু বাদকের কৃতিত্বে মধুর হয়।

যিনি ভক্তের জয় গাহিয়াছেন,—তিনি সে সুর বুঝেন, কোথা দিয়া কেমন করিয়া কোন্ রন্ধ্রে তাহার ধ্বনি উঠে জানেন, তাই তেমন মধুর লাগিয়াছিল।

কিন্তু আশা মিটে নাই—আরও শুনিবার, আরও জানিবার সাধ ছিল। সে সাধ পূরিল—ভক্তের জয়, আবার প্রকাশ হইয়াছে—ইহা দ্বিতীয় উল্লাস।

ভক্তের জয় গ্রন্থের দ্বিতীয় উল্লাসে—গৌরচন্দ্র, জগদ্বন্ধু মহাপাত্র, গোবিন্দ দাস, গীতা-পণ্ডা, শান্তোবা, জগন্নাথ দাস, গঙ্গাধর দাস, মণিদাস, রাম বেহারা, নারায়ণ দাস ও পলিগ্রাম দাস এই এগারটি ভক্ত-চরিত লিখিত হইয়াছে।

সুরভি-কুসুম-সকাশে তৈল থাকিলেও তাহা সুগন্ধ হইয়া যায়, ভক্ত-চরিত সমীপে তোমার আমার মত কাম-কামনা-বিজড়িত চিত্ত অবস্থিত হইলে তাহাও ভক্তিময় হইয়া যায়—অতএব প্রত্যেক নর-নারীর এগ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য।

তা' আমাদিগকে কষ্ট করিয়া পড়িতে হইবে না। সুনিপুণ লেখকের এমনই গুণপনা—প্রাণের ত্বকে যেন অমৃত-মদিরা ঢালিয়া দিয়াছেন—পড়িতে পড়িতে সব ভুলিতে হয়—সেই ভক্ত চরিত্রের আনন্দ-তুফানে ডুবিয়া থাকিতে হয়।

সাহিত্য হিসাবে ভক্তের জয় শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। কাব্য ত আমাদেরই মনের ছায়া। সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মত যে সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্ অলক্ষ্যে বায়ু-প্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখন

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-বিরচিত এবং ৪০নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গুরুদাস বাবুর দোকানে বিক্রয় হয়,—মূল্য ১৲ এক টাকা।

সংলগ্ন, কখন বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রমাগত মেঘ রচনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যদি কোন অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্ব-প্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত, তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য ভক্তের জয়ের ভক্ত-চরিত্রগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এ ভক্ত-চরিত্রগুলির বর্ণনা-ভাব ভক্ত জীবনের অন্তরাকাশের ছায়া মাত্র,—তরল স্বচ্ছ পবিত্র সরোবরের উপর মেঘ-ক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মত। সেই জন্যই বলিয়াছিলাম,—এ গ্রন্থ শ্রেষ্ঠকাব্য।

আমাদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে, ভক্ত-চরিত্র আর ভক্তির তরল-তরঙ্গ-প্রবাহ লেখনীর মুখে ফলান বড় কঠিন ব্যাপার। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেই ভক্ত-চরিত্র ফুটিয়া উঠে—ভক্তির স্বপ্নানন্দ 'কানের ভিতর দিয়া' মর্ম্ম মধ্যে প্রবেশ করে। কিন্তু তাহা নহে, সে ভাব—সে স্বপ্ন-মদিরা লেখনী মুখে, ভাষার-প্রবাহে আনা সহজ নহে! সংসারের সকল কার্য্যেই আমাদের এমনি অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে, সহজ ভাবের অপেক্ষা সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না ভাবিলেও ব্যস্তবাগীশ চেষ্টা, সকল কাজের মধ্যে আপনি আসিয়া হাজির হয়, এবং সে যেখানেই হস্তক্ষেপ করে, সেই স্থানেই ভাব লঘু মেঘাকার ত্যাগ করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহার আর বাতাসে উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। এই-জন্য ভক্তি জিনিষটার বর্ণনা করা যাহার পক্ষে সহজ, তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন, তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সরস, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন—সহজের প্রধান লক্ষণই এই!

গোস্বামী মহাশয় এই সহজ সাধনায় সমুত্তীর্ণ। ভক্তি-প্রবাহ সে হৃদয়ে নিত্য বিরাজিত। তাই ভক্ত-চরিত-গাথা লিখিয়া তিনি এত সৌন্দর্য্য রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাই এই ভক্ত-চরিত্র গুলির বর্ণনা এত মধুর, এত উজ্জ্বল, এত প্রাণস্পর্শী হইয়াছে। যেমন মেঘে মেঘে স্বপ্নে স্বপ্নে মিশাইয়া যায়, এই ভক্তচরিত্র গুলি লেখকের সুনিপুণতা গুণে তেমনই মানসিক মেঘ-রাজ্যের লীলা স্বরূপ হইয়াছে—সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার নির্ণয় নাই। আছে—রস আর রসিক, প্রেম আর প্রেমময়—ভক্তি আর ভগবান্। সকলেরই ইহা পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

নানা কথা।

অবসরের আশ্বিনের সংখ্যা ৺পূজার চতুর্থীর দিন প্রকাশ ও ডাকে রওনা হইবে। যাঁহাদের স্থানান্তরে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা সে বন্দোবস্ত নিজ নিজ পোষ্টাফিসেই করিবেন।

পূজার মধ্যে—মহামায়ার মহদুৎসব আনন্দের মধ্যে—শারদোৎফুল্ল মল্লিকা শেফালী রজনীগন্ধার গন্ধামোদিত শরচ্চন্দ্রের রজত কিরণের মধ্যে এবং হেমন্তের প্রথমাগমন-অলসিত ভাবের মধ্যে এ সংখ্যা না পড়িলেই নয়।

এ সংখ্যা যেন বাগ্‌দেবীর চরণ-সরোজ-সমীপস্থ প্রবন্ধ-নলিনী-মালায় সুসজ্জিত হইতেছে। মনীষী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মা না মেয়ে" পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্যের "কল্পারম্ভ" সুলেখক মণিবাবুর নেপোলিয়নের পত্নীপ্রেম, তদ্ভিন্ন সাহিত্যরথী অনুকূল বাবুর একটী উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ, রস-রচনায় সিদ্ধহস্ত ভূপেন ব বুর একখানি সম্পূর্ণ নক্সা, আর সেই চির-পরিচিত রঙ্গরস-রসিকের—"প'ড়ে পাওয়া"—ইহাতে সবিশেষ রঙ্গ-রস আছে—"নাককাটা সেপাই, বিরহিনীর বুকের ব্যথা, নিমন্ত্রণ-রক্ষা, বাইজীর বাসাবাড়ী, বকুল-বাসে বাঞ্ছারাম, ব্যবসাদারের দুর্গাপূজা, বাঙ্গালবাবু।" তদ্ভিন্ন যে সকল লেখকের লেখা ক্রমশঃ প্রকাশ হইতেছে, তাহাও থাকিবে। এবার অবসরে চারিখানি ছবি থাকিবে।

বিলাতের চিকিৎসকেরা প্রাণস্পন্দন ঠিক রাখিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিতেছেন। সাফল্যলাভ করিতে পারিলে মানুষ দীর্ঘজীবী হইতে পারিবে, প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণস্পন্দন ঠিক রাখিয়া আর্য্যগণ দীর্ঘজীবী হইতেন, এখন সেটা কলে হইবে।

কলিকাতার বিখ্যাত-বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক মেসার্স বি, ভট্টাচার্য্য এণ্ড ব্রাদার্সের "রোজেলা" ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। ইহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব জিনিষ। ইহার গন্ধ গাজিপুরী ফুল হইতেও উৎকৃষ্ট এবং রং ফর্সা করিবার শক্তি অসীম।

অনেকগুলি পুস্তক সমালোচনার্থ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, বিলম্ব-জন্য গ্রন্থকার মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন। আগামী কার্ত্তিক মাসের কাগজে সমালোচনা বাহির হইবে।
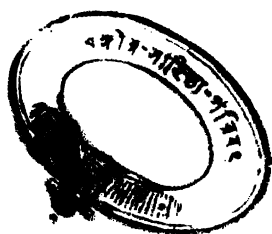
অবসর—

শিবপূজার্থ গৌরীর বিল্বমূলে গমন।

ধর্ম্মক্ষেত্রে-কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের প্রতি যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীশ্রীগীতা কথন।
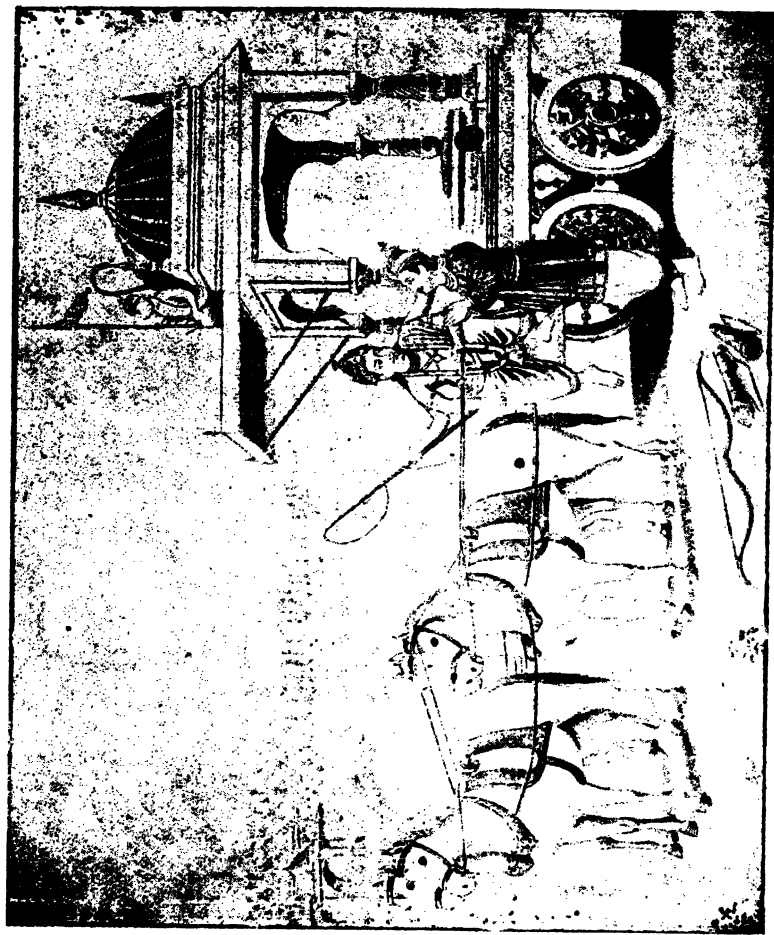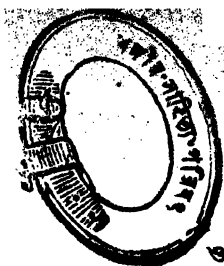
আবাহন।

ওমা, কেটে গেছে এবে বরষার মেঘ
চকিত চিকুর চাহনি,—
চলে গেছে কোন্ অজানা প্রদেশে
জীমূত-মন্দ্র-কাহিনী ;—
মুক্ত গগনে পূর্ণ চাঁদিমা
নবীন ছন্দে তোমারি মহিমা
গাহিছে শরত-নিশীথে ;
প্রকৃতি-দুহিতা শেফালি মানিনী
জানা'য়ে দিতেছে তব আগমনি
বঙ্গপল্লী দিশিতে।

(২)

ওগো, শারদ প্রভাতে পল্লী ভবনে
নিতি হেরি তব মুরতি,
সান্ধ্যগগনে শত দীপ জ্বালা
তারকা-প্রদীপ আরতি ;
শিশির-সিক্তা প্রকৃতি নগ্না
তোমারি ধ্যানেতে হ'য়েছে মগ্না
ভুলিয়া অতীত কাহিনী ;
ওগো গিরিসুতা, অনাদি অতীতা
শত বঙ্গবাসী ডাকিতেছে মাতা,
এস মা পিনাকি-গেহিনী !

(৩)

মাগো পূর্ণবরষ গিয়াছে চলিয়া
করম-সাগর বাহিতে,
নিরাশায় হৃদি গিয়াছে ভরিয়া
বিফলতা মাঝে রহিতে ;
বরষের পরে তব আগমনে
নব উদ্যমে ভরাক' এমনে
করম-সাগর মথিতে
নব উদ্যমে ভরুক হৃদয়
তাড়ায়ে দূরেতে ম্লান নিরাশায়
জীবন-তরণী বহিতে।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কল্পারম্ভ।

সংকল্প মানস-কর্ম্ম।—কোনও বিষয়ে ঐকান্তিক ইচ্ছার-উদ্রেক হইলে তন্নিবৃত্তির বা সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার যে অভিলাষ, তাহাই সঙ্কল্প। শ্রীশ্রীভগবদ্দুর্গারাধনার জন্য নবম্যাদি তিথিতে যে সংকল্প করা যায়, তাহাকেই কল্পারম্ভ বলা হয়।

মন একটি যন্ত্র বিশেষ,—ইহা দ্বারাই বহির্জ্জগৎ অনুভব করা যায়। বহির্জ্জগতে কি আছে? আমরা যাহা দেখি, তাহা ভ্রম—তাহা নাই। বাস্তবিক যাহা আছে, তাহা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। উহা কেবল উত্তেজক কারণ মাত্র। উহা যাইয়া মনে আঘাত প্রদান করে, আর মন হইতে একটি প্রতিক্রিয়া হয়। যদি জলে একটি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে জল যেন প্রবাহ আকারে বিভক্ত হইয়া ঐ প্রস্তরখণ্ডকে প্রতিঘাত করিবে। আমরা যাহাকে জগৎ বলিতেছি, তাহা কেবল মনের ভিতর যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহারই এক-প্রকার কারণ-স্বরূপ। মনুষ্যাকার, বৃক্ষাকার, গৃহাকার বা পর্ব্বতাকার কোন পদার্থ বাহিরে নাই। বাহিরের উত্তেজক কারণ হইতে মনের মধ্যে যে একটি প্রতিক্রিয়া হয়, আমরা কেবল সেইটিই জানিতে পারি। বাহিরে কেবল ঐ প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া দিবার উত্তেজক কারণ মাত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।

শাস্ত্র বলেন—সেই উত্তেজক কারণ মহামায়া। তিনি মূলা প্রকৃতি।

আমরা সেই মহামায়ার মায়া-জালে সমাচ্ছন্ন হইয়া শুক্তিতে মুক্তা জ্ঞান করতঃ দিবানিশি ভ্রমে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। তথাপি কিন্তু স্মৃতির অনুভূতি একেবারে যায় নাই,—বাহিরের বস্তুর অত্যধিক বিকাশ দেখিলে, তাই আমাদের সেই অরূপার ভুবনময়ী রূপের কথা মনে জাগিয়া উঠে। তাই শরতের প্রথম বিকাশে মনে পড়ে,—ঐ যে বর্ষণলঘু মেঘমালার গড়াগড়ি, ঐ যে শরচ্চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণমালার আকুল-ব্যাকুলী, ঐ যে শেফালী-মল্লিকা জাতি-যূথী স্থলপদ্ম-কমল-কহ্লারের শোভা-সুগন্ধি, ঐ যে নদীর স্বচ্ছ নীল বারিরাশির আকুল কলতান, ঐ যে বনের পাখীর মধুর সঙ্গীত, ঐ যে প্রকৃতির অলস-মদির-উচ্ছ্বাস ওত আর কিছু নয়, আমাদের করুণাময়ী মায়েরই রূপ। তখন মনে হয়, মা কোথায়? মা ত বিশ্বময়ী—বিশ্বেশ্বরী—ভবদুঃখহন্ত্রী। কিন্তু ক্ষুদ্র আমি—সান্ত আমি—সে বিশ্বময়ীর ধারণা করি কেমন করিয়া?

মেঘ-মন্দ্র-স্বরে মহর্ষি মেধস বলিয়া দিতেছেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥

তিনি অরূপা হইয়াও রূপ গ্রহণ করেন। তবে আর ভাবনা কি,—কল্পারম্ভ করিতে হইবে। বিধি-নির্দ্দিষ্ট দিবসে তাঁহার রূপ গড়াইয়া পূজা করিতে হইবে। কিন্তু ততদিন যে সহ্য হয় না। আর যে পারি না। প্রভাতে ভিখারী গাহিয়া গেল—

"আর আমি পারি না হে, আন গৌরী প্রাণধনে।"

আমি কি করিয়া থাকিব? মা! মা! হৃদয়ে উদয় হও - কল্পারম্ভ করিলাম বিধি-নির্দ্দেশিত দিবসে তোমার আরাধনা করিব।

নবম্যাদি কল্পারম্ভ।

এ যে শাস্ত্র-বিহিত তিথি। মহামায়া লীলা-জন্য এই দিনে একদিন আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এবং দেবতাগণকে বলিয়াছিলেন, এদিনের স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন বিফল হয় না। শাস্ত্রে আছে—

উগ্রচণ্ডা চ যা মূর্ত্তিরষ্টাদশভুজাভবৎ।
সা নবম্যাং পুরা কৃষ্ণপক্ষে কন্যাং গতে রবৌ।
প্রাদুর্ভূতা মহামায়া যোগিনীকোটিভিঃ সহ॥

কালিকাপুরাণ।

"ভগবতী অষ্টাদশভুজা উগ্রচণ্ডা নামে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, উহা পূর্ব্বে, সূর্য্য কন্যারাশি গত হইলে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে কোটি যোগিনীর সহিত প্রাদুর্ভূত হয়।" অতএব ঐ দিনে মায়ের কল্পারম্ভ হইয়া থাকে।

বোধন।

কল্পারম্ভের সহিতই বোধন হয়। বোধন অর্থে জাগরণ। প্রসুপ্তা দেবীকে জাগাইয়া না লইলে হইবে কেন? তিনি যে নিদ্রিতা,—তিনি নিদ্রিতা না থাকিলে আমাদের জ্ঞান নাই কেন? আমরা অবাস্তবে বাস্তব জ্ঞান করিয়া দিবানিশি প্রমত্ত রহিয়াছি কেন? যখন সাধন-বলে মা আমার জাগরিত হন, তখন ঐ সঞ্চিত শক্তি সুষুম্নামার্গে ভ্রমণ করে—তখন যে প্রতিক্রিয়া হয়, তাহা স্বপ্ন, কল্পনা অথবা ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহাকেই অতীন্দ্রিয় অনুভব বলে,—আর এই সময়েই জ্ঞানাতীত বা পূর্ণ চৈতন্যাবস্থা লাভ হয়। যখন উহা সমুদয় জ্ঞানের, সমুদয় অনুভূতির কেন্দ্রস্বরূপ মস্তিষ্কে যাইয়া উপস্থিত হয়, তখন যে সমুদয় মস্তিষ্ক হইতেই এক মহা প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। শরীরের প্রত্যেক অনুভবশীল অংশ, অনুভব-সম্পন্ন প্রত্যেক পরমাণু হইতে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়। ইহার ফল, জ্ঞানালোকের প্রকাশ বা আত্মানুভূতি। তখনই আমাদের ইন্দ্রিয় জ্ঞান ও

উহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জগতের কারণ-সমূহের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান হইবে, সুতরাং তখনই আমাদের পূর্ণজ্ঞান লাভ হইবে। কারণ জানিতে পারিলেই কার্য্যের জ্ঞান নিশ্চিত আসিবেই আসিবে। তখন আমি কি, মা কি,—সবই বুঝা যাইবে। মায়ের পূজার অধিকার হইবে।

শ্রীভগবানের অবতার শ্রীরামচন্দ্রকেও বোধনে দেবীকে জাগরিতা করিয়া তমোরূপী শত্রু দশাননকে নিহত করিতে হইয়াছিল। সে এমনই শরদ্রৌদ্র বিকশিত দিবসে—সে এমনই মায়ের জগন্ময়ী মূর্ত্তির পূর্ণতার কালে। কিন্তু তিনি এ সকল দিন প্রাপ্ত হন নাই—তথাপি বোধন করিয়াছিলেন। কবি বলিয়াছেন—

"শ্রীরাম আপনি কয়, বসন্ত শুদ্ধি-সময়,
শরৎ অকাল এ পূজায়॥
বিধি আর নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন,
কৃষ্ণা নবমীর দিনে তাঁয়॥
সে দিন হ'য়েছে গত, প্রতিপদে আছে যত,
কল্পারম্ভে সুরথ রাজায়॥
সে দিন নাহিক আর, পূজা হবে কি প্রকার,
শুক্লা ষষ্ঠী মিলিবে প্রভাতে॥
কন্যারাশি মাস বটে, কিন্তু পূজা নাহি ঘটে,
অত্র যোগ সব হৈল যাতে।
বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তায়,
কর ষষ্ঠী কল্পেতে বোধন।
ব্যাঘাত না হবে তায়, বিধি খণ্ডি পুনরায়,
কল্পখণ্ডে সুরথ রাজন॥" কীর্ত্তিবাস।

কৃষ্ণপক্ষের নবমী, শুক্লপক্ষের প্রতিপদ ও ষষ্ঠীতে জগদম্বার কল্পারম্ভ ও বোধন হইয়া থাকে, তারপরে মহাপূজা।

কিন্তু কেন সারা বঙ্গে এক মন্ত্র, এক স্বর, এক উদ্যম, এক উৎসাহ প্রবাহিত হইয়া থাকে? কেন রোগ-শোক-আধি-ব্যাধি-অভাব-অভিযোগ বিস্মৃত হইয়া বঙ্গের নর-নারী এই দিবসে এক মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। এক সুরে-এক রাগিণীতে কেন জগদম্বার চরণ-সমীপে প্রার্থনা করে—

দেবি ত্বং জগতাং মাতা সৃষ্টিসংহারকারিণী।
পত্রিকাসু সমস্তাসু সান্নিধ্যমিহ কল্পয়॥
পল্লবৈশ্চ ফলোপেতৈঃ শাখাভিঃ সুমনারিকে।
পল্লবে সংস্থিতে দেবি পূজাং গৃহ্ন প্রসীদ মে॥

মা! বিশ্বেশ্বরি! সারা বিশ্ব তোমারই মূর্ত্তি,—কিন্তু ক্ষুদ্র আমি,—অণু হইতে অণু আমি, আমি কি করিয়া তোমার সে বিশ্বরূপা মূর্ত্তি ধারণা করিতে

পারিব? এস মা, আমার চণ্ডীমণ্ডপে তোমার আসন গড়াইয়াছি,—তোমার দশভুজা মাতৃমূর্ত্তি গড়াইয়া মনের মত করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি,—তুমি কি আসিবে না? কোথা হইতে আসিবে? এ জগতই যে তুমি। এ জগতের বৃহত্তম পদার্থ হইতে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থ তুমি। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, পর্ব্বত, প্রান্তর, অনন্ত বারিধি, বৃহৎকায় হস্তী, ক্ষুদ্রদেহ মশক, মানব, সর্প, সরীসৃপ—ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কান্তি, শান্তি, লজ্জা, ধৃতি, মেধা, তুষ্টি, পুষ্টি প্রভৃতি তুমিই যে সব,—তবে আসিবে কোথা হইতে? একি আমাদের উন্মাদ-কল্পনা! না না,—সারা বিশ্ব যুড়িয়া বায়ুস্তর সজ্জিত আছে, তথাপি বায়ু যখন খণ্ড না হয়, চঞ্চল না হয়, তখন আমরা তাহা অনুভব করিতে পারি না। বিশ্বরূপিণী মা তুমি—তোমাকে আমরা অনুভব করিতে পারি না,—তাই তুমি দেবগণের হিতকল্পে এবং সাধকের সুগম জন্য যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছ, সেইরূপেই ডাকি,—তাই আমরা সমগ্র বঙ্গবাসী আ'জ তোমার দশভুজা রূপ দেখিবার জন্য কল্পারম্ভ করিয়াছি,—শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে! এস মা!—তোমার আসিবার উপলক্ষণ দেখিয়াই কল্পারম্ভ করিলাম।

শরতের অধিষ্ঠাত্রী শারদীয়া! শরৎ আসিয়াছে—শরতের নিরুপম নীল-মেঘ স্বপ্নের ন্যায় তোমার আগমন-পথ চাহিয়া আছে চপলা চেতনার ন্যায় এক একবার চমকিয়া তোমার অধিষ্ঠান চণ্ডীমণ্ডপের দিকে চাহিয়া দেখি-তেছে। সারি সারি ফুল-ফল-ভারাবনত বঙ্গ-বৃক্ষ সকল তোমারি উপহার লইয়া অপেক্ষা করিতেছে - নদীবক্ষে তোমারি স্নান-বারি—কাঁপিয়া কাঁপিয়া স্বচ্ছ হইতেছে। তোমারি আগমন প্রতীক্ষায় গৃহে গৃহে মানব-মানবীর মুখে হাসি,—গোষ্ঠে গাভীর উচ্ছ্বাস, ভ্রমর-ভ্রমরী গুঞ্জনামোদে দিক্ আমোদিত করিতেছে, এবং শারদোৎফুল্ল ফুলগন্ধে সুধাগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে ও শাখায় শাখায় মৃদু কুহরণে পিককুল তোমারি মহিমা-গাথা গাহিয়া ফিরিতেছে।

ভব-ভয়হারিণি মা আমার;—**এস**।

শারদীয়ামিমাং পূজাং করোমি কমলেক্ষণে।
আজ্ঞাপয় মহাদেবি দৈত্যদর্পনিসূদনি॥
সংসারার্ণবদুষ্পারে সর্ব্বাসুখবিনাশিনি।
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

বর্ষা প্রাতে।

আজি বরষা-প্রাতে মধুর বাতে
সুখের শরৎ এসেছে।
ফুল্লপ্রাণে হৃদয়াসনে
সাজায়ে অরঘ যতনে,
হেরি বরবেশে মন্দির-দ্বারে
শরতে সুহাস আননে,
পূজিতে মুগধা প্রকৃতি রূপসী
সুমোহিনী সাজে সেজেছে!

বাজাল শঙ্খ মঙ্গল নাদে,
দিগঙ্গনা হরষে,
মঙ্গল হুলু দিলা পিকবধূ
ললিতকণ্ঠে পাপিয়া,—
গাহিল মধুর মঙ্গল গীতি;
অঞ্চলানিলে মলয়া,—
ব্যজনিলা সুখে, আশিষিলা মরি—
সেফালি সরম পরশে।

গন্ধামোদে মাতায়ে মন্দ—
সমীরে,—সরঃশোভিনী,
বিকশিতাধরে চাহিলা রূপসী
হাসিল কেতকী সুহাসে,
জাগাতে বাসর সে মিলন যাগে
কুমুদিনী প্রেম পরশে,
নিশীথিনী সহ লয়ে জ্যোছনারে
বিকশিলা চারু-হাসিনী।

নির্ম্মল চারু সুনীল নভে
চাঁদিমা সে মধু মিলনে;—
হাসি হাসি সাজি তারার মালায়
গগনের কোলে বসিয়া,—

ঢালিয়া ধরায় রজতের ধারা
প্রেমরসে মরি রসিয়া,—
হাসাল কুমুদে, তটিনী-বালায়
তুষিলা বিমল কিরণে।

যৌবন-মদ-মত্তা তটিনী
যেতেছিল ওই গরবে।
স্ফীত বক্ষে উদ্বেলিতা
চঞ্চলা, দ্রুত গমনে,—
ভাদরে, আদরে সোহাগের ধারা
ঢালিতে সাগরে যতনে ;
গত-যৌবনে এবে স্রোতস্বিনী
চলিছে মৃদুলে নীরবে।

বহিয়া মন্দ মলয়ানিল
উলসে অলস পরাণে!
শাখী-শাখে পাখী বিভু-গুণগায়
তুলিয়া সুস্বর লহরী,
নিরালা নিশীথে খদ্যোতিকাকুল
ছড়ায় রূপের মাধুরী ;
যেন সে মুগধা প্রকৃতির অঙ্গে
ভূষিত হীরক রতনে।

শরতাগমে মুগধা প্রকৃতি
বিলাসাবেশে ভাসিল।
উলসিত শত অলস পরাণ,
নবীন জীবন লভিয়া,—
জননী রূপিণী প্রকৃতির পদে
মন প্রাণ দিল সঁপিয়া ;—
আশিষিলা সতী সু-রতন দানে ;
মধুরে জগত হাসিল।

শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার।

মা না মেয়ে।

মা! তুমি মা, না মেয়ে? বারে বারে তোমার মা মা বলিয়া ডাকিয়াছি, তোমার আবাহন করিয়াছি, তোমারে বিসর্জ্জন করিয়াছি, মনের কথা, প্রাণের ব্যথা তোমাকে জানাইতেছি; তুমি আসিয়াছ, আবার প্রচ্ছন্ন হইয়াছ। জিজ্ঞাসা করি;—মা! জননী হইয়া যাতায়াত করিয়াছ, না মেয়ের মত বাপের বাটীর আদর খাইয়া গিয়াছ? শাস্ত্রে শুনিয়াছি—তুমি জগন্মাতা, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, অনাদি, অনন্ত-প্রসূতি। কিন্তু এসব কথার দ্বারা আমার মনের সাধ মিটে না। আমি জগৎ দেখি নাই, ব্রহ্ম বুঝি নাই, তাহার আবার অণ্ড আছে, সে সংবাদও রাখি না। আদি এবং অন্তের আমার ধারণা নাই, সুতরাং ওসব গুণবাচক কথায় আমার মন উঠিবে না। আমার কাছে আসিতে হইলে কেবল আমারই মা হইয়া আসিতে হইবে। আমি মায়ের একছেলে হইয়া একলা ঘরের আদুরে মাণিক হইয়া, তোমার আদর খাইব, তোমার কাছে আব্দার করিব, তুমি আমার সকল উৎপাত সহিবে। আমি নিশিদিন অনবরত তোমার ত্রিভুবন দুর্ল্লভ পীযূষপোরা স্তনযুগল ধরিয়া পান করিতে থাকিব। আর যদি আমার কন্যা হইয়া আইস, তবে গজমুক্তার নোলক দোলাইতে দোলাইতে, অধরোষ্ঠ ঈষৎ ফুলাইয়া কচি কচি গাল দুটি অভিমানে আদরে একটু রাগ-রঞ্জিত করিয়া দ্রুত গমনে অস্থিরা চঞ্চলার ন্যায় আমার কোলে আসিয়া বস। হিমগিরি তাহা দেখিয়া অভিমানে হেটমুণ্ডে স্থির থাকুক। মা! মা! কন্যার সাধ মিটাইতে হইলে আমার বুকপোরা কোলজোড়া ঘর আলো করা মেয়ে হইয়া আইস। মৃণাল বাহুযুগল শয্যায় এলাইয়া ঘুমাইয়া থাকিবে, আর আমি তোমার চাঁদ মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া কানের কাছে ধীরে ধীরে বলিব।—

"আর কত ঘুমাবি কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারে।
জাগ মম অন্তরে জাগ, জাগ জাগ সহস্রারে॥
আমায় দিয়ে মায়া-নিদ্রা,
মা তোমার কি কপট নিদ্রা,
আমার আগত যে মহানিদ্রা, অজপা ফুরাইবারে।
কিবা রাত্রি দিনের বেলা
একি ঘুম তোর দীনের বেলা,
আমি কাল-ভয়ে হয়ে উতলা
মা বলে ডাকি তোরে॥"

তুমি অমনি উঠিয়া বসিবে, আমি তোমার মুখ চুমিয়া ঘুমঘোর ভাঙ্গাইব, কোলে বসাইয়া ক্ষীর সর খাওয়াইব, নানা বস্ত্রাভরণে তোমাকে সাজাইব, আর দুই হাতে তোমার রাঙ্গা হাত দুটি ধরিয়া গালপোরা হাসি হাসিয়া আমি বলিব,—

"আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম
একবার নেচেছ ভবে, তেমনি কোরে
আবার নাচিতে হবে, নূপুর দিয়াছি পায়,
সুমধুর ধ্বনি তায় গো!
শুনেছি নিগূঢ় বাণী, চারি বেদ নূপুরের ধ্বনি,
ওগো আমার উমা নাচে ভাল।
মা নেচে সফল কর, আমার ইহ পরকাল॥"

মা, মেয়ে হইয়া সাধ মিটাওত এম্নি করিয়া মিটাইও। কি জানি মা, তুমি মা কি মেয়ে। মা বলিলে মাও হয়, মেয়েও হয়, কি বলিয়া ডাকিব মা? কোন্ কথা তোমার কানে গিয়া পৌঁছিবে?

কি বলিয়া ডাকিব মা? কথার ব্যবসায়ী, কবিগণ তোমাকে কত কথায় ডাকিয়াছে, কত গুণবাচক, ভাববাচক কথায় তোমার মহিমা ব্যাখা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু অত কথায় আমার কাজ নাই, আমি জানি তুমি "মা"। যাহার জন্য কাতর হইয়া, যে শব্দ প্রথম উচ্চারণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছি, যে শব্দ দেশ দেশান্তরের নানা জাতিতে উচ্চারণ করিয়া থাকে, গো মহিষাদি জীব জন্তুগণ যে শব্দের সাহায্যে মনের ব্যথা ব্যক্ত করিয়া থাকে, যাহা সহজ, তাহাই তোমার বাচক,—তুমি আমার গালপোরা, বুক-ভরা, জগৎজোড়া, মা। তোমার উপমা নাই, তোমার বিশেষণ পদ নাই, তোমাকে বুঝাইবার যো নাই—তুমি কেবল মা। তবে মা, তুমি মা না মেয়ে? আমার ইচ্ছা তুমি মাও হও—মেয়েও হও। আমার মাই মেয়ে, মেয়েই মা। পুত্রের ত মাতাই প্রথমা কন্যা, কন্যাই বার্দ্ধক্যের মাতা। যতদিন আমি আদরের বালক থাকিব, ততদিন তুমি আমার মা হইও। আমার দুষ্টামি, দুরন্ত ব্যবহার, ঝোঁক, আব্দার ঝুঁকি সহ্য করিবে। আমি যাহা চাহিব, যাহার জন্য কাঁদিব, তাহা তুমি দিও। আমি যেমন সাজে তোমাকে দেখিতে চাহিব, তুমি সেই রূপে সেই বেশে আমার কাছে আসিয়া বসিও। আবার যখন সংসারের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দারিদ্রের পেশনে

বিনষ্ট হইয়া যাইবে, যখন জ্ঞানের-প্রখর-করে আমার পূর্ণ বালকত্ব নষ্ট হইবে, যখন আমি বুঝিতে, দেখিতে, হিসাব করিতে শিখিব; যখন পুত্র কন্যার সাধ হইবে, ঘর দুয়ার বাঁধিবার চেষ্টা ও উদ্যোগ হইবে, তুমি—মা! তখন আমার কন্যা হইয়া ঘর দুয়ারে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইও। তোমাকে কত আদর করিব, কত যত্ন করিব, কোলে বসাইব, হৃদয়ে ধরিব, উঠিতে বসিতে, ঘুরিতে ফিরিতে যখন ইচ্ছা হইবে তোমাকে ধরিয়া চুম্বন করিব, তুমি হাসিয়া - জোর করিয়া অস্থিরা চঞ্চলার ন্যায় আমার হাত ছাড়াইয়া পলাইয়া যাইবে। শেষে যখন জরাজীর্ণ হইয়া রোগ-শয্যায় শায়িত থাকিব, তখন উমে! স্নেহময়ী কন্যার ন্যায় আমার রোগের সেবা করিবে —আমার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইবে। আমার বড় সাধ মা তুমি আমার একাধারে মা ও মেয়ে হইয়া জন্ম-জরার সকল জ্বালা যন্ত্রণা মিটাইয়া দেও। আমার এ উৎকট বাসনা পূর্ণ হইবে কি না জানি না। আপাততঃ অনেক বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতে আমাকে পাগল বলিয়া খারিজ করিবেন। পাগল হইতে আমার আপত্তি নাই। তবে কেবল দশজনে দশদিক হইতে হাততালি দিয়া নাচাইয়া-রাগাইয়া ক্ষেপাইয়া তোলে যদি তবেই বিশেষ ভাবনার কথা। আপনার ভাবে আপনি মজিয়া পাগল হইবার চেষ্টা করাও ভাল। যাউক, এখন এই বিষয়ে যুক্তির অবতারণা করিলে কি প্রকার হয় তাহাও দেখা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিতের কাছে, কবির মুখে শুনিয়াছি, মা তুমি বহুদর, বহুবক্ত্র, বহুরূপ—আব্রহ্ম-তৃণ-স্তম্ব পর্য্যন্ত তুমি। বিশ্ব তোমাময়—তোমাতে মাখা, উহার প্রত্যেক অস্তিত্বে তোমার অস্তিত্ব প্রতিভাত হইতেছে, এবং যাবৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি তোমার বিরাট্ অনন্ত অস্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠাপিত। কেহ তোমাকে নিরাকার নির্ব্বিকার নিগুর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কেহ কেহ বা সাকার, সগুণ, সোপাধিক বলিয়া ব্যাখ্যা করে। তুমি কি, তুমি কেমন, কোথায় যাইলে, কি বলিয়া ডাকিলে তোমার সন্ধান পাইতে পারি, তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না, বলিতেও পারে না।

কি বলিব মা, দশ ক্রোশ বিশক্রোশস্থ বস্তুর প্রমাণ যে মস্তিষ্কে ধারণা হয় না, নিত্যব্যবহার্য্য সভাগৃহের কোন স্থানে কি ভাবে কয়টা সামগ্রী সাজান আছে, একবার চক্ষু মুদিত করিয়া যাহার চিত্র চিন্তাপটে চিহ্নিত হয় না, এমন সকল স্বল্প বুদ্ধিজীবী মনুষ্যের কানের কাছে পলে পলে অনন্তের কথা,

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথা হইতেছে, তাঁহাদের নিরাকারের মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ ও ব্যবস্থা হইতেছে। দেশের লোকে "অনন্ত" শব্দের কি অর্থ বুঝে জানি না, কিন্তু আমি জানি "অনন্ত" অর্থে তাহাই, যাহার পরিচ্ছেদ নাই। সুতরাং যাহার পরিচ্ছেদ নাই, তাহা ধারণা করিতেও পারা যায় না; অতএব তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে একটু ভাষার পরিপাটী করিতে হয়, একটু অনুপ্রাসের ছটা, অলঙ্কারের ঘটা দেখাইতে হয়। "অনন্ত" শব্দটি ও সুললিত, কাযেই মানান হয় ভাল; তাই উঠিতে বসিতে অনন্তের ছড়াছড়ি। কিন্তু মা, তোমার আলোচনা করিতে হইলে কেবল কথার হাওয়ায়, শব্দের আড়ম্বরেত কাজ হইবে না। তোমাকে বুঝিতে হইলে, ধ্যান করিতে হইবে, তবেই ধারণার যোগ্য তুমি হইবে। পরন্তু পণ্ডিত জ্ঞানী আচার্য্যগণের কাছে শুনিয়াছি তুমি "বাঙ্‌মনসয়োরগোচরং" বাক্য মনের অগোচর তুমি—ব্যাখ্যা বিবৃতির পরপারে তুমি। বুঝিবার নয়, বুঝাইবার নহে। অথচ তোমাকে বুঝিতে হইবে, দেখিতে হইবে—ইষ্টদেবী পরমেশ্বরী করিয়া রাখিতে হইবে। নচেৎ আমার জন্ম বৃথা, আমার মনুষ্যত্ব বৃথা, আমার পুরুষকার নাই। তোমার উপাসনা ভবব্যাধির মহৌষধ, তোমার উপাসনা অতৃপ্তি—অশান্তির নিবারক, তোমার উপাসনা অজ্ঞানান্ধতামসে একমাত্র বিদ্যুজ্জ্যোতি; তোমার উপাসনা আমার সকল কার্য্যে উৎসাহ, সকল চেষ্টায় সাহস, সকল ব্যবসায়ের বল। তোমার সেবাই আমাদের নিত্য কর্ম্ম। কিন্তু তোমাকে বুঝি না—জানি না, তাই সর্ব্বদা বিপদ্-জালে বিজড়িত।

অন্যান্য অনেক লোকেই বলে তুমি "বাঞ্ছাকল্পতরু" "সন্তক্ত-কল্পলতিকা"। অতএব সহজে তুমি আমার উপাস্য দেবতা হইলে। আমি স্বীকার করি যে, আমার বাসনা কোটীজিহ্ব-অগ্নি-শিখার ন্যায় নিয়তই লহ লহ জ্বলিতেছে, সকল পদার্থই গ্রাস করিতে চাহে। আমার কল্পনা অনন্ত পথে ছুটিতে চাহে, পলে পলে সামগ্রী পাইবার জন্য বাসনা হয়। কল্পনার স্বপ্নেতেও যাহা দুষ্প্রাপ্য—অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহাও পাইতে আকাঙ্ক্ষা ছুটিয়া যায়! কিন্তু তুমিত আমার ইচ্ছার বশ, কল্পনার অধীন সাধের দেবতা, যখন যে ভাবে তোমাকে সাজাইব তুমি সেই ভাবেই সাজিবে। ইচ্ছা হইলে আমি তোমাকে কখন পিতা বলিব, কখন মাতা বলিব, কখন সখা বলিব, কখন প্রভু বলিব, কখন বা পতি-স্বামী বলিয়া তোমার সেবা করিব। আমার ইচ্ছা হইলে কদাচিৎ তোমার পূজা করিব, কদাচিৎ তোমার সহিত খেলা

করিব, কদাচিৎ বা তোমার কাছে অভিমান করিয়া, রাগ করিয়া ঠোঁট ঝুলাইয়া, কটু কথা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিব। তোমাতে ত ভাল মন্দ নাই, উচ্চ নীচ নাই, শ্লীল অশ্লীল নাই। আমার যেমন প্রকৃতি, যেমন শিক্ষা, যেমন বুদ্ধি, যেমন ধারণা তুমি তাহাই। যদি তাহা না হও, তাহা হইলে আমার দ্বারা তোমার পূজা হওয়া, সেবা হওয়া অসম্ভব। তোমার "বাঞ্ছাকল্পতরু"র মর্ম্মইত এই মা?

কে জানে মা, তুমি কি—তুমি কেমন? অথচ দুরন্ত সংসারের দুঃখ-দারিদ্র-শোক-মোহের বিষম ঝঞ্ঝাবাতের ভিতরে পড়িয়া স্থির ও আত্মস্থ থাকিতে হইলে, তোমা বৈত আর অন্য অবলম্বন, অন্য সহায় নাই। তুমি যাহা, তুমি তাহাই থাক, সে আলোচনায় সে অনুসন্ধানে আমার কি উপকার হইবে। আমি যখন ভব-ভয়ে ভীত হইয়া কাঁপিতে থাকিব, তখন তুমি ভয়হারিণী হইয়া বরাভয় দিয়া আমাকে প্রকৃতিস্থ করিবে, যখন আমি দুঃখদারিদ্র-যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে থাকিব, তখন তুমি প্রভাময়ী দয়াময়ী সর্ব্বৈশ্বর্য্যশালিনী জগজ্জননী অন্নপূর্ণা হইয়া আমার পিপাসিত, শুষ্ককণ্ঠে পীযূষ-ধারা ঢালিয়া দিয়া আমাকে সঞ্জীবিত করিবে, যখন আমি আত্মীয়-স্বজন মৃত্যু-শোকে উন্মত্ত, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিব, তখন তুমি শান্তিবিধাত্রী, আনন্দময়ী হইয়া, আমার নিরানন্দের অবসান করিবে। আমি যাহা চাহিব, যাহা পাইব না, যাহা যাহা মিলিবে না, তুমি তাহাই জুটাইয়া দিবে, তাহাই মিলাইয়া দিবে। তুমি আমার অমূল্যনিধি স্পর্শমণি। আশা তোমাময় সাগরে ডুবিয়া গলিয়া মিশিয়া যাইবে।

কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ ইহার হিসাব নিকাষ ত আমাদেরই দ্বারা হইয়াছে এবং হইতেছে। এবং তুমিও আমাদের হিসাব নিকাষের বাহিরে, তবে তোমাকে ভাল মন্দের ঘূর্ণিপাকে ফেলিয়া আমি কেন বঞ্চিত হই? এই অতৃপ্তিময় সংসারে তোমা ভিন্ন অন্য কেহ শান্তিবিধায়িনী নাই। আমি অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ, কলুষিত এবং ব্যসনাসক্ত, অতএব আমার মনের মত না হইলে সাধ মিটাইয়া তোমার পূজা আমি করি কি প্রকারে? মা অরূপিণী, আমি যেরূপে ডাকিব, তোমাকে সেইরূপেই আসিতে হইবে। সাধনার ভিত্তিই ইহা, সাধনার আকর্ষণী শক্তিই এই। কাজেই ভাল মন্দের আবর্জ্জনা আনিলে তোমার বসিবার স্থান থাকিবে না। তুমি নিজ গুণে সকল মল দূর করিবে, সকল জ্বালা জুড়াইবে, সকল সাধ মিটাইবে। আমি সংসারের

ভাল মন্দের মেঘমণ্ডল এড়াইয়া, তড়িৎতরঙ্গ-তুফান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অনন্ত নির্ম্মল জ্যোতির্ম্ময় আকাশে গিয়া তোমার সহিত মিলিব, সেখানে উদয় নাই, অস্ত নাই, গতি নাই, পরিণতি নাই, বিচার, বিতণ্ডা নাই, বলিবার বুঝাইবার বুদ্ধি দিবার কেহ নাই, সে কেমন স্থান, যখন যাইব, তখন তাহার মর্ম্ম বুঝিব। আমি ভক্তিভাবে ডাকার মত তোমাকে ডাকিতে পারিলে তুমি আমার মা হইয়া আসিবে, আমি তোমাকে যথারীতি প্রাণের সহিত আদর করিয়া, সোহাগ করিয়া "উমে মা" বলিয়া ডাকিলে তুমি দৌড়িয়া আসিয়া ঝাঁপিয়া আমার কোলে উঠিবে। তুমি আমার মা, তুমি আমার কন্যা, আমি ইহাই চাই, তুমিও তাহাই। দশজনে দশকথা বলিবে; তুমি গুপ্তরূপে দেখা দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবে।

সংসার যেমন দুঃখের আকর, চিন্তা ও শোক মোহের মহাসমুদ্র, ভগবৎ উপাসনাও তেমনি শান্তির খনি, আনন্দের অনন্ত-সাগর। ভগবানের সৃষ্টি-চাতুরীর সৎ ব্যবস্থাই এই—হলাহল এবং অমৃত একাধারে আছে, উষা এবং ছায়া পাশাপাশি থাকে। যাহার মুখে বিষ, তাহার মাথায় অমূল্য নিধি, যাহার বাহিরে সৌন্দর্য্য, তাহার ভিতরে কালকূট। ভবব্যাধি যেমন বিষম, তাহার ঔষধও তেমনি উত্তম এবং সহজ। এ রোগের সুলক্ষণ কাতরতা এবং অস্থৈর্য্য। আর রোগের দুর্লক্ষণ এই—রোগী যদি বুঝে যে তাহার কোন রোগ নাই, কোন জ্বালা নাই তাহা হইলে রোগ দুরারোগ্য! তুমি কাতর হইয়া, অস্থির-উন্মত্ত উদ্ভ্রান্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে থাক, নিশিদিন তাঁহার উপাসনা কর, সদ্‌গুরুর সাহায্যে সৎপথ অবলম্বন করিয়া, সাধনায় মগ্ন হও, দেখিবে সকল ব্যাধি দূরে যাইবে, সকল জ্বালা জুড়াইবে। বস্তু বিশেষের সাহায্যে যেমন কর্দ্দমাক্ত জল নির্ম্মল হয়, তেমনি ভগবানের সেবার গুণে তোমার কলুষময় পাপজীবন নির্ম্মল, পবিত্র, স্বর্গীয় হইবে, যে ভাবে তুমি তাঁহাকে ডাক, যে কথায় তাঁহার আবাহন কর, যে প্রকারে তাঁহার উপাসনা কর, তিনি তোমার সেই ডাকেই বিজ্ঞাত হইবেন, তিনি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া তোমাকে কৃতার্থ করিবেন। যাহার যেমন প্রবৃত্তি, যাহার যেমন স্বভাব, যাহার যেমন গুণ, যে যে দেশের, তাহাকে সেইমত, সেই ভাবে, সেই গুণানুযায়ী হইয়া পবিত্র করিবেন। পরে যখন জ্ঞানের পূর্ণেন্দু বিকাশ হইবে, পরা ভক্তির প্রভাবে আত্ম-সংযোগ হইবে, যখন সাধক জীবন মুক্ত হইবে, তখন কাঁদাকাটি থাকিবে না, আব্দার অনু-

রোধের জবরদস্তি থাকিবে না, তখন মা বলা, কন্যা বলার সাধ আকাঙ্ক্ষা দূরে যাইবে, তখন কি জানি, কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

লোকে বলে তুমি আমি এক হইব। পরন্তু এখন তুমি আমার মা হও মেয়েও হও। মাতৃ-ভাবে এবং কন্যার ভাবে যে কি স্নিগ্ধ মধুর পীযূষ-প্রবাহ হইতেছে, সে যে এই নদীতে ডুবিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। কোমল সরস অথচ অতৃপ্ত পিপাসিত প্রকৃতির তৃষ্ণা মিটাইবার ইহাই এক উপায়। যে মায়ের এক ছেলে সেই মা নামের মহিমা বুঝে। তাই মাই তাহার মা, এবং মেয়েও তাহার মা।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

একি ?

শারদ-যামিনী, মরি কিবা মনোরম সাজে
সাজিয়ে প্রকৃতি দেবী মৃদুল হাসিছে লাজে।
বহিছে সমীর মন্দ,—লুটিছে কুসুম-বাস,—
তুষিছে মনুজকুল,—করিছে ক্লান্তির নাশ,—
খরতর রবিকর দহে না ধরণী আর,
গলিতেছে—সুশীতল উজল জ্যোছনা-ধার!
প্রাকৃত-সৌন্দর্য্য হেরি' দিবস-যাতনা ভু'লে,
আশ্রয় লইনু সুখে নিদ্রার কোমল-কোলে।
আইল মোহিনী উষা, বিহগ ধরিল তান—
'শ্যামা'র মোহন-শিশে উছলি' উঠিল প্রাণ!
তেয়াগি' নিদ্রার কোল, উঠিনু আনন্দ চিত—
সহসা,—ঘটিল একি,—হেরি অতি বিপরীত!
মেঘ-জালে সমাকীর্ণ হইল গগন-তল
নিবিড় তিমিররাশি আবরিল ভূমণ্ডল।
বজ্রের নির্ঘোষ-ঘোর, বহে বেগে প্রভঞ্জন
হেরি' ভীম ঘনঘটা ব্যাকুল হইল মন!
ক্ষণপূর্ব্বে, প্রকৃতির মোহন-মুরতি দেখি—
ভুলেছিনু—হেসেছিনু; সহসা ঘটিল একি!!

শ্রীমুরারিমোহন গোস্বামী।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি ?

বেদান্ত দর্শন মতে সৃষ্টির ক্রম প্রথমতঃ বাসনাতীত নিগুর্ণ অবস্থা। এই অবস্থা লাভ করাই হিন্দুমতে জীবের লক্ষ্য। তৎপরে বাসনাপূর্ণ সগুণ অবস্থা, এখান হইতেই সৃষ্টি। বাসনা, রাগ (অনুরাগ) ও দ্বেষ এই দুই ভাবে বিভক্ত হইয়া যায়। কোন বস্তু লাভের ইচ্ছাই রাগ এবং কোন বস্তু দূর করিয়া দিবার ইচ্ছাই দ্বেষ। এই দুই ভাব চরিতার্থ করিতে আমাদের ইন্দ্রিয়-গুলি যন্ত্র স্বরূপ কার্য্য করিয়া থাকে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সতত রাগ ও দ্বেষের অনুচর সাজিয়া ইতস্ততঃ বস্তু-জগতে অতিবেগে ধাবিত হইতেছে। সাধারণ সংসার বা বর্ত্তমান সমগ্র সংসার এই ভাবেরই খেলা; পূর্ব্বোল্লিখিত সৃষ্টির ক্রমে দেখা গিয়াছে, মনুষ্য সাধারণ অবস্থাতে ইন্দ্রিয়দলের এদিকে ওদিকে ছুটাছুটি ভিন্ন কিছু নহে। কিন্তু ইহা মনুষ্যের স্বরূপ নহে, স্বরূপ প্রকাশে চেষ্টাসাধ্য প্রকৃ-তির স্রোতে ভাসিয়া গেলে হয় না। তবে সেই মনুষ্যত্ব কি ? কোন গতিশীল জিনিষের গতি proper directionএ থাকিলেই ঠিক হইল বলা যায়, নতুবা বিপথগামী বলিতে হইবে। কিন্তু পথ ঠিক হইয়াছে কি না তাহা ঠিক করিতে হইলে, প্রথমতঃ লক্ষ্য স্থির করিতে হইবে, নতুবা পথ ঠিক হইল কি না কি করিয়া বলা যাইতে পারে! মনুষ্যের লক্ষ্য কি ? হিন্দু দর্শন মতে বাসনাতীত হইয়া নিগুর্ণ অবস্থা লাভ করাই জীবের লক্ষ্য। ইহাকেই মুক্তি বলা যায়। হিন্দু দর্শনের প্রদর্শিত এই লক্ষ্য সম্বন্ধে যুক্তিতে এই বলা যাইতে পারে, এইরূপ বাসনাতীত কোন অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু প্রকৃতপক্ষে জগতে লক্ষ্য নামে অভিহিত হইতেই পারে না। কেন না বাসনার রাজ্যে সমস্তই অস্থির, অস্থির জিনিষ কখনও লক্ষ্য হইতে পারে না, লক্ষ্য অচল অটল হওয়া চাই, ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা এদিক ওদিক যাইতেছে; এই জিনিষ ছাড়িয়া ঐ জিনিষ ধরিতেছে। এখানে লক্ষ্য শব্দের প্রয়োগই হইতে পারে না। বলা যাইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়-গণ কোন না কোন একটা জিনিষে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াইত চলে, ইহার উত্তরে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে। যদি একজন লোক কতকগুলি ঢিল ছুড়িয়া মারে তবে সেগুলি কোন না কোন জিনিষের উপর পড়িবেই, কিন্তু সেখানে লক্ষ্য শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক যথেচ্ছা গতি সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই খাটে। এখানে প্রকৃত লক্ষ্য বলিয়া জিনিষ হইতেই

পারে না। আরও বলা যাইতে পারে, লক্ষ্য যাহা হইবে তাহা অবশ্য লাভ করারও সম্ভাবনা থাকিবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় এ জিনিষ ছাড়িয়া ঐ জিনিষ ধরিয়া জীব অনন্ত কাল ভ্রমণ করিতে পারে, কখন কোন সীমায় পৌঁছিবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। পাশ্চাত্য দর্শন অনেক গুলিই God becoming তাহাতে মনে হয়, এই সব কোনটাই বাসনার রাজ্য ছাড়িয়া প্রকৃত লক্ষ্য ধরিতেই পারে নাই, বাসনার রাজ্যের Snbtlety নিয়াই ব্যস্ত। কাজেই লক্ষ্য বাসনার রাজ্যে হইতে পারে না। লক্ষ্য বাসনাতীত কোনরূপ অবস্থাই হওয়ার সম্ভাবনা। আমরা হিন্দুদর্শন প্রদর্শিত এই লক্ষ্যে দৃঢ় বিশ্বাস করি। এই বাসনাতীত মুক্ত অবস্থাই মান বর লক্ষ্য, তবে জীবের গতি সম্বন্ধে বিচার হইতে পারে। গতি এই লক্ষ্যের দিকে আসিলেই ঠিক হইল, নতুবা নরকাভিমুখী হইল, সন্দেহ নাই। যে ভাবে চলিলে এই লক্ষ্যের দিকে গতি হয় ইহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তাহার বিপরীত তদভাব। এখন এই লক্ষ্যে গতি Practically কি ভাবে হইতে পারে? ইন্দ্রিয় গঠিত শরীর বিশিষ্ট জীব বাহ্যজগতে কাজ করিতে করিতেই ক্রমে অন্তর্জগতে এবং তথা হইতে মুক্তিতে যাইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বহির্মুখী তাহাদিগকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দিলে, তাহারা অনন্তকাল বস্তুজগতে ভ্রমণ করিতেই আমোদ পায়; তাহারা স্বভাবতঃ মুক্তির দিকে যাইতে চায় না। কাজেই মুক্তি লক্ষ্যে চলিয়া উত্তরোত্তর মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গুলিকে যথেচ্ছাচারী হইতে না দিয়া শাসনে আনা আবশ্যক, নতুবা মনুষ্যত্বের কার্য্য প্রায় আরম্ভই হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণকে ক্রমে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে, উচ্চ হ'তে উচ্চতর বিষয়ে প্রেরণ করতঃ উচ্চবৃত্তি সমূহের বিকাশ সাধন করিয়া ক্রমে সমুদয় পরব্রহ্মে প্রেরণ করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব, তাহা ভিন্ন সমস্তই তদ্বিপরীত। আজ কাল দেশে মনুষ্যত্বের খুব অভাব বোধ হয়। কাজেই মনে আসে মনুষ্যত্ব কি একটা সৃষ্টি ছাড়া কথা; কিন্তু কলির অন্তিমে এইরূপ হওয়ারই কথা। কাজেই ইন্দ্রিয় সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত শিক্ষা হইতেই পারে না। কেন না শিক্ষার অর্থ জীবন গঠন, শুধু দু'টা কথা মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় পাশ করা হইতে পারে না। জীবন গঠনের অর্থ শরীর মন ও আত্মাকে রীতিমত গঠিত করিয়া পরব্রহ্মে প্রেরণ করা। আজ কাল যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সম্পূর্ণ অঙ্গহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেন না এখন ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম হইল শাসন না থাকিলে স্বভাবতঃ অসংযত হইবে।

ইন্দ্রিয় সংযমের কার্য্যকে বৃথা কঠোরতা অন্ধবিশ্বাসের কার্য্য বলা হয়। কালের কি অপরূপ গতি! বর্ত্তমানে সংযম শিক্ষার অভাবে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়া অনেককে নষ্টই করিয়াছে। যাহারা কোন রূপে ২।৪টা পাশ করিয়া একটা চাকুরীর যোগ্য হইতে পারে, তাহারা কোন চাকুরী লইয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ বিলাসের সেবা করিয়া থাকে এবং ইহাই লক্ষ্য মনে করিয়া থাকে। জীবন-লক্ষ্যের কথা মনে হইলে মরণ সময় হয়। ইহাই কি মনুষ্যত্ব গঠন বা জীবন গঠন বলিতে হইবে? প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যবিহীন শিক্ষা নামই ধরিতে পারে না। তাহা বিলাসিতা ও তৎচরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র। বাল্যাবস্থা হইতেই মুক্তি লক্ষ্যে ব্রহ্মচর্য্য সাধন দ্বারা উচ্চবৃত্তি সমূহের দিন দিন বিকাশ সাধন করতঃ মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে থাকাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। বাল্যকাল হইতে ইন্দ্রিয় সঞ্চালন শিখিয়া কোন প্রকারে ভোগ সুখের সুবন্দোবস্ত করিয়া জীবনে কোন দিন জীবনের লক্ষ্যের কথা না শুনিয়া না বুঝিয়া শুধু ইন্দ্রিয়ের ভোগ সাধন করিয়া চলা মনুষ্যত্ব বিপরীত। আজ কাল প্রায় অনেকেই ইন্দ্রিয়ের ক্রীতদাস হইয়া পড়িয়াছে।

সংযম সাধন করতঃ উচ্চবৃত্তি সমূহের বিকাশ সহকারে ক্রমে মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে থাকাই জীবনের মূল তত্ত্ব, এবং ইহাই মনুষ্যত্ব। এতদভাবেই অবশ্য পতন; তাই আজ বিরাট সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। *

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষুদ্রতা।

স্রষ্টা যার সীমাহীন মুক্ত, শুদ্ধ, নিত্য,
অসীম সৌন্দর্য্যে হয় পুলকিত চিত্ত;
অপূর্ব্ব অধ্যেয় এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ—
ক্ষুদ্র বলি ধরিবার নাহি কোন কাজ।
অনন্ত এ বিশ্বে নর শুভ জন্ম লভি—
ক্ষুদ্রতায় আবরিত কেন বল সবি।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

---

* এই প্রবন্ধের মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি।

নেপোলিয়নের মহত্ত্ব !

নেপোলিয়নের বীরত্ব সসাগরা ধরণীব্যাপী। নেপোলিয়ন এক একটি যুদ্ধে এক একটি শক্তির দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে ইয়োরোপের সম্রাটগণের সিংহাসন কম্পিত হইত, রাজদণ্ড খসিয়া পড়িত, তাঁহাদের সিংহাসন লইয়া নেপোলিয়ন কন্দুক-ক্রীড়া করিতেন,—যুদ্ধ ব্যবসায়ে তিনি 'বিপণি-সমরক্ষেত্রে—রাজ্য-বিনিময়' জ্ঞান করিতেন;—কিন্তু বীরত্বেই যে নেপোলিয়ন অসাধারণ ছিলেন, এমন নহে; সর্ব্ববিষয়েই তিনি অসাধারণ ছিলেন। বৃথা রক্তপাত তিনি দেখিতে পারিতেন না; প্রতারণা প্রবঞ্চনা তিনি প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার ন্যায় সদয় হৃদয় বন্ধু, কর্ত্তব্য-পরায়ণ সেনাপতি, ভৃত্য-বৎসল প্রভু, স্বদেশ-প্রেমিক দেশনায়ক, আর্ত্তের সুহৃদ্, বিপন্নের সহায়—পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কেহ কখনও নেপোলিয়নকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই; আবার নেপোলিয়নের ন্যায় প্রেমিক পুরুষ বোধ হয় ইয়োরোপে আর কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই!—এ সকল বীরেরই স্বধর্ম্ম; বিধাতা তাঁহাকে বীর করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন;—অনেকে প্রতারণা প্রবঞ্চনার সাহায্যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া বীর নামে অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু তথাকথিত বীরগণের সহিত স্বভাব-বীর নেপোলিয়নের তুলনা করিলে তাঁহার অপমান করা হয়। নেপোলিয়নের বীরত্ব-কাহিনী অনেকেই অবগত আছেন; আমরা এই সংখ্যায় নেপোলিয়ন সম্বন্ধে কয়েকটি সরস গল্প পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিব।

সম্রাট নেপোলিয়নের প্রধান প্রাইভেট সেক্রেটারীর অনেকগুলি সহকারী ছিলেন। তাঁহারা সকলেই যথেষ্ট বেতন পাইতেন। তাঁহাদের মধ্যে জনৈক যুবক সহকারী ঋণ-জালে বিজড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার বেতনের পরিমাণ পর্য্যাপ্ত হইলেও, ঋণের পরিমাণ এত অধিক ছিল যে, তিনি কিছুতেই ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারিতেন না। উত্তমর্ণগণ তাগাদায় তাগাদায় তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল।

একদা রাত্রে ঋণের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে সেই যুবক কর্ম্মচারীর আর নিদ্রা হইল না; তাঁহার যেন শয্যাকণ্টকী উপস্থিত হইল। বিষয়ান্তরে মনঃসংযোগ করিবার অভিপ্রায়ে তিনি তাঁহার আফিষ ঘরে গিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘটনাক্রমে এই সময় সম্রাট নেপোলিয়ন তাঁহার নিজের

আফিস ঘর হইতে প্রাসাদ-কক্ষে যাইতেছিলেন। এত রাত্রে তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর আফিস ঘরে আলো দেখিয়া, তাঁহার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল; তিনি ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন কর্ম্মচারীটি নিবিষ্টমনে স্বকার্য্যে নিযুক্ত আছে। সে ব্যক্তি এত নিবিষ্টচিত্তে কার্য্য করিতেছিলেন যে, সম্রাটের উপস্থিতি আদৌ জানিতে পারেন নাই। কিন্তু সম্রাট যখন তাঁহার টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন।

সম্রাট তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যুবক, এত রাত্রে আফিস ঘরে বসিয়া তুমি কি কার্য্য করিতেছ?"

যুবক যে কার্য্য করিতেছিল, তাহা সম্রাটকে নিবেদন করিল।

সম্রাট বলিলেন,—"এ কার্য্যগুলি তো কল্য করিলেও করিতে পারিতে?"

যুবক। হাঁ সম্রাট, তাহা সত্য; কিন্তু রাত্রে আমার কিছুতেই নিদ্রা না হওয়ায়, আমি কার্য্যে মনঃসংযোগ করিয়াছি।

সম্রাট। তোমার ন্যায় নবীন যুবকের রাত্রে নিদ্রা না হইবার কারণ কি? তুমি বুঝি তোমার স্ত্রীর জন্য বড়ই অস্থির হইয়া উঠিয়াছ?

যুবক। সম্রাট! আমি এখনও বিবাহ করি নাই।

সম্রাট। তবে বোধ হয়, ভাবী পত্নীর জন্যই তোমার বিষম ভাবনা হইয়াছে?—সেই ভাবনাতেই নিদ্রা হইতেছে না!

যুবক। না সম্রাট,—আমি এ পর্য্যন্ত কাহাকেও ভালবাসি নাই,—বিবাহ করিবার বাসনাকেও কখনও হৃদয়ে স্থান দিই নাই।

সম্রাট। কেন? তোমার ন্যায় পদস্থ বিত্তশালী যুবকের এরূপ বৈরাগ্যের তো কোনও কারণ দেখিতেছি না!

যুবক। বিবাহ করি, আমার তেমন সামর্থ্য নাই;—কারণ আমি বিষম ঋণজালে বিজড়িত।

সম্রাট। সে কি! তুমি আমার নিকট পর্য্যাপ্ত বেতন পাও,—তবু তোমার ঋণ?

যুবক। আমার সংসারে অনেকগুলি ভাই-ভগিনী আছে;—আমার এই বেতন তাহাদের প্রতিপালন করিতেই ফুরাইয়া যায়।

সম্রাট। তোমার ঋণের পরিমাণ কত টাকা?

যুবক। দশ হাজার ফ্রাঙ্ক।

সম্রাট। আশ্চর্য্য! তুমি আমার নিকট মাসিক হাজার ফ্রাঙ্ক বেতন পাও, তত্রাচ তোমার এত ঋণ? তুমি জান—ঋণের ওপর আমার কত ঘৃণা! আমার কর্ম্মচারীরা ঋণগ্রস্ত হইয়া সাধারণের নিকট নিগৃহীত হয়—ইহা বড়ই লজ্জার কথা! এমন কর্ম্মচারীদের আমার সংশ্রবে রাখা আমি কিছুতেই যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। আমি তোমাকে আজ হইতে কর্ম্মচ্যুত করিলাম; কাল প্রত্যুষেই তুমি তোমার পাওনা গণ্ডা বুঝিয়া লইয়া চলিয়া যাইয়ো।

সম্রাট তৎক্ষণাৎ সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন; যুবকের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল!

পরদিন প্রভাতে মর্ম্মাহত যুবক যখন বাটী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিলেন,—সেই সময় সম্রাটের প্রধান সেক্রেটারী যুবককে সম্রাটের স্বাক্ষরিত একখানি পত্র প্রদান করিলেন; পত্রে এই কয়টি কথা লেখা ছিল,—

"যুবক,

সেই রাত্রে আমার কক্ষে আসিয়া আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া তোমার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বুঝিলাম, বর্ত্তমান অবস্থায় তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করিলে, তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীগণের অনাহারে অপমৃত্যু অনিবার্য্য! সুতরাং এবার আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিয়া তোমার পূর্ব্বপদেই তোমাকে নিযুক্ত রাখিলাম। আর আমার সেক্রেটারীর নিকট দশ হাজার ফ্রাঙ্কের নোট পাঠাইলাম। এই টাকা আমি তোমাকে আমার নিজস্ব তহবিল হইতে দান করিলাম; আশা করি, আজই তুমি তোমার পাওনাদারদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহাদের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে। আমি যদি পুনরায় শুনিতে পাই, তুমি কোনও ব্যক্তির একটি মাত্র ফ্রাঙ্ক ধার করিয়াছ, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই আমি তোমাকে কর্ম্মচ্যুত করিব।"

সম্রাটের অনুগ্রহ পত্র পাইয়া—এই অপ্রত্যাশিত দান প্রাপ্ত হইয়া, যুবক কর্ম্মচারী আনন্দে অভিভূত হইয়া সম্রাট নেপোলিয়নের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন। বজ্রের ন্যায় কঠোর এবং কুসুমের ন্যায় কোমল হইবার ক্ষমতা নেপোলিয়নের অসাধারণ ছিল; সেই জন্যই তিনি কর্ম্মচারীগণের ভয় ও ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

———

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

তারাহরণ।

ঋক্‌বেদে (১০।১০৯) এবং অথর্ব্ববেদে (৪।১৭) সোমরাজ বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারাকে হরণ ও প্রত্যর্পণ করার উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। পুরাণে এই উপাখ্যান অতিরঞ্জিত হইয়া তারার গর্ভে তারেয় (বুধ) জন্ম সংযোজিত হইয়াছে। পুরাণমতে হরণকালে তারা কাঁদিতে কাঁদিতে সোমরাজকে এই অভিসম্পাত করেন যে, এই পাপে তুমি পাপদৃশ্য হইবে। তদবধি ভাদ্রী শুক্লা চতুর্থীতে পাপচন্দ্র নষ্টচন্দ্র উপাধি ধারণ করেন।

তারার উদ্ধারার্থে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, সোমরাজ অসুরগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সোমরাজ তারাকে প্রত্যর্পণ করিলে সংগ্রাম নিবৃত্ত হয়। দেবগণের জিজ্ঞাসামতে গর্ভবতী তারা বলিলেন, এই সন্তান সোমরাজের। তারাপুত্র বুধগ্রহ তারেয় এবং সৌম্য খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। এবং বৃহস্পতি স্বীয় ভার্য্যা তারাকে পুনঃ গ্রহণ করিলেন। বুধগ্রহ বৃহস্পতির ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া পরিচিত আছেন। ফলিত জ্যোতিষমতে ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়, সোমরাজের ঔরসে জাত বুধগ্রহ শিশু ও শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন।

বনপর্ব্বে এবং কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে এই উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুগ্রীব-ভার্য্যা তারাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতা হেমমালী বালীরাজা হরণ করেন। তারার গর্ভে বালীর ঔরসে তারেয় জন্মগ্রহণ করেন। রামলীলায় তারেয় অঙ্গদ নামে বিশেষ পরিচিত। শ্রীরাম বালীবধ করিয়া সুগ্রীবকে তারা প্রত্যর্পণ করেন। বুধ-অঙ্গদ (১) (Mercury) শ্রীরামের দৌত্যকার্য্যে রাবণ-সভায় গমন করেন। মৃত্যুকালে বালীরাজা ইন্দ্রদত্ত হেমমালা সুগ্রীবকে অর্পণ করেন। এবং তারেয়কে ঔরসজাত পুত্রবৎ পালন করিতে আদেশ করেন। (২)

---

(১) "Mercurius was the messenger of the gods"

(২) মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরম্ পুত্রম্ পুত্রম্ ইব ঔরসম্।
ময়া হীনম্ অহীনার্থম্ সর্ব্বতঃ পরিপালয় (রাম ৪।২২।৯)।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

তারাদর্শক জানেন যে, সন্ধ্যাতারাদ্বয় বুধ ও শচীদৈবত শুক্র অস্ত বিন্দুর অতি নিকটে সন্ধ্যাকালে উদিত হয়। কখন বা উভয়ে স্বর্য্যের একপার্শ্বে থাকে। তখন সন্ধ্যাতারা শুক্রের তলে ক্ষুদ্র বুধগ্রহ ঝুলিতে থাকে। দেখিলে বোধ হয় যেন ভৃগু-দুহিতা নারায়ণ-পত্নী শ্রীদেবী (স্বর্গলক্ষ্মী) শিশু সন্তান ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছেন।

শুক্লা দ্বিতীয়া তৃতীয়া এবং চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র আকাশের ঐ পশ্চিমভাগে উদিত হয়। এই উপলক্ষে কখন বা চন্দ্রে ও শচীদৈবত শুক্রগ্রহে গ্রহযোগ অর্থাৎ সমাগম ঘটে। চন্দ্রবিম্ব শুক্রবিম্বকে আচ্ছাদিত করে। এইরূপে স্বর্গ-লক্ষ্মী ভৃগু-দুহিতা শ্রীদেবী (স্ত্রীগ্রহ শুক্র) চন্দ্রের অঙ্কগত হইলে সন্ধ্যাতারা শুক্র অদৃশ্য হয়। এবং চন্দ্রের তলে ক্ষুদ্রগ্রহ বুধ ঝুলিতে থাকে। দেখিলে বোধ হয় যে, শ্রীদেবী আপন শিশুকে পতির ক্রোড়ে রাখিয়া অন্তর্হিত হই-লেন। অর্দ্ধদণ্ড মধ্যে সমাগম বিচ্ছিন্ন হয় এবং চন্দ্র দূরে গমন করেন। শ্রীদেবী পূর্ব্ববৎ আকাশে প্রদীপ্ত হন। তখন শিশুগ্রহ বুধ আবার মাতা শ্রীদেবীর অঙ্কে বিরাজ করেন।

ঋকৃবেদমতে (৪।৫০।৭) বৃহস্পতি রাজা। ঋকৃবেদমতে (২।২৩।১) বৃহস্পতি দেবসৈন্যের সেনাপতি। ঋকৃবেদমতে (১।৪০।৮ বৃহস্পতি বজ্রধর। ঋকৃবেদমতে (১।২৪।৮) বৃহস্পতি সুধন্বা। ঋকৃবেদমতে (২।২৬।৩) বৃহস্পতি দেবগণের পিতা। ঋকৃবেদমতে (১।১৯০।১) বৃহস্পতি গায়ক-শ্রেষ্ঠ। ঋকৃ-বেদমতে (১০।৩৮।১২) এবং (২।২৫।৫) বৃহস্পতি মেঘদেব ও জলদেবতা। ঋকৃবেদমতে (১।৬২।৩) বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্র। এক কথায় ভারতের বৃহৎপতি গ্রীস্‌দেশীয় দ্যুপিতর্ দেবের (Jnpiter) সাক্ষাৎ ভ্রাতা। সুতরাং বৃহস্পতি—ইন্দ্র স্বর্গলক্ষ্মী শ্রীদেবী ওরফে শচীর পতি। হিন্দু-জ্যোতিষমতে চন্দ্রমণ্ডল বুধ-আদি ছয় গ্রহমণ্ডল ও নক্ষত্রমণ্ডলের উপরিস্থ। চান্দ্রবর্ষ গণনা-কালে চন্দ্র নক্ষত্র-চক্রের অধিপতি বলিয়া তারাপতি উপাধি ধারণ করেন। এবং বার্হস্পত্য বর্ষ গণনাকালে বৃহস্পতি নক্ষত্র-চক্রের অধিপতি হইয়া তারা-পতি আখ্যা ধারণ করেন।

উপপত্তি।

চিন্তাশীল পাঠক! তারাহরণের উপাখ্যান পাঠ করিয়া ঐতিহাসিকগণের চতুরতায় কে না বিমুগ্ধ হয়। তারাহারা ভারতে এমন মনোরম জ্যোতিষিক

ইতিহ প্রকৃত ঘটনামূলক ইতিবৃত্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছে। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে। হিন্দুর সমাজের আদর্শ দেবসমাজে এই ঘৃণিত ব্যাপার সত্য সত্যই ঘটিলে হিন্দুর সমাজ পাতালেও স্থান পাইবে না। এবং সম্ভব অসম্ভবের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে এই ইতিহকে প্রকৃত ঘটনামূলক বলিবার কোন হেতু আমরা দেখি না। পুরাণে বৃহস্পতি নিরীহ গো-ব্যাচারি দেব-পুরোহিতের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বেদে বৃহস্পতি বজ্রধর ও সুধন্বা এবং দেবসৈন্যের নেতা। তাঁহার পত্নীকে চন্দ্র হরণ করিতে সাহসী হইবেন এমন কোন্ বলে চন্দ্র বলীয়ান্ তাহা আমরা দেখি না।

কথিত হয় যে তারাকে পুনঃ গ্রহণ করিয়া গরজে বৃহস্পতি স্মৃতিতে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, "প্রসবাৎ শুদ্ধ্যতে নারী" এবং বেদে যখন বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারার হরণ গীত হইয়াছে তখন তাহা সত্য বলিয়া মানিতে হইবে।

কিন্তু বেদাধ্যায়ী জানেন যে, বেদোক্ত ইতিহগুলিকে নিরুক্তকারগণ প্রায়শঃ অর্থবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং নৈরুক্ত ঋষিগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া আমরা অর্থবাদের সাহায্যে বেদোক্ত ইতিহের সদ্ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হইলে বৈয়াকরণিক অসম্ভব অসৎ অর্থ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইব কেন?

বালী সুগ্রীবের উপাখ্যানে আমরা সেই তারা ও তারেয় (৩) উভয়ের সাক্ষাৎ পাইতেছি এবং তারার সেই হস্তান্তর দেখিতেছি। মহর্ষি বাল্মীকি বুধগ্রহের যোগরূঢ়ী তারেয় নাম অপরকে দিয়াছেন। কোন্ ভাষাবিৎ একথা সমর্থন করিতে চাহিবেন?

গায়কশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি এই ইতিহে সুগ্রীব নাম গ্রহণ করিয়াছেন এবং দেবী-সিনিবালী (অমাচন্দ্র) বালী নামে পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। বালীচন্দ্রের সাক্ষাৎ সমাগমে রাম-সূর্য্য পরাস্ত হইয়া থাকেন এবং সূর্য্যগ্রহণ উপস্থিত হয়। (৪) এজন্য রামসূর্য্য প্রচ্ছন্ন থাকিয়া বালীচন্দ্রকে কিরণ-বাণে বধ করিলেন। বালীচন্দ্র বুধ-আদি ষট্ গ্রহমণ্ডল ও তারামণ্ডল এই সপ্ততাল পরে স্থিত বলিয়া রামসূর্য্য কিরণবাণে সপ্ততাল ভেদ করিয়া সুগ্রীবের নিকট পরীক্ষা দিয়াছিলেন।

(৩) করিষ্যতি এষঃ তারেয়ঃ তেজস্বী তরুণঃ অঙ্গদঃ (রাম ৪।২৩।১২)

(৪) দৃশ্যমানঃ তু যুধ্যেথা, ময়া যুধি নৃপাত্মজ।
অদ্য বৈবস্বতম্ দেবম্ পশ্যেঃ ত্বম্ নিহতঃ ময়া॥ (রাম ৪।১৭।৪৭)

বালীচন্দ্র বধ হইলে বার্হস্পত্যবর্ষ গণনা হইবে বলিয়া হেমমালী বালীচন্দ্র ইন্দ্রদত্ত হেমমালা অর্থাৎ নক্ষত্রমালা সুগ্রীব বৃহস্পতিকে অর্পণ করিলেন (৫) এবং সুগ্রীবের ক্ষেত্রজ সন্তান (৬) বলিয়া তাচ্ছল্যভাবে তারেয় প্রতিপালিত না হয় এজন্য বালীচন্দ্র সুগ্রীবকে ঔরসজাত পুত্রবৎ তারেয়কে প্রতিপালন করিতে আদেশ দিলেন।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

কতদিনে হায়!

বনের বিহগ আকাশে উড়িতে
নয়নে লাগিল ধাঁধা,
ছোলা খেতে নীচে আসিয়া হেথায়,
খাঁচায় পড়িল বাঁধা।
খেতে দিলে পাখী কিছুই খায়না,
পরাণ উদাস করে,
গাইতে বলিলে কি গান যে গাবে
জ্বালায় জ্বলিয়া মরে,
খাঁচা হ'তে ভাল ছিল বনে দূরে,
স্বাধীনতা ছিল মনে;
আকুল পরাণে কি যেন হেরিছে
উন্মুক্ত আকাশ-পানে।
এ হেন প্রবাসে আমিও হেথায়
কেন বা পড়িনু বাঁধা,
ভাবিতেছি তাই কতদিনে হায়!
ঘুচিবে মোহের ধাঁধা।

শ্রীনলিনীকান্ত দাস।

---

(৫) ইমাম্ চ মালাম্ আধৎস্ব দিব্যাম্ সুগ্রীব কাঞ্চনীম্ (রাম ৪।২২।১০)

(৬) পিতুঃ সমীপম্ আগত্য অঙ্গদঃ অব্রবীৎ "সৌমিত্রিঃ অয়ম্ আগতঃ ॥"
(রাম ৪।৩১।৩৫)

হিন্দু কি পৌত্তলিক?

পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া নানা কুৎসা রটনা করিতেছেন। এই শ্রেণীর নিন্দুকদিগের হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিবার প্রধান ও প্রথম কারণ, হিন্দুর সাকারোপাসনা। ইঁহারা বলেন, যে ধর্ম্ম প্রতিমা পূজা অনুমোদন করে, তাহা অসভ্য বর্ব্বরের ধর্ম্ম, অশিক্ষিত অজ্ঞানের ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম যখন পৌত্তলিকতা অনুমোদন করে, তখন হিন্দুরা অজ্ঞান, অসভ্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে?"

হিন্দুধর্ম্মদ্বেষীদিগের প্রাগুক্ত বাক্যাবলীর উত্তর প্রদান করিবার পূর্ব্বে বলিয়া রাখি, আমরা কুৎসাকারীদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের কুৎসা বা নিন্দা করিব না। হিন্দুর এ উদারতা আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞানোদয়ের সহিত উদ্ভূত হয় নাই—ইহা বহু প্রাচীনকাল হইতে সমুদিত। ভাগবতে লিখিত আছে—

"কিরাতহুনান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেহন্যেচ পাপা যদপাশ্রয়া শ্রয়াঃ শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

অর্থাৎ "কিরাত, হুন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, কঙ্ক, যবন, খস প্রভৃতি এবং অন্যান্য পাপাচারী ব্যক্তিরা যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ হইয়া থাকে, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার করি।"

এই শাস্ত্রবাক্যে কি সার্ব্বভৌম প্রেম সূচিত হয় নাই? যাহারা এরূপ উদারতায় অনুপ্রাণিত, তাহাদিগের ধর্ম্মকে অসভ্যের ধর্ম্ম বলা প্রগল্‌ভতা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

এখন দেখুন, আর্য্যশাস্ত্রে ব্রহ্মোপাসনার কিরূপ ব্যবস্থা আছে। হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র বিশাল রত্নাকরসদৃশ। যিনি যেরূপ রত্ন আহরণ করিতে পারেন, তিনি তাহারই অধিকারী হইয়া থাকেন। তাই অধিকারীভেদে ধর্ম্মার্জ্জনের শ্রেণী বা স্তর বিভাগ আছে।

হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় ধর্ম্মে উপাসনার প্রকারভেদ পরিদৃষ্ট হয় না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, অজ্ঞ বিজ্ঞ, নিরক্ষর শিক্ষিত, সভ্য অসভ্য, অজ্ঞান জ্ঞানী, সকলের জন্যই একই প্রকারে সাধনা, উপাসনার মার্গ নির্দ্দেশিত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মে তাহা নাই—প্রকৃতিভেদে, গুণভেদে ধর্ম্মার্চ্চনার পর্য্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। যে যেমন সাধনার অধিকারী, তাহার জন্য তদ্রূপ

বিধিনিষেধ ব্যবস্থিত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের নিম্নস্তরের ভজন পূজন পদ্ধতি সন্দর্শন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি করিয়া থাকেন, আমরা তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা কোনমতেই করিতে পারি না।

হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্মনির্দ্দেশ যেরূপ আছে, অন্য কোন ধর্ম্মপুস্তকে তদ্রূপ আছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। এই ব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার ও একমাত্র উপাস্য। যাঁহারাই হিন্দুর শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদিগের উক্তি সমর্থন করিবেন। ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করিবার স্থান বা সময় আমাদিগের নাই। তবে আমরা কয়েকটি মাত্র শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। হিন্দুশাস্ত্রে যেরূপ নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ কোন ধর্ম্মে হয় নাই বলিলেই হয়। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করেন, তাঁহারা স্ব স্ব ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, হিন্দুর ব্রহ্মজ্ঞান, তাঁহাদিগের নিরাকার পরমেশ্বরের জ্ঞান অপেক্ষা স্বতন্ত্র। হিন্দুর ঈশ্বর ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়া ক্লান্ত শ্রান্ত কলেবরে বিশ্রাম গ্রহণ করেন না। হিন্দুর পরমেশ্বর প্রয়োজন হইলে প্রেরিত দূতের সহিত কথা কহেন না, বা যখন তখন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন না। হিন্দু বলেন, তাঁহাদিগের ব্রহ্ম—

"চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপ-কল্পনা॥
রূপস্থানাং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিক কল্পনা॥"

স্মার্ত্তধৃত যমদগ্নিবচন।

"জ্ঞানস্বরূপ অদ্বিতীয় অশরীরী পরমেশ্বরের রূপের কল্পনা উপাসকের কার্য্যের জন্যই করা হয়। রূপ কল্পনা করিলে দেবতার পুংস্ত্রীভেদ কল্পনাও করিতে হয়।"

ব্রহ্মনির্দ্দেশ এবং রূপ কল্পনার কারণ পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে কিরূপ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা উদ্ধৃত করিতে হইলে বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন হয়। তথাপি আমরা কয়েকটি মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিধর্ম্মীদিগের ভ্রমনিরসনে সচেষ্ট হইব।

বিধর্ম্মীরা বলিয়া থাকেন, হিন্দুর পুরাণাদি আধুনিক গ্রন্থনিচয় হিন্দুর অধঃপতন সূচনাকালে রচিত। আমরা তর্কানুরোধে যদি তাঁহাদিগের কথাই স্বীকার করি, তাহা হইলেও তথা কথিত, সেই অধঃপতন সময়ের

পুরাণাদি বচন দ্বারাই প্রতিপাদন করিতে পারি।" হিন্দুর অধঃপতনের সময়েও ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান গরীয়ান ও মহোচ্চ ছিল।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—

"রূপনামাদি-নির্দ্দেশ-বিশেষণ-বিবর্জ্জিতঃ।
অপক্ষয়-বিনাশাভ্যাং পরিণামার্ত্তি-জন্মভিঃ।
বর্জ্জিতঃ শক্যতে বক্তুং যঃ সদাস্তীতি কেবলম্॥"

"পরমাত্মা রূপ নাম প্রভৃতি বিশেষণ বিবর্জ্জিত, ক্ষয়রহিত বিনাশরহিত, অবস্থান্তরপরিশূন্য, দুঃখ ও জন্ম হীন। তিনি আছেন, ইহাই মাত্র তাঁহার সংজ্ঞাবাচক।

মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে লিখিত আছে,—

"ব্রহ্মতেজোময়ং শুক্রং যস্য সর্ব্বমিদং রসঃ।
একস্য ভূতং ভূতস্য দ্বয়ং স্থাবরজঙ্গমম্॥"

হিন্দু জানে ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। এই বিপরীতধর্ম্মী শক্তিদ্বয়ের একত্র সমাবেশ অহিন্দুর নিকট বিচিত্র ব্যাপারের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে বৈচিত্র্য কিছু মাত্র নাই।

নিষ্কম্প, নিশ্চল বারিধিবক্ষ, আর বাত্যাবিক্ষুব্ধ উর্ম্মিমালাসঙ্কুল জলধি-বক্ষ। সেই একই সাগর—একবার প্রশান্ত স্থির, অন্যতর সময়ে চঞ্চল। সেইরূপ ব্রহ্ম নির্গুণ ও সগুণ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইহা সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

"ব্রহ্মৈকং মূর্ত্তিভেদস্তু গুণভেদেন সন্তনম্।
তদ্ব্রহ্ম দ্বিবিধং বস্তু সগুণং নির্গুণং শিব॥
মায়াশ্রিতো যঃ সগুণো মায়াতীতশ্চ নির্গুণঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবানিচ্ছয়া বিকরোতি চ॥
ইচ্ছাশক্তিশ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিপ্রসূঃ সদা।
কেচিদেকং বদন্ত্যেব ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্॥
কেচিদ্বদন্তি দ্বিবিধং ব্রহ্ম প্রকৃতিপূর্ব্বকম্।
শৃণু যে চ বদন্ত্যেকং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ পরম্॥
তস্মাত্তবতি তৌ দ্বৌ চ তদ্ব্রহ্ম সর্ব্বকারণম্।
অথবৈকং পরং ব্রহ্ম দ্বিবিধং ভবতীচ্ছয়া॥

ইচ্ছাশক্তিশ্চ প্রকৃতিঃ সর্ব্বশক্তিপ্রসূঃ সদা।
তত্রাসক্তশ্চ সগুণঃ স শরীরী চ প্রাকৃতঃ ॥
নির্গুণস্তত্র নির্লিপ্তঃ অশরীরী নিরঙ্কুশঃ।
স চাত্মা ভগবান্ নিত্যঃ সর্ব্বাধারঃ সনাতনঃ ॥
সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বত্রাস্তি ফলপ্রদঃ।
শরীরং দ্বিবিধং শম্ভো নিত্যং প্রাকৃতমেব চ ॥
নিত্যং বিনাশরহিতং নশ্বরং প্রাকৃতং সদা।
অহং ত্বঞ্চাপি ভগবন্নাবয়োর্নিত্যবিগ্রহঃ ॥"

আহা! সগুণ নির্গুণ, পুরুষ প্রকৃতির এমন বর্ণনা অন্য ধর্ম্ম পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় কি? আধ হর আধ গৌরী, আধ কৃষ্ণ আধ রাধা, আধ দিবা আধ রাত্রি, আধ শ্বেত আধ কৃষ্ণ! জলদ-পটল-সংযোগে দামিনীবিকাশ যেমন, নির্গুণ পরব্রহ্মে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ তেমনি, ইহাতে রূপ বিকাশ, ইহাতেই সাকার উপাসনা প্রবর্ত্তিত। এমন চমৎকার বিবৃতি—বিবেকবিমূঢ় ব্যতীত সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে।

গারুড়ে লিখিত আছে,—

"দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতম্।"

পুনশ্চ—

"বর্জ্জিতং ভূততন্মাত্রৈর্গুণজন্মাশনাদিভিঃ।
স্বপ্রকাশং নিরাকারং সদানন্দমনাদিনম্ ॥"

ব্রহ্মনির্দ্দেশ সম্বন্ধে আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। স্থূল কথা, যে জাতির আবালবৃদ্ধ-বনিতা জানে যে ব্রহ্ম, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সে জাতিকে পৌত্তলিক বলা ধৃষ্টতা প্রকাশ করা ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আমরা "সোহহং" শব্দের অর্থ যেরূপ বুঝি, স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক বলিতে পারি, ভূমণ্ডলের অন্য কোন জাতি ইহার মহান্ অর্থ তদ্রূপ বুঝিতে পারেন না। যে জাতির পূর্ব্ব পুরুষেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে মনোবিজ্ঞানের রাজ্যে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব করিয়া গিয়াছেন, যে জাতির দর্শনাদি শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া পাশ্চাত্য মনীষিগণ এখনও বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে প্রাচ্যের প্রতি চাহিয়া থাকেন, সেই আদি সুসভ্য জাতির বংশধরদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানেরই কর্ত্তব্য নহে।

আমরা পৌত্তলিক নহি। আমরা বুঝি আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত ব্রহ্মের সত্তা বিদ্যমান। তবে তাঁহার ধ্যান ধারণা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। তুমি জড়-বুদ্ধি-সম্পন্ন জীব, তোমার কল্পনা আধারাবলম্বন সাপেক্ষ। তুমি চক্ষু বুজিয়া নিরাকারের ধ্যান কিরূপে করিতে পারিবে? ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন,

"প্রবেশ্যাত্মনি চাত্মানং যোগী তিষ্ঠতি যোঽচলঃ।
পাপং হন্তি পুনীতানং পদমাপ্নোতি সোঽজরম্॥"

অর্থাৎ, "যে যোগী পরমাত্মার সহিত স্বীয় আত্মার সংযোগপূর্ব্বক অচল ভাবে অবস্থান করেন, তিনি পাপ হনন করেন ও অক্ষয় ব্রহ্মপদ লাভ করেন।"

আত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগসাধন কয় জনের সাধ্যায়ত্ত? তুমি বিষয়মদে মত্ত হইয়া দিবানিশি ঘুরিয়া বেড়াইতেছ, তুমি কিরূপে মনঃসংযো-গের অধিকারী হইবে? তোমার মন অবলম্বনবিহীন হইয়া অবস্থান করিতেই পারে না, কাজেই তোমার জন্য সাকারোপাসনার একান্ত প্রয়োজন। রূপ ধ্যান করিতে করিতে যখন ধ্যেয় বস্তুর অবয়বাদি সমস্ত তোমার ধ্যানমার্গ হইতে অপসারিত হইয়া তেজঃ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে, তখন ব্রহ্মোপাসনার জ্ঞান আপনা হইতেই উদ্বুদ্ধ হইবে। নতুবা বলপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিলে তমোরাশির সঞ্চার ব্যতীত আর কিছুই তোমার প্রতীয়মান হইবে না।

পরমব্রহ্মের জ্ঞান হইলে কর্ম্মকাণ্ডাদি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কুলার্ণব তন্ত্রে বলেন,—

"পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥

ইহার অর্থ "মলয়মারুত পাইলে যেমন তালবৃন্তের কোন প্রয়োজন হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে নিয়মাদির কোন প্রয়োজনই হয় না।"

এখন কথা হইতেছে, যাবৎ ব্রহ্মজ্ঞান না হইতেছে, তাবৎ রূপ কল্পনার প্রয়োজন। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রজ্ঞাসম্পন্ন জীব ব্রহ্মোপাসনাই করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথমাবস্থায় সাধকের ত ব্রহ্মোপাসনা সম্ভবপর নহে। তখন জীব যে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন। তাই উত্তর গীতায় লিখিত হইয়াছে,—

অগ্নির্দেবো দ্বিজাতীনাং মুনীনাং হৃদি দৈবতং।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র সমদর্শিনাং॥

"দ্বিজাতিদিগের অগ্নিদেবতা, মুনিগণের হৃদয়স্থ পরমাত্মা দেবতা, স্বল্পবুদ্ধি

জীবগণের প্রতিমা দেবতা এবং সমদর্শী ব্যক্তিগণের সর্ব্বত্রই সর্ব্বব্যাপী পরম-ব্রহ্মই দেবতা।”

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছেন,—

> “যে২প্যন্যে দেবতা ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
> তে২পি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকং॥”
>
> ভগবদ্গীতা ৯ অঃ।

“হে কৌন্তেয়! যে ভক্ত শ্রদ্ধার সহিত অন্য দেবতাকে ভজনা করে, তাহারাও আমাকেই ভজনা করে, কিন্তু তাহা অবিধিপূর্ব্বক।”

কেহ হয়ত বলিতে পারেন, এই “অবিধিপূর্ব্বক” শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতেই প্রতিমা পূজার বিরোধিতা প্রতিপন্ন হইতেছে।

একটু নিবিষ্টচিত্তে অনুধাবন করিলেই উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি হইতে পারে। সকাম উপাসনা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন, নিষ্কাম ব্রহ্মোপাসনা ব্যতিরেকে ধনজনাদি ঐহিক সুখসন্তোষের জন্য অন্য দেবতার উপাসনা, কাজেই অবিধি বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। দেবোপাসনায় সন্তুষ্ট দেবগণ ভোগকামনাই পূর্ণ করেন। সুতরাং উহা মোক্ষপ্রাপক বিধিসিদ্ধ নহে বলিয়াই উক্ত হইয়াছে।

এখন দেখুন, প্রতিমা পূজা আমরা কি ভাবে সমাহিত করি। প্রতিমা পূজার একটা প্রধান অঙ্গ প্রাণপ্রতিষ্ঠা। এই প্রাণপ্রতিষ্ঠায় ব্রহ্মত্ব সূচিত হয়। আত্মাই পরমাত্মার অংশ। সুতরাং সর্ব্বজীবে এমন কি জড়ে পর্য্যন্ত তাঁহার সত্তা অনুভব করিবার উপায়, ব্রহ্মোপাসনার ভিত্তি বলিয়া বিবৃত করা যাইতে পারে। এই মূর্ত্তি পূজা হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান সমুদ্ভূত হয়। সাধক রামদুলাল নন্দী গাহিয়াছেন,—

> “জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজী।
> যে তোমায় যে ভাবে ডাকে তাতেই তুমি হও মা রাজী।”

সাধক-প্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

> “আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম ভেদাভেদ জ্ঞান সব ছেড়েছি।”

যাঁহারা ইহাদিগকে পৌত্তলিক আখ্যা প্রদান করিতে চাহেন, তাঁহারা যে হীনবুদ্ধি, পরমতত্ত্ব-জ্ঞানবিরহিত ভ্রান্তজীব, তাহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

———

নাট্যসাহিত্যে সেক্সপীয়র।

পনর কিম্বা ষোল বৎসর মাত্র বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, এই অপ্রাপ্ত বয়স্ক যুবক ভাগ্য-চক্রাধীনে কখন কি কার্য্যে যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ না থাকাতে "নানা মুনির নানা মত" পূর্ব্বেই পাঠকগণকে প্রদান করিয়াছি ; ভিত্তিহীনতায় সে গুলি যে নিতান্ত অবিশ্বাস যোগ্য তাহারও আভাস দিয়াছি। শত্রুপক্ষের অপবাদ কিম্বা সাধারণের অভিমত সকলগুলিই পর্য্যালোচনা করিলে মোটের উপর এই মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, সকলেই এই অপরিণত বয়স্ক শ্রীসম্পন্ন বালক সেক্সপীয়রকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাঁহাদের সাংসারিক অবস্থাও কোন প্রকার স্বচ্ছল ছিল না বরং দিন দিন ঋণগ্রস্ত হইয়াই পড়িতেছিল ; সুতরাং বিদ্যালয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাঁহাকে যে কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার পিতার সহিত কর্ম্মে বাহির হইতেন। কেহ বলেন, তিনি সন্নিকটস্থ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, কেহ বা বলেন যে, তিনি বিদ্যালয় ছাড়িয়া জনৈক উকিলের অধীনে কেরাণীর কর্ম্ম করিতেন।

আঠার বৎসর মাত্র বয়সে তাঁহার বিবাহ হয় ; যাহাকে তিনি পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বয়সে তাঁহার অপেক্ষা প্রায় সাত বৎসরের অধিক ছিলেন—যাহা হউক, এই নব দম্পতী অতি অল্পকাল মধ্যেই দুই তিনটি সন্তানের জনক জননী হইয়াছিলেন এবং এই সময়ে তিনি কোন বেশী বেতনের চাকুরীর অনুসন্ধানে জন্মভূমি ষ্ট্রার্টফোর্ড ও জনকের সুখ-নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া নবজাত পুত্রকন্যার মমতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার মনস্থ করেন। তখন তাঁহার বয়স ২২।২৩ বৎসরের অধিক হইবে না।

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে জেমস বারবেজের সম্প্রদায় (Queens players) কুইনস প্লেয়ারস সেক্সপীয়রের জন্মভূমি ষ্ট্রার্টফোর্ডে প্রথম অভিনয় করিতে আগমন করেন ; এই স্থানেই তাঁহার (জেমস বারবেজের) সহিত সেক্সপীয়রের প্রথম আলাপ পরিচয় হয় ও সেক্সপীয়র যে একজন লেখক তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারেন ও তাহাকে আপনার দলভুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সেক্স-

পীয়রও সম্মত হইয়া তাঁহার সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া ভাগ্য পরীক্ষার্থ অতি শীঘ্রই ষ্ট্রাটফোর্ড হইতে লণ্ডনে আগমন করেন।

সেক্সপীয়র লণ্ডনে আসিয়া দেখিলেন, লণ্ডনে নাট্যচর্চ্চার এতই প্রভাব যে, সেই সময়ে ছয়টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছয়টি নাট্যশালা ও ইহা ব্যতীত দুইটি বালকদিগের জন্য পৃথক ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে।

সেক্সপীয়র লণ্ডনে আসিয়া প্রথমে লর্ডষ্ট্রেঞ্জের নাট্যসম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন এই সম্প্রদায় হইতেই তিনি ভবিষ্যতে আপনার সুনাম ও অক্ষয়-কীর্ত্তি লাভ করিয়া স্বদেশ ও বিদেশে সকলের আদরণীয় ও বরণীয় হইয়াছিলেন। লর্ডষ্ট্রেঞ্জের সম্প্রদায়টি প্রথমে লর্ড হডসনের, পরে লর্ড চেম্বারলিনের ও তাহার পর ১৬০৩ খৃঃ কিংস থিয়েটার নামে অভিহিত হয়। জেমস বারবেজ তখন লর্ড চেম্বারলিনের সম্প্রদায়ের সর্ব্বময় কর্ত্তা; ইহাঁরই চেষ্টায় ও যত্নে ১৫৯৯ খৃঃ গ্লোব থিয়েটার নির্ম্মিত হয়।

১৫৮৭ হইতে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এই ৫ বৎসর কাল সেক্সপীয়র নাট্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে কি ভাবে কাটাইয়া ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহার পর ১৫৯৩ খৃঃ বড়দিনের সময় হইতে (Christmas time) লর্ড চেম্বারলিনের সম্প্রদায় ভুক্ত মিঃ কেম্প ও সেক্সপীয়র কমিডিয়ন ও রিচার্ড বারবেজ ট্রাজিডিয়ান আখ্যায় অভিহিত হন; এই সময় হইতেই সেক্সপীয়রের ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর সুপ্রসন্না হইলেন।

১৫৯৬ খৃঃ জেমস বারবেজ সেণ্টপলস্ ও ব্ল্যাকফ্রাইয়ার্স ব্রীজের মধ্যবর্ত্তী ব্ল্যাকফ্রাইয়ার্স নামক স্থানে আর একটি নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়া অস্থায়ী ভাবে কখন কখন অভিনয় করিতেন, পরে ১৬১৩ খৃঃ হইতে ঐ স্থানে তিনি স্থায়ীভাবে অভিনয় কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বিশেষতঃ শীতকালেই ব্লাকফ্রাইয়ার্স থিয়েটারে অভিনয়কার্য্য চলিত বলিয়া উহার আর একটি নাম (Winter theatre) উইনটার থিয়েটার। শিশির ও হিম নিবারণের জন্য উহার উপরি ভাগে ছাদ ও চারিধারের নানারূপ দৃঢ় আবরণের বন্দোবস্ত ছিল; সেইরূপ গ্লোব থিয়েটারে গ্রীষ্মকালে অভিনয় হইত বলিয়া উহার উপর তখন ছাদের বন্দোবস্ত ছিল না। এইরূপ বন্দোবস্তে পাঠকগণের আশ্চর্য্য হইবার কোন কারণ নাই, কারণ সেই সময়ের পদ্ধতিই এইরূপ ছিল। এই গ্লোব থিয়েটারেই সেক্সপীয়র অভিনয় করিতে আরম্ভ করেন।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে নাটকীয় কবিতার ছন্দের সহিত ঐতিহাসিক চিত্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। নাট্যকার স্বভাবতই তাঁহার ভাবের উপর চিত্র অঙ্কিত করেন, তাহার প্রমাণ Greene, Marlowe, Ben Johnson, Heywood, Webster এই সকল ও অপরাপর ব্যক্তিগণের রচনায় দেখা যায়; তবে আবার কেহ কেহ ভাব, ভাষা, বর্ণনা ও চরিত্রের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া গিয়াছেন।

সেক্সপীয়রের একান্ত সুহৃদ জেমস বারবেজের পুত্র সুপ্রসিদ্ধ ট্রাজিডিয়ান বারবেজ, রিচার্ড যিনি সেক্সপীয়রের জন্মের তিন বৎসর পরে পৃথিবীতে আসিয়া সেক্সপীয়রের মৃত্যুর তিনবৎসর পর পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করেন ও যিনি ধারাবাহিক রূপে সেক্সপীয়রের নায়কের প্রধান প্রধান অংশের অভিনেতা, এমন কি অভিনয় নিপুণতায় যাঁহার কেহ সমকক্ষ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, দর্শকবৃন্দ যাঁহার অভিনয়ে চক্ষু কর্ণের সার্থকতা লাভ করিতেন, যিনি ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত অংশ গ্রহণান্তর স্বকীয় ক্ষমতাবলে ভাষা ও ভাবের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এক অতি অচিন্তনীয়, হৃদয়গ্রাহী, গভীর ভাব-সমষ্টিতে দর্শকগণের সম্মুখে অপরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়া সকলের ধারণার উপর অঘটন ঘটাইতে পারিতেন;—King Lear, Hamlet, Richard III, Shylock, Romeo, Brutus, Othello, Macbeth, Coriolana প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করিয়া অভিনয় চাতুর্য্যে দর্শকগণকে সমভাবে তৃপ্তিদান করিয়াছেন ও আপনার নাম নাট্যজগতে উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, এমন কি মহামতি সেক্সপীয়র মৃত্যুকালেও যাহাঁকে ও যাঁহার গুণাবলী ভুলিতে পারেন নাই, বন্ধুত্বের ও ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ মৃত্যুকালেও তাঁহার শেষ উইলে একটী বহুমূল্য অঙ্গুরী যাঁহাকে উপহার দিয়া গিয়াছিলেন সেই নাট্যরথী রিচার্ড বারবেজের অভিনয় কৃতিত্বে সেক্সপীয়রের নাটকগুলি নাট্যজগতে অতি অল্পকাল মধ্যেই এত প্রসার লাভ করিয়াছিল যে, সেক্সপীয়র নবীন লেখক হইলেও তৎকালীন প্রবীণ নাট্যকারগণকে দূরে ফেলিয়া সকলের উচ্চ আসন গ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ঠিক এই সময়ে অর্থাৎ যখন গ্লোব ও ব্যাকফ্রাইয়ার্স থিয়েটারে সেক্সপীয়রের নাটকাবলীর অভিনয় আরম্ভ হইতেছিল, সেই সময়ে প্রথম জেমস্ ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইনি নাট্যশালার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন ও সেই জন্যই উপরোক্ত সম্প্রদায়কে রাজকীয় নাট্য সম্প্রদায়

নামে অভিহিত করিয়া ১৬০৩ খৃঃ রাজকীয় পরোয়ানা প্রদান করেন। তাহাতে Laurence Fletcher, William Shakespare, Richard Burbage, John Hemings ও সম্প্রদায়ের অপরাপর সকলকে হাস্য, করুণ, বীররসাশ্রিত নাটকাবলী এবং এইরূপ ধরণের নাটকাদি যাহা তাঁহারা অভিনয় করিয়াছেন, করিতেছেন, বা করিবেন ও সাধারণের উন্নতি-কল্পেও আমোদ আহ্লাদের মধ্যে শিক্ষা-দীক্ষা-প্রদ নাটকগুলির অভিনয় করিতে অনুমতি প্রদান করেন, এমন কি সাধারণের মনস্তুষ্টির ও সুবিধার জন্য টাউন হল প্রভৃতি প্রকাশ্যস্থানে আবশ্যক হইলে অভিনয় করিতেও ক্ষমতা প্রদান করেন।

এই সময়টাই সেক্সপীয়রের অতি সুখের সময় ছিল; এই সময়েই তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর সুপ্রসন্না. এমন কি তাঁহার পক্ষপাতিনী হইলেন; সেক্সপীয়র তখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যেই সম্পূর্ণরূপে সফলকাম হইয়াছিলেন, এই সময়েই গ্লোব ও ব্ল্যাক ফ্রায়ার্স থিয়েটারের তিনি অন্যতম অংশীদার রূপে গণ্য হইলেন। ইহা আরও আনন্দের বিষয় যে, প্রধান অংশীদার মিঃ বারবেজ অপরাপর অংশীদার থাকা সত্ত্বেও সেক্সপীয়রকে গ্লোব থিয়েটারের তাঁহার পর অর্থাৎ দ্বিতীয় অংশীদাররূপে নথীভুক্ত করিয়া পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

শ্রীননীলাল শূর।

শৈশবের স্মৃতি।

জীবন-প্রভাতে বসি ভবিষ্য আঁধারে
আঁকিতাম কল্পনায় স্বপ্নময়ী ছবি;—
সহসা উদিবে মম জীবন-অম্বরে
সোণার কিরণ মাখা মধ্যাহ্নের রবি।
আজ কেন হেরি হায় জীবন-সন্ধ্যায়
অলীক সকলি তার নাহি কিছু মূল;
গভীর তিমিরে মগ্ন শূন্য নীলিমায়
'শৈশবের স্মৃতি' মম আকাঙ্ক্ষা বিপুল।

শ্রীমতী সুরবালা মিত্র।

দেবী গড়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন দর্শন।

মিনিয়া চলিয়া গেলে কমলা সেই পার্ব্বত্য গৃহে একা বাস করিতে লাগিল। যদিও অনেক দাস দাসী ছিল—যদিও সিপাহী সান্ত্রী ছিল,—কিন্তু কমলা তথাপি একা। একা এই জন্য যে, কথা কহিবার একটি লোক ছিল না। পিতা মাতার ক্রোড় বিচ্যুত হইয়া আসিয়া এই পার্ব্বত্য গৃহে অসভ্য-গণের মধ্যে সে বাস্তবিকই বড় কষ্ট জ্ঞান করিতে লাগিল।

এই সময় কমলার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা নগরমধ্যে অধিকতর প্রবলভাবে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

মিনিয়াকে যে গোপনে হত্যা করিতে গিয়াছিল, তাহা তাহার সঙ্গিগণ জানিত। যখন ব্যাঘ্রে তাহাকে নিহত করিয়াছে শুনিল, তখন তাহারা সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিল। তাহাতে সকলেই বুঝিল—দেবীর চক্ষু সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি জানিতে পারিয়া ব্যাঘ্রের দ্বারা তাহাকে হত্যা করাইয়াছেন।

এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল। একজন চিকিৎসক এক দিন রাজসভায় বসিয়া কমলা যে দেবতা নহে, এইরূপ ভাবে দুই একটা কথা বলিয়া গিয়াছিল—কিন্তু হঠাৎ এক দিন রাত্রে তাহার গৃহে বজ্রপাত হয়, তাহাতে সেই চিকিৎসক ও তাহার পত্নী এবং তিনটী শিশুর মৃত্যু হয়। তাহাতে সকলেই বুঝিল—দেবীর নিন্দা করাতেই তিনি বজ্র পাঠাইয়া উহাকে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

কমলা যে দেবী, কমলা যে অসীম দৈবীশক্তি সম্পন্ন, সে বিষয়ে সে দেশের আর কেহই অবিশ্বাস করিত না।

কিন্তু কমলা আর পিতামাতাকে ছাড়িয়া সেখানে অবস্থান করিতে পারি-তেছিল না। তাহার বড়ই কষ্ট বোধ হইতে লাগিল - তাহার পিতামাতা সে স্থানে কি অবস্থায় আছেন; আসিবার সময় তাহার মাতাকে অত্যন্ত পীড়িত দেখিয়া আসিয়াছে,—এত দিনে তাঁহারই অবস্থা বা কিরূপ হইয়াছে,—তাহার শোকে হয়ত তিনি আরও পীড়িত হইয়াছেন— এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল।

আর একদিন সে রাজাকে বলিয়া পাঠাইল,—“আমাকে আমার পিতা মাতার নিকটে পাঠাইয়া দিন। আমি আর এখানে কিছুতেই থাকিতে পারিতেছি না।”

যে লোক সংবাদ লইয়া রাজার নিকটে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—“রাজা বলিলেন, দেবী যদি একান্তই যাইতে বাসনা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে উড়িয়া যাইতে হইবে। কারণ, চারিদিকের নদীগুলি এত স্ফীত হইয়াছে, এত বন্যা আসিয়াছে যে, আর কোন উপায়ে তিনি যাইতে পারিবেন না।”

উত্তর শুনিয়া কমলা স্তম্ভিত হইল। তবে রাজা যে তাহাকে উপহাস করিয়াছেন, এমন মনে করিল না; কারণ কমলার দেবীত্বে রাজার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল,—নদী গুলির বাস্তব অবস্থা দর্শনেই ঐরূপ বলিয়াছেন।

কমলা সে দিন আরও চিন্তান্বিত হইল। তাহার প্রাণের মধ্যে একটা গুরুতর অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইল। সমস্ত দিন ভাবিয়া চিন্তিয়া কাটাইয়া দিল।

তারপরে রাত্রে আহারাদি করিয়া শয়ন করিল। শয্যায় পড়িয়া চিন্তা-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনেকক্ষণ ছটফট করিল,—তারপরে ঘুমাইয়া পড়িল।

রাত্রি শেষে কমলা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিল। স্বপ্নে দেখিল—সে যেন জাগিয়া আছে। এক পর্ব্বতের সানুদেশে অনেকগুলি লোক দল পাকাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই বীরের পোষাক পরিহিত। কত লোক কমলা তাহা গণিয়া স্থির করিতে পারিল না,—সকলকে ভাল করিয়া দেখিতেও পাইল না। নানাবিধ ভাবের নানাবিধ লোক সেখানে বসিয়া আছে। সকলেই একদিকে মুখ করিয়াও বসে নাই—দিকে দিকে ফিরিয়া মণ্ডলাকারে উপবেশন করিয়া আছে। সকলেরই মুখে চিন্তার রেখা প্রতিফলিত।

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—“যে দূত গিয়াছিল, সে কোথায়?

তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অপর একজন পুরুষ বলিল,—“আপনার সম্মুখেই বসিয়া আছেন।”

পূর্ব্ব ব্যক্তি সম্মুখস্থ একটি ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“রমজান খাঁ; তুমি গিয়াছিলে?”

রমজান বলিল,—“হাঁ খোদাবন্দ; আমিই গিয়াছিলাম।”

যিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার নাম মহম্মদ খাঁ। মহম্মদ খাঁ বলিলেন,—“কতদিন সেখানে ছিলে?”

রম। প্রায় তিনমাস।

মহ। তাহা হইলে সমস্তই জানিয়া আসিতে পারিয়াছ ?

রম। গোলামের যতদুর সাধ্য, ততদুর জানিয়া আসিয়াছে।

মহ। তুমি যে বিদেশী—তুমি যে মুসলমান—তাহারা তাহা জানিতে পারে নাই নাকি ?

রম। না, খোদাবন্দ! তাহারা সে প্রকৃতির লোকই নয়, বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়াও বোধ হয় না। কুসংস্কারে তাহাদের হৃদয় সমাচ্ছন্ন। প্রবাদ বাক্যের উপরে নির্ভর করিয়াই রাজকার্য্য পর্য্যন্ত পরিচালনা করে। আপনারা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না যে,—একটি বঙ্গদেশীয় রমণীকে লইয়া আসিয়াছে—সেই রমণীর পিতা একজন ধর্ম্মপ্রচারক—হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার করিতে সেই দেশে আসিয়াছে। সেই মেয়েটাকে তাহাদের দেশের উপাস্য দেবী বলিয়া একটা পাহাড়ের দেবমন্দিরে একরূপ বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে, সেই দেবীই নাকি তাহাদিগকে আমাদের যুদ্ধ হইতে রক্ষা করিবে।

একজন যুবা এই কথা শুনিয়া মুখ উন্নত করিল,—মুখখানা কমলা ভাল করিয়া দেখিতে পাইল না—কিন্তু তথাপি প্রাণের মধ্যে যেন একটা পরি-চিতের দর্শনানন্দ জাগিয়া পড়িল। যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—"সে রমণীর পিতা কি ধর্ম্মপ্রচারক ?"

রম। হাঁ।

যুবক। কতদিন সে দেশে আসিয়াছেন ?

রম। বড় অধিক দিন নহে। আমি সেখানে যাইবার কয়েক মাস পূর্ব্বে।

যুবক। সেই যুবতীর নাম কি জানিতে পারিয়াছ কি ?

রম। সে দেশের লোক দেবী বলিয়াই অভিহিত করে,—তবে আমা-দের গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী সিংহ বলিল,—তাহার নাম কমলা।

যুবকের মনে যেন আশার উত্তেজনা উপস্থিত হইল। মহম্মদ খাঁ বলি-লেন,—"তুমি তাহাদের সম্বন্ধে কোন সংবাদ জান নাকি ?"

যুবক। জানি,—তাহাদেরই অন্বেষণে আমি আপনাদের দলে মিশিয়াছি।

মহম্মদ। তবে এক কাজ কর।

যুবক। আজ্ঞা করুন।

মহম্মদ। তুমিই প্রথমে সে দেশে যাও,—তোমার পশ্চাতে আমরা সৈন্য

লইয়া যাইব। তুমি গিয়া মহাজনরূপে কয়েক দিন অবস্থান করিয়া সৈন্যের খাদ্য ক্রয় কর। খাদ্যাভাব হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সাবধান যুবক;—তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর জাতি। অন্য বিষয়ে যেমন উদাসীন—মৃত্যু বিষয়েও তাহাই। কথায় কথায় মানুষকে কলা-কচুর মত কাটিয়া ফেলে।

যুবক। সে জন্য কোন চিন্তা নাই—একটি অশ্ব, দুইটী পিস্তল ও আট-জন বলিষ্ঠ লোক আমাকে দিন।

মহম্মদ খাঁ তাহাই প্রদান করিলেন।

তখন সেই যুবক একটি কৃষ্ণাশ্বে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন।

কমলা দেখিল, সেই যুবক তাহার অতি পরিচিত গোলোক নাথ।

নিদ্রিতাবস্থায় কমলা ডাকিল,—"গোলোক নাথ! এস এস;—কতদিন তোমায় দেখি নাই। দেখি নাই, কিন্তু ভুলিতে ত পারি নাই!"

সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল,—কমলা বুঝিল, সে স্বপ্ন দেখিতেছিল।

তাহার বুকের মধ্যে 'দুর দুর' করিতে লাগিল। মনে হইল, এ স্বপ্ন ভাঙ্গিল কেন? আর দুদণ্ড গোলোক নাথকে দেখিতে পাইলাম না কেন?—গোলোক নাথ! তুমি কি এখনও জীবিত আছ?"

স্বপ্ন-কম্পিত হৃদয় লইয়া কমলা উঠিয়া বাহিরে গেল। তখন ঊষা—"সমুদ্রান্ত মণির ন্যায় রঙ্গ—দিব্য শোভন-স্বচ্ছ—এক প্রকার হরিৎ আলোকে উদয় গিরির দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে;—যেন তৈলের একটি কোঁটা নৈশগগন-তটে মণ্ডলাকারে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইল। ওদিকে অস্তাচল-দিগন্তে একটি স্থূল লোহিত গোলক অবসাদে ম্রিয়মাণ—একটি পুরাতন গ্রহ শ্রান্ত ক্লান্ত—একটি পুরাতন প্রাচীন জীবলোকে পৃথিবীর অতি সান্নিধ্যবশতঃ ভয়ে আকুল;—ইনি অস্তমান চন্দ্রমা।

মন্দিরের সমস্ত কাকগুলা জাগ্রত হইয়া কা—কা রব করিতেছে। নিম্ন-দেশ হইতে—আকাশের সর্ব্বদিক্ হইতে—সেখান দিয়াই উহারা চলিয়া যাইতেছে—ঐ কা—কা—ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। কমলা সে সকল দেখিয়া আর ম্রিয়মাণ হইয়া সেখানে বসিয়া পড়িল।—হায়! তাহার গতি কি হইবে? এই পর্ব্বত গৃহে অজ্ঞাতবাসেই কি তাহার জীবনের শেষ নিশ্বাস মাটীতে মিশাইবে? (ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

গর্দ্দভের জাতীয় সঙ্গীত।

যবিষ্ঠ তেজিষ্ঠ জাতি আমরা ভূতলে।
আদর্শ বীরের জাতি মোরা সবে বলে॥

বিধির হয়নি সখ, দিয়া দ্রংষ্ট্রা শৃঙ্গ নখ,
সাজাইতে এ জাতিকে পশুর নকলে।
দেব-অংশে অবতংশ মোরা পুণ্যফলে॥ ১॥

আমাদের নাহি ভয়, গাত্র-বলে কিবা হয়,
মুহূর্ত্তে ভুবন জয়, করি সুকৌশলে।
কে মোদের সমকক্ষ জ্ঞান-বুদ্ধি-বলে॥ ২॥

আঁকড়িয়া বিশ্বটাকে, লাঙ্গুলে ঘুরায়ে পাকে,
উড়াইয়া দিতে পারি আকাশমণ্ডলে।
অথবা ডুবাতে পারি সাগরের জলে॥ ৩॥

জন্মাবধি মোরা জঙ্গী, গিরিসম দুর্গ লঙ্ঘি
নর জানে বলীয়ান আমরা কি বলে।
হেন মাতৃস্তন্যদুগ্ধ কোথা ভূমণ্ডলে॥ ৪॥

আশৈশব যেই নর, পান করে নিরন্তর,
আমাদের মাতৃ-দুগ্ধ যত্নে কুতূহলে।
মোদের বীরত্ব-বীর্য্য পায় ভাগ্যবলে॥ ৫॥

আমাদের বংশধর, নরে কহে অশ্বতর,
অক্লান্ত অশ্রান্ত সদা হর্ষে রণে চলে।
নর সম কামানের গর্জ্জনে না টলে॥ ৬॥

বীর-রক্ত-অস্থি-মজ্জা, তাই মোরা পাই লজ্জা,
বহিতে অন্নের যষ্টি—নিন্দা করে খলে।
কি তেজস্বী জাতি মোরা জানে না সকলে॥ ৭॥

হবে রাজ্য অরাজক, নিবারিতে তা রজক,
চাপায় বস্ত্রের ভার পৃষ্ঠদেশে ছলে।
জানে জ্ঞানী তাই রজ্জু নাহি দেয় গলে॥ ৮॥

শান্তিকামী সদাশয়, গুরুভার সদা সয়,
আমাদের তুল্য কে বা সহরে জঙ্গলে।
চেনে এ জাতিকে শান্তি-সমিতির দলে ॥ ৯ ॥

শীতলাবাহন নাম, হয় সুশীতল ধাম,
মোরা যেথা থাকি, সদা আনন্দ-উছলে।
মোদের মধুর গানে মুনি-মন গলে ॥ ১০ ॥

শিবসংহিতার উক্তি, মরণে মোদের মুক্তি,
নর জন্ম লভি পুন সুকৃতির ফলে।
শোভি সচিবের পদে রাজ-সভাতলে ॥ ১১ ॥

মানব মোদের প্রতি, দেখায় সম্মান অতি,
প্রতীচ্যের নর-নারী রঙ্গ-নৃত্য ছলে।
মোদের মুখস্ পরে মাস্কারেড্ বলে ॥ ১১ ॥

আমাদের কে না মানে, কত দেশে কত স্থানে,
প্রস্তরে খোদিয়া মূর্ত্তি আগ্রহে সকলে।
সাজায়ে রেখেছে সৌধ পার্ক টাউনহলে ॥ ১৩ ॥

অন্বেষিলে পাতি পাতি, আমাদের তুল্য জাতি,
মিলে মাত্র দুই চারি মানব-মহলে।
সম যোদ্ধা অন্তরীক্ষে জলে কিম্বা স্থলে ॥ ১৪ ॥

তারাও মোদের মত, যুদ্ধ করি অবিরত,
জিনে রাজ্য কত—আনে আপন দখলে।
মৃত্যু পরে নাহি যায় কালের কবলে ॥ ১৫ ॥

লভে দেবতার দৃষ্টি, হয় শিরে পুষ্পবৃষ্টি,
ধরাপূর্ণ হয় জয়-ঢক্কা-কোলাহলে।
নেমে আসে পুষ্পরথ হেসে স্বর্গে চলে ॥ ১৬ ॥

শ্রীদেবকণ্ঠ বাকৃচী।

পড়ে পাওয়া।

(বৃহস্পতিবারের বারবেলায় বেহালার বৈষ্ণব-পাড়ার বাইলেনে)

মতামতে দায়ী থাকিতে সম্পাদক নারাজ।

তবে দায়ী কে ?

কথা কবে যে।

বিরহিণীর বুকে ব্যথা।

প্রাণনাথের প্রতি প্রিয়তমার প্রেম-পত্র।

আস্‌বে কবে আবাসেতে, আছি পথ চেয়ে,
বিরহের ব্যথা ভরা বুকখানা ল'য়ে।
বৎসর অতীত নাথ, পরবাসে বাস,
শুধু পূজায় এসে কর চারিদিন বাস।
কান্ত খুদী খেঁদী ক্ষেমা খগেন্দ্রনন্দিনী,
স্বামী সহ সুখে সদা যাপিছে যামিনী।
শরতের চাঁদ উঠে ঢালিছে কিরণ,
শেফালি ফুটিয়া গন্ধ করে বিতরণ।
লুঠিয়া ফিরিছে বায়ু হতাশের শ্বাস —
এ দিনে কি করে সখা বিদেশেতে বাস ?
পূজা ত পড়েছে এসে, কাজেই বাড়িছে
বিরহ-বেদনা নাথ, হৃদয় ধসিছে।
মাথা খাও, [illegible]-নিশি পোহাতে দিয়োনা,
আবাসে আসিবে চলি—বিলম্ব কোরোনা।

কি আনিবে পূজা-প্রাইজ,—ভাবচো বুঝি তাই ?
অল্পের মধ্যে এস সেরে—অধিকে কাজ নাই।
ফর্দ্দ শোন, এম্নি এন—ভুলিয়ো না যেন।
মাথা খাও—কয়টা জিনিষ—এন এন এন।
একখানা পিরালী শাড়ী সাচ্চা বুটা দেওয়া,
তারিমত জ্যাকেট হবে 'প্রাণ কেড়ে নেওয়া'।
ব্রেস্‌লেট নাই, বালা কি ছাই ওকি কেউ আর পরে,
হ্যামিল্টনের বাড়ী থেকে এন মনে ক'রে।
রেশমী রুমাল ডজন খানেক, আঁকা প্রেমের ফুল,
হাইপলিশের গিনির গড়া দুটো এন দুল।
ল্যাভেণ্ডার ইউডিকলন বিয়াল্লিশটা চাই,
এর কমেতে কিছুতেই হবে নাক' ভাই।
বাসন্তী হ'য়েছে নাকি সরেস পমেটম।
অধিক না হয় মনে ক'রে এন আধ ডজন।
কেশরঞ্জন জবাকুসুম গোটাদশেক এন।
শেফালী তেলের রাণী ভুলনা ক' যেন।
রোজেলা মাতায় প্রাণ ফুল্ল ফুল-বাসে,
তুফান তোলে রূপের গাঙে তাহার পরশে।
দুটী ডজন আনাই চাই শুনবো না ওজর ;
উল ফিতা তাস এন দেখিয়া পিওর।
বই এন যাতে আছে প্রেমের লহর ;
প্রেমে মাখা বিনা নাহি চাহিগো অপর।
আনিওনা সুরেশ ভট্টার যেন কোন বই,
পরকাল আর ধর্ম্মকথা—ও আবার কি ছাই !
একেই আমার নার্ভগুলা সদা কম্পবান্।
হিষ্টিরিয়া ডেকে আনে—সাবধান সাবধান।
কি নামটা ? মনে নাই ক' হৃদে আছে আঁকা,
প্রেমের বর্ণনে তার ভাষা সদা পাকা।
দেখ্‌লো অমনি হ'ল প্রেম, জাগিল বিরহ,
গঙ্গায় দড়ী জলে ঝাঁপ কি মিষ্টি অহ-হ।

প্রেমের দাগা, পীরিত মাখা, নামগুলি ত জান,
সব শুদ্ধ আশিখানা নভেল গুণে কিনো।
আরও কত রৈল বাকি আসিল না মনে,
দাসী ব'লে প্রাণধন গুছিয়ে এন কিনে।
ত্রিশ টাকা মাইনে তোমার কি করিব আমি,
আমি তোমার প্রেমাধিনী, তুমি আমার স্বামী।
হতভাগ্য বঙ্গসমাজ, বন্ধু-বিহার নাই,
তুমি যদি না আন আর আছে কি উপায়?
আস্‌বে বাড়ী, দেখ্‌বো জিনিষ কইব তবে কথা,
নইলে এবার বিষম গোল, হবে একটা যা' তা।

তোমার—

বিরহিণী—গোলাপ।

নিমন্ত্রণ রক্ষা।

বিনোদবিহারী গাঙ্গুলী স্থানীয় জমিদারের বাড়ী বোধনের নিমন্ত্রণে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রায় পঞ্চাশ জন—জমিদারবাবু নিজে প[illegible]ক্তি-মধ্যে ভ্রমণ করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতেছিলেন। বিনো[illegible] জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাপ্রসাদের পাক হইয়াছে কেমন?

বিনোদ। আজ্ঞে, কেমন হইয়াছে বলিতে হইবে জানিলে বাড়ী হইতে বন্দোবস্ত করিয়া আসিতাম।

সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিনোদবিহারীর মুখের দিকে চাহিল। জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন—"মাংস কেমন পাক হইয়াছে বলিতে হইবে জানিলে বাড়ী হইতে কি বন্দোবস্ত করিয়া আসিতে?"

বিনোদ। আজ্ঞে, একটু থোর লইয়া আসিতাম।

জমিদার। থোর কি হইত?

বিনোদ। বয়স হইয়াছে,—দাঁতের গোড়াগুলি ফাঁক হইয়া গিয়াছে—যে টুকু পাইয়াছিলাম, তাহা দাঁতের ফাঁকের মধ্যেই চলিয়া গিয়াছে, আস্বাদ পাই নাই। আগে থোর চিবাইয়া তারপরে মাংস খাইলে দাঁতের মধ্যে যাইত না। সুতরাং কেমন হইয়াছে বলিতে পারিতাম।

বকুলবাসে বাঞ্ছারাম।

বাঞ্ছারাম শুধু বাঞ্ছারাম নহেন—স্বামী। কার স্বামী, কিসের স্বামী, কত দিনের স্বামী, কাহার নির্ব্বাচিত স্বামী, সে সংবাদ কেহ জানে না, তথাপি বাঞ্ছারাম স্বামী! যে হেতু তিনি প্রাণায়াম না জানিয়াও কচ্ছহীন গেরুয়া বস্ত্র পরিহিত,—গৈরিক রঞ্জিত পাল ব্রাদার্সের নিউপ্যাটার্ণের পাঞ্জাবী জামা দ্বারা সমাচ্ছাদিত এবং সাবান দ্বারা কেশ প্রসাধনে রুক্ষভাব প্রদর্শিত। পায়ে প্যানেলার স্নু, চক্ষু সুরমারঞ্জিত এবং মস্তকে কচিৎ পার্শী ফ্যাসানের উষ্ণীষ পরিহিত—অতএব স্বামী। তাঁহার শিষ্য আছে, উপদেশ আছে, মতামত আছে, নাই কেবল একটি মনের মত প্রেমের নিকেতন। বাহিরে বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চনই বন্ধনের মূল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ঐ দুইটা জিনিষের একান্তই অভাব অনুভব করিতেন।

সহরের ক'টা দুষ্ট ছোকরা পরামর্শ করিয়া এক বক্তৃতা সভায় স্বামীজির পার্শ্বে একটি রূপসী অভিনেত্রীকে বসাইয়া দিল। রূপসীর গাত্রবিচ্ছুরিত বকুল-বাস আর চক্ষুর বঙ্কিম চাহনী স্বামীজির মর্ম্মত্বকে মিশিয়া গেল।

তিনি সে দিন বক্তৃতা দিতে দিতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। ভাবোত্থিত মধুর পদাবলীতে সমস্ত শ্রোতা একেবারে মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। স্বামীজি সে পদাবলী নিজেই গাহিলেন—

কি আর বলিব তোরে,
বকুলের বাসে পরাণ লইলি কেড়ে।

আমি তোমারি হইয়া রহিব সজনী সারাটি জীবন ধ'রে।
আমি তোমারি ধেয়ানে রহিব মগন প্রেমপ্রতীক্ষা ক'রে।
তুমি অবসর মত আসিয়া আমার পরাণে প্রবেশ ক'রো,
আমি তোমাময় হয়ে গিয়াছি লো ধনি, আমারে তোমার করো।
আমি বিনামূলে আ'জ বিকানু ও-পায় লহ গো করুণা ক'রে।

দুষ্ট ছোক্‌রার দল হাসিয়া জনান্তিকে বলিল—স্বামীজি, কামিনী যে বন্ধনের কারণ। চলিবে কি?

স্বামীজি সাঙ্কেতিক ইঙ্গিতে বলিলেন—যোগের পথে গ্রহণ করা যায়।

দুষ্ট ছোকরা বলিল—আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তিও তেমন অধিক নয়। আমরাও যোগে-যাগে গ্রহণ করিয়া থাকি।

———

বিজয়া।

১

সপ্তমী, অষ্টমী গত, নবমী-রজনী,—
প্রভাত হইল হায় ! আনন্দ ফুরা'য়ে যায়,
কৈলাসে যাইবে আজ উমা ত্রিনয়নী।
উমারে ঘিরিয়া কাঁদে পুরের রমণী ॥

২

উমাকোলে মেনকার নেত্রে জল ঝরে।
"পাঠাইয়ে তোমাধনে, কেমনে বা এ ভবনে,
রহিব মা ! দীর্ঘকাল শূন্য প্রাণ ধ'রে,
দেখিব এ বিধুমুখ কতকাল পরে ?"

৩

হেনকালে গিরিরাজা আসিয়া তথায়।
বিষাদে বলেন বাণী, কেন বৃথা গিরিরাণী,
কাতরা হও গো এত উমার মায়ায় ?
আপনার নহে সে তো জান সর্ব্বদায় ॥

৪

কন্যা আর অর্থ দুই পরের কারণ,
সৃজিলেন মহাপ্রভু, আপনার নহে কভু,
জেনে শুনে তবু কেন অস্থির এমন ?
কর্ত্তব্যের ডোরে বাঁধি স্থির কর মন ॥

৫

গৌরীরে লইতে আজি এসেছেন হর।
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে ল'য়ে, বৃষভে-বাহিত হ'য়ে
উপনীত গিরিপুরে ভোলা মহেশ্বর,
যাত্রার উদ্যোগ রাণী করহে সত্বর ॥

৬

অশ্রু মুছি' গিরিরাণী বলেন বিষাদে।
"সারাবর্ষ চেয়ে রই, শুধু তিন দিন বই,
দেখিতে না পাই আমি এই মুখ চাঁদে,
কেমনে ধরিব প্রাণ বল কোন সাধে ?"

৭

জয়া ও বিজয়া ধীরে আইল তথায়।
বলে, "মাগো শীঘ্র চল, বারবেলা এসে প'ল;
শুভলগ্ন কেটে যায় কথায় কথায়,
নন্দী ভৃঙ্গী সেজে' অই ডাকিছে তোমায়॥

৮

সকলের ত্বরা দেখে হেমন্তের রাণী,
আঁখি-বারি সম্বরিয়া, উঠিলেন দাঁড়াইয়া,
দু'টী হাতে শঙ্করীর ধরি' দু'টী পাণি,
বলিলেন মৃদুভাষে সকরুণ বাণী॥

৯

"তোমারে প্রসব মাগো ক'রেছি যখন,
তখনি জেনেছি সার, নহ তুমি আপনার,
সে সব কথায় আর নাহি প্রয়োজন,
পাষাণী হইয়ে দিব বিদায় এখন॥

১০

আবার থাকিব মাগো! আশা পথ চেয়ে,
বর্ষ পূর্ণ হবে যবে, ও মুখ দেখিব তবে,
ভু'লনা ভু'লনা মাগো ভোলানাথে পেয়ে,
ত্যজিয়ে হেমন্ত পুরী কৈলাসেতে যেয়ে॥

১১

লীলাময়ী মহেশ্বরী জানে কত লীলা।
মনে মনে করে ছল, নেত্রে দু'টী ছল ছল,
সোহাগ করেন, ধরি জননীর গলা।
কে বুঝিবে যার মনে আছে কত ছলা॥

১২

"তোমারে ছাড়িতে মাগো প্রাণ নাহি চায়,
রেখো মা আমারে মনে, যাই এবে পতিসনে,
এক বর্ষ পরে পুনঃ আসিব হেথায়।
স্নেহভরা হাসিমুখে দাও গো বিদায়॥

১৩

মায়ে সম্ভাষিয়া দেবী হইলা বিদায়।
আঁধারিয়া গিরিপুরী, চলিলেন মহেশ্বরী,
হইল হেমন্ত রাজ্য অরণ্যের প্রায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে সবে ঘরে ফিরে যায়॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।

মণি।
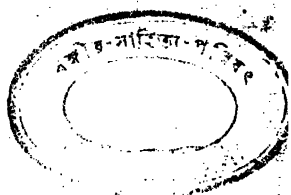
(ক্ষুদ্র গল্প।)

অমল আর মণি সমবয়স্ক, গ্রামের বিদ্যালয়ে দুইজনে এক শ্রেণীতে পড়িত। তাহাদের মধ্যে বড় ভাব; তবে তাহাদের সৌহার্দ্দের বিষয় বিদ্যালয়ের কয়েকটি সয়তান বালক ব্যতীত আর কেহ জানিত না।

আখ্যায়িকা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, প্রাচীন কালীন গ্রন্থকারগণের প্রথা অবলম্বন করিয়া, সুহৃদ্দ্বয়ের পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তান্ত না লিখিলেও, সংক্ষেপে তাহাদের পিতৃপরিচয় দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত।

অমলেন্দুর পিতার নাম শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায়,—কেশবপুরের অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। মধুসূদন রায় বিস্তর অর্থের অধিকারী হইলেও, লোকে তাঁহাকে ক্রূরস্বভাব ও কৃপণ বলিয়া জানিত। অনেক গোঁড়া লোক, দৈনিক খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কায় প্রাতঃকালে তাঁহার নাম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিত না,—ভগবান্ স্মরণ করিবার প্রয়োজন হইলে তাঁহার মধুসূদন নামটি ছাড়িয়া অবশিষ্ট নামগুলি হইতে একটি বাছিয়া লইত।

মণিমোহনের পিতা শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। তাঁহারও বাড়ী কেশবপুরে; স্থানীয় পোষ্টাফিসে পোষ্টমাষ্টারি করিয়া মাসে পনেরটি করিয়া টাকা পাইতেন। কায়ক্লেশে তাহাতেই তাঁহার দিন একরূপে চলিয়া যাইত।

মণি যখন চারি বৎসরের শিশু, তখন তাহার মাতা পরলোক গমন করেন। নবীনচন্দ্রের আর কেহ আত্মীয় স্বজন ছিল না। পত্নীবিয়োগে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় শ্মশানের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও, একমাত্র সন্তানের স্নিগ্ধ মুখখানি দেখিয়া তিনি হৃদয়ে বল পাইলেন; মণিকে কোলে টানিয়া নূতন জীবন আরম্ভ করিলেন।

শৈশব হইতে মণি পিতৃ-ক্রোড়েই লালিত পালিত হইয়াছিল। পিতাপুত্রে একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে থাকিত। মণির একটি পোষা বিড়াল ছিল। পিতা যখন আফিসে কার্য্য করিতেন, মণি তখন প্রায়ই বিড়ালটি লইয়া খেলা করিত; শূন্য গৃহ মণির আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত হইত।

কিছু বড় হইলে নবীনচন্দ্র মণিকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। মণি বুদ্ধিমান বালক ছিল; বৎসরে বৎসরে ক্লাসে উঠিতে লাগিল। তাহাতে পিতার মন পুলকে নাচিয়া উঠিত।

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন মণি তের বৎসরের; চতুর্থশ্রেণীতে পড়িতেছিল। 'ভালছেলে' বলিয়া ছাত্রমহলে তাহার খ্যাতি ছিল। সহপাঠী অমল তাহাকে বড় ভালবাসিত।

কিন্তু পুত্রের বুদ্ধিমত্তাসম্বন্ধে নবীনচন্দ্র কিছু গর্ব্বিত হইলেও, তাঁহার বড় দুঃখ যে মণি বড় দুরন্ত। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে প্রায়ই তাহার মারামারি হইত। একবার সে, বেণীকে বেঞ্চ হইতে ফেলিয়া দিয়া, তাহার কপাল কাটিয়া দিয়াছিল। গ্রামের পুষ্করিণীতে গিয়া সে বহুক্ষণ ধরিয়া সাঁতার দিত এবং জল ছিটাইয়া ঘাটের লোকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে সে স্কুলে যাইত না অথবা স্কুল হইতে পলাইত; বাগানে বাগানে, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইত; পাখীর বাসা ভাঙ্গিত; ডাব পেয়ারা ইত্যাদি পাড়িয়া খাইত। আমের সময় মণির খোঁজ পাওয়া যাইত না; শীতকালে খুব ভোরে উঠিয়া, চুরি করিয়া খেজুরের রস চুঁয়াইয়া খাইত, কলস ভাঙ্গিয়া রাখিত; ইত্যাদি ইত্যাদি। এজন্য সে অনেকবার শাস্তিভোগও করিয়াছে;—মালীর হাতে মার খাইয়াছে, পিতা বকিয়াছেন, সময়ে সময়ে খুব প্রহারও করিয়াছেন; স্কুলের শিক্ষকগণও প্রত্যহ নূতন নূতন সাজা উদ্ভাবন করিয়া, দুরন্ত বালকটিকে বশে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এ সমুদয় সত্ত্বেও মণির স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

মণির সহিত আর কোন বালকের ভাব ছিল না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে অমল তাহাকে কেন এত ভালবাসিত। একটি প্রবাদ আছে, "সমানে সমানে সদা পিরীতি সঞ্চয়।" কিন্তু এই সাধারণ নিয়মটি এতৎক্ষেত্রে প্রয়োজ্য নহে, কারণ অমল ও মণি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতি—একজন যেমন শান্ত, অপরজন তেমনি দুরন্ত। আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও এই বালক দুইটীর প্রণয়ের মূলতত্ত্বে উপনীত হইতে পারি নাই—আশাকরি মনোবিজ্ঞানবিৎ অথবা পুনর্জ্জন্মবাদী ব্যক্তিগণ ইহার সম্যক্ মীমাংসা করিয়া লইবেন।

যাহাহউক, অমল ও মণির মধ্যে প্রগাঢ় প্রণয় অবস্থিতি করিলেও, মণির দৌরাত্ম্য হইতে অমল যে কিছু কিছু ভোগ না করিত তাহা নহে। কিন্তু অমল শান্তভাবে তাহার প্রতিশোধ লইত। মণি কোন অপরাধ করিলে, সে

তাহার উপর কিছুক্ষণ রাগ করিয়া থাকিত; এবং মণি তাহার সহিত পুনরায় ভাব করিতে আসিত।

অমল মধ্যে মধ্যে মণিকে তাহাদের বাগানে লইয়া গিয়া ভাল ভাল পেয়ারা দিত; কোন কোন দিন বা জলছবি, পেন, ইত্যাদি আনিয়া দিত। মণিও যে বন্ধুকে কিছু প্রতিদান না করিত তাহা নহে। সে বন হইতে অমলের জন্য ভাল ভাল ছড়ি কাটিয়া আনিত; দোয়েল শালিকের ছানা ধরিয়া আনিয়া খাঁচায় পুষিবার জন্য অমলকে দিত।

স্বভাবতঃ সাহচর্য্য হইতে লোকে অজ্ঞাতসারে পরস্পরের কার্য্যকলাপ অনুকরণ করিয়া থাকে। কিন্তু অমলের শিষ্টাচার যে মণির চরিত্রের উপর বিশিষ্ট কোন আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল; তৎসম্বন্ধে কোন স্থূল প্রমাণ আমরা অবগত নহি। অমল নিজের চক্রে ঘুরিত; মণি নিজের চক্রে ঘুরিত;—তবে তাহাদের উভয়ের চক্র যেন অপর কোন এক বৃহত্তর চক্রের ভিতরে চলিত; উভয়ের গতির "সা" এবং "রে" দুই সুরে বাজিয়া উঠিয়া এক নূতন লয়ে মিলিয়া যাইত।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, নবীনচন্দ্র পুত্রের দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে প্রহার করিতেন। পাড়ার লোকে নবীনচন্দ্রের নিকট মণির নামে নালিশ করিলে, অন্ততঃ তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য, নবীনচন্দ্র পুত্রকে বেশ উত্তম মধ্যম দিতেন। এজন্য মণি পিতার উপরও অত্যাচার করিতে ছাড়িত না;—সে তাঁহার চস্‌মা লুকাইয়া রাখিত, দোয়াত উপড় করিয়া রাখিত, কলমের নিব ভাঙ্গিয়া রাখিত। মণির বড় সৌভাগ্য যে, সে এসমস্ত কারণে পিতার নিকট উপরি প্রহার লাভ করিত না; কেন না, নবীনচন্দ্র পুত্রের এসব অপরাধ সামান্য বিবেচনা করিতেন,—"বাবা লক্ষ্মীটি" বলিয়া চস্‌মার সন্ধান লইতেন এবং পুনরায় দোয়াতে কালি পূরিতেন ও কলমে নিব বদলাইতেন। যে দিন নবীনচন্দ্র মণিকে কিছু অতিরিক্ত প্রহার করিতেন, সেদিন মণি পিতার উপর রাগ করিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য, গৃহত্যাগ করিয়া গ্রামের পাশে এক বনে আশ্রয় গ্রহণ করিত; এবং নবীন চন্দ্রও অনুতপ্ত-হৃদয়ে সস্নেহ-বচনে পুত্রকে ডাকিয়া অনিতেন, তাহাকে কত আদর করিতেন।

* * *

আজ দোলের ছুটি। ছেলেরা কেহ বা পিচ্‌কারী লইয়া কেহ বা আবির

রাগ লইয়া, ছুটাছুটি করিতেছে। মণির সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সে একশিশি বাদুড়ে রং যোগাড় করিয়াছে, এবং রংটি সুগন্ধি করিবার জন্য তাহাতে খানিক গোবর গুলিয়াছে। বীরেন্ বাটী হইতে স্নান করিয়া ফরসা কাপড়ে বাহির হইয়াছে দেখিয়া মণি চুপি চুপি তাহার দিকে চলিল এবং সমস্ত রংটুকু তাহার কাপড়ে ঢালিয়া দিল। বীরেন্দ্র যখন কাঁদিয়া বলিল,—"কেন ভাই আমার নূতন শান্তিপুরে কাপড় নষ্ট করিলে ?" মণি তখন বীরেনের কাপড় এপাশ ওপাশ ছিঁড়িয়া প্রতিপন্ন করিল যে তাহার কাপড় নূতন নহে।

বৈকালে বীরেন্ সপিতৃক নবীনচন্দ্রের কাছে গিয়া নালিশ করিল। নবীনচন্দ্র বড়ই রাগিয়া পুত্রকে খুব চপেটাঘাত করিলেন। মণি কাঁদিতে লাগিল।

আজও মণি পিতাকে জব্দ করিবার জন্য বাড়ী ছাড়িয়া তাহার অভ্যস্ত বনে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল;—কই পিতা ত এখনও আদর করিতে আসিলেন না ? বন ক্রমেই অন্ধকার হইতে লাগিল। ভয় কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না; প্রতিজ্ঞা করিল, পিতা লইতে না আসিলে কখনই বাড়ী ফিরিবে না। কিন্তু রাত্রি ক্রমেই বেশী হইতে লাগিল—পিতা ত লইতে আসিলেন না ? মণি সেই বনমধ্যে বৃক্ষতলে ঘুমাইয়া পড়িল।

মণি ভাবিয়াছিল—পিতা তাহার উপর খুব রাগিয়াছেন বলিয়া তাহাকে আদর করিতে আসেন নাই। বস্তুতঃ তাহা নহে। নবীনচন্দ্র পুত্রের উপর যে রাগ করিতেন তাহা ক্ষণিক মাত্র। তাহার দৌরাত্ম্য অসহ্য হইলে, তিনি তাহাকে বকিতেন ও মারিতেন বটে; কিন্তু পরক্ষণেই আবার তাহাকে হাসাইতে চেষ্টা করিতেন। মণি তাঁহার মরুময় জীবনের একমাত্র স্নিগ্ধ প্রস্রবণ, তাঁহার দুস্তর সংসার-সমুদ্রে স্থিরজ্যোতি ধ্রুবনক্ষত্র; মণির উপর তিনি রাগ করিয়া কতক্ষণ থাকিবেন ? নবীনচন্দ্র পুত্রের উপর রাগ করেন নাই। অদৃষ্টের নির্ম্মম বিধানে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা লিখিতেছি।

প্রায় তিন মাস হইল নবীনচন্দ্র ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছিলেন। দিনে দুইবার করিয়া জ্বর আসিত। তথাপি তিনি শরীরের দিকে তত মনোযোগী হন নাই অথবা হইতে পারেন নাই; প্রত্যহ আফিসে কার্য্য করিতেন, নহিলে পেট চলে না; জ্বরগায়ে নিজের ও পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের যোগাড় করিতে হইত। পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া অথবা স্নেহাধিক্য বশতঃ তিনি

মণিকে কখনও কোন সাংসারিক কার্য্য করিতে বলিতেন না, খেলার সময়েও তাহাকে বাধা দিতেন না। এজন্য মণির দিন আনন্দেই কাটিত; দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নে থাকিয়াও পিতার কৌশলে সে কখনও দুঃখ ভোগ করে নাই।

যেদিন মণি রাগ করিয়া বনে গেল, সে দিন সন্ধ্যার সময় নবীনচন্দ্রের বড় জ্বর আসিল। জ্বর ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। নবীনচন্দ্র আর উঠিতে পারিলেন না, লেপ মুড়ি দিয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। ক্রমে বিকার দেখা দিল। নবীনচন্দ্র "মণি মণি" বলিয়া চীৎকার করিয়া খুঁটি জড়াইয়া ধরিতে লাগিলেন, শয্যা হইতে লাফাইয়া নীচে পড়িলেন; তারপর—তারপর—সব ফুরাইল; সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবীনচন্দ্রের জীবন প্রদীপ নিবিয়া গেল।

এদিকে মণির যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন বনের ভিতর প্রভাতের আলো দেখা দিয়াছে। নিদ্রার কোমল প্রভাবে মণির অভিমানের আবেগ কমিয়া গিয়াছিল; বন ছাড়িয়া অপরাধীর মত গুঁড়ি গুঁড়ি বাড়ীর দিকে চলিল।

নবীনচন্দ্র প্রত্যহ খুব প্রাতঃকালে উঠিতেন; মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আগে তুলসীতলা পরিষ্কৃত করিতেন; তৎপরে তথায় একটি আসনে উপবিষ্ট হইয়া গুরুমন্ত্র জপ শেষ করিয়া, কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ সুর করিয়া পড়িতেন। ইহা তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্মগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতদিন জ্বরে ভুগিলেও, এ নিয়মটি কখনও তিনি ভঙ্গ করেন নাই। মণি আশা করিয়াছিল যে, সে বাড়ী গিয়া পিতাকে তুলসীতলায় দেখিতে পাইবে। কিন্তু কই—তুলসীতলা ত পরিষ্কৃত হয় নাই?—পোড়া প্রদীপ পড়িয়া রহিয়াছে, কেঁচোর মাটি উঠিয়া রহিয়াছে। মণি ভাবিল—"তবে কি বাবা এখনও ঘুম হইতে উঠেন নাই?" সে আস্তে আস্তে ঘরে উঠিল; দেখিল দরজা খোলা এবং ভিতরে ধূল্যবলুণ্ঠিত-দেহে পিতা মেজেতে পড়িয়া রহিয়াছেন। মণি ভাবিল পিতা তাহার জন্য দুঃখ করিয়া মাটিতে শুইয়া আছেন; মনে একটু কষ্ট অনুভব করিল; ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া ডাকিল,—"বাবা উঠ, আমি আসিয়াছি।" কিন্তু কই—কোন উত্তর নাই। মণি মনে করিল, পিতার বোধ হয় খুব জ্বর হইয়াছে; ধীরে ধীরে গাত্রস্পর্শ করিল,—সর্ব্বনাশ, সর্ব্বাঙ্গ হিম!—মণির সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে পিতার হস্ত ধরিয়া টানিল,—তৎসঙ্গে কঠিন শবদেহ নড়িয়া উঠিল। তখন মণি "বাবা বাবা" চীৎকার করিয়া প্রভাত গগন কাঁপাইয়া তুলিল।

প্রতিবেশীরা দলে দলে আসিল। মণির নিকট তাহারা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিল—শুনিল যে, সে, রাত্রে পিতাকে ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। অনেকে তজ্জন্য তাহাকে যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিতে লাগিল; কারণ তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, প্রবল জ্বরের তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া নবীনচন্দ্রের প্রাণ বহির্গত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তাহারা আকস্মিক মৃত্যুর অন্য কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না। একজন বর্ষীয়সী চোখ ঘুরাইয়া মণিকে বলিলেন,—"হ্যারে মনে, বাপ তোর জন্যে এত কর্‌তো, আর তুই কিনা তায় এমনটা কর্‌লি? এক-বিন্দু জল অভাবে বাছার প্রাণ বেরিয়ে গেল?" নবু মুখুর্জ্জে এ কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কুপুত্র, কুপুত্র! ঘোর কলি!" পার্শ্বে বিন্দু ঠাকুরুণ ছিলেন; তিনি মনুষ্যহিতের জন্য প্রার্থনা করিলেন,—"বাবা! মানুষের যেন এমন সন্তান না হয়!" মণি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

যাহা হউক, প্রতিবেশীদের কোলাহল-বারিধি-মন্থনে এই টুকু ফল উদ্ভূত হইল যে, নবীনচন্দ্রের সৎকারের ব্যবস্থা তাহারা করিয়া দিল। কিন্তু প্রতিবেশীদের দায় এইখানেই শেষ হইল। নবীনচন্দ্রের চিতা নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই প্রতিবেশীদের সহানুভূতি দপ করিয়া নিবিয়া গেল। নবীনচন্দ্রের সৎকারের পর আর কেহ তাঁহার অনাথ বালকটির উপর চোখ তুলিয়া চাহিল না।

* * * *

সন্ধ্যাকাল। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমন সময় লাবণির তীরে ঘাসের উপর বসিয়া অমল ও মণি—উভয়ে চিন্তামগ্ন—উভয়ের গণ্ডেই দুই এক বিন্দু অশ্রু কাঁপিতেছিল। মণির হৃদয়াকাশে যে নিবিড় বিষাদ-মেঘ উদিত হইয়াছে, তাহা অপসারিত হইবার নহে; সে মেঘ অমলের হৃদয়েও একটি কাল ছায়া বিস্তার করিয়াছে। পিতার মৃত্যুর পর মণির আর কোন দুষ্টামি নাই। সে গম্ভীর হইয়াছে। কিন্তু তাহার এ গাম্ভীর্য্য অমলের নিকট ভাল লাগিল না; সে ভাবিল, এমন শান্তভাব অপেক্ষা দুষ্টামিই ভাল। মণিকে প্রফুল্ল করিবার জন্য সে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু সবই বিফল হইল। অবশেষে অমল ভাবিল যে, সে তাহার পিতাকে বলিয়া মণিকে তাহাদের বাড়ীতে রাখিবে। তাই সে মণিকে বলিল "ভাই তুমি অমন ক'রে থেকো না। আমাদের বাড়ী চল। বাবা, তোমাকে ভাল বাস্‌বেন। আমরা দুইজনে কেমন একসঙ্গে থাক্‌বো,

একসঙ্গে পড়্‌বো। শচীন্‌ রাণু তোমাকে দাদা বলে ডাক্‌বে।" বন্ধুর কথায় মণি ঘাড় তুলিল, বলিল "তবে চল।" তখন উভয়ে উঠিয়া চলিল।

মণিকে সঙ্গে লইয়া অমল পিতার নিকট উপস্থিত হইল। অমলের প্রস্তাব শুনিবামাত্র রায় মহাশয় চোখ কপালে তুলিলেন, অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ও সব হবে টবে না। বড় রাজা মহারাজা হয়েছিস্‌ কিনা, তাই চৌদ্দ জনকে ঘরে পুষবি। নিজের অন্ন কোথায় থেকে আসে আগে দ্যাখ্‌।" পূর্ব্বে রায় মহাশয়ের কর্ণে গিয়াছিল যে, পোষ্টমাষ্টার নবীনচন্দ্র ঘোষ কেবল পুত্রের দুর্ব্যবহারেই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। তাই তিনি অমলকে ছাড়িয়া মণির উপর বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাকে বলিলেন, "তুই হচ্ছিস্‌ বদ্‌মায়েসের ধাড়ী। গ্রামের লোক তোর উপদ্রবে থরহরি কম্পবান্‌। তোর জন্যে নবীন বেচারীর জীবনে সুখ ছিল না। বাপ্‌কে মেরে ফেলেছিস্‌, দ্যাখ্‌ এখন মজা, ভিক্ষে কর্‌;" পার্শ্বে নীলাম্বর চৌধুরী বসিয়াছিলেন, তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখ্‌লেন মশায়—একরত্তি ছেলের পেটে পেটে কি বুদ্ধির পেঁচ! অমলকে বোকা ছেলে পেয়েছে, আর অমনি তাকে বাগিয়েছে।—ওরে কালাচাঁদ দে ত ছোড়াটাকে বার করে।"—অমলের প্রাণ উড়িয়া গেল; মণি নিঃশব্দে বহির্গত হইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

মণি অন্ধকারে মিশিয়া গেল,—বাহিরের অন্ধকারের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার মিশিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে শূন্য কুটীরখানিতে গেল; ঘরে উঠিল না, আঙ্গিনায় উপবেশন করিল। তাহার মনে তখন শত ধিক্কার জন্মিতেছিল—সেই তাহার পিতার মৃত্যুর কারণ?—তাহার জন্যই পিতার জীবনে সুখ ছিল না? মাথার উপরে নিমগাছের ভিতর দিয়া হুহু করিয়া নৈশ বায়ু বহিয়া গেল। মণির হৃদয়েও মর্ম্মান্তিক যাতনার প্রবল তরঙ্গ উঠিল। তপ্ত অশ্রু গণ্ডস্থল বহিয়া বক্ষ ভাসাইয়া দিল। মৃত পিতার উদ্দেশে সে করযোড়ে আকাশপানে চাহিল, বলিতে লাগিল, "বাবা তুমি এস—আর আমি দুষ্টামি করিব না, আর আমি তোমাকে কষ্ট দিব না—তুমি এস।" তখন শৈশবের সব কথা একে একে তাহার মনে জাগিতে লাগিল। বহুদিনমৃতা জননীর স্নেহময় মুখখানিও অস্পষ্ট ভাবে তাহার স্মৃতিপথে ভাসিয়া উঠিল। সে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ শৈশবের পোষা বিড়ালটির কথা মনে পড়িল; ঘরে ঢুকিয়া

বিড়ালের অন্বেষণ করিতে লাগিল। হায়! বিড়ালটিও পিতার পরিত্যক্ত লেপের উপর মরিয়া রহিয়াছে। বিড়ালটি বৃদ্ধ হইয়াছিল—তাহার পর নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর পর কয়েক দিন খাইতে পায় নাই, গৃহ ছাড়িয়া অন্যত্র আহারের চেষ্টায় যায়ও নাই। কল্যও মণি তাহাকে বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে। কিন্তু আজ সেও মণিকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। মণি বিড়ালটিকে কোলে করিয়া আবার বাহিরে ছুটিয়া আসিল; তাহার মৃতদেহ বার বার চুম্বন করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এদিকে অমলের রাত্রিও শান্তিতে কাটে নাই। মণির প্রতি তাহার পিতার ব্যবহারের কথা তাহার হৃদয়ে চিতার ন্যায় জ্বলিতেছিল। ভোর হইতে না হইতে সে মণির কুটীরে ছুটিল; গিয়া দেখিল মণি নিমতলায় নিদ্রিত—তাহার চোখ দুটি ফুলিয়াছে—গণ্ডদ্বয়ে শুষ্ক অশ্রুচিহ্ন—যেন সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। কোলে মৃত বিড়ালটি পড়িয়া আছে। অমল গিয়া মণিকে তুলিল; মণির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, "ভাই, ক্ষমা কর।" অনেকক্ষণ পরে মণি উত্তর করিল, কিন্তু তাহা বড় গম্ভীর, বড় স্থির, বালকের সে স্বর নয়; বলিল, "ভাই বুঝেছি—এতদিন হেসে খেলে বেড়িয়েছি, বুঝ্‌তে পারি নাই—বুঝেছি পিতা আমার জন্যে কত কষ্ট পেয়েছেন। যে দিন পিতা আমাকে জন্মের শোধ ত্যাগ করে গিয়েছেন, সে দিন হ'তে আমি পথের ভিখারী। তুমি কেঁদ না অমল। তোমার কি দোষ ভাই?—তোমার পিতারই বা কি দোষ? দোষ এই হতভাগ্যের।" অমল বলিল, "ভাই, ও সব কথা ভুলে যাও। মাকে তোমার কথা বলেছি। তিনি তোমাকে ভাল বাস্‌বেন। তিনি তোমার জন্য রোজ খাবার পাঠাবেন, স্কুলের মাহিনা দিবেন। বাবা কিছুই জান্‌তে পার্‌বেন না।" মণি ক্ষণেক নীরব রহিল; পরে বলিল,—"না ভাই, তোমার বাবা জান্‌তে পার্‌লে রাগ কর্‌বেন, তোমাকে বক্‌বেন। তুমি কোন দুঃখ ক'রো না ভাই, আমি ভিক্ষে ক'রে আনন্দে দিন কাটাব।"

নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর পর মণি আর স্কুলে যাইত না। সে আর ঘাটে গিয়া জল ছিটাইত না, বাগানে বাগানে ফল চুরি করিয়া বেড়াইত না, গ্রামের কাহাকেও আর ব্যতিব্যস্ত করিত না। পিতৃ-পরিত্যক্ত কুটীর খানির পাশে রাস্তার ধারে প্রায়ই সে বসিয়া থাকিত। কিন্তু যে দিন প্রাতঃকালে মণি অমলকে বলিল,—"ভাই, ভিক্ষে করে আনন্দে দিন কাটাব।"

তাহার পরদিন হইতে আর কেহ তাহাকে গ্রামে দেখিতে পাইল না। তাহাতে গ্রামের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইল না—বরং গ্রামবাসীরা দুরন্ত মণির উপদ্রব হইতে চিরদিনের মত অব্যাহতি পাইল। কিন্তু একটি মাত্র বালক-হৃদয় সেই দুরন্ত বালকটির জন্য কাঁদিত। অমল অবসর পাইলেই একাকী গিয়া মণির পরিত্যক্ত কুটীরের ভিটাটির উপর বসিয়া থাকিত।

শ্রীসুধীরকুমার গোস্বামী।

মহাদান।

শীতল স্নিগ্ধ কুসুম সুরভি
দিয়াছ ভুবন ভরিয়ে;
মলয় মধুর মৃদু সমীরণ
দিয়াছ জগতে বহিয়ে।
কুসুম কাননে ফুটায়েছ ফুল
থরে থরে থরে পুঞ্জে;
বাড়ায়েছ শত মাধুরী মধুর
কোকিল-কুজিত কুঞ্জে।
মঞ্জরিত মঞ্জু তরুশাখি মাঝে
দিয়াছ মত্ত মধুপ গান;
তরঙ্গভঙ্গ তটিনী সঙ্গে রঙ্গে
ঢালিয়াছ মধুকুল তান।
ভরিয়া দিয়াছ মৃদু জোছনায়
অমল রজতধারা;
নীলনভঃ মাঝে দিয়াছ চাঁদিমা
হীরক উজ্জ্বল তারা।
অসীম সুন্দর শরীর দিয়াছ
দিয়াছ হৃদয় প্রাণ;
বুঝিয়াছি প্রভু মোদেরই তরে
তোমার এ মহাদান।

শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ।

জ্যোতিষ-তত্ত্ব।

অকাল।

অকালে বেদবিহিত যাগযজ্ঞ নিষিদ্ধ। সুতরাং তৎকালে উপনয়ন ও বিবাহ আদি সংস্কার নিষিদ্ধ এ কথা হিন্দু মাত্রেরই সুপরিজ্ঞাত আছে।

কিন্তু আকাশের যে ব্যাপার-মূলে অকাল উপস্থিত হয়, সেই জ্যোতিষিক ব্যাপারের খবর রাখা আয়াস-সাধ্য অথচ উহার জ্ঞান লাভে অর্থাগম হয় না গতিকে সে জ্ঞানলাভে প্রবৃত্তি বা উৎসাহ হয় না।

কিন্তু অকালের জ্ঞান লাভে যে আয়াস লইতে হয়, সে অতি সামান্য। এবং অত্যস্ত হইলে ঐ আয়াস অতীব আনন্দময় হয়।

বৃহস্পতি গ্রহ।

তারাগ্রহ বৃহস্পতি কনকবর্ণ এবং অতি উজ্জ্বল। আকাশের উত্তর খণ্ড ও দক্ষিণ খণ্ডের মধ্যবর্ত্তী খণ্ডে এই উজ্জ্বল কনকবর্ণ তারা বিচরণ করে। মধ্য আকাশে ইহার তুল্য উজ্জ্বল অন্য তারা বা তারাগ্রহ নাই। সুতরাং ইহাকে চিনিতে কোন কষ্ট নাই।

এই তারাগ্রহ একবর্ষ কালে এক রাশি ভ্রমণ করে। প্রতি বর্ষে সেই রাশিতে সূর্য্য নারায়ণ উপনীত হইলে সূর্য্য কিরণে এই তারাগ্রহ আচ্ছাদিত হয় সুতরাং আমাদের অদৃশ্য হয়। গুরুর অদর্শনে অকাল উপস্থিত হয়। প্রতি বর্ষে গুরুর অদর্শন-জনিত অকাল একবার উপস্থিত হইবেই হইবে।

বর্ত্তমান সন ১৩১৯ সালে বৃহস্পতি বৃশ্চিক রাশিতে ভ্রমণ করিতেছেন। ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে তিনি স্বীয় গৃহ ধনু রাশিতে যাইবেন। এ বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বৃহস্পতি সন্ধ্যার সময়ে পূর্ব্ব আকাশে উদিত হইবেন। ভাদ্র আশ্বিনে সন্ধ্যার সময় বৃহস্পতি মধ্য আকাশে উদিত হইবেন। এবং কার্ত্তিক মাসে সন্ধ্যার সময় গুরু পশ্চিম আকাশে উদিত হইবেন।

অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য্য নারায়ণ বৃশ্চিক রাশিতে সংক্রমণ করিবেন। ৬ই তারিখে সূর্য্য কিরণে এই তারাগ্রহের জ্যোতি ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইবে। মাসের শেষ ভাগে ২১শে হইতে গ্রহটি পশ্চিম আকাশে অদৃশ্য বা অস্তগত

হইবে। অর্থাৎ গ্রহটি সূর্য্যের সুদূর পার্শ্বে যাইবে। এবং পৌষ মাসের মধ্যভাগে ১৮ই তারিখে ক্ষীণপ্রভ গুরু ঊষাকালে পূর্ব্বাকাশে উদিত হইবেন। কিন্তু মাঘের ৪ঠার পূর্ব্বে গুরু উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইবেন না।

অস্তগমনের পূর্ব্বে প্রভার ক্ষীণতাকে শাস্ত্রীয় ভাষায় গ্রহের বৃদ্ধত্ব বলে। এবং অস্তগমনের পরবর্ত্তী ক্ষীণ প্রভত্বকে শাস্ত্রীয় ভাষায় গ্রহের বাল্যত্ব বলে। বৃদ্ধত্ব ও বাল্যত্ব সময়ে তারাগ্রহ কষ্টদৃশ্য হয়।

বৃদ্ধত্বের প্রারম্ভ হইতে বাল্যত্বের শেষ পর্য্যন্ত ৫৭ দিন অকাল বলিয়া গণ্য। গুরু ১৫ দিন বৃদ্ধত্ব এবং ১৫ দিন বাল্যত্ব ভোগ করেন। এবং ২৭ দিন অস্তে থাকেন।

শুক্র গ্রহ (শুকতারা) প্রভাতী তারা।

তারাগ্রহ শুক্র পীতাভ শুক্লবর্ণ। এই তারাগ্রহ আকাশের স্থূলতম বা উজ্জ্বলতম তারা। এই তারাগ্রহ আট মাস কাল ঊষাকালে পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়ের অগ্রে উদয় বিন্দুর অদূরে উদিত হয়। এবং এক দুই বা তিন ঘণ্টা কাল মধ্যে সূর্য্য-কিরণে গগনে বিলীন হয়। তৎকালে ইহাকে প্রভাতী তারা ("পোহাতে ভাই") বলে। প্রভাতী তারা চিনিতে কোন কষ্ট নাই। তিনি নিজেই দর্শককে তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে আহ্বান করেন। তবে "কে বা আঁখি মেলে" বলিলে নাচার।

আট মাস উদয়ের পর প্রভাতী তারা সূর্য্য নারায়ণের সুদূর পার্শ্বের সন্নিহিত, হয় তখন তাহার বৃদ্ধত্ব উপস্থিত হয়। ১৫ দিন পরে প্রভাতী তারা পূর্ব্ব দিকে অদৃশ্য ও অস্তমিত হয়। অর্থাৎ তারাগ্রহ সূর্য্যের সুদূর পার্শ্বে গমন করে এবং সূর্য্য-কিরণে আচ্ছাদিত হয় ও ৭৪ দিন শুক্র আচ্ছাদিত ও অদৃশ্য থাকে। পরে এই তারাগ্রহ পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যা তারারূপে উদিত হয়। কিন্তু ক্ষীণপ্রভা হেতু দশদিন কাল কষ্ট দৃশ্য থাকে। দশ দিন অন্তে তারাগ্রহ বাল্য ত্যাগ করে ও স্বাভাবিক জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হয়।

শুক্রের এই অস্তগমন দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া ইহাকে "মহাস্ত" বলে।

সন্ধ্যাতারা।

সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাতারা অস্ত বিন্দুর অদূরে পশ্চিমাকাশে উদিত হয় এবং এক দুই বা তিন ঘণ্টা মধ্যে অস্তগমন করে। শুকতারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম আকাশে দৃষ্টি গোচর হয়। মধ্য আকাশে ইহার দর্শন দুর্লভ। কারণ এই

তারাগ্রহ সতত সূর্য্যের অদূরে থাকে এবং সূর্য্যকিরণে বিলুপ্ত থাকে। সুতরাং ইহাকে চিনিতে কোন কষ্ট নাই।

আটমাস কাল উদয়ের পর সন্ধ্যা-তারা সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্য স্থানের সন্নিহিত হয় এবং বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। ১০ দিন পরে সন্ধ্যাতারা অদৃশ্য ও অস্তগত হয়। অর্থাৎ তারাগ্রহ সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী হয় এবং ইহার অমা উপস্থিত হয়। এবং দশদিন কাল অমা শুক্র সূর্য্যকিরণ মধ্যে অদৃশ্য ভাবে বিচরণ করে। তৎপরে ক্ষীণপ্রভ তারাগ্রহ শুক্র প্রভাতীতারা-রূপে পুনঃ উদিত হয় এবং দিনত্রয় গতে বাল্য ত্যাগ করে। তারা গ্রহ শুক্রের এই স্বল্পস্থায়ী অস্তগমনকে পাদাস্ত বলে। এইরূপে শুক্রের মহাস্ত জন্য ৯৯ দিন এবং পাদাস্ত জন্য ২৩ দিন মাত্র অকাল হয়।

বৎসর বিশেষে একবর্ষে মহাস্ত ও পাদাস্ত-জনিত দুইবার অকাল ঘটে। কোন বর্ষে বা অস্তদ্বয়ের একটি মাত্র ঘটনা হয়। কখন বা এক বর্ষে একটী অস্ত এবং অপর অস্তের অংশ মাত্র পড়ে।

পাদাস্ত কালে রবি শুক্র পৃথিবীর সমসূত্রে পড়িলে ভৃগু, শ্রেষ্ঠ শুক্র কৃষ্ণ-বিন্দুরূপে সূর্য্যবিম্ব বক্র গতি দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম গমন দ্বারা উপসর্পণ ও অতিক্রম করে। শাস্ত্রে এই যোগকে ভেদ যুদ্ধ বলে। ঐতিহাসিক-গণ এই জ্যোতিষিক লোমহর্ষণ ভেদ-যুদ্ধে সূর্য্য নারায়ণের বক্ষে ভৃগুপদ লাঞ্ছন বা শ্রীবৎস লাঞ্ছন (১) সন্দর্শন করেন।

তারাগ্রহ বৃহস্পতি ও শুক্রের এই অস্তকে অস্তমন, যোগ, বা গ্রহযুদ্ধ বলে। বৃহস্পতি ও শুক্র উভয় গ্রহের অধিষ্ঠাতা দেবরাজ ইন্দ্র। সুতরাং ইন্দ্রের সহিত সূর্য্য নারায়ণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বিষম দেববিভ্রাট উপস্থিত হয় এবং এই দেববিভ্রাটে বেদ মন্ত্র পাঠ সুতরাং বেদোক্ত যাগ যজ্ঞ আদিও স্থগিত রাখিতে হয়। নতুবা যজ্ঞভাগ গ্রহণ অভাবে যজ্ঞ পণ্ড হইবে।

হিন্দু জড় নক্ষত্রের উপাসক নহে। তবে নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেবতা প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া নক্ষত্রগণ "দেবগৃহ" নাম ধারণ করে। (২) এবং হিন্দু দেব-গৃহকে দেবসম ভক্তি প্রদর্শন করেন মাত্র।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

(১) এক শুক্র গ্রহে দৈত্য গুরু শুক্র আচার্য্য এবং শ্রীদেবী বা স্বর্গলক্ষ্মী দেবী অধিষ্ঠিত আছেন। এজন্য শুক্র আচার্য্য "লক্ষ্মী সহজ" উপাধি ধারণ করেন।

(২) "দেব-গৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি" (তৈঃ ব্রাহ্মণ)

আসামের ইতিবৃত্ত।

শাণজাতির অন্তর্নিবিষ্ট সম্প্রদায় বিশেষ আহম নামে পরিচিত ছিল। আহমেরা প্রচণ্ডস্বভাব ও স্বাধীনজাতি। তাঁহাদের পুরাতন রাজ্যের নাম "পুঙ্গ"। মোগঙ্গ এই রাজ্যের পূর্ব্বকালীন রাজধানী ছিল। ইরাবতী নদীর উচ্চতর উপত্যকায় এই রাজ্য এখনও বর্ত্তমান আছে। ১২২৮ খৃঃ আহমেরা ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা প্রদেশের উত্তর প্রান্তে প্রবেশ করে। ক্রমে তাহারা সমগ্র উপত্যকা অধিকার করিয়া, তাহাদিগের নিজ নামে সমগ্র দেশের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাহাদের নাম অনুসারেই এখন ঐ রাজ্যের আসাম বা আহাম নাম হইয়াছে। অতঃপর পুঙ্গের সিংহাসন লইয়া কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। যাহারা সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হয়; তাহাদিগের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম—চুকাফা। তিনি বিবাদে বিফল-মনোরথ হইয়া কতিপয় সহচর সহ কয়েকবৎসর কাল ইরাবতী নদী ও পাত্‌কই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে ভ্রমণ করিতে থাকেন। অবশেষে তাঁহারা পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকায় প্রবিষ্ট হন। এই উপত্যকায় তৎকালে বিবিধ পার্ব্বত্যজাতির বাস ছিল। একে একে সেই সকল পার্ব্বত্যজাতি তাঁহাদিগের বশীভূত ও অধীন হইয়াছিল। ইহা হইতেই সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আহম্‌দিগের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে আহমেরা কাছাড়িদিগকে বিতাড়িত করিয়া ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তটেও আপনাদিগের ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিল। অতঃপর আহম্‌ রাজগণ ক্রমান্বয়ে তথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আহম্‌ রাজগণের মধ্যে এক ব্যক্তির নাম চুচেঙ্গাফা। তিনি ১৬১১ খৃঃ হইতে ১৬৫৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তখন মোগলকুলতিলক দিল্লীশ্বর মহামতি আকবরসাহ (১৫৫৬ – ১৬০৫) দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। চুচেঙ্গাফা বহু হিন্দুমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সকল মন্দিরের মধ্যে মহেশ্বরের মন্দিরই সর্ব্বপ্রধান। তিনি ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণ যাজক নিয়োগ করেন এবং হিন্দুধর্ম্মকেই রাজধর্ম্মে পরিণত করিয়াছিলেন। শৈবসম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুগ্রহ ছিল।

চুচেঙ্গাফার মৃত্যুর পর ১৬৫৫ খৃঃ তাঁহার পুত্র "জয়ধ্বজ সিংহ" এই হিন্দুনাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে

পরবর্ত্তী সকল আহম্ রাজগণই আহম্ ও হিন্দু উভয়বিধ নাম গ্রহণ করেন। ১৬৬২ খৃঃ জয়ধ্বজ সিংহের রাজত্বকালে দিল্লীর সম্রাট আরঙ্গজেবের (১৬৫৮—১৭০৭) সুদক্ষ সেনাপতি মীরজুম্‌লা আসাম আক্রমণ করিয়া তথায় রণ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। মীরজুম্‌লাকর্ত্তৃক আহম্ রাজধানী অধিকৃত হয়; অবশেষে তিনি আসাম হইতে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় আহমেরা নিম্ন আসামে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া গৌহাটী পর্য্যন্ত তাঁহা-দিগের আধিপত্য বিস্তার করেন। এই সময় আহম্‌রাজ জয়ধ্বজ সিংহ এক-দল সৈন্য ও একবহর রণপোত লইয়া কুচবিহারের বিরুদ্ধে প্রস্থানপর হন। তিনি মুসলমান ও কুচবিহার সৈন্য উভয়কেই আক্রমণ করেন। কুচবিহারের তৎকালীন মুসলমান শাসনকর্ত্তা মিরলুৎজুল্লা আহম্‌দিগের সহিত যুদ্ধে আপ-নাকে অসমর্থ মনে করিয়া তৎকালীন রাজধানী ঢাকায় প্রত্যাগমন করেন। কুচবিহারের রাজাও আহম্‌রাজ অপেক্ষা আপনাকে হীনবল বুঝিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিয়াছিলেন। এইরূপে সমগ্র নিম্ন আসাম আহম্‌দিগের অধীন হয়। অবশেষে আহম্‌রাজ সন্ধি প্রার্থনা করিয়া একজন দূত ঢাকায় প্রেরণ করেন। মীরজুম্‌লার সহিত সেই সন্ধিতে আহম্‌রাজ জয়ধ্বজ সিংহ, তাঁহার এক কন্যাকে পরিণয়ার্থ মোগল সম্রাট্‌সমীপে প্রেরণ করিবেন, তাঁহাকে তখন ২০০০০ তোলা স্বর্ণ, ১২০০০০ তোলা রৌপ্য, ৩৫টী হস্তী দান করিতে হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। ইহার পর তিনি বৎসরের মধ্যে ৩টী লায়া ৯০টী হস্তী দিবেন এবং প্রতি বৎসর করস্বরূপ তাঁহাকে ২০টী করিয়া হস্তী দিতে হইবে; এতদ্ব্যতীত আহম্‌রাজকে দারঙ্গ, গারোপর্ব্বত, নাগাপর্ব্বত, চেলতলী এবং ডুমুরিয়া এই কয়েকটি জেলাও ছাড়িয়া দিতে হইল। ১৬৬৩ খৃঃ জয়ধ্বজ সিংহ পরলোকগত হন।

অতঃপর তাঁহার পুত্র রামসিংহ সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি একজন বড় রাজপুত অভিজাত বা সম্ভ্রান্ত রাজন্যমধ্যে গণ্য ছিলেন। রাজা রামসিংহ দিল্লীর সিংহাসন লাভ বিষয়ে আরঙ্গজেবের বিশেষ সাহায্য করিয়া-ছিলেন। এই রামসিংহ কর্ত্তৃক উল্লিখিত ঘটনার দশ বৎসর পরে, পুনরায় মোগলদিগের পক্ষ হইতে গৌহাটী বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল। ইহার পর, বোধ হয়, আবার মোগলেরা গৌহাটী হইতে বিতাড়িত হন এবং গৌহাটী আহম্‌রাজগণের রাজধানী হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এই স্থানে আহম্‌গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত এবং গৌহাটী তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল।

১৬৯৫ খৃঃ চুকুঙ্গফা আহম্‌সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি “রুদ্রসিংহ” নাম ধারণ করিয়া অভিষিক্ত হন। রাজা রুদ্রসিংহই আহম্‌রাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। সমগ্র ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা তাঁহার অধীন ছিল। তিনি সমগ্র আসাম উপত্যকার উপর অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।• সমুদয় পার্ব্বত্যজাতিগুলি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তিনি রংপুর নগর প্রতিষ্ঠা ও তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। রুদ্রসিংহ তিব্বতের সহিত আসামের বিস্তৃত বাণিজ্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আসামের বাণিজ্য সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে আসাম ও কাছাড় রাজ্যের মধ্যে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ ঘটনা হয়। অবশেষে আহমেরা জয়লাভ করে এবং কাছাড়িগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল। আহমেরা জয়লাভ করিয়া ধনশ্রী নদী পর্য্যন্ত গমন করে; কাছাড়িদিগের রাজধানী ডিমাপুর লুণ্ঠন ও অধিকার করিয়া লয় এবং কাছাড়িরাজ দেৎসঙ্গের সহিত বহু সংখ্যক কাছাড়িকে হত্যা করিয়াছিল। কাছাড়িগণ ইহার পর ধনশ্রী নদীর উপত্যকা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া যায় এবং উত্তর কাছাড়ে মাহুর নদীর তটে মাইবং নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিল। ১৭০৩ খৃঃ কাছাড়িরাজ শত্রুদমন, জয়ন্তীয়ার রাজাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাঁহাকে করদানে বাধ্য করেন, কিন্তু জয়ন্তীয়াধিপতি কিছুদিন পরে, আহম্‌রাজ রুদ্রসিংহের নিকট এক কন্যা দানে প্রস্তুত হইয়া, কাছাড়ি রাজ্যের মধ্যদিয়া তাঁহার কন্যাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, আহম্‌রাজকে অনুরোধ করেন। এই সূত্রে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কাছাড়িরাজ শত্রুদমন আহম্‌রাজকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া স্বয়ং “প্রতাপ নারায়ণ” উপাধি গ্রহণ করেন এবং রাজধানী মাইবঙ্গের কীর্ত্তিপুর নাম রাখেন। ১৭০৬ খৃঃ কাছাড়িরাজ তাম্রধ্বজ নারায়ণ প্রকাশ্যভাবে আপনাকে স্বাধীন রাজ বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময় রুদ্রসিংহ আহম্‌দিগের রাজা ছিলেন। কাছাড়িরাজের ঐরূপ গর্ব্বিত ঘোষণা শ্রবণ করিয়া রুদ্রসিংহ ৭০০০০ লোক লইয়া কাছাড়িরাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা তাম্রধ্বজ নারায়ণ পলাইয়া গিয়া জয়ন্তীয়ার রাজা রাম সিংহের শরণাপন্ন হন। আহমেরা সমগ্র কাছাড় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রাজধানী মাইবঙ্গে উপস্থিত হয়। তাহারা মাইবঙ্গে উপস্থিত হইয়া তথাকার ইষ্টক নির্ম্মিত দুর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিল। কিন্তু আহমেরা দীর্ঘকাল তথায় অবস্থান করিতে পারে নাই; তাহাদিগের বহুসংখ্যক লোক রোগাক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আহম্‌দিগকে

কাছাড় পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে হয়। এদিকে জয়ন্তীয়া-পতি রাজা রামসিংহ শরণাপন্ন কাছাড়িরাজ তাম্রধ্বজকে বন্দী করিয়া রাখিয়া কাছাড় রাজ্য স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া লইতে প্রস্তুত হন। অতঃপর রাজা তাম্র-ধ্বজ নারায়ণ কোন কৌশলে রুদ্রসিংহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া এক-খানি পত্র লিখিয়া পাঠান। আহম্‌রাজ রুদ্রসিংহ এই পত্র প্রাপ্ত হইয়া জয়ন্তীয়া আক্রমণ ও রাজা রামসিংহকে যুদ্ধে পরাভব করিয়া ১৭০৮ খৃঃ তাম্র-ধ্বজকে মুক্ত করেন। ইহার পর তাম্রধ্বজ নারায়ণ এক বৃহৎ দরবারে আহম্‌রাজকে করদানে এবং বৎসরে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হন। গৌহাটীর ঠিক বিপরীত দিকে প্রবাহিত নদীতটে আহম্-রাজ রুদ্রসিংহের মৃত্যু হয়। এই স্থানে পশ্চাৎ তাঁহার পুত্র, রুদ্রেশ্বর নামক এক শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন।

১৭৮০ খৃঃ আহম্‌রাজ রুদ্রসিংহের উত্তরাধিকারী গৌরীনাথ সিংহ আহম্ সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহার সময়ে মোয়ামারিয়াগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। মোয়ামারিয়া একটি শক্তিশালী ধর্ম্ম সম্প্রদায়। তাহাদিগের বাস-ভূমি ডিব্রুগড়। মোয়ামারিয়াদিগের সহিত আহম্‌রাজ গৌরীনাথের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাহারা কয়েকটি যুদ্ধে রাজার সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছিল। মণিপুরের তদানীন্তন রাজা, আহম্‌রাজ গৌরীনাথের সাহায্যার্থে আগমন করেন; কিন্তু তিনিও যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে দাররাঙ্গের রাজা কৃষ্ণনারায়ণ আহম্‌রাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা গৌরীনাথ এইরূপে বিপন্ন হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৯২ খৃঃ রাজা গৌরীনাথের সাহায্যার্থে কলিকাতা হইতে একদল ইংরাজ-সৈন্য প্রেরিত হয়। কাপ্তেন্ ওয়ালেস্ এই সৈন্যদলের সেনাপতি হইয়া অভি-যান করিয়াছিলেন। কাপ্তেন্ ওয়ালেস্, কৃষ্ণনারায়ণকে এক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, মোয়ামারিয়া বিদ্রোহ-দমন এবং সমগ্র আসাম উপত্যকা বশীভূত করিয়া দিয়াছিলেন। আসামে শান্তিস্থাপন করিয়া ১৭৯৪ খৃঃ কাপ্তেন্ ওয়া-লেস্ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ইহার কয়েকমাস পরে আহম্‌রাজ গৌরীনাথ সিংহ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

রাজা গৌরীনাথের পর, তদীয় পুত্র কমলেশ্বর সিংহ রাজা হন। তিনি কয়েকমাস মাত্র আহম্‌সিংহাসনে সমাসীন থাকিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার সময়ে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই।

রাজা কমলেশ্বরের পর, তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ ১৮০৯ খৃঃ আহম্ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার সহিত স্বীয় মন্ত্রী বুরাগোহাইনের বিরোধ উপস্থিত হয়। বুরাগোহাইন্ প্রকাশ্যভাবে তাঁহার প্রতিরোধিতায় প্রবৃত্ত হইলে, রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ ব্রহ্মদেশের তদনীন্তন রাজা জিদপায়ার (১৭৮১—১৮২২) নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মদেশীয় বিপুল-বাহিনী আসিয়া আসাম আক্রমণ করে। তাহারা বুরাগোহাইনের দলকে পরাভূত করিয়া চন্দ্রকান্তকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যায়। ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেই বুরাগোহাইন পুনরায় শক্তিশালী হইয়া উঠেন এবং চন্দ্রকান্তকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ১৮১৬ খৃঃ পুরন্দর সিংহকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। চন্দ্রকান্ত পুনরায় ব্রহ্মবাসীর শরণাপন্ন হন। ১৮১৮ খৃঃ তাহারা পুনরায় তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যায়। পুরন্দর সিংহ আহম্‌সিংহাসনচ্যুত হইয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান; কিন্তু বৃটিশরাজ সাহায্যদানে সম্মত হন নাই। ইহার পর রাজা চন্দ্রকান্ত ব্রহ্মবাসীদিগের সহিত বিরোধ আরম্ভ করেন। অবশেষে ব্রহ্মবাসিগণ ১৮২২ খৃঃ রাজা চন্দ্রকান্তকে আসাম হইতে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র আহম্-রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ পলায়ন পূর্ব্বক ইংরাজ অধিকারে গমন করেন। তাঁহার সহিত বহু সংখ্যক আসামী আসিয়া বৃটিশ-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই ঘটনার পর, ব্রহ্মরাজ জিদপায়ার (১৮২২—১৮৩৮) সেনাপতি ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে রাজা চন্দ্রকান্তকে তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য লিখিয়া পাঠান। যদি বৃটিশরাজ এই প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে, ব্রহ্মবাসিগণ বৃটিশরাজ্য আক্রমণ করিয়া বলপূর্ব্বক চন্দ্রকান্তকে ধরিয়া আনিবেন। এইরূপ ভয়-প্রদর্শনের সহিত একদল ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য কাছাড়ের দিকে অভিযান করে। এই সময় কাছাড় রাজ্য বৃটিশ রাজের রক্ষণশীল ছিল। অতএব ১৮২৪ খৃঃ বৃটিশরাজ ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাহার পর ১৮২৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত জান্দাবু নগরে এক সন্ধি স্থাপিত হয়; এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে ব্রহ্মরাজ জিদপায়ার আসাম রাজ্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

অতঃপর আসামের একাংশ অর্থাৎ কামরূপ, নওগাঁ ও দারুরাঙ্গ এই তিনটি জেলা বৃটিশ রাজের শাসনাধীন হয়। ডিব্রুগড় জেলায় মোয়ামারিয়াগণ

বাস করিত। ইহা কয়েক বৎসর কাল মোয়ামারিয়াদিগের দলপতির শাসনে ছিল। কিন্তু ১৮৩৯ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় ১৮৪২ খৃঃ ডিব্রুগড় জেলা বৃটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। প্রথমতঃ শিবসাগর ও লক্ষীপুর জেলাদ্বয় রাজা পুরন্দর সিংহের শাসনাধীন ছিল; তিনি বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা রাজস্ব প্রদানে সম্মত হইয়া উহা রাখিয়াছিলেন। ১৮৩৯ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি প্রতিশ্রুত রাজস্ব প্রদান করেন। তদনন্তর তিনি আর এই রাজ্যশাসন করিতে পারিবেন না বলিয়া প্রকাশ করেন; সুতরাং দুইটী জেলা বৃটিশ রাজ্যভুর্ক্ত হয়। সাসীয়া জেলা খামপতি সর্দ্দারের হস্তে ছিল; খামপতিগণ বিদ্রোহী হইলে এই সময় সাসীয়া জেলাও বৃটিশ রাজ্যের অন্তভুর্ক্ত হইয়া যায়। এইরূপে ১৮৪২ খৃঃ হইতে আসাম বৃটিশ শাসনাধীন হয়। পূর্ব্বদুয়ার রাজ্য হিমালয়ের পাদদেশে বিস্তৃত ছিল; ১৮৬৬ খৃঃ ভুটান যুদ্ধের অবসানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ইহা ভূটানের নিকট হইতে অধিকার করিয়াছেন। গোয়ালপাড়া সমেত আসাম প্রদেশের অবশিষ্ট অংশ মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গরূপে বাঙ্গালার অধীন ছিল। মিঃ গেইট সাহেবের আসামের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গোয়ালপাড়া প্রাকৃতিক নিয়মে কোন কালেই প্রকৃত আসামের অংশ ছিল না। পাঠান শাসনের সময় হইতে ইহা বঙ্গদেশের অধীন ও অন্তভুর্ক্ত ছিল। স্থানীয় রাজস্বে চলিত না বলিয়াই আয় বৃদ্ধির জন্য ১৮৭৪ খৃঃ এই জেলা আসামের শাসনাধীন করা হয়। ঐ জেলার অধিবাসীদিগের সহিত খাস আসামের অধিবাসীদের আচার ব্যবহার ও সামাজিক রীতি নীতিতে বিশেষ পার্থক্য বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়।

ছোটলাট স্যার ফ্রেড্রিক্ হ্যালিডে এবং তৎপরবর্ত্তী বঙ্গেশ্বর স্যার্ জন্ গ্রাণ্ট্, স্যার সিসিল্ বিডন্, স্যার উইলিয়ম্ গ্রে এবং স্যার জর্জ্জ ক্যাম্বেলের শাসনকাল পর্য্যন্ত বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, ছোট নাগপুর এবং আসাম——এই সুবিস্তৃত ভূভাগ একজন ছোট লাটের দ্বারাই শাসিত হইত। ১৮৭৪ খৃঃ ক্যাম্বেল সাহেবের শাসনকালে আসামের জন্য একজন স্বতন্ত্র চীফ্ কমিশনার নিযুক্ত হয়। তৎকালে শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া এই দুইটী জেলাকে বঙ্গ-দেশের অপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

অতঃপর বাঙ্গালীর চিরস্মরণীয় ভারতের ভূতপূর্ব্ব "নামজাদা" বড় লাট্ লর্ড কর্জ্জন ১৯০৫ খৃঃ ১৬ই অক্টোবর গঙ্গার পূর্ব্ববর্ত্তী ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসাম প্রদেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া উহাকে "পূর্ব্ববঙ্গ ও

আসাম” নামক এক নূতন প্রদেশে পরিণত করেন। বিগত ১৯১১ খৃঃ ঐ প্রদেশের লোক সংখ্যা—৩৪০১৮৫২৭ জন। ১৯১১ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে ভারত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত করিয়া অষ্টকোটি বাঙ্গালীর একমাত্র কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। নির্ম্মল সূর্য্য-করোজ্জ্বল যমুনা-চুম্বিত-চরণ ইন্দ্রপ্রস্থে তিনি দানের মত দান করিয়া গিয়াছেন। আসাম প্রদেশের পরিমাণ ৪৬৩৪১ বর্গ মাইল। ভাষা—আসামী। আসামের অন্তর্গত শিলং, নওগাঁ, কামরূপ, কাছাড়, দারং, গোয়ালপাড়া, লক্ষ্মীপুর, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, শ্রীহট্ট, তেজপুর, লামডিং প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান নগর।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

পথহারা।

জগতের কোলাহল নাহিক হেথায়,
প্রকৃতির বিমলতা, রজনীর কোমলতা,
ছড়াইছে সুধারাশি সুষুপ্ত ধরায়,
বিজন নীরব কুঞ্জ নিভৃতে ঘুমায়।
বসি এই নিরজনে, ধীরি ধীরি সযতনে,
মুদিলাম আঁখিদুটী তাপসের প্রায়,
ভাবনা-বারিধি-মাঝে ডুবিলাম হায়॥

কেবা আমি? কই সেই—“আমি”টি আমার?
কই সেই পরিচিত “আমি” নাম যার?
এই ক্ষীণ বপু মাঝে, যেই ক্ষুদ্র জীব রাজে,
এত দ্বেষ হিংসা যার—এত অহঙ্কার,
কই সেই মোহময় জীবাত্মা—আমার?
শুধু কি নশ্বর কায়, শুধু রক্ত মাংস তায়
নাহি কি অমর কিছু ভিতরে আমার?
থাকে যদি—কোথা আছে সেজন আমার?
আমি ত আমার কথা ভাবিনা কখন!
কে আমি? কিসের তরে আমার জীবন?

আসিয়াছি কোথা হ'তে, যাব আমি কোন পথে,
কোন দেশে কার কাছে করিব গমন?
কত দিনে নিজ কার্য্য হবে সম্পাদন?
পাঠায়েছে কে আমায়, কি ধন দিয়াছে হায়
কি পাথেয় উপদেশ দিয়াছে সে জন?
বিপদে সহায় কেবা আত্মীয় স্বজন?
আমার "আমিত্ব" টুকু অন্ধকার হায়!
আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করি রাখে সর্ব্বদায়।
বাহিরে বাহার মাখা, ভিতরে আঁধার ঢাকা,
শুধু এ শরীর ল'য়ে আছি ভুলে হায়॥
খুঁজি না কোথায় আমি, কি আছে আমার,
বৃথা কাজে ব্যস্ত মন, ঘুরে মরি অনুক্ষণ,
"ভূতের ব্যেগার" খাটি মায়ার ধরায়
মায়ায় গিয়াছি ডুবি কি হ'বে উপায়!
এস হে দয়াল হরি হৃদয়ের ধন!
হৃদয় আসনে বসি' ঘুচাও বেদন।
তুমি হৃদয়ের রাজা, আমি তব চির প্রজা,
দাসের বিপদে আজি ভুলনা রাজন্!
তোমার এ ক্ষুদ্র রাজ্য করহে গ্রহণ॥
দগ্ধ হৃদে আছে যাহা, সকলি তোমার তাহা,
তোমারি জিনিষ তোমা করিনু অর্পণ।
অধীরে করুণা কর দাও দরশন॥
পথহারা আমি পথ দেখাও আমায়,
ঘুচে যাক্ অন্ধকার, ঘুচে যাক্ দুখভার,
পড়ে থা'ক প্রাণ মন, তোমারি ও পায়,
আমার "আমিত্ব" টুকু মিশাক্ তোমায়।
তোমাময় হ'ক প্রাণ, তোমাময় হ'ক জ্ঞান,
তোমাময় হ'ক ধরা তুমি রাজা তায়।
পূতমনে পূজি আমি তব পদে হায়॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র দেব, বি, এ।

খুন না আত্মহত্যা।

(৩)

আমরা দুইজনে অখিলচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজপথে আসিলাম। সেখান হইতে তিন জনে গাড়ী করিয়া ডাক্তার অখিলবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। এক বালক ভৃত্য আমাদিগকে দরজা খুলিয়া দিল। আমরা উপরে উঠিতেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলাম। সহসা উপরের আলো নিবিয়া গেল, চারিদিক অন্ধকার। অন্ধকার মধ্য হইতে বলিল, "আমার হাতে পিস্তল আছে; আর এক পা অগ্রসর হইয়াছ কি—গুলি করিব"।

ডাক্তার বলিলেন, "ভবানী বাবু, একি পাগলামী হইতেছে?"

তখন সেই অন্ধকারবর্ত্তী ব্যক্তির স্বর অনেক শান্তভাব ধারণ করিল, "ও ডাক্তার, তুমি! সঙ্গে কাহারা?"

আমরা বুঝিলাম, ভবানী বাবু অন্ধকারের মধ্য হইতে আমাদিগকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি বলিলেন, "হাঁ হাঁ—ঠিক্ হইয়াছে। কোন কারণে আমাকে একটু সাবধানে থাকিতে হইয়াছে—কিছু মনে করিবেন না—আসুন—আসুন।"

তিনি আলো জ্বালিলেন। তখন আমরা তাঁহার অপরূপ রূপ দেখিলাম। খুব স্থূলকায়, মুখখানা যেন একটা বৃদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় পরিপক্ক ও ভীষণ,—দেখিলে ভয় হয় কি ঘৃণা হয়, সে বিচার করিবার তখন অবসর হইল না।

তাঁহার হাতে তখনও পিস্তল ছিল; আমরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে তিনি পিস্তলটা পকেটে রাখিলেন। রাখিয়া বলিলেন, "গোবিন্দরাম বাবু আসুন—বোধ হয়, ডাক্তারের নিকটে সব শুনিয়াছেন। আপনি ব্যতীত এ রহস্য কেহ ভেদ করিতে পারিবে না। আমাদের এখন কি করা উচিত, তাহারও পরামর্শ আপনি ব্যতীত আর কেহ দিতে পারিবে না। এই দেখুন, আমার অনুপস্থিতে আমার ঘরে অপর লোক প্রবেশ করিয়াছিল।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ডাক্তার বাবু আমাকে সব বলিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য, এই দুই জন লোক কে, আর কেনই বা তাহারা আপনার অনিষ্ট করিতে চাহে?"

ভবানীচরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কম্পিত স্বরে বলিলেন,"কেমন করিয়া বলিব, কে তাহারা ? আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"আপনি কি বলিতে চাহেন যে, আপনি তাহাদের চিনেন না ?"

ভবানীচরণ সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "ঐ সিন্দুকটা দেখিতেছেন—ওটা আমার। আমি বড়লোক নহি,—এই ডাক্তার সম্বন্ধে কিছু টাকা খরচ করিয়া যাহা কিছু দুই পয়সা রোজগার করিয়াছি—যাহা কিছু আমার আছে, সমস্তই ঐ সিন্দুকে রহিয়াছে ; সুতরাং যদি কোন লোক আমার ঘরে লুকাইয়া আসে, তাহা হইলে আমার মনে কি হয়, আপনি তাহা বেশ বুঝিতে পারেন।"

গোবিন্দরাম ভবানীচরণের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "দেখুন, যদি আমাকে সত্যকথা না বলেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে কি পরামর্শ দিব ?"

"আমি ত সবই আপনাকে বলিলাম।"

এই কথায় গোবিন্দরাম বিরক্তভাবে অখিলবাবুর দিকে ফিরিলেন। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ডাক্তারবাবু, তবে বিদায়।"

ভবানীচরণ ভীত হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি কি আমাকে কোন পরামর্শ দিবেন না ?"

"আমার পরামর্শ—আপনি সত্যকথা বলিতে শিখুন। এস ডাক্তার।"

এই বলিয়া গোবিন্দরাম তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিলেন।

পথে বহুক্ষণ তিনি আমার সহিত কোন কথা কহিলেন না—অনেক দূর আসিয়া তিনি মুখ খুলিলেন, "ডাক্তার বৃথা তোমার সময় নষ্ট করিলাম, কিন্তু এই ব্যাপারটার ভিতরে বিশেষ রহস্য আছে।"

আমি বলিলাম, "কই—আমি ত কিছুই বুঝিলাম না।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "দুইজন লোক যে এই ব্যাপারের মধ্যে আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বোধ হয়, বেশি লোকও থাকিতে পারে। ইহারা যে কোন-না-কোন উপায়ে এই ভবানীর কাছে গোপনে আসিতে চাহে, তাহাতেও আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যখন ডাক্তার এক জনের রোগ পরীক্ষা করিতেছিল, অপরে তখন এই ভবানীর ঘরে আসিয়াছিল।"

"আর মৃগীরোগ। সে-ও কি জাল ?"

"এ রোগ যত সহজে নকল করিতে পারা যায়,—তত আর কিছুই পারা যায় না—সময়ে সময়ে আমিও এ রোগ নকল করিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহাদের উদ্দেশ্য কি?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ঘটনা ক্রমে ভবানী দুই দিনই নিজের ঘরে ছিল না। যদি তাহাদের চুরির মতলব থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ তাহারা সেজন্য চেষ্টা পাইত,কিন্তু চুরির কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে বোঝা যায়, নবনীকেই তাহারা চায়। ভবানীর চোখ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, সে তাহার টাকার জন্য ভীত হয় নাই, সে তাহার নিজের প্রাণের ভয়ে এখন ভীত হইয়া পড়িয়াছে। দুইজন লোককে এরূপ ভয়ানক মর্ম্মান্তিক শত্রু করিয়াছে, অথচ তাহারা কে, সে জানে না—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই জন্য বুঝিতে হইবে, এই দুইজন লোককে ভবানী বেশ জানে। তবে কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সে তাহাদের নাম বলিতেছে না। খুব সম্ভব, কাল ভবানী কতক কতক কথা আমাদিগকে খুলিয়া বলিবে।"

আমি বলিলাম, "যদিও সম্ভব নহে, তবু ইহাও ত হইতে পারে যে, ডাক্তার এই দুইজন লোক সম্বন্ধে যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ডাক্তারই নিজের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভবানীর ঘরে গোপনে গিয়াছিল।"

গোবিন্দরাম মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ডাক্তার, প্রথমেই এ কথা আমার কর্ণে উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তাহা নহে; ডাক্তার যাহা বলিয়াছে, তাহা মিথ্যা বলে নাই। ঘরে জুতার দাগ ও ডাক্তারের জুতা দেখিয়া বুঝিলাম যে, দাগ ডাক্তারের পায়ের নহে, সুতরাং ডাক্তার সে ঘরে যায় নাই;—অপর কেহ গিয়াছিল। আজ এই পর্য্যন্ত। আমার বিশ্বাস, কাল সকালেই ইহারা আমাদের আবার ডাকিবে।"

৪

গোবিন্দরাম যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। তিনি প্রাতে আমাকে ঘুম হইতে তুলিলেন, বলিলেন, "ডাক্তার, এস, ডাক পড়িয়াছে।"

"কোথায়?"

"কাল যেখানে গিয়াছিলাম।"

"এত সকালে?"

"অখিল ডাক্তার গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছে।"

"নূতন খবর কিছু—"

"কিছু ভয়ানক বোধ হয়—এই দেখ।"

এই বলিয়া তিনি আমার হাতে এক টুকুরা কাগজ দিলেন। তাহাতে লিখিত;—

"শীঘ্র আসুন—ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "শীঘ্র এস—বিলম্ব করা উচিত নহে।"

আমরা তখনই রওনা হইলাম। অখিল ডাক্তারের বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী লাগিলে তিনি ছুটিয়া নিকটে আসিলেন, ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন, "ভয়ানক ব্যাপার!"

"কি ভয়ানক?"

"ভবানী বাবু আত্মহত্যা করিয়াছেন।"

শুনিয়া গোবিন্দরাম শিশ দিয়া উঠিলেন।

ডাক্তার বলিলেন, "রাত্রিতে তিনি গলায় দড়ী দিয়াছেন।"

আমরা নীরবে তাঁহার সঙ্গে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। ডাক্তার বলিলেন, "আমি কি করিব, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। পুলিশ আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করিয়াছে।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "কখন এই ব্যাপার দেখিলেন?"

ডাক্তার বলিলেন, "সকালে চাকর তাঁহার ঘরে তাঁহার চা লইয়া গিয়া দেখিল, তিনি গলায় দড়ী দিয়া ঝুলিতেছেন। ছাদ হইতে আলোর জন্য একটা মোটা দড়ী ঝুলিত। সিন্দুকের উপরে দাঁড়াইয়া তাহাই গলায় দিয়া তিনি সিন্দুক হইতে ঝুলিয়া পড়িয়াছেন।"

গোবিন্দরাম কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিলেন, "চলুন, দেখি।"

ভবানীর শয়ন-গৃহের দ্বারে আসিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম, তাহা বোধ হয় জীবনে আর কখনও দেখি নাই। তখনও ভবানীর দেহ দড়ীতে ঝুলিতেছে; তাহার মুখের যে ভয়াবহ ভাব হইয়াছে, তাহার বর্ণনা হয় না। তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, জিহ্বা লম্বিত, দেখিলে হৃদয় শিহরিয়া উঠে। গৃহমধ্যে একজন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার নোটবুকে কি লিখিয়া লইতেছেন।

তিনি গোবিন্দরামকে দেখিয়া বলিলেন, "আসুন—আসুন—গোবিন্দরাম বাবু যে—আসুন—আসুন!"

"আমি আসায় বিরক্ত হন নাই ত ?"

"বিরক্ত! বরং অনুরক্ত বলুন; আপনার সাহায্য পাইলে কে না সন্তুষ্ট হয় ?"

"কি ব্যাপারের পর এই ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা শুনিয়াছেন কি ?"

"যত দূর আমি বুঝিতেছি, তাহাতে বোধ হয়, লোকটা ভয়ে একেবারে বুদ্ধি হারাইয়াছিল। দেখুন, সে যে বিছানায় কাল রাত্রিতে ঘুমাইয়াছিল,—তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। শেষরাত্রিতেই প্রায়শঃ আত্মহত্যা হইয়া থাকে। আমার বিশ্বাস, রাত্রিশেষে উঠিয়া সে এই কাজ করিয়াছে।"

আমি বলিলাম, "দেহের অবস্থা দেখিলে বোধ হয়, ভবানীর অন্ততঃ পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে।"

আমার এই কথা শুনিয়া গোবিন্দরাম বলিলেন; "ইন্‌স্পেক্টার বাবু, গৃহমধ্যে কিছু লক্ষ্য করিয়াছেন কি ?"

"বিশেষ কিছু নয়—একটা হাতুড়ী ও গোটা-কতক স্ক্রু ঘরের মধ্যে পড়িয়াছিল। তবে লোকটা যে খুব চুরুট খাইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। চারিটা চুরুটের গোড়া ঘরের মধ্যে পাইয়াছি—এই দেখুন।"

"ভবানীর অন্য কোন চুরুট পাইয়াছেন ?"

"এই একটা তাহার জামার পকেটে পাইয়াছি।"

গোবিন্দরাম চুরুট নাকের কাছে ধরিয়া বলিলেন, "এ স্বতন্ত্র জাতের চুরুট —অন্য চারটি অন্য জাতীয়। দুইটা অন্য জন খাইয়াছে—আর দুইটা অপরে খাইয়াছে। এই চুরুটের গোড়ার দাঁতের দাগে ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। ইন্‌স্পেক্টর বাবু, এ আত্মহত্যা নহে—বিশেষ জোগাড় যন্ত্রের পর কেহ ভবানীকে খুন করিয়াছে।"

"অসম্ভব!"

"কিসে অসম্ভব ?"

"এরূপে কে তাহাকে খুন করিবে ?"

"সেটা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।"

"যদি তাহাই হয়, তবে তাহারা কিরূপে বাড়ীতে প্রবেশ করিল ?"

"সদর দরজা দিয়া।"

"সদর দরজা সকালে বন্ধ ছিল।"

"তাহারা বাহির হইয়া যাইবার পর বন্ধ করা হইয়াছে।"

"কিরূপে জানিলেন ?"

"তাহার চিহ্ন পাইয়াছি ;—প্রথম ঘরটা ভাল করিয়া দেখি। ইহাকে আর এরূপে ঝুলাইয়া রাখিয়া লাভ কি ?"

তখন আমরা সকলে ধরাধরি করিয়া ভবানীর গলার দড়ী কাটিয়া তাহাকে গৃহতলে নামাইয়া তাহার উপরে কাপড় ঢাকা দিলাম।

গোবিন্দরাম গৃহের চারিদিক্ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে গৃহতল পরীক্ষা শেষ করিয়া, ভবানীর গলার দড়ী দেখাইয়া বলিলেন, "এই দড়ী কোথা হইতে আসিল ?"

ডাক্তার খাটের নিম্ন হইতে কতকগুলি দড়ী টানিয়া বাহির করিয়া বলিলেন, "এই দড়ী হইতে কাটিয়া লইয়াছে, দেখিতেছি।"

"এত দড়ী এখানে কেন ?"

"ভবানী বাবু সর্ব্বদাই এত প্রাণের ভয় করিতেন যে, প্রাণরক্ষার জন্য নিজের বিছানার নীচে এই লম্বা দড়ী রাখিয়া দিয়াছিলেন ; বলিতেন, যদি বাড়ীতে আগুন লাগে, আর সিঁড়ী হইতে নামিবার উপায় না থাকে, তাহা হইলে এই দড়ী লাগাইয়া জানালা দিয়া পলাইবেন।"

গোবিন্দরাম চিন্তিতভাবে বলিলেন, "ইহাতে তাহাদের কাজের খুব সুবিধা হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। যাহা রাত্রিতে ঘটিয়াছে, তাহা এখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে। কেন তাহারা এই কাজ করিয়াছে, তাহাও বোধ হয়, দুই-এক দিনের মধ্যে বলিতে পারিব। দেখিতেছি, এইখানে ভবানীর একখানা ছবি রহিয়াছে ; ইন্‌স্পেক্টার বাবু, এখানা আমি লইয়া যাইতেছি ; ইহাতে আমার অনুসন্ধানের সুবিধা হইবে।"

অখিল উদ্বিগ্ন ভাবে বলিলেন, "কি ব্যাপার হইয়াছে, তাহা আপনিতো আমাদিগকে কিছুই বলিলেন না।"

গোবিন্দরাম গম্ভীরভাবে বলিলেন, "যাহা ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। এই ব্যাপারে তিন জন লোক ছিল, সেই বৃদ্ধ—সেই যুবক,—আপনার মৃগী-রোগী আর তাহার পুত্র, আর একজন—সে কে এখন ঠিক বলিতে পারিতেছি না। প্রথম দুই জনকে ডাক্তার আপনি দেখিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের চেহারার বর্ণনা পাইয়াছি—তাহাদের চিনিতে কষ্ট হইবে না, তাহার পর এই বাড়ীর কোন লোক কাল রাত্রিতে তাহাদের দরজা খুলিয়া দিয়াছিল। তাহারা কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া গেলে সেই লোকই

আবার ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আমার বোধ হয়, আপনার ডাক্তারের ছোকরা চাকরকে গ্রেপ্তার করিতে বিলম্ব করা উচিত নহে।"

অখিল ডাক্তার বলিলেন, "সকাল হইতে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।"

গোবিন্দরাম ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ডাক্তার বাবু, সে সম্প্রতি আপনার বাড়ীতে আসিয়াছে বলিয়াছিলেন না?"

"হাঁ এই মাসখানেক মাত্র আছে।"

"সে-ই এই ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সে দরজা খুলিয়া দিলে, অপর দুই জন লোক নিঃশব্দে গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তখন পা টিপিয়া টিপিয়া তিন জনে উপরে উঠিতে থাকে; বয়সে বড় লোকটি সর্ব্বাগ্রে, তাহার পর যুবক, তাহার পর সর্ব্বশেষে এই চাকর।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, "ইহা কিসে জানিলে?"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "পায়ের দাগে। আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই যে সত্য সত্য ঘটিয়াছিল, তাহাতে আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই। তাহারা তিন জনে নিঃশব্দে ভবানীর শয়ন-গৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিতে পায়, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। তাহারা জানিত, ভবানী কখনই দরজা খুলিয়া রাখিয়া ঘুমাইবে না, সে জন্য বাহির হইতে যাহাতে দরজা খুলিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিল। এই দেখ, ছিঁচকের দাগ রহিয়াছে—দরজার ফাঁক দিয়া ছিঁচকে লাগাইয়া হুড়্‌কো খুলিয়া ফেলিয়াছিল।

"তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া নিশ্চয়ই তাহারা প্রথমেই ভবানীর মুখ বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল—হয়ত ভবানী ঘুমাইয়াছিল; কিম্বা হয়তো জাগিয়াও ভয়ে এমনই নিস্পন্দ হইয়াছিল যে, সে আদৌ চীৎকার করিতে পারে নাই। যাহাই হউক, ডাক্তার বাবু তাহার কোন চীৎকার শুনিতে পান নাই।

"তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া, আমার বোধ হয়, তখন বেশ একটা কি পরামর্শ চলিয়াছিল। সম্ভবতঃ কতকটা বিচারের মত কিছু হইয়াছিল। ইহা যে বহুক্ষণ ধরিয়া হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ চুরুটের গোড়া; দুই জনের প্রত্যেকে দুইটা করিয়া চুরুট শেষ করিয়াছিল; ইহাতেই স্পষ্টই জানা যাই-তেছে, অনেকক্ষণ ধরিয়া এই পরামর্শ বা বিচার কার্য্য চলিয়াছিল। বৃদ্ধ

ঐ চেয়ারখানায় বসিয়াছিল, যুবক এই জানালার কাছে বসিয়াছিল, এই জানালার ধারে সে চুরুটের ছাই ফেলিয়াছিল, এখনও ছাই এখানে রহিয়াছে। চাকরটা তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে এদিক্ ওদিক্ করিতেছিল। ভবানী বিছানার উপরে সিধা হইয়া বসিয়াছিল—কিন্তু এ কথাটা আমি ঠিক নিশ্চিত বলিতে পারি না।

"যাহাই হউক, তাহাদের পরামর্শ বা বিচার শেষ হইলে তাহারা ভবানীর খাটের নীচে হইতে দড়ী টানিয়া বাহির করিয়া তাহা হইতে খানিকটা কাটিয়া লইয়া ছাদ হইতে লণ্ঠনের যে দড়ী ঝুলিতেছিল, তাহাতে শক্ত করিয়া বাঁধিয়া দেয়। তাহার পর ভবানীকে তিন জনে টানিয়া আনিয়া এই দড়ীতে তাহার ফাঁসী দিয়াছিল।

"এই খুনের বন্দোবস্ত যে পূর্ব্ব হইতে তাহারা করিয়াছিল, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহারা কোনরূপ কপিকল সঙ্গে আনিয়াছিল কিন্তু ছাদ হইতে দড়ী ঝুলিতেছে দেখিয়া তাহাদের আর বেশী কষ্ট পাইতে হয় নাই। এই হুক্ ও হাতুড়ীও সেই উদ্দেশ্যে আনিয়াছিল। কার্য্য শেষ করিয়া তাহারা তাড়াতাড়ি চলিয়া গিয়াছিল; এ সকল লইয়া যাইতে মনে ছিল না।

"তাহারা নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলে, ছোকরা ভৃত্য ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। আজ সকালে ডাক্তার বাবু উঠিলে সে সুবিধা মত পলাইয়াছে। বলা বাহুল্য, সে এই দুই জনের লোক; খুনীদের কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্যই ডাক্তার বাবুর বাড়ী চাকরী লইয়াছিল।"

আমরা সকলে অতি মনোনিবেশ করিয়া তাহার কথা শুনিতেছিলাম। গৃহমধ্যে তিনি যে সকল সামান্য চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া এই সকল সিদ্ধান্তে আসিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেও আমরা খুব ভাল বুঝিতে পারিলাম না। তিনি যে ভাবে গত রাত্রির ঘটনা বর্ণনা করিলেন, তাহাতে বোধ হয়, যেন তিনি কাল এখানে সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন।

ইন্‌স্পেক্টর আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না। তিনি ডাক্তার মহাশয়ের সেই ভৃত্যের অনুসন্ধানে ছুটিলেন। আমি ও গোবিন্দরাম বাড়ীর দিকে চলিলাম।

* * * * *

আহারাদির পর গোবিন্দরাম বলিলেন, "আমি একটু কাজে বাহিরে

যাইতেছি, বেলা তিনটার সময়ে ফিরিব। ইন্‌স্পেক্টর ও অখিল ডাক্তার দুই জনেরই আসিবার কথা আছে। আমার ফিরিতে যদি একটু বিলম্ব হয়, তাহাদিগকে বসাইয়া রাখিও। বোধ হয়, এই ব্যাপারে আর যেটুকু রহস্য বাকী আছে, তাহাও সেই সময় বলিতে পারিব।

৫

ইন্‌স্পেক্টর ও ডাক্তার ঠিক তিনটার সময়ে আসিলেন; কিন্তু গোবিন্দরাম তখনও ফিরেন নাই। বেলা চারিটার পরে তিনি ফিরিলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া আমি তখনই বুঝিলাম যে, তাহার কার্য্যোদ্ধার হইয়াছে।

আসিয়াই তিনি বলিলেন "ইন্‌স্পেক্টর বাবু,কোন খবর ?"

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "ছোকরা ধরা পড়িয়াছে।"

গোবিন্দরাম উৎফুল্ল. কণ্ঠে বলিলেন, "বেস্ বেস্—আমিও বাকী লোক দুইটাকে পাইয়াছি।"

আমরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম, "লোক দুইটা ধরা পড়িয়াছে ? কি আশ্চর্য্য !"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "ধরা ঠিক পড়ে নাই, তবে তাহারা কে, তাহা জানিতে পারিয়াছি। এই ভবানী পুলিসের খুব পরিচিত লোক—তাহার হত্যাকারী দুইজনও পুলিশের অবিদিত নহে। ভবানীর প্রকৃত নাম গোবর্দ্ধন—অপর দুই জনের নাম গোবিন্দ ও গৌর, তিন'গ'কার।"

ইন্‌স্পেক্টর বলিয়া উঠিলেন, "তালতলার সেই চোরের দল !"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "হাঁ—তাহারাই।"

ইন্‌স্পেক্টর পরিহাস করিয়া বলিলেন, "ছিঃ, গোবিন্দরাম বাবু ! আপনার মত লোকের নামেও লোক চোর হয় ?"

গোবিন্দরাম হাসিয়া বলিলেন, "হয় বই কি ! তবে ইন্‌স্পেক্টর বাবু, আপনারা নাম আর রূপ যতখানি সত্য মনে করেন,আমি তা আর পারি না ; সংসারের নানা বিচিত্র ঘটনার মধ্যে পড়িয়া আমার সে ভাব একেবারে উল্টে গেছে। আমিই এক গোবিন্দ—এক গোবিন্দ মূর্ত্তিতে চুরি কর্‌ছি,আবার আর এক গোবিন্দ মূর্ত্তিতে চোর-ধরার বাহাদুরী নিচ্ছি, এই না সংসার ! কিন্তু, কেউ চুরিও কর্‌ছে না—আর কেউ কাকেও ধর্‌ছে না, একটা খেয়াল দেখা যাচ্ছে মাত্র; নতুবা চোর গোবিন্দও মিথ্যা—আর এই চোর ধরা সাধু

গোবিন্দও মিথ্যা; কিন্তু আর একটি গোবিন্দ আছে—সেই মূলাধার। সেইটাকেই ধরাই শক্ত—খেল্‌তে আসা গেছে, খেলে যাওয়া যাক্—কি বল ডাক্তার!"

ইন্‌স্পেক্টর হাসিয়া বলিলেন,"সব মিথ্যা হোক—আপত্তি নাই, কিন্তু পুরস্কারের যে উজ্জ্বল রজত-মুদ্রাগুলি করতলগত হয়, তা'ত কিছুতেই মিথ্যা ঠেকে না, সেগুলা খুব ভারি নিরেট সত্য।"

গোবিন্দরাম সহাস্য মুখে বলিলেন, খুব সত্য—যেমন স্বপ্নে একটা টাকা হারিয়ে গেলে, যে মুখো টাকা হারিয়েছিল, ঠিক সেই রাজার মুখ, কি রাণীর মুখ টাকাটাই সেই স্বপ্নে পাওয়া যায়; এমন কি যদি তাতে একটু কোঁড়া-ঝালার দাগ থাকে, সে দাগটুকুরও অন্যথা হয় না—একেবারে হুব-হু!

ইন্‌স্পেক্টর বলিলেন, "তবে এত বড় প্রকাণ্ড জগৎটা একটা স্বপ্ন নাকি!"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "বেবাক্—বেবাক্—প্রকাণ্ড জগৎ—প্রকাণ্ড স্বপ্ন। এই সব ব্যাপার সত্য হলেই গিয়েছি আর কি—একেবারে কসাইয়ের রাজ্য! গোবর্দ্ধনের দেহটি কেমন দড়ীতে ঝুল্‌ছিল, বল দেখি? কার সাধ্য বলে মিথ্যা!"

"ইন্‌স্পেক্টর চকিত হইয়া বলিলেন, তাহা হইলে এই ভবানী হইল সেই গোবর্দ্ধন।"

"নিশ্চয়ই।"

"এখন সবই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে!"

আমি ও ডাক্তার অখিলচন্দ্র বিস্মিত ভাবে তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম; তাঁহারা যে কি কথা কহিতেছেন, তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

ইহা দেখিয়া গোবিন্দরাম আমাকে বলিলেন, "ডাক্তার, তুমি নিশ্চয়ই তালতলার বিখ্যাত তস্কর-পুঙ্গবদের কথা শুনিয়াছ। ইহারা যে কত বড় বড় চুরি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেক কষ্টে পুলিশ অবশেষে ইহাদিগকে ধৃত করিতে সক্ষম হয়।

"এই দলে পাঁচ জন লোক ছিল; তিন জন এখনও জেলে আছে, কেবল গোবিন্দ ও গৌর সম্প্রতি জেল হইতে খালাস পাইয়াছে। গোবর্দ্ধন ওরফে আমাদের এই ভবানী সরকারী সাক্ষী হয়। তাহারই সাক্ষ্যে গোবিন্দ

গৌর প্রভৃতি জেলে যায়; নতুবা তাহাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা পুলিশের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইত।

"যাহা হউক, এই দুই জন জেল হইতে বাহির হইয়াই তাহাদের বিশ্বাসঘাতক সঙ্গীর সন্ধানে নিযুক্ত হয়। কিরূপে তাহারা ভবানীর সন্ধান পাইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে তাহারা তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য পরে কি কি করিয়াছিল, তাহা আমরা সমস্তই জানিতে পারিয়াছি। অখিল বাবু, আর কিছু আপনার জানিবার আছে?"

অখিলচন্দ্র বলিলেন, "না—আপনি সমস্তই পরিষ্কার রূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বোধ হয়, গোবিন্দ আর গৌর জেল হইতে বাহির হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়াই ভবানী এত ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল।"

গোবিন্দরাম বলিলেন, "নিশ্চয়ই—চুরির ভয় সম্পূর্ণ বাজে কথা, আপনার চক্ষে ধূলি দিবার জন্য বলিয়া ছিল। স্বয়ং সে কে, পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই জন্য সে আপনাকে কিছুই বলে নাই। সেদিন আমাকেও কিছু বলিল না, বলিলে হয় ত হতভাগ্য এযাত্রা রক্ষা পাইত। কিন্তু সাহস করিয়া নিজ পরিচয় কাহাকেও দিতে পারে নাই; তাহার ফল যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমরা সকলেই দেখিলাম। যাহাই হউক, ইন্‌স্পেক্টর বাবু, সে চোরই হউক, আর ডাকাতই হউক, তাহাকে হত্যা করিবার অধিকার কাহারও নাই। আমার বিশ্বাস, আপনারা এইবার তাহার হত্যাকারীদিগকে ধৃত করিতে সক্ষম হইবেন। আর তাহারাও তাহাদের উপযুক্ত দণ্ড পাইবে।"

আমাদের ডাক্তার বাবু সম্বন্ধে যে অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছিল, আমি সংক্ষেপে তাহারই বিবরণ বিবৃত করিলাম। ভবানীর সিন্দুক খোলা হইলে দেখা গেল, ডাক্তার বাবু তাহাকে যত টাকা উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই সঞ্চিত রহিয়াছে; ভবানী যৎসামান্য ব্যয় করিয়াছে মাত্র। এ অর্থ সমস্তই ডাক্তারবাবুর উপার্জ্জিত, সে জন্য গভর্ণমেণ্টের হুকুমে সমস্তই তিনি পাইলেন। এখন ডাক্তার অখিলচন্দ্র বড়লোক এবং আমাদের বিশেষ বন্ধু।

সেইদিন হইতে গোবিন্দ ও গৌরের কোন সন্ধান হইল না। এই সময়ে বর্ম্মায় একখানা জাহাজ ডুবিয়া যায়,—সেই জাহাজের কোন লোকই রক্ষা পায় নাই। পুলিশ অনুমান করেন যে, গোবিন্দ ও গৌর এই জাহাজে এ

দেশ হইতে পলাইতেছিল, অন্যান্যের সহিত সমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছে। ইহা কতদূর সত্য, নিশ্চিত বলিবার উপায় নাই।

সেই ছোকরা চাকরের বিরুদ্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ না পাওয়ায় সে অব্যাহতি পাইল।

শ্রীপাঁচকড়ি দে।

সমাপ্ত।

সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা এলো ঘনিয়ে ওই
আঁধার আলো মাখা।
রবি ডুব্‌লো সিন্ধু-নীরে
যায় না তাই আর দেখা॥
পাখীরা সব দলে দলে
যাচ্ছে দ্রুত নীড়ে।
রাখাল যাচ্ছে গরু নিয়ে
বাড়ীর দিকে ফিরে॥
ছুট্‌ছে নদী আপন মনে
মিশতে সাগর-সনে।
কিবা মধুর যাচ্ছে শুনা
কল্‌ কল্‌ কল্‌ তানে॥
আকাশ পটে উঠ্‌ছে বিধু
হাস্‌ছে মধুর হাসি।
চারি ধারে উঠ্‌ছে ফুটি
তারা রাশি রাশি॥
ঢাল্‌ছে জ্যোৎস্না মধুর ধার
ধর্‌ছে মোহন বেশ।
জীবনেরও একটী দৃশ্য
হয়ে গেল শেষ॥

ডাক্তার বাবু।

কলিকাতার সহরে রোগও যত, ডাক্তারও তত। পাঁচবৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়া,—রাশি রাশি বই কিনিয়া—অর্থব্যয় করিয়া—অবিচারে মড়া ঘাঁটিয়া—রাত্রি জাগরণ করিয়া হাসপাতালস্থ রোগীদিগকে সেবা করিয়া শেষে যথাসময়ে এল্‌-এম্‌-এস্‌ কিম্বা এম্‌-বি অথবা এম্‌-ডি খেতাব লইয়া বৎসর বৎসর পাশ করা ডাক্তার যে কত বাড়িতেছে, তাহার তো হিসাবই নাই। কিন্তু তাহা ছাড়া ভূঁইফোঁড় ডাক্তারেরও ছড়াছড়ি। হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা দেশে প্রচলিত হওয়ার পর হইতে—অলিতে গলিতে আজ কাল ডাক্তার বাবু। অন্য কোন উপায়ে রোজগার পাতির তেমন সুবিধা না হইলেই আজকাল প্রায়ই দেখিতে পাই, লোকে ডাক্তার বাবু হইয়া পড়েন। সোজা উপায়! টাকা তিনেক খরচ করিয়া একখানি "গৃহ-চিকিৎসক" নামক কেতাব,—টাকা ২৫৲ দিয়া এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ,—পাঁচ সিকে খরচে একখানি রং চংএ কাঠের ট্যাবলেট্‌ নিজবাটীর সদর দ্বারের বামদিকের দেয়ালে আঁটা, প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিনামূল্যে রোগিগণকে ঔষধ দিবার ব্যবস্থা করিয়া একটি ছোটখাটো রকমের বিজ্ঞাপন! ব্যস্‌—তাহার পসার দেখে কে?

আমাদের পাড়ার দয়ারাম ঘোষ আজকাল ডাক্তার হইয়াছেন! না হইয়াই বা করেন কি? দয়ারাম হেন ব্যবসায় নাই যাহা করেন নাই;—তাহার ফলে পৈতৃক ভিটাটি খোয়াইয়াছেন। কন্‌ট্রাক্‌টারি, কোম্পানী কাগজের দালালী, তাহাও দিনকতক করিয়াছেন; দেখিলেন তেমন সুবিধা রকমের নয়। লেখাপড়া তেমন শেখেন নাই, ইংরাজি ইস্কুলের সিক্‌স্‌থ্‌ ক্ল্যাশ্‌ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। চাকুরি বাকুরিও করিয়া দিবার তেমন মুরুব্বি নাই। কোন গতিকে কারেন্সি আফিসে ঢুকিয়া বার কতক টাকা গণিয়াছিলেন। শেষে মতলব করিলেন ডাক্তার হইব। মতলব করার সঙ্গে সঙ্গেই কাজে পরিণতি! দয়ারাম আমাদের বাড়ীর সম্মুখে মিত্রদের দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়া সাজসরঞ্জাম করিয়া একেবারে "ডাক্তার বাবু" হইয়া বসিলেন।

বিনা পয়সায় যদি "বিষ" দিব বলিয়া প্রচার করা যায়,—তাহা হইলেও দলে দলে লোক তাহার প্রার্থী হইয়া আসে। দয়ারামের বাহিরের ঘরে

(অর্থাৎ যেটাকে ডিস্‌পেন্‌সারি বলেন)—সকাল সন্ধ্যায় রুগ্ন আবাল বৃদ্ধ-বনিতা খালি শিশি হস্তে আসিয়া জমায়েৎ হয়। ঘরে একখানি পুরাতন ছোট টেবিল আছে,—একখানি ঐ দরেরই কেদারা আছে—(সে খানিতে ডাক্তার বাবু নিজে বসেন),—একখানি বেন্‌চ্‌ও আছে (কষ্টে সৃষ্টে ঠেশা-ঠেশি করিয়া আন্দাজ পাঁচ ছয় জন রোগী বসিতে পারে)!, তাহার উপর একটা কাঁচভাঙ্গা আল্‌মারি—কতকগুলি খালি শিশি অভ্যন্তরে ধারণ করিয়া মাকড়সার জাল এবং ধূলারাশিতে সুশোভিত হইয়া আছে, দেখিলে বোধ হয়, সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ দুর্ভিক্ষ যেন দণ্ডায়মান।

মধ্যে মধ্যে নিকিরিপাড়া ডুলেপাড়া হইতে দয়ারাম (call) "কল" পান। দর্শনী শুনেছি কেহ কেহ নগদ অষ্টগণ্ডা পয়সা পর্য্যন্ত দিয়াছে। দয়ারাম ব্যাজার কিছুতেই নহেন; চারটি পয়সা দীনু ময়রা সে দিন ডাক্তার বাবুকে দিতে গেল,—তিনি "না" বলিলেন না। বলেন "পয়সা লক্ষ্মী,—হাতে আসিলে ছাড়িতে নাই!"

দয়ারামের "ডাক্তারি-বেশ" বড় চটকদার। একটী বহু পুরাতন "সপ্ততালি বিশিষ্ট" কাশ্মিরী কাপড়ের পেণ্টুলুন,—অঙ্গে একটি আল্‌পাকার কোট; সেটী কতকালের তাহা জানিনা,—তবে তাহার কাল রং উঠিয়া গিয়া "কটা" রং বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভিতরে একটি পিরাণ, দৈবাৎ তাহার অবস্থা একদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছিলাম। হাতের কফ্‌টি এবং গলার "কলার"টি আছে—বুকের একহারা পটী প্লেট আছে;—পিরাণের অন্যস্থানে কাপড় নাই বলিলেও চলে। যে কাপড়টুকু আছে—তাহাতে কোন প্রকারে পিরাণের অস্তিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কখনো যে সে পিরাণ রজকালয়ে পরি-ভ্রমণ করিয়াছে—এমন তো বিশ্বাস হয় না। কারণ, কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই ঘামের জলে এবং অঙ্গের তৈলে তাহা সিক্ত! এই পিরাণের দুর্গন্ধে ডাক্তার বাবুর নিকট রোগ আরোগ্যের আশায় সমাগত রোগীর রোগবৃদ্ধি হয় বলিয়া পাড়ার লোকের ধারণা! পায়ে কাল চাম্‌ড়ার জুতা—গোড়ালী পর্য্যন্ত ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। বুরুশ করা অভাবে—আল্‌পাকার কোটের ন্যায় তাহারও দশা দাঁড়াইয়াছে। মাথায় একটি ধুচুনী আকারের বৃহৎ টুপী—রৌদ্র ও বৃষ্টিতে ছাতার কাজ করিয়া থাকে। পদযুগলে মোজা আছে—কিন্তু হায়! তাহার তলদেশে আর কোন রকম আচ্ছাদন নাই!

ডাক্তার বাবুকে পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা "দুর্ভিক্ষ" বলিয়া নামকরণ করি-

য়াছে। ভদ্রলোকে বড় একটা তাঁহার কাছে ঘেঁস দেন না ;—তাহার কারণও আছে। কেহ যদি সামান্য একটু পেটের অসুখ হইয়াছে বলিয়া ঔষধ অথবা ব্যবস্থা আনিতে যায় বা তাঁহাকে ডাকেন—তিনি একবার নাড়ীতে হাত দিয়াই বলেন "ইস্—এ যে সাংঘাতিক কলেরার টাইপ—বড় শক্ত ব্যায়রাম!" সর্দ্দির দরুণ একটু গা গরম হইয়াছে—ডাক্তার দয়ারাম পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"তাইতো,—ডবল্ নিউমোনিয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে!" কেহ কেহ আসিয়া বলিল—"মশাই—আপনার রোগী—মারা গিয়াছে,—খাট আনিতে চলিলাম!" ডাক্তার বাবু বলিলেন—"আরে ছি-ছি—রোগী মরেছে কে ব'ল্লে? ভেতরে ভেতরে প্রাণ আছে! ঐ রকম অসাড় হয়ে ঘুমুবে ব'লে একটা নতুন রকমের ওষুধ দিইছি। চল-চল আর একটা ওষুধের ব্যবস্থা করি।" এই বলিয়া দয়ারাম আবার রোগীর নিকটে ছুটিলেন। মূর্খ—গরীব লোক,—ভাবিল—"হয়তো বা রোগী বেঁচে আছে—যখন ডাক্তার বাবু বল্ছেন!" ডাক্তার বাবু তখন মড়া লইয়া নাড়িতে চাড়িতে আরম্ভ করিলেন ; এ ওষুধ খাওয়ান—ও ওষুধ খাওয়ান! কিছুতেই রোগীর সাড়াশব্দ পান না। সকলে বলে—"মশাই আর কি নাড়ছেন—ও হ'য়ে গেছে! দিন্—দিন্—লাস ছেড়ে দিন্—সৎকার করে আসি! আপনার জন্যে কি ঘরে মড়া পচাব?" ডাক্তার বাবুও মড়া ছাড়িবেন না—বাড়ীর লোকেরাও আর ডাক্তারী করিতে দিবেন না! সে মহা হুলস্থুল ব্যাপার!

আমি মাঝে মাঝে ডিস্পেন্সারিতে বসিয়া ডাক্তার বাবুর রকম সকম দেখি। নিত্য নূতন কাণ্ড! ডাক্তার একা সমস্ত কাজকর্ম্ম করিয়া উঠিতে পারেন না বলিয়া একটি চাকর—একটি কম্পাউণ্ডার রাখিয়াছেন। সে দুটিও অদ্ভুত জীব। চাকরটির নাম "ভোত্তু"—কম্পাউণ্ডার সদ্গোপ-নন্দন,—নাম "মধু"। বোধ হয় এ দুটি প্রাণীকে ত্রিসংসারে আর কেহই স্থান দান করে নাই ;—তাই প্রাণের দায়ে এবং পেটের দায়ে ডাক্তারপ্রবর দয়ারাম ঘোষের ডিস্পেন্সারিতে আশ্রয় লইয়াছে।

ডাক্তারীতে পসার জমাইয়াও দয়ারাম সন্তুষ্ট নহেন—আবার একটা "কেশ তৈল" এবং একটি পেটেণ্ট ঔষধ বাহির করিয়াছেন। মধু তাহার তদারক করে। আমার বৈঠকখানার সম্মুখেই ডাক্তারের ডিস্পেন্সারি ; সুতরাং দিবারাত্রই শুনি—ডাক্তারে,—কম্পাউণ্ডারে—চাকরে বকাবকি—

মারামারি—ধরাধরি হইতেছে! হাড় জ্বালাতন। এক এক সময় ডিস্‌পেন্‌-সারির কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া একটা খুব আনন্দ উপভোগ করা যায়; হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। রোজ রোজ যে কত মজা দেখিতে পাই—তাহা লিপিবদ্ধ করিতে গেলে একখানি অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত হইয়া পড়ে। এক দিনের একটা মজার ঘটনা শুনুন।

সকাল বেলা রোগী কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। ডিস্‌পেন্‌সারিতে কেবল মধু কম্‌পাউণ্ডার জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে, আর ভোত্‌তু চাকর ঝাড়ু হস্তে ডিস্‌পেন্‌সারি ঝাড়ু দিতেছে।

মধু জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁরে ভোত্‌তু!"

ভাঙ্গা আওয়াজে ভোত্‌তু একটা—হাই তুলিয়া বলিল "কে-য়া!"

"শিশি বোতল গুলো ধুয়ে রেখেছিস্?"

"হাঁ—রাখ্‌খা!"

"আরে মর্! রাখ্‌-খা তো জানি! কাঁহা রাখ্‌খা?"

"উও আস্তাবল্‌মে!"

মধু অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আস্তাবল্‌মে কিরে? কার আস্তাবলে?"

"আরে উও মুকুজি বাবুকো আস্তাবল্‌মে!"

"অ্যাঁ—সে কিরে? মুখুয্যেদের আস্তাবলে আমাদের শিশি বোতল রাখ্‌লি কি বল্?"

ভোত্‌তু তদপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইয়া বলিল—"তা হাম্ ক্যা জানে? তোম্‌তো বিশ দফে বোলা আস্তাবল্‌মে ধো-কর রাখ্‌ দে!"

"তোর মাথা আর মুণ্ডু বোলা। ব্যাটা! কথা যদি বুঝ্‌তে পারিস্‌না—তো—ভাল ক'রে শুনিস্‌নি কেন? আমি বলেছিলুম্—"আস্তে আস্তে ভাল করে ধুয়ে রাখ্‌!"

আমি বুঝিলাম—গলদ কোন খানে। "আস্তে আস্তে ভাল করে ধুয়ে" রাখিতে বলাতে—বুদ্ধিমান্ ভৃত্য সে গুলি একজনদের আস্তাবলে রাখিয়া আসিয়াছে। শুনিয়া মধুতো ভয়েই অস্থির। তাড়াতাড়ি বলিল—"যা-যা শিশি বোতল গুলো চট্ করে নিয়ে আয়—যা-যা!" বলিয়া যেমন ডাক্তার বাবুর কেদারায় বসিতে যাইবে—অমনি ধপাস্ করিয়া কেদারাশুদ্ধ মাটীতে পড়িয়া গড়াগড়ী খাইতে লাগিল।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া গা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল—"উহু-হু—ওরে ব্যাটা—কেদারার একটা পায়া ভেঙ্গে রেখেছিস্?"

ভোত্তু বলিল—"হাম্ ক্যা জানে? তোম্ আপনা খোসিসে বৈঠা,—আপ্সে গির্ পড়া!"

"তাতো পড়া! কেদারার পায়া ভাঙ্গলো কি ক'রে? কাল রাত্রে ডাক্তার বাবু এসে বসেছিলেন—তখন তো আস্ত ছিল!"

"আরে বাবু—কাল্ রাত্মে একঠো চুয়া ঘরমে ঘুসা; কুটুর কাটুর সব কাট্নে লাগা। হাম্ ইঠো লেকে—ওস্কো পর্ যব জোরসে ফেকা,—ব্যস্ চুয়া শালা ভাগ্ গিয়া,—আউর ইস্কা একঠো পাঁও ভি টুটা!"

ভোত্তুর কথা শুনিয়া আমি তো হাসিয়া আকুল; কিন্তু মধু একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। বলিল—"ব্যাটা! তুমি চেয়ার ছুঁড়ে ইঁদুর মার্ত্তে গিয়েছিলে? মশা মার্ত্তে কামান? এতক্ষণ আমাকে বলিস্নে কেন? যেমন করে হোক্ মেরামত করে রাখ্তুম। আজ ডাক্তার বাবু দেখ্লে একেবারে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ক'রবে! সে পায়াটা কোথায়?"

ভোত্তু দন্তপাতি বিস্তার পূর্ব্বক বলিল—"আরে উস্তো হম্ চুল্লীমে ধর্ দেকে রোটী বনায়া!"

মধু আর রাগ সামলাইতে পারিল না;—একেবারে আস্তীন গুটাইয়া ভোত্তুকে কীচক বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। ভোত্তু ঝাড়ুশুদ্ধ হাত তুলিয়া আত্মরক্ষার ছলে প্রকারান্তরে মধুকে প্রাতঃকালে ঝাঁটা প্রহার করিতে লাগিল। অকস্মাৎ এই সময়ে ডাক্তার বাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মধু তৎক্ষণাৎ দ্বন্দ্বে ক্ষান্ত দিয়া ভোত্তুকে বলিল—"ওরে-ওরে—ভোত্তু! যা করিছিস্-করিছিস্! জল্দি এক কাজ কর্ দিকি! তুই এই টেবিলের তলায় বোস্! ভাঙ্গা দিক্টা হাত দিয়ে এই—এমনি ক'রে ধরে তুলে থাক্!" ভোত্তু গম্ভীরভাবে বলিল—"আরে হম্ না সেক্বে!"

"ওরে—বোস্ বোস্ ব্যাটা! নইলে তোরও চাক্রী যাবে—আমারও চাক্রী যাবে। উপরন্তু দুজনকে লাঠিপেটা খেতে হবে! ডাক্তার বাবু বেশীক্ষণ বস্বেন না! বোস্-বোস্!" বলিয়া মধু তাড়াতাড়ি ভোত্তুকে টেবিলের তলায় বসাইয়া ভাঙ্গা কেদারাখানা Temporary মেরামত করিল।

মধুর উপস্থিত বুদ্ধির বহর দেখিয়া— আমিতো অবাক্!

এমন সময় শুম্ভ-নিশুম্ভ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ডাক্তার দয়ারাম ঘোষ ডিস্‌পেন্‌সারিতে প্রবেশ করিলেন। মধুকে অতি কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ছোক্‌রা কি ক'চ্ছিলে? সাড়া দিচ্ছিলে না কেন?"

মধু ভয়ে একেবারে জড়শড় হইয়া কাতর স্বরে বলিল--"আজ্ঞে—আজ্ঞে—"

ধমক্ দিয়া ডাক্তার বলিলেন—"Hold your আজ্ঞে আজ্ঞে! চুরী ক'চ্ছিলে বুঝি?"

মধু অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল; পরে ধীরে ধীরে বলিল—"আজ্ঞে চুরী কর্ব্বার এখানে কি আছে ধর্ম্মাবতার?"

"নেই? কিছু নেই? আমি দয়ারাম ঘোষ—আমাকে তুমি চুরী অচ্চুরী শেখাবে? ওষুধ চুরী কচ্ছিলে না?"

মধু বলিল—"আজ্ঞে—ওষুধ চুরি কোরে কোথা রাখ্‌বো হুজুর? এই দেখুন—পকেট দেখুন—কাপড় চোপড় দেখুন—আমার বাক্‌স প্যাঁট্‌রা সব দেখুন!"

সন্দিগ্ধ দয়ারাম তখন সে বেচারীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্ত পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। কোথাও কিছু না পাইয়া শেষে বলিলেন—"হাঁ কর, হাই দাও, পেট দেখি! পেটে পূরে নিয়ে যেতে পার তাওতো জানি!"

মধু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল "আজ্ঞে—পেটে পুরে নিয়ে যাব কি বাবু?"

"যাওয়া যায় না? বটে? আমি যখন করেন্সি আফিসে টাকাগোণার ডিপার্টমেণ্টে চাক্‌রি ক'র্ত্তুম,--তখন রোজ ৮টা ১০ টা সিকি দোয়ানী পেটে পূরে বাড়ীতে নিয়ে আস্‌তুম! আর এতো জলের মতন ওষুধ!"

পাঠক! ডাক্তারের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়টা বুঝিতেছেন? মধু বেচারীকে কিছুক্ষণ এইরূপে নির্য্যাতন ভোগ করাইয়া দয়ারাম তখন নিজ কেদারায় বসিয়া পড়িলেন। সেই তিন পায়ার কেদারা!—ভাঙ্গা দিকে নিরীহ ভৃত্যটী হাত দিয়া ধরিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে।

দয়ারাম মধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ সকালে রোগী একটাও আসেনি?"

মধু বলিল "আজ্ঞে,—ওষুধের দাম চাইতেই কাল থেকে আর বড় কেউ আস্‌ছে না!"

টেবিলে একটী ছোটখাটো মুষ্ট্যাঘাত করিয়া দয়ারাম রুক্ষস্বরে বলিলেন—

"তবে তুমি আমার মাথামুণ্ড কি Canvass কচ্ছ? বলিয়া যেমন একটু জোরে অঙ্গ চালনা করিলেন অম্‌নি কেদারাশুদ্ধ ভূমিতলে পপাত। টেবিলের তলা হইতে তাড়াতাড়ী ভোত্‌তু বাহির হইয়া মধুর সাহায্যে ডাক্তার বাবুকে ধরিয়া তুলিতে গেল। দয়ারাম আপনি উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "এঁ্যা—এ সব কি ব্যাপার? আমাকে খুন কর্ব্বার ষড়যন্ত্র" বলিয়া কম্‌পাউণ্ডার ও ভৃত্যকে দুইহাতে চড়-চাপড়-কীল ঘুসী লাগাইতে আরম্ভ করিলেন।

প্রহার এইভাবেই অনন্তকাল পর্য্যন্ত বোধ হয় চলিত; সৌভাগ্যক্রমে এই সময় একটী ব্যাগ্‌ হস্তে কতকগুলি বিলহস্তে লইয়া বাড়ীওয়ালার নিকট হইতে বৃদ্ধ বাঙ্গাল বিলসরকারটী উপস্থিত হইল। দয়ারাম ভাবিলেন পেসেণ্ট আসিয়াছে;—আর দ্বিরুক্তি না করিয়া—আর কোনও কথা না শুনিয়া একেবারে তাহার হস্ত ধারণ করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই ব্যক্তি কে,—কি বৃত্তান্ত—কোথা হইতে—কিসের জন্য আসিয়াছে—তাহা জিজ্ঞাসা করিবার অবসর হইল না! সাধে পাড়ার লোকে বলে "দুর্ভিক্ষ"? ডাক্তার বাবু বলিলেন—"হাত দেখি—"

বিলসরকার অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল—"খালি হস্ত কি দেহামু? দ্যাহেন—চারি মাসের বিল্‌ আন্‌ছি! টাহা দেন—"

ডাক্তার বাবু তখন তন্ময়! সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বলিলেন—"তাই দাও—তাই দাও—আগে টাকা দাও। এখনই প্রেস্‌ক্রিপসন্‌ ক'রে দিচ্ছি—দাঁড়াও! আগে ভাল ক'রে এক্‌জামিন্‌ করি!" এই বলিয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিলসরকার বলিল —"অয়! প্যাট্‌ টিপ্‌ছ ক্যান্‌? উঃ বরই ক্যালেশ্‌ পাই যে!"

দয়ারাম। "তাতো পাবেই। লিবার অ্যাব্‌শেশের বেশ লক্ষণ হয়েছে।" এই বলিয়া মধুকে বলিলেন "একবার থার্‌মোমিটারটা বগলে দাও তো!" মধু তাড়াতাড়ী থারমোমিটার লইয়া ডাক্তার বাবুর সাহায্যে বদ্দজ বেচারার বগলে থারমোমিটার ধরিয়া জ্বর পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিলে বিলসরকার বলিল "হাদে—মোরে সং পাইছ নাহি?" দয়ারাম গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ইস্‌—ব্রেণে অ্যাফেক্ট করেছে! দেখি—হাঁ কর—হাঁ কর,—জিব দেখি!"

"আরে! হাঁ ক'রমু ক্যান্‌? ঘুরা পাইছ! দাত দেখ্‌বা?"

মুখব্যাদান করিলনা দেখিয়া ডাক্তার বাবু—তাহার গালে জোরে দুটী চপেটাঘাত করিলেন; অগত্যা বেচারী প্রাণের দায়ে ভীষণ মুখ ব্যাদান করিয়া অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখাইল। দেখিয়া দেখিয়া দয়ারাম বলিলেন—"উঃ সিরিয়স্ এপেন্‌ডিসাইটিস্ দেখাচ্ছে! আচ্ছা—আচ্ছা—সবুর—সবুর—ভয় নেই—সেরে যাবে—।"

বিলসরকার হতভাগ্য তখন ভয়ে যথার্থই ক্রন্দন সুরু করিয়াছে। কি করে? স্থির হইয়া এক পার্শ্বে নীরবে দণ্ডায়মান রহিল।

দয়ারাম আপনার খেয়ালে তখন প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্ লিখিতে বসিলেন। লেখা শেষ হইলে জলদগম্ভীর স্বরে বলিলেন—"কম্পাউণ্ডার! জল্‌দি ওষুধ দাও! বিল কর ৪৵৹! একটা হেয়ার-গ্রোয়ার তেল দাও—২॥৹ টাকা!"

এই বলিয়া সে ব্যক্তির দিকে ফিরিয়া বলিলেন "দিনে তিনবার খাবে! কাল সকালে কেমন থাক খবর দিবে!"

বিলসরকার আর কথাটী কহে না। মধু ঔষধের এবং তৈলের শিশি এবং বিল লইয়া তাহাকে বলিল—"এই নাও!—"

সে এইবার একটু ভরসা করিয়া বলিল—"হ্যাদে কি লইমু?"

মধু বলিল—"ওষুধ ওষুধ!"

"ঔষদ? কিসের ঔষদ?"

মধু বলিল—"আরে মর্! রোগ হ'য়েছে—ডাক্তারখানায় এলে,—ডাক্তার দেখালে—ওষুধ নেবেনা? টাকা দেবে না?"

সে বলিল—"টাহা দিবার আস্‌ছি—না,—টাহা নিবার আস্‌ছি—আগে তা কও? আমি বিশ্বনাথ মিত্রের দপ্তরখানা হতি আস্‌ছি! চারি মাহের বারা পাওনা হইছে—কল্যাই লুটিস্ পাবা অ্যানে! মোর প্যাট টিপ্‌ছ—হা করাইয়া চিবুক ধরছ—হা করাইয়া জিহ্বা ট্যাপ্‌ছো—

এতক্ষণে দয়ারাম ঘোষের চৈতন্যের উদ্রেক হইল! তিনি তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন "আরে পাষণ্ড! তুমি অনর্থক আমায় এত কষ্ট দিলে—এত পরিশ্রম করালে,—আমার এত আশা ভরসা ওষুধ পত্র নষ্ট ক'রলে,—আবার বাড়ীভাড়ার টাকার তাগাদা ক'চ্ছ! আজ তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ ক'র্ব্ব!"

বিল্‌সরকার বেচারী ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া এক লম্ফে একেবারে সদর রাস্তায় পড়িল—এবং সম্মুখের বৈঠকখানায় আমাকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া

আমার নিকটে আসিয়া আমার পদতলে পড়িয়া বলিল, "ছোটবাবু! আমারে রইক্ষা করেন!"

আমি তাহাকে আশ্বাস দিয়া নিজের কাছে বসাইলাম এবং যমরূপী ডাক্তার বাবুর কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলাম।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দীপান্বিতা।

১

আজি অম্বর তরু প্রান্তর মরু
কান্তার ঘনারণ্য,
ব্যাপ্ত কালিমা লিপ্ত, বিভব
স্থলজ বারিজ বন্য
সান্দ্রীভূত সে গাঢ় তিমিরে
অন্ধীকৃত এ বিশ্ব; গভীরে
মজ্জিত যেন সজ্জিত চির
দৃশ্য সমূহাগণ্য।

২

ভীত জগত শান্ত শ্বাপদ,
ক্রন্দন হীন-চক্ষে
অঞ্চল ধরি চঞ্চল শিশু
লুকায় মাতৃ বক্ষে,
শঙ্কিত-চেতা সৌম্যা বালিকা
কম্পিত করে ক্ষুদ্র দীপিকা
অঙ্গনে গোঠে আম্রকাননে
গৃহ দ্বারে দ্বারে রক্ষে।

৩

পল্লী-গৃহিণী মন্ত্রোচ্চারি
বিঘ্ন করিছে দূর
সংযত মৃদু কণ্ঠে ধ্বনিছে
শঙ্কা তাহে প্রচুর ;
উজ্জ্বলে দিক্ মশালের রাজী
দগ্ধি তাহাতে আতসের বাজি
বালক সঙ্ঘ রঙ্গ করিছে
মানস হরষে পূর।

৪

স্তব্ধ নিশীথে শ্মশানের চিতা
নির্ব্বাণ রত দীপ্তি
রঞ্জিছে শত দৃশ্য ভীষণ
পিশাচ সঙ্ঘতৃপ্তি
প্রেত পিশাচ রাক্ষস দানা
সংঘাত সম শক্তিতে হানা
অট্ট অট্ট হাস্যমুখর
হুঙ্কার ঘোর লিপ্তি।

৫

মন্দির হ'তে শঙ্খ নিনাদে
পরাণ লভিছে হর্ষে
যেন সে জগৎ শক্তি রূপার
অভয় দায়ক স্পর্শে
অর্চ্চিতা মাতা ভক্ত কুটীরে
খণ্ডিত শির ছাগ রুধিরে
তৃপ্তি লভিয়া ভীত সন্তানে
মঙ্গলাশিষ বর্ষে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

পিতৃযানে পবিত্র মিলন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বদরিকাশ্রম।

হিমাচলের উন্নতপ্রদেশ—তুষারময় গিরিশৃঙ্গ-মূলে প্রস্তরময় প্রাচীরবেষ্টিত ভূভাগে রমণীয় তপোবন।

(মহর্ষি বেদব্যাসের শিষ্য শ্বেতকেতুর প্রবেশ।)

শ্বেতকেতু। [রাত্রিশেষে গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে অবলোকন করতঃ]

গান।

আসিছে দিবাসুন্দরী, নিশা পালাইছে ডরে।
উজ্জ্বল রূপের আলো তামসী কি সইতে পারে!
পূর্ব্বদিকে এসে দিবা রূপে আলোকিত কায়;
আঁধার সঙ্গিনী লয়ে পশ্চিমে নিশি পালায়—
ঐ শুন পেচককুল ডাকে কাতরে।
নিশাঅঙ্গে নীলবস্ত্রখচিত তারকাচয়,
পলায়নবেগে তারা একে একে খসে যায়—
হারায় সে নিধি তবু চাহেনা ফিরে।
জায়ার দুর্দ্দশা নাশে চন্দ্রমা হতাশ হয়ে,
বিষাদে বিবর্ণমুখ শান্তি কান্তি হারাইয়ে,
ধাইছে বিরাগভরে গিরিগহ্বরে।
দিবার উদয় আর নিশামান অন্তর্ধান,
শিখাইছে এ জগতে ধন্য যেই জ্ঞানবান।
জ্ঞানালোকে অহঙ্কার—অন্ধকার হরে।

রজনী প্রভাত হোলো। আমাকে মহর্ষি বেদব্যাসের আদেশে এখনই কুরুক্ষেত্র রণস্থলে যেতে হবে, আর তথাকার সংবাদ আন্‌তে হবে। মহর্ষি ধ্যানবলে এখান হতেই সব জান্‌ছেন, তবুও পাণ্ডবগণের প্রতি বাৎসল্যবশে

আমাকে এই কঠোর কার্য্যে নিযুক্ত কোরেছেন। কোথায় ব্রাহ্মণসন্তান প্রত্যূষে বনপুষ্পাদি আহরণ কোরে দেবার্চ্চনা কোর্‌বো, আর প্রফুল্লমনে বেদাধ্যয়ন কোর্‌বো এবং দ্বেষ, হিংসা, ভয়, ক্রোধাদি চিত্তবৃত্তি সংযত কোরে মনকে একমাত্র শান্তির আধার কোরে রাখব, না কোথায় আমি তপোবন ছেড়ে, দ্বেষ, হিংসা, ভয় ক্রোধাদির রঙ্গস্থল রণক্ষেত্রে চল্লেম। রণক্ষেত্রের কথা স্মরণমাত্রেই যেন মনে অশান্তির উদ্রেক হোচ্ছে। ইহারই নাম স্থান-মাহাত্ম্য। সাধে কি আর মুনিগণ লোকালয় ত্যাগ কোরে অরণ্যে এসে তপশ্চরণ করেন? লোকালয়ে শান্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ। কামক্রোধাদি বৃত্তিগণের উত্তেজনার কারণ যেখানে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, সেখানে শান্তি কোথায়? একে ত দেহীমাত্রেই জরা ও ব্যাধি এই দুই কারণে সর্ব্বদা অশান্তি ভোগ কোচ্ছে, তারপর আবার বৃত্তিসমূহের উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হোলে ত আর কথাই নাই। শান্তিই চিত্তের স্থিরতা সম্পাদন করে। শান্তিই পরম সুখের মূল। সেই সুখের প্রত্যাশায় তপোবনবাসী হয়েও ভাগ্যদোষে বিপরীত ফল ভোগ কর্ত্তে লাগ্‌লেম। যাই আর চিন্তায় ফল নাই। গুরুর আদেশ পালন কর্ত্তেই হবে। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুরুক্ষেত্র রণস্থল।

পাণ্ডব শিবির।

(রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ।)

রাজা যুধিষ্ঠির। (স্বগতঃ) অকস্মাৎ চিত্ত কেন এহেন অস্থির?
বাম চক্ষু কেন বা নাচিছে? তবে কি ঘটিবে
কোন অমঙ্গল আজি? ছিছি, অরে মন
কেন চিন্ত অমঙ্গলে, মঙ্গল নিদান
যাহার সহায় তার অমঙ্গল কোথা?
ভীমবাহু ভীমসেন হস্তীবল ধরে।
জ্বলন্ত পাবক মোর প্রাণের অর্জ্জুন।
অমিত বিক্রম বীর মাদ্রীসুত দ্বয়।

এদের জিনিতে পারে কে আছে ভুবনে ?
ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ভ্রাতৃগণ মোর।
পাশবিক পাপবলে বলী এ কৌরব
পারে কি জিনিতে কভু পাণ্ডবে সমরে ?

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দূত। (প্রণাম করিয়া) মহারাজ, দ্বিতীয় পাণ্ডবের আদেশে রণক্ষেত্রের সংবাদ নিয়ে এলেম।

রাজা যুধিষ্ঠির। কি সংবাদ দূত ? সংবাদ শুভ ত ?

দূত। শুভ নয়, মহারাজ, মহাবীর দ্রোণ,
চক্রব্যূহ রচি আজি করে মহারণ।
জয়দ্রথ মহাতেজে দ্বার রক্ষা করে
যমের সমান বীর—হেন সাধ্য কার
প্রবেশে ভিতরে আজি ব্যূহভেদ করি !
যুদ্ধে বিশারদ বীর ভীমসেন আদি
করিল তুমুল রণ ব্যূহ ভেদিবারে
কিন্তু হায়, বৃথা চেষ্টা, কেহ না পারিল।
বার বার পরাঙ্মুখ হয়ে বৃকোদর
গদা ফেলি মন্ত্রমুগ্ধ শার্দ্দূলের ন্যায়
ব্যূহদ্বারে দাঁড়াইয়ে। কর মহারাজ—
উপায় বিধান এর। নতুবা এখনি
পাণ্ডব গৌরব-রবি যাইবে ডুবিয়া
অতল জলধিতলে।

রাজা যুধিষ্ঠির। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) যাও দূত, রণস্থলে ফিরে যাও। পাণ্ডবরথী ভীমসেনকে পুনরায় বিপুল বিক্রমে যুদ্ধকোরে ব্যূহভেদ কোর্‌বার চেষ্টা কোর্‌তে বলগে। আমিও এদিকে উপায়ান্তর চিন্তা কোরে দেখি।

[দূতের প্রস্থান।

(স্বগতঃ) কি শুনিনু দূত মুখে ! পাণ্ডবের সেনা
চিত্রার্পিত প্রায় আজি অচল নিশ্চল
ব্যূহ মুখে ! কেহ নাহি পারিল ভেদিতে
আঁচার্য্য রচিত ব্যূহ। গুরো, ভক্তিভরে

নমি দেব তব পায়। তব শিষ্য মাঝে
কে আছে এমন বীর, যে পারে বুঝিতে
সমর কৌশল তব? শিখায়েছ প্রভো
সযতনে সমভাবে শিষ্যগণে তব
রণবিদ্যা। কিন্তু হায়, হীন বুদ্ধি মোরা
ক্ষুদ্রাধার, শিখিবারে নারিনু সম্যক।
যেমতি সজল ঘন ঘন বরষিলে
ক্ষুদ্র খাল বিল পুরি যায় উছলিয়া
বারিরাশি, পড়ে গিয়া গভীর নদীতে,
তেমতি সে আচার্য্যের উপদেশ রাশি
অদ্ভুত সমর বিদ্যা, ধারণে অক্ষম
শিষ্যগণে ত্যজি সব সুবুদ্ধি অর্জ্জুনে
রয়েছে সঞ্চিত হয়ে। বিনা সে অর্জ্জুন
কে রক্ষা করিবে আজি! ব্যূহের বাহিরে
নারায়ণী সেনা সহ যুঝে পার্থবীর,
কেমনে আনিব তারে ব্যূহ ভেদিবারে?
হোথা নারায়ণী সেনা হেথা ব্যূহভেদ—
একা পার্থ এককালে কেমনে সাধিবে—
দুই কাজ। কারে আজি পাঠাইব রণে
সাধিতে দুষ্কর কার্য্য, কেবা আর আছে
হেন বীর? কণ্ঠশোষ হোতেছে চিন্তায়।
বুঝি আজি পাণ্ডবের বীরত্ব কৌমুদী
হীন-জ্যোতি হোলো পাপ কৌরব সমীপে।

(জনৈক দূতের প্রবেশ।)

দূত। (প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয় হউক। কুমার অভিমন্যু মহারাজের সহিত দেখা কোর্‌বার জন্যে দ্বারে অপেক্ষা কোচ্ছেন।

রাজা যুধিষ্ঠির। প্রিয়তম অভিমন্যু! যাও দূত, ত্বরা কোরে তাকে নিয়ে এস। [দূতের প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল।

রাস-পূর্ণিমা।

কি সুখের দিন আজি বঙ্গে !
জোছনার হাসি হেসে,
সুখে চাঁদ যায় ভেসে,
সোহাগে গলিয়া মরি গগনের অঙ্গে,
কি সুখের দিন আজি বঙ্গে !

ঘরে ঘরে উচ্চ রোল
'হরি বোল' 'হরি বোল'
ভাসিছে জগত-বাসী সুখের তরঙ্গে !
গোলোক ত্যজিয়া হরি
অবনীতে অবতরি,
করিলা মধুর লীলা শ্রীরাধার সঙ্গে,
মরি, সেই বৃন্দাবনে
নিভৃতে নিকুঞ্জ বনে,
মাতায়ে গোপিকাগণে, নেহারী অপাঙ্গে,

পুলকে পূরিত ধরা,
প্রকৃতি হাসিত ধরা
নিরমল নিশীথিনী ভেসে যায় রঙ্গে,
ফুল বনে ফুল রাণী
বিকাশি বদন খানি,
সোহাগে ঢলিয়া পড়ে, জ্যোছনার অঙ্গে !
কি সুখের দিন আজি বঙ্গে !

সুমধুর সমীরণে
চলিছে আপন মনে
উছলি তটিনী বালা, তরঙ্গের রঙ্গে ;
কুলু কুলু তানে মরি,
দুকূল প্লাবিত করি

ঢালিতে এ সুখ-স্রোত সাগরের অঙ্গে ;
কি সুখের দিন আজি বঙ্গে !

সুমন্দ মলয়ানিলে
কাঁপায়ে কুসুম-কুলে
আহরি সুবাস-রাশি, বিমোহিতে বঙ্গে ;
প্রতি ঘরে, প্রতি জনে,
বিতরিছে সযতনে,
ভাসিতেছে দীন বঙ্গ, সুখের তরঙ্গে ;

শঙ্খ, ঘণ্টা, প্রতি ঘরে
আরবে গভীর স্বরে,
করতালে, করতালে, মধুর মৃদঙ্গে ;
শ্রীহরির নাম গানে,
মাতাইয়া মন প্রাণে
ভাসিছে বঙ্গজ-হৃদি, প্রেমের তরঙ্গে ;
কি সুখের দিন আজি বঙ্গে !

কে ওই মন্দিরে আজি,
কুসুম-ভূষণে সাজি,
শ্রীরাধারে বামে লয়ে, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গে ;
গলে বন-ফুল-মালা
শিখী-পুচ্ছ শিরে হেলা,
সুচম্পক বরণীরে, নেহারি অপাঙ্গে ;

ঘেরি চারু তারা-মালা,
সরলা গোপের বালা,
শ্যাম-চাঁদ-সুধা আশে, পীড়িয়া—অনঙ্গে ;
আধ অনাবৃত-বক্ষে
নেহারী কুটিল চক্ষে,
হানিছে কটাক্ষ শর, শ্যামচাঁদ অঙ্গে ;
কে ওই প্রেমের তরু বঙ্গে !

ওই রে ভকত হৃদি—
বিমোহন-কারী, নিধি,
শঙ্কর-সেবিত ধন, বিরাজিত বঙ্গে,
জগত যে প্রেম-রসে
আনন্দ-সাগরে ভাসে,
রবি, শশী, গ্রহ, তারা, রঞ্জিত যে রঙ্গে;

যেরূপ সাগরাকাশে,
অনুরূপ সুপ্রকাশে,
উথলে ভকত হৃদি, যে প্রেম তরঙ্গে;
ওই সে ভকত হৃদি—
বিমোহন-কারী, নিধি,
ত্রিদিব-আরাধ্য-রত্ন, বিরাজিত বঙ্গে!

জয় জয় রাধা শ্যাম,
চরণে করি প্রণাম
অধম ভকত, দীন না জানি মহিমা,
যেন এ হৃদয় মাঝে,
মধুর যুগল সাজে,
নেহারি সতত তব, ও রাস-পূর্ণিমা!

শ্রীচারুচন্দ্র মজুমদার।

ব্যবধান।

ওপারেতে আছ তুমি এ পারেতে আমি
মধ্যে-ব্যবধান তার নদী স্রোতগামী।
ইচ্ছা হয় এ মুহূর্ত্তে মিলিব দুজনে
বলিব মনের কথা অতি সঙ্গোপনে।
কিন্তু হায়, জানি ইহা অসাধ্য লোকের,
আশা আছে তবু ওই পারে মিলনের॥

শ্রীরামানন্দ বৈশ্য।

জ্যোতিষ তত্ত্ব।

রাকা পূর্ণিমা।

পৌরাণিক হিন্দুসমাজে চন্দ্রের পুরুষ-মূর্ত্তি সুপরিচিত আছে। চন্দ্রের স্ত্রী-মূর্ত্তি হিন্দু ভুলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ চন্দ্র স্ত্রীগ্রহ বলিয়া জানেন মাত্র। স্ত্রীগ্রহ অমাচন্দ্র ধর্ম্ম ইতিহে কুহু এবং সিনীবালী আখ্যা ধারণ করেন। পূর্ণ চন্দ্র ধর্ম্ম ইতিহে রাকা ও অনুমতি নাম ধারণ করেন। উদয় কালে ষোলকলা পূর্ণ থাকিলে সেই পূর্ণচন্দ্রকে রাকা বলে।

কুহু ও সিনীবালী গর্ভদেবতা বলিয়া বেদে গীত ও অর্চ্চিত হইয়াছেন। এবং রাকা ও অনুমতি প্রসব দেবতা বলিয়া বেদে গীত ও অর্চ্চিত হইয়াছেন।

শ্রাবণী পূর্ণিমা দিনে সায়ং সন্ধ্যাকালে যিনি সূর্য্য ও চন্দ্রমা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে প্রদোষকালে পূর্ব্ব-আকাশে পূর্ণ চন্দ্র এবং পশ্চিম আকাশে প্রভাকর উভয়ে ক্ষিতিজ বৃত্তের তুল্য উর্দ্ধে যুগপৎ বিরাজ করে। দেখিলে বোধ হয় যেন দ্যৌ-দেবীর রজত কুণ্ডলদ্বয় ঝুলিতেছে। অথবা যেন অদিতি-নন্দন যুগল জগৎজনকে সৌভ্রাত্র বন্ধন দেখাইতেছেন। অথবা যেন আদিত্য পত্নী (১) লক্ষ্মী দেবী সপত্নী শ্রীদেবীর পতি-সমাগমের সৌভাগ্য দর্শনে ঈর্ষ্যাবশে অসময়ে উদিত হইয়া বিবাহ বন্ধন দেখাইতেছেন।

এ মনোহর দৃশ্য অন্য মাসে দুর্ল্ভ। প্রকৃত রাকা শ্রাবণী পৌর্ণমাসীতে সম্যক্ উপলক্ষিত হয়।

শ্রাবণী পৌর্ণমাসীর সূর্য্যচন্দ্রমার সৌভ্রাত্র বন্ধন হইতে রাকাদিনে রাখী বন্ধনের প্রবর্ত্তনা হইয়াছে।

রাখী বন্ধনের বন্ধু বিপদে বন্ধন দাতাকে প্রাণপণে রক্ষা করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য থাকেন, গতিকে বীরপুরুষ রাখীবন্ধনের উপযুক্ত পাত্র। তাই পশ্চিম ভারতে রাখীবন্ধনের ঘটা চির-প্রচলিত আছে। রাখীর হাটে এক আজগবী মন্ত্রের খুব কাট্‌তি হয়। সুচতুর পাণ্ডাগণের বেশ দুই চার পয়সা হয়।

---

(১) শ্রী চ তে লক্ষ্মীঃ চ পত্ন্যোঃ। ইতি (বাজসনেয়ীসংহিতা)

তাঁহারা রাখীবন্ধনের ফল হাতে হাতে পান। দেশপূজ্য বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেনঃ—

"পৃথিবীতে যত লোক সব বেটা গোরু।
যে যারে ঠকাতে পারে সেই তার গুরু॥"

রাজনৈতিক বিভ্রাটের রঙ্গভূমি রাজপুতনা প্রদেশে রাখীবন্ধন এক অপূর্ব্ব দিব্যশ্রী ধারণ করিয়াছে। তথায় বসন্তকালে রাজপুত্রী ভাবী বিপৎ-পাতে উদ্ধার জন্য যে কোন জাতীয় বীরপুরুষকে রাখীবন্ধন সহ "ধর্ম্ম ভাই" উপাধি উপহার দিয়া "রাখীবন্ধন ভাই" মকবর করিয়া থাকেন। বন্ধনদাত্রীর অবস্থাভেদে এই রাখীবন্ধন জন্য মতিময় রেশমী সুতা বা জহরৎময় স্বর্ণদাম প্রেরিত হয়। এই উপহারের বিনিময়ে রেশমী বা সাটিনের কাঁচুলি বা মুক্তাময় জরিদার কাঁচুলি প্রত্যুপহার দানে রাখীবন্ধন গ্রহণ করিতে হয়।

অত্যাসন্ন বিপৎ-পাতে কুমারীও রাখীবন্ধন প্রেরণ করিতে পারেন।

বীর রমণী ও বীর পুরুষ এই ভাই ভগ্নী সম্বন্ধের প্রীতি অনুভব করিতে অধিকারী।

গুজরাটের বাহাদুর সুলতান চিতোর অবরোধ করিলে রাণী কর্ণবতী তাঁহার "রাখীবন্ধন ভাই" দিল্লীশ্বর হুমায়ুনকে সংবাদ দিলেন। দিল্লীশ্বর বঙ্গবিজয়ের ফল পরিত্যাগে বাঙ্গালা হইতে চিতোর রক্ষার্থে ধাবমান হইলেন। এদিকে চিতোরের পতনে মেবরী রাণী কর্ণবতী তেরহাজার রাজপুত্রী সহ জহুরে ভস্মীভূত হইলেন। হুমায়ুনের আগমন সংবাদ প্রাপ্তে বাহাদুর সুলতান জয়লব্ধ চিতোর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। দিল্লীশ্বরের বিক্রমে বিক্রমজিৎ ভগ্ন-প্রাকার চিতোরের সিংহাসনে পুনঃ অধিষ্ঠিত হইয়া উদয়পুরে আশ্রয় লইলেন।

বাঙ্গালার বেলে মাঠে রাখীর বীজ বপন হইয়াছিল, ফুঁতে বালি উড়িয়া গেল। বীজ শূন্যে ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘুরিতেছে।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

সুখ-স্মৃতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পেন্সন প্রাপ্ত সবজজ বিপত্নীক অভয় বাবুর বাস বসন্তপুরে। বিদ্বান্, জ্ঞানবান্ ও অর্থবান্ বলিয়া অভয়বাবুর গ্রামে প্রতিপত্তি ও সম্ভ্রম যথেষ্ট। কি বিবাহাদি মঙ্গলকার্য্যে, কি বিপদ আপদে অধিকাংশ লোকেই অভয় বাবুর পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য্য করিত না। যিনি তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী কার্য্য করিতেন, তিনি প্রায়ই ঠকিতেন না। যিনি তাঁহার পরামর্শ লইয়াও স্বীয় বুদ্ধি বা জ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধি পূর্ব্বক আপনার মতে কার্য্য করিয়া পরিণামে ঠকিতেন, তিনিও পরে অভয় বাবুকে ভয় ও ভক্তি করিতেন। বলিতে কি, অভয়বাবুর তুল্য অর্থতত্ত্বে সুদৃঢ় জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামের লোকে একবাক্যে বলিত "অভয়বাবু অতি তীক্ষ্নবুদ্ধি ব্যক্তি।" ঐ সঙ্গে তাহারা বলিতে ভুলিত না, "অভয়বাবুর দেহে দয়া নামক পদার্থের একান্ত অভাব।"

অভয়বাবুর এক পুত্র—নাম সুরেশ। ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়গণ থাকিলেও অভয়বাবুর রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় তাহাদের অধিকার বা স্থান ছিল না।

পুত্র সুরেশের লেখাপড়ার দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি, যত্ন ও চেষ্টা থাকিতেও পুত্রের মনোযোগ ও বুদ্ধির অতিশয় চাঞ্চল্য এবং অধ্যবসায়হীনতা বশতঃ তাহার তেমন লেখাপড়া হইল না বলিয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত। তাঁহার সেই দুঃখ এক সুরেশ ব্যতীত গ্রামের অন্য কেহই জানিত না। তিনি ভুলিয়াও কখনো কাহারও নিকট পুত্রের লেখাপড়ার বিষয় উল্লেখ করিতেন না। উত্তরাধিকার-সূত্রে তাঁহার তীক্ষ্নবুদ্ধি ও অধ্যবসায় যে কেন তাঁহার পুত্র প্রাপ্ত হয় নাই, সময়ে সময়ে এই দুশ্চিন্তা তাঁহার মনে আধিপত্য বিস্তারপূর্ব্বক তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিত মাত্র।

এম্ এ পাশ করা একজন দক্ষ শিক্ষক সুরেশকে লেখাপড়া শিখাইত। সুরেশ কখনও বিদ্যালয় দেখে নাই। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করা অল্প বয়সে অনেক সময়ে অনিষ্টজনক বলিয়া অভয়বাবু নিজগৃহেই সুরেশের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কথোপকথন-প্রসঙ্গে অভয়বাবুর নিকট যদি কেহ সুরেশের লেখাপড়ার কথা তুলিত—অভয়বাবু চেষ্টাকৃত পরিমিত কথায় উত্তর দিয়া বলিতেন, "সুরেশ চিত্রবিদ্যার অনুশীলন ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পটুতালাভ করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। শৈশব হইতেই তাহার চিত্রকলায় প্রগাঢ় অনুরাগ। এ অনুরাগ স্বভাবজ—ইহার গতিরোধ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অকর্ত্তব্য।"

তদুত্তরে যদি জিজ্ঞাসা করা হইত "এ বিদ্যায় কি অর্থোপার্জ্জন হইবে?"

অভয়বাবু বিরক্তিব্যঞ্জকস্বরে বলিতেন "তেমন শক্তি সম্পন্ন হইলে,—নাম করিতে পারিলে—সকল বিদ্যাই যথেষ্ট অর্থ দিতে পারে।" তাঁহার কথার ভাবে চতুর লোক বুঝিত—এ প্রসঙ্গ তাঁহার মনঃপূত নহে; সুতরাং এই প্রসঙ্গের সেইখানেই ইতি হইত।

সুরেশের বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বৎসর। সুরেশ সুন্দর—সবল ও সদা হাস্যময়। পিতার মত বেশ-পারিপাট্য সুরেশের একেবারেই ছিল না।

কিছুদিন পরে গ্রামের লোক দেখিল,—সুরেশ গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। পরম্পরায় শ্রুত হইল, সুরেশ বিদ্যাশিক্ষার্থ কলিকাতায় গিয়াছে। এ সংবাদে এমন একটা কিন্তু নূতনত্ব নাই যে উহা নিতান্ত নবীনতাশূন্য বৈচিত্রহীন জীবনযাপী গ্রামস্থ নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তিবর্গের নিয়ত চর্চ্চার বিষয়ীভূত হইতে পারে। সুতরাং কিছুদিন পরে সুরেশের কথা আর বড় কেহ কহিত না—তাহারা সুরেশকে প্রায় ভুলিয়া গেল।

তবে সুরেশ বৎসরাবধি গ্রামে পদার্পণ না করায় লোকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। কেহ কেহ বলিতে লাগিল "বোধ হয় পিতাপুত্রে অসদ্ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, নতুবা সুরেশ বাড়ী আসে না কেন?" কিন্তু অভয়বাবুকে দেখিয়া কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কোনও ব্যক্তিই পিতাপুত্রে অসদ্ভাবজনিত ব্যথার কোন চিহ্নই তাঁহার কথা বা মুখে লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইত না। সুতরাং ইহা একটা সমস্যার মত হইয়াই রহিল।

অভয়বাবুর অর্থভাণ্ডার আমরা স্বচক্ষে দর্শন না করিলেও তাঁহার প্রচুর অর্থ যে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কুক্ষিগত ছিল এবং তাহার জামিনস্বরূপ কতকগুলি পার্চ্চমেণ্ট কাগজ যে তাঁহার লৌহসিন্দুকে নির্দ্দয় তালাচাবির কড়া পাহারায় আবদ্ধ ছিল, একথা আমরা জ্ঞাত আছি। এত অর্থ থাকিতেও দুর্গোৎসবাদি পুতুল পূজা করিয়া তাঁহার এই আয়াসোপার্জ্জিত অর্থের যৎকিঞ্চিৎ ব্যয়

করাও তিনি অর্থনীতির নিতান্ত বিরুদ্ধ এবং অপরিণামদর্শিতার ক্লেশকর দৃষ্টান্ত বোধ করিতেন। সুতরাং পূজা-পার্ব্বণাদির সময়ে তাঁহার বাটীতে নিয়মিত আলোক ব্যতীত বাজে আলো জ্বলিত না। তিনি সময়ে সময়ে গ্রামান্তরের জমীদারদিগকে দশ বিশ হাজার টাকা ধার দিতেন এবং ঠিক কড়ারে কড়াক্রান্তি সুদ হিসাব করিয়া টাকা লইয়া অব্যাহতি দিতেন। কাহারও বাস্তুভিটা বন্ধক রাখিয়া টাকা দিবার নিয়ম তাঁহার ছিল না। তবে সময়ে সময়ে গ্রামের মর্য্যাদাপন্ন লোকের অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা কর্জ্জ দিতেন এবং সে টাকার সুদের হার চড়া ছিল। ফল কথা, যে উর্ব্বর ক্ষেত্রে তাঁহার অর্থবৃক্ষ রোপিত হইয়া ফল-ফুলে শোভিত হইবে—সেই ক্ষেত্রেই তিনি তাঁহার অর্থের বীজ বপন করিতেন।

সুরেশ একদা পিতার বিনা অনুমতিতে অজ্ঞাতসারে কলিকাতা হইতে একটা গ্রামোফোন যন্ত্র ক্রয় করিয়া লইয়া আসে। তখন সবে এই যন্ত্র কলিকাতায় উঠিয়াছে। এখন যেমন পাড়াগাঁয়ের একটু নামজাদা গৃহস্থের বাড়ীতেও গ্রামোফোনের আবির্ভাব দেখা যায়, তখন সেরূপ ছিল না। তখন গ্রামোফোন যন্ত্রটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যের তালিকাভুক্ত ছিল। সুতরাং সে সময়ে সুরেশ গ্রামে এই যন্ত্র আনিয়া—লোককে ইহা হইতে গান ও কত রকম বক্তৃতা শুনাইতেই সকলে সুরেশের সদ্ব্যয়ের এবং তৎসঙ্গে ঐ আশ্চর্য্যজনক যন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এই সর্ব্ববাদী প্রশংসায় বালক সুরেশ মনে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিল। অপরাপর নিকটস্থ গ্রামের অনেক ভদ্রলোক অভয়বাবুর বাড়ী আসিয়া সুরেশের এই গ্রামোফোনের গান শুনিয়া যাইতে লাগিল এবং ধাতুনির্ম্মিত এই অভিনব যন্ত্রে মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনির অনুকৃতি শ্রবণে একেবারে বিষম বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিল।

অভয়বাবু এই অন্যায় জনতায় তাঁহার শান্তিময় নির্জ্জন গৃহের শান্তিভঙ্গে নিতান্ত ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া—একদিন নির্জ্জনে সুরেশকে ডাকিয়া কহিলেন "আমার প্রাণপণ চেষ্টাতেও তুমি ত লেখাপড়া শিখিলে না। আমি মস্তকের ঘর্ম্ম পদে প্রক্ষেপ করিয়া যে অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি—সে অর্থ তুমি পশুবৎ পদে দলিত করিয়া আমার মনের স্বস্তি ও শান্তি ভঙ্গ করিতেও একটু কুণ্ঠাবোধ করিতেছ না। তুমি আমার একমাত্র পুত্র হইলেও জানিও—কালে তোমার প্রতি আমার অতরল হৃদয়ের সঞ্চিত অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ তোমাকে পথের ভিখারী করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিবে না।"

পিতার এইরূপ কঠোর শাসন-বাক্য অন্য পুত্র হইলে অম্লানবদনে সহ্য করিত কিনা সন্দেহের বিষয়। শান্ত শিষ্ট প্রিয়দর্শন বালক সুরেশ তাহা সহ্য করিল। উত্তরে একটি কথাও কহিল না। পর দিবস সুরেশকে কেহই গ্রামে দেখিতে পাইল না।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনাই, গ্রাম ত্যাগ করিয়া সুরেশের কলিকাতায় আসিবার মুখ্য কারণ বলিয়া মানিতে হইবে। সেই হইতেই সুরেশ কলিকাতায় আছে। কলিকাতায় সুরেশের মাতুল একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণী। সুরেশের মাতুল বা মাতুলানী সুরেশকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত। কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানী অভয়বাবুর জন্য তাঁহাদের সে ভালবাসা তাঁহারা সুরেশকে এতদিন দেখাইবার সুযোগ পান নাই। সুরেশকে অভয়বাবু কদাচিৎ কলিকাতায় আসিতে দিতেন। সুরেশ যদি কোন প্রয়োজনে কলিকাতায় আসিত, অভয়বাবু তাহাকে মাতুলের নিকট আসিতে বারণ করিয়া দিতেন। অভয়বাবু বলিতেন, "স্ত্রীবিয়োগে শ্যালকের সহিত সম্বন্ধ কি?" সুরেশ কলিকাতায় আসিয়া লুকাইয়া মাতুল বা মাতুলানীর সহিত দেখা করিত, তাহা অভয়বাবু জানিতে পারিতেন না।

সুরেশের মাতুল অপুত্রক। মাতুল পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেও সুরেশের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় স্নেহ বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রান্ত হয় নাই। সুরেশ গৃহত্যাগ করিলে, অভয়বাবু তাহা একটা যৎসামান্য বিষয়জ্ঞানে উপেক্ষা করিলেন। শান্ত সুরেশ কলিকাতায় আসিয়াই পিতাকে পত্র লিখিল। সে পত্রের সম্বাদ অতি সংক্ষিপ্ত। তাহার মর্ম্ম—অতঃপর সে কলিকাতায় থাকিয়া আর্ট স্কুলে প্রবেশপূর্ব্বক চিত্রবিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিবে—এইমাত্র। পত্রখানি পাঠান্তে অভয়বাবু তাহা শতখণ্ডে ছিন্ন করিয়া ছিন্ন কাগজের টুকরীতে বিসর্জ্জন করিলেন। তাহাতে পত্রের ছিন্নাংশের অক্ষরগুলি কেহ হত, কেহ আহত হইল, কেহ বা অনাহত রহিল। তাহাদের কি কারণে এই দুর্দ্দশা হইল, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তাহারা হতচেতন হইয়া গিয়া টুকরীতে পড়িয়া রহিল। সেই সময়ে—অভয়বাবুর গুরুগম্ভীর বদনমণ্ডল নিরীক্ষণে সেই প্রকোষ্ঠের নিবিড় নিস্তব্ধতা আতঙ্কে নিবিড়তম হইয়া গেল।

মাঝে মাঝে পিতাপুত্রে পত্র-ব্যবহার চলিতে লাগিল। পুত্রের পত্র সকল সময়েই সংক্ষিপ্ত হইত। পিতার উত্তরবাহী পত্রের লিখন তদপেক্ষাও সংক্ষিপ্ত—শুষ্ক—উলঙ্গ! পিতা কোন পত্রেই পুত্রকে বাটী আসিতে অনুরোধ করিতেন না। অভিমানী পুত্রও সুতরাং বাটী আসিত না। কিন্তু

চিত্রাঙ্কণ সময়ে যখন বাড়ীর কথা মনে পড়িত, তখন সুরেশ চিন্তায় অধীর হইত। তাহাদের স্বচ্ছসলিলা পুষ্করিণীর সেই বাঁধা ঘাটে বসিয়া সে সেই পুষ্করিণীর প্রভাতসৌরকরোজ্জ্বলা মন্দানিল-হিল্লোল-আন্দোলিতা ক্ষুদ্রবীচিমালাগুলি চাহিয়া চাহিয়া দেখিত—দেখিত, সেই ছোট ছোট ঢেউ-গুলি যেন তাহার চরণস্পর্শ করিতে আসিত; তাহাদের মনোরম উদ্যানের পত্র-পুষ্প-ফলশোভিত নানা বৃক্ষরাজিতে যখন দোয়েল কোয়েল পাপিয়া তান ধরিয়া দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিত, সে সেই আনন্দময় গানে বিভোর হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিত। তাহাদের বাড়ীর সেই শুভ্রবর্ণা দধীমুখী সুন্দরী বিড়ালটি যখন লেজ নাড়িয়া তাহার পায়ের কাছে আসিয়া আদরের অপেক্ষায় তাহার মুখের পানে চাহিত, তখন সে তাহাকে কোলে করিয়া কত আদর করিত, তাহার গায়ে হাত বুলাইত, তাহার মুখ চুম্বন করিত। একে একে ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কত স্মৃতি তাহার মনের পথ দিয়া যখন নীরবে চলিয়া যাইত—সে তখন তন্ময় হইয়া পড়িত। তখন তাহার কিছুই ভাল লাগিত না—জনাকীর্ণ মহানগরী কলিকাতা তখন যেন নিতান্ত নির্জ্জন—একান্ত বৈচিত্রশূন্য বলিয়া তাহার বোধ হইত। সে তখন তুলি ত্যাগ করিয়া বাটীর বাহিরে আসিয়া রাস্তার জনসঙ্ঘের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া সকল কথা ভুলিয়া যাইত।

হায় শৈশব স্মৃতি! মানুষ জীবনের অনেক বিষয় ভুলিতে পারে—শৈশব স্মৃতি ভুলে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সুরেশের মাতুলের বাটীর সংলগ্ন বাটীতে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছোট আদালতের উকিল বাস করিতেন। তাঁহার সহিত সুরেশের মাতুলের বেশ সদ্ভাব ছিল। সুরেশের মাতুলানী উক্ত উকিলের পত্নীর সহিত 'মনের কথা' পাতাইয়া ছিলেন। উকিল রাঢ়ীয়-শ্রেণী ব্রাহ্মণ। তাঁহার এক কন্যা ও দুই পুত্র। উকিল বাবু অবকাশ পাইলে, সুরেশের মাতুল জগদীশ বাবুর বাটীতে প্রাতে বা সন্ধ্যায় গল্পগুজব করিয়া দুই এক ঘণ্টা কাটাইতেন।

সুরেশ একদিন প্রাতঃকালে বৈঠকখানায় বসিয়া একখানি বিলাতী ছবি দেখিয়া সেই ছবির অনুকরণে তৈল-চিত্র লিখিতেছিল। ছবিখানি এক

নামজাদা পরমা সুন্দরী বিলাতী যুবতী অভিনেত্রীর। সুরেশ ছবি আঁকিতে আঁকিতে রূপসীর রূপে মোহিত হইয়া গিয়াছিল। বলিতে কি, সে সেই মূর্ত্তির রূপের ধ্যানে একেবারে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া গিয়াছিল। ঠিক এইরূপ সময়ে, পূর্ব্বোক্ত উকিল কেশব বাবু সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তখন সেখানে আর কেহ ছিল না। কেশব বাবু দুইখানি ছবিই মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—অনুকৃতি-চিত্রখানি ঠিক আসলের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে, বরং আসল অপেক্ষাও স্থানে স্থানে সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিতেছে। কেশব বাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া তুলনার্থে উভয় চিত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই কক্ষে যে সে সময়ে অপর ব্যক্তি প্রবেশ করিয়া সুরেশের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল, চিত্র-ধ্যান-নিরত সুরেশ তাহা দেখিতে পায় নাই। কেশব বাবু আবেগে বলিয়া ফেলিলেন "বাঃ"।

"বাঃ" বলিতেই সুরেশ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।—দেখিল কেশব বাবু। লজ্জায় সুরেশের হস্ত হইতে তুলিকা স্খলিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। সুরেশের তপ্তকাঞ্চনবৎ কপোলদ্বয় লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল।

কেশব বাবু সুরেশের পরিচিত। বুদ্ধিমান্ কেশব বাবু বুঝিলেন—"সুরেশের বালস্বভাবসুলভ লজ্জা আসিয়াছে। তিনি স্মিত-বদনে বলিলেন "বাঃ বাঃ! সুরেশ তুমি কালে র‍্যাফেলকেও পরাজিত করিবে।"

সুরেশ এ অযথা প্রশংসায় কোন কথা কহিল না—ছবি আঁকা ত্যাগ করিয়া বৈঠকখানার বিছানায় আসিয়া বসিল। কেশব বাবুও বসিলেন, এমন সময়ে মাতুল জগদীশ বাবু আসিলেন। জগদীশ বাবুকে দেখিয়া কেশব বাবু বলিলেন "সুরেশ এমন ছবি আঁকিতে পারে, তাহা ত তুমি আমাকে বল নাই।" জগদীশ বাবু হাসিতে লাগিলেন। কেশব বাবু বলিলেন "দেখ জগদীশ, আমি অনেক দিন হইতে মনে করিতেছি, আরতির একখানি অয়েল পেণ্টিং আঁকাইব। কোন্ দিন সে আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইবে। ঘরে যখন এমন পেণ্টার—তখন আর ভাবনা কি?"

বলা বাহুল্য, আরতি কেশব বাবুর কন্যা। জগদীশ বাবু বলিলেন, "বেশ কথা, শুধু ক্যাম্বিস্‌টা দিও—সুরেশ আঁকিয়া দেবে। তোমার অন্য কিছু খরচ লাগিবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা সাতটা। টিপি টিপি বৃষ্টি হইতেছিল, এমন সময় ধবল-তুষারশুভ্র-কেশ বৃদ্ধ অভয় বাবু আর্দ্রবস্ত্রে একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগ হস্তে তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে একজন ভৃত্যও প্রবেশ করিল। গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া অভয় বাবু তাহাকে তাড়াতাড়ি জামা কাপড় ছাড়াইয়া লইতে বলিলেন। প্রাচীন ভৃত্য অনুজ্ঞামত বস্ত্রাদি আনিয়া দিল। অভয় বাবু সিক্তবস্ত্র ত্যাগ করিয়া অন্য বস্ত্র ও জামা পরিধান করিয়া তাহাকে কক্ষের বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। সে চলিয়া গেলে, তিনি চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক গ্লাডষ্টোন ব্যাগটি খুলিয়া একটি কাগজের তাড়া বাহির করিয়া—টেবিলে রাখিয়া—তাহার ভিতর হইতে একখানি দলিল বাহির করিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে কখনও তাহার বদনমণ্ডল যেন ক্রোধে আরক্তিম হইয়া উঠিতে লাগিল, আবার কখনও বা স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিতে লাগিল। মুখমণ্ডলে যেন পরে পরে মেঘ ও রৌদ্রের ভাবসঞ্চার হইতে লাগিল।

এই ভাবে কিয়ৎকাল কাটিলে, অভয় বাবু তাঁহার বক্ষের ও পঞ্জরের অস্থিরাশি কাঁপাইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইতে লাগিল; তাহাতে বোধ হইল, যেন কিছু কূট প্রশ্ন তাঁহার মনের মধ্যে উত্থিত হইয়াছে, তিনি তাহার মীমাংসায় নিবিষ্ট। এইবার তিনি স্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন "যখন সে অর্থের মর্য্যাদা বোঝে না, তখন অর্থ যাহাতে তাহাকে কখনও ত্যাগ না করে, তাহার জীবনে দারিদ্র্য না আসে,সেইরূপ ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য-দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন পিতার কর্ত্তব্য। সে কর্ত্তব্য আমি সমাধান করিলাম, এখন তাহার অদৃষ্ট। আমার সমস্ত সম্পত্তি ট্রষ্টীর হাতে রহিল, সে মাসহারা পাইবে মাত্র—দান কি বিক্রয়ে তাহার কোন অধিকারই রহিল না। যদি সে বিবাহ করে এবং যদি তাহার সন্তানাদি হয়, তবে তাহারাও এই মাসহারা পাইবে। আমার এই সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না।"

অভয় বাবু অনেকক্ষণ নীরব রহিলেন। ভাবিতে লাগিলেন—যে আমার রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা হইতে তাহার রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে আমি কি দোষে এই অতুল বৈভব হইতে বঞ্চনা করিলাম। কি

দোষে ?—সে দোষের মার্জ্জনা নাই। সে দোষ—তাহার অমার্জ্জনীয় অদূরদর্শিতা।

হায় বৃদ্ধ! তুমি কত কালে এই দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছ ?

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শরীর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি যেন দেখিলেন "সেই পূর্ণালোকিত নির্জ্জন-কক্ষে তাঁহার নয়নের সম্মুখে বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে তাঁহার পরলোকগতা পত্নী দাঁড়াইয়া! একি- তাঁহার দৃষ্টি-বিভ্রম নাকি ?—যেন মৃতা পত্নীর বদনমণ্ডলে—নয়নযুগলে তীব্র ঘৃণার ভাব উদ্রিক্ত। মূর্ত্তি যেন অঙ্গুলী-সঙ্কেতে তাঁহাকে উর্দ্ধদেশ দেখাইয়া কি স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যেন তাঁহাকে নীরবে কত ধিক্কার দিতেছে! এ ভীষণ দৃশ্য বৃদ্ধের সহিল না।—বৃদ্ধ বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছাক্রান্ত হইয়া চেয়ার হইতে ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন। পার্শ্বের কক্ষে ভৃত্য ছিল,সে সেই শব্দ শুনিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া দেখিল, বাবু চেয়ার হইতে ভূমিতলে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পতিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

একদিন প্রাতঃকালে জগদীশ বাবুর একটি দ্বিতল কক্ষে সুরেশ একখানি তৈল-চিত্র আঁকিতেছিল। যাহার তৈল-চিত্র আঁকিতেছিল—সে বালিকা। সে কিশোর-বয়স্কা বালিকা সুরেশের সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্টা। এ চিত্র তাহারই। বালিকার বয়ঃক্রম পনর বৎসর। বালিকা অনিন্দ্যসুন্দরী। তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ ঘনকেশদাম পৃষ্ঠদেশে সংসর্পিত,—চূর্ণকুন্তল মন্দানিল-স্পর্শচঞ্চল। অবহুলালঙ্কারশোভিতা বালিকার রূপ যেন দেহে ধরেনা—যেন দেহ হইতে উছলিয়া পড়িতেছিল।

বড় দুঃখ, এই ক্ষুদ্র গল্পে বালিকার সূক্ষ্মভাবে রূপালোচনা করিবার স্থান নাই।

এই বালিকাই আরতি। আরতিকে কেশব বাবু বহুব্যয়ে সংস্কৃত ও ইংরাজী লেখা পড়া শিখাইয়াছিলেন। কেশব বাবুর মত ও ধারণা—যেমন পুত্রকে রীতিমত লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য, তদ্রূপ কন্যাকেও সৎবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য। কেননা, কন্যাকে পরের বাড়ী যাইয়া পরের ঘর আপন করিয়া লইবার সর্ব্বতোমুখী বুদ্ধি শুধু সৎশিক্ষাতেই প্রদান করিতে পারে।

অবকাশ মত, ধীরে ধীরে সুরেশ আরতির চিত্র অঙ্কিত করিতেছিল।

দুই মাস হইল, সুরেশ এই ছবি-আঁকা আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম প্রথম আরতি সুরেশের কাছে বসিয়া সিটিং দিতে লজ্জা বোধ করিত। কিন্তু সুরেশের মধুর স্বভাবে—হাস্যময় বিমল মুখের মধুমাখা কথায়—বিনীত মিষ্ট ব্যবহারে—সুললিত আলাপে, আরতির ক্রমে লজ্জা বা ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। চিত্রাঙ্কনব্যপদেশে ক্রমাগত প্রত্যহ উভয়ে একত্রে নির্জ্জন কক্ষে কিছু সময় কথায় বার্ত্তায় অতিবাহিত করায়, এই দুই মাসে উভয়ের অজ্ঞাতসারে উভয়ের মধ্যে একটা অজানিত সুখদ আকর্ষণের ক্রীড়া চলিতেছিল।

কোন বিশেষ প্রয়োজনে যে দিন আরতির সিটিং দিতে আসিতে বিলম্ব হইত, সুরেশ সে বিলম্বে বড় অসন্তুষ্ট ও চঞ্চল হইত। সে নিশ্চেষ্ট অবস্থায় কাল যাপন করা অবিধেয় জ্ঞানে, আরতিকে বাটী হইতে ডাকিয়া আনিত এবং গুরুর মত অল্প তিরস্কার-অনুপানে তাহাকে কত উপদেশ-ঔষধ দিত। সুরেশের সেই তিরস্কার আরতির বড় মধুর লাগিত, তিরস্কার যে এত মধুর হয়, তাহা আরতি সুরেশের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে জানিত না। আবার কোন দিন হয়ত আরতি অগ্রে আসিয়াছে, কোন কারণবশতঃ সুরেশের সিটিং লইতে বিলম্ব হইতেছে, আরতি তাহার গোলাপাভ কপোলদ্বয় অভিমানে কৃষ্ণাভ গাঢ় গোলাপী রঙ্গে রঞ্জিত করিয়া মুখখানি ভারী করিত। বালকবুদ্ধি সুরেশ তদ্দর্শনে তাহার মনোরঞ্জনার্থ কত "অ্যাপলজী" করিত। আরতি অভিমান করিলে তাহার মুখখানি যেন কাঁদ কাঁদ হইয়া যাইত। বুদ্ধিমতী আরতি তাহা বুঝিত। সে কথার ছলে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিত, অমনি সুরেশের অজ্ঞাতসারে সুরেশের মুখে আরতির সেই হাসির প্রতিবিম্ব পড়িত।

এ চায় উহারে ও চায় ইহারে
দোঁহে দোঁহা মিলি চায়।
চাহিতে চাহিতে যেন আচম্বিতে
দোঁহে এক হ'য়ে যায়॥

এও তাহাই নাকি?—সেইরূপই বটে! নতুবা একজনের হৃদয়, অপরের হৃদয়-স্পন্দনের তালে তালে স্পন্দিত হইবে কেন?

আরতির প্রতিকৃতি আঁকা প্রথমে সুরেশের বেশ সহজ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, ততই যেন সে ছবি-আঁকা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া আসিতে লাগিল। কেননা, সুরেশ আরতিকে যখন যেরূপ ভাবে বসিতে বলিত—যেরূপভাবে চাহিয়া থাকিতে বলিত, মাথাটি

যেরূপ ভাবে হেলাইয়া রাখিতে বলিত—আরতি সেইরূপ করিয়া থাকিলেও সে ভাব বেশীক্ষণ থাকিত না। তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার অঙ্গের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িত। সুরেশ তাহা দেখিয়া স্মিতবদনে আরতিকে চপলা-বালিকা বোধে ধমক দিত। আরতি সে ধমকে অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া আবার সব গোলমাল করিয়া ফেলিত। খানিক পরে আবার ঠিকঠাক হইয়া বসিত। সুরেশ আবার তন্ময় হইয়া ছবি লিখিত। আবার—আবার ঐরূপ গোলমাল—সুরেশ আবার আরতিকে ঠিক হইয়া বসিতে বলিত। আরতি শিক্ষকের নিকট ধমক খাইয়া যেন জড়সড় হইয়া যাইত। এই ভাবে ছবি আঁকা অতি অল্পই অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাতে সুরেশ দুঃখিত নহে বরং আনন্দিত—কারণ তাহার মনে হইত, সে অনন্তকাল পর্য্যন্ত আরতির ছবি আঁকিয়াও শেষ করিতে পারিবে না। যেন আরতির বৈচিত্রময় সৌন্দর্য্য মনুষ্যের নির্জীব তুলিকার স্পর্শের বাহিরে।

সুরেশের কোমল, উর্ব্বর হৃদয়ে প্রণয়ের অঙ্কুর দেখা দিয়াছে। আর আরতির?—সে কথা লিখিতে আমার কৃষ্ণা মসী স্বর্ণ-বর্ণ ধারণ করুক।

যখন সুরেশ আরতির ছবি আঁকিত, সেই সময়ে কখন কখন সুরেশের মাতুলানী আসিয়া উভয়ের অজ্ঞাতসারে বাতায়ন-পথে মুখ দিয়া তাহাদের এই প্রেমের খেলা দেখিয়া, মনে মনে তাহাদের ভাবী সুখ কল্পনা করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইতেন। সে আনন্দ তিনি একা উপভোগ করিতেন না। আরতির জননীকেও তিনি তাহার অংশ দিতেন।

এমন কেহ বিজ্ঞানবিৎ এ সংসারে আছেন—যিনি মনের ফটোগ্রাফ তুলিতে পারেন?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অভয়বাবু যে রাত্রে চেয়ার হইতে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন, সেই রাত্রি-শেষে তাহার প্রবলবেগে জ্বর আসিল। এমন কি তিনি জ্বরের প্রাবল্যে একেবারে অজ্ঞান হইয়া গেলেম।

বাটীর ভৃত্যেরা তাঁহার এ অবস্থা দর্শনে ভীত হইয়া গ্রামের এল, এম, এস, পাশ হরিহর ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। হরিহর বাবু আসিয়া নাড়ী পরীক্ষা করিলেন। থার্ম্মোমিটার দিয়া টেম্পারেচার লইলেন—দেখিলেন টেম্পারেচার একশো পাঁচ। ষ্টেথেস্কোপ দ্বারা বুক পিঠ পরীক্ষা করিয়া বুঝি-

লেন, নিউমনিয়ার সূত্রপাত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ হরিহর বাবু ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। এবং সুরেশকে টেলিগ্রাম করিবার জন্য ভৃত্যদিগকে বলিলেন। ভৃত্যেরা কহিল "কর্ত্তার হুকুম না হইলে টেলিগ্রাম কি করিয়া করিব?"

এই সময়ে অভয় বাবুর জ্ঞানের সঞ্চার হইলে, তিনি নয়ন উন্মীলিত করিয়া হরিহর বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কখন আসিয়াছেন?"

হরিহর বাবু উত্তরে কহিলেন "আমি আধ ঘণ্টা হইল, আসিয়াছি। আমি মনে করিতেছি, সুরেশকে একটি টেলিগ্রাম করি।"

অভয় বাবু ধীরে বলিলেন "না—টেলিগ্রাম করিবার প্রয়োজন এখন নাই। আমার পীড়ার বিষয় তাহাকে পত্র লিখুন। আসিতে লিখিবার প্রয়োজন নাই।"

হরিহর বাবু সেই ভাবেই পত্র লিখিলেন। এবং অভয় বাবুর জন্য ঔষধাদি যাহা আবশ্যক—সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া বিদায় হইলেন।

হরিহর বাবু অভয় বাবুর পারিবারিক ডাক্তার। সেই দিন হইতে তিনি নিজে দুই তিনবার করিয়া অভয় বাবুকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। অভয় বাবুর পীড়া শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সমাগম হইতে লাগিল। তাঁহার পীড়ার সম্বাদ পাইয়াও সুরেশ আসিল না কেন, এ প্রশ্ন অভয় বাবুর মনে নিয়ত উত্থিত হইয়া তাঁহাকে নিতান্ত কাতর করিতে লাগিল। গ্রামের গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গের বিবেচনায় সুরেশকে লোক পাঠাইয়া কলিকাতা হইতে আনাই ধার্য্য হইয়া গেল। অভয় বাবু সে কথায় দ্বিরুক্তি করিলেন না। একজন ভৃত্য কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

অভয় বাবুর পীড়ার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা যেন একটু ভাল। বিজ্ঞ চিকিৎসক হরিহর বাবুর চিকিৎসায়, জ্বরের প্রাবল্য কিছু কমিল—তবে ভয়ের কারণ দূরীভূত হইল না।

রাত্রি আটটা। ভৃত্যেরা এদিক ওদিক ঘুরিতেছিল। সে সময়ে অভয় বাবুর কক্ষে কেহই ছিল না। কক্ষের প্রবেশদ্বার অল্প উন্মুক্ত ছিল। এমন সময়ে ধীরে ধীরে অতি সন্ত্রস্ত-পদ-বিক্ষেপে এক যুবক সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। যুবকের মুখমণ্ডল বিষাদকালিমাঙ্কিত—চিন্তাজড়িত। অভয় বাবুর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত, মুখ মাত্র উন্মুক্ত ছিল, তিনি তখন তন্দ্রাভিভূত। যুবক ধীরে ধীরে আসিয়া অভয় বাবুর পার্শ্বে শয্যায় উপবেশন পূর্ব্বক তাঁহার মুখের

দিকে একদৃষ্টে উদ্বিগ্ন নয়নে চাহিয়া রহিল। ঠিক এমনি সময়ে অভয় বাবু চক্ষু উন্মীলিত করিয়া চাহিলেন। অভয় বাবু চাহিতেই যুবক বলিল "বাবা কেমন আছেন ?"

অভয় বাবু দেখিলেন,—তাঁহার পুত্র সুরেশ। তাঁহার সেই রোগক্লিষ্ট-বদনে ক্ষীণক্ষণপ্রভাসম একটা আনন্দের আভা যেন চকিতে চলিয়া মিলাইয়া গেল। অভয় বাবু বলিলেন "সুরেশ ?"

সুরেশ বলিল "আজ্ঞে হাঁ—আপনি কেমন আছেন।"

অভয় বাবু কহিলেন "আমি ভাল আছি।" এই উত্তরে সুরেশ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। সে উষ্ণ নিশ্বাস-বায়ু-তরঙ্গ যেন তাহার মনের একটা বিষম ভার সরাইয়া দূরে ফেলিয়া দিল।

সুরেশ পিতার পীড়ার সম্বাদজ্ঞাপক পত্র পাইয়াও বিশেষ বিচলিত হয় নি। ভাবিয়াছিল সামান্য অসুখ হইয়াছে মাত্র। সেই পত্র সে আরতিকে দেখায়, আরতি পত্র পাঠ করিয়াই তৎক্ষণাৎ সুরেশকে বাটী আসিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে। সুরেশ প্রথম বাটী আসিতে স্বীকৃত হয়নি—কিন্তু আরতির নিতান্ত জিদে ও মাতুল মাতুলানীর একান্ত উপরোধে সেই দিনই কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বাটী আসে। সুরেশ পিতার অবস্থা দেখিয়া আরতির সাশ্রু অনুরোধের মূল্য বুঝিয়া, মনে মনে আপনাকে শত তিরস্কৃত করিয়া, আরতির বুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল।

বিজ্ঞ ও বহুদর্শী ডাক্তার হরিহর বাবুর সুচিকিৎসায় এবং সকলের ঐকান্তিক শুশ্রূষায় অভয় বাবু সে যাত্রায় মৃত্যুর করাল কবল হইতে রক্ষা পাইলেন। তবে তিনি প্রায় দুইমাস শয্যাশায়ী রহিলেন। পীড়ার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের উপর তাঁহার ক্রোধও অন্তর্দ্ধান করিল।

* * * *

আরতির সহিত সুরেশের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আরতি বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবায় প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছে। পত্নী থাকিতে অভয় বাবু যে সুখে ছিলেন, সেই সুখ-তরঙ্গ যেন বাণ ডাকিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে। সুজলা সুফলা ধরিত্রী অভয় বাবুর চক্ষে যেন আবার সর্ব্বসুখদা হইয়া উঠিয়াছে। এত সুখ পুঞ্জীভূত হইয়া যে তাঁহার নয়নের অন্তরালে এতদিন কোথায় লুক্কায়িত ছিল, অভয় বাবু তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। অভয় বাবু বধূমাতাকে পাইয়া যেন কোন্ স্বর্গ হইতে কোন্ দেবীকে কন্যারূপে লাভ করিলেন।

শ্বশুর বধূমাতাকে একেবারে তাঁহার সম্মুখে লজ্জা করিতে বারণ করিয়াছেন। এখন সর্ব্বদাই হাস্যময়ী আরতি পূজনীয় শ্বশুরের চতুর্দ্দিকে উপগ্রহের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। অভয় বাবুর শুষ্ক সংসারতরু আবার নব ফল-ফুলে শোভিত হইয়া উঠিল।

বৈশাখের শেষে একদিন রাত্রি আটটা বাজিয়াছে। আরতি ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিয়া অভয় বাবুকে শুনাইতেছিল। এমন সময়ে সেই প্রকোষ্ঠে সুরেশ প্রবেশ করিল। সুরেশ প্রবেশ করিতেই অভয় বাবু তাহাকে বলিলেন "দেখ ঐ আলমারীটা খুলিয়া আমার দলিলের বাক্সটা বাহির কর ত।" অভয় বাবু চাবির গুচ্ছ সুরেশকে দিলেন, সুরেশ দলিলের বাক্স আনিয়া দিল। অভয় বাবু বাক্স খুলিয়া একখানি দলিল বাহির করিলেন। কক্ষে বাতি জ্বলিতেছিল। সুরেশকে বলিলেন "এই দলিলখানি বাতির আগুনে পুড়াইয়া ফেল—খুলিও না।"

সরল-প্রকৃতি সুরেশ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আরতি যেন একটু একটু কিছু বুঝিল। সুরেশ সেই বাতির শিখায় দলিলখানি পোড়াইল।

অভয় বাবু বিস্ফারিত-লোচনে—স্মিতবদনে তাহা দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন "সমস্তটা পুড়াইয়া ফেল, কোথাও একবিন্দুও বাকী না থাকে। পুড়াইয়া একেবারে চূর্ণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া আইস।" সুরেশ তাহাই করিল। এই দলিল কিসের?

ইহা অভয়বাবুর উইল!

পাঠকের কেশব বাবুকে মনে আছে ত? কেশব বাবুর সুসজ্জিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিতেই দেখিতে পাইবে—তাহার প্রাচীরে লম্বিত পরমাসুন্দরী বালিকার একখানি তৈল-চিত্র। যে চিত্রকর এ তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, সে যেন ইহার প্রাণদান দিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল,—কিন্তু হীনশক্তি মানুষের সে সাধনা সফল হয় নাই। চিত্র—নির্ভুল। চিত্রের এক কোণে ক্ষুদ্র অক্ষরে লিখিত "সুরেশ"।

পাঠক বুঝিলে—এ চিত্র কাহার?—ইহাই সেই আরতির প্রতিকৃতি। প্রতিকৃতির নিম্নে—মাঝখানে লেখা ———

"সুখ-স্মৃতি"।

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

———

অন্তরালে।

সে পুরাণো স্মৃতিটুকু জাগে না কি হৃদে
ওগো মোর হৃদয়ের মণি!
তুমি যে আমার ছিলে সরবস্ব ধন
জীবনের চির-সঞ্জীবনী।
সরমে মরিছ কেন—কিম্বা আছে ভয়?
অতীতের কথাগুলো ভুলে;
রয়েছ আপন মনে আপনার সনে
কেন তুমি অত অন্তরালে?
আড়ালেই থাক ওগো জীবনের সখা
আড়ালেই বড় নাকি ভাল,
আড়ালে আঁধার থাকে দৃষ্টি নাহি যায়,
সেই টুকু করে দাও আলো।
সেখানেতে বড় সুখ বড়ই আমোদ
বিরাজিত সদা বড় প্রেম,
সেখানের গাছে ফলে মুকুতার ফল
প্রেমিকের হাস্তে-ঝরে হেমা
আবেগের স্রোত সেথা বয়ে যায় ধীরে—
পিয়াসা নাহিক কভু মিটে।
মনে পড়ে মুখখানি—তীব্র জ্বালাতন
দীর্ঘ-শ্বাসে বক্ষ যায় ফেটে।
মন-বিমোহন সাজে হৃদয়-আসনে
নীরবে রয়েছ তুমি বসে'
মিলিব তোমার সনে গেহকর্ম্ম যত—
সমাপিয়া, অন্তরালে এসে।

শ্রীমতী যামিনীপ্রভা।

দেবীগড়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আদেশ।

সে দিন কমলার চিত্তের স্থৈর্য্য ছিল না। তাহার মনের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে একটা করুণ-কম্পনের উদয় হইতেছিল,—আশার আলোকের ক্ষীণ-রেখার উপরে নিরাশার গাঢ় অন্ধকার ঘনাইয়া বসিতেছিল।

তাহার মনে হইতেছিল, স্বপ্ন কি সত্য হয় না? স্বপ্ন কি বাস্তবিকই অলীক কল্পনা? কিন্তু গোলোকনাথ সম্বন্ধে আমি যাহা স্বপ্নে দেখিলাম, বাস্তবিক কখনও কি আমি সেরূপ চিন্তা করিয়াছি? কৈ, কখনও না। তবে এরূপ দেখিলাম কেন? তবে স্বপ্ন কি? কেহ কেহ বলেন,—চিন্তা-স্রোতের গতির কাল্পনিক দৃশ্যকে স্বপ্ন বলা যায়। যদি তাহাই হয়, তবে গোলোকনাথকে কখনও কখনও চিন্তা করিয়াছি—গোলোকনাথ সম্বন্ধেই না হয়, নানাপ্রকার ব্যাপার দেখিতে পারি! কোথাকার রমজান খাঁ—মহম্মদ খাঁ! কে এই অসভ্যরাজ্যে আসিয়া রাজ্য ও রাজনীতি সম্বন্ধে কি জানিয়া গিয়াছে, না জানিয়া গিয়াছে, তাহা দেখিব কেন? তবে কি স্বপ্ন সত্য?

কমলার মনে হইল, তাহার পিতা একদিন বলিয়াছিলেন, স্বপ্ন সকলই যে সত্য, তাহা নহে। আবার সকলই যে মিথ্যা, তাহাও নহে।

মিথ্যা স্বপ্ন—মানুষ যাহা চিন্তা করে, তাহার বীজ মনের গায়ে দাগ হইয়া লাগিয়া থাকে। মানুষ যখন ঘুমাইয়া পড়ে, নিশ্চিন্ত হয়,—তখন অপর লোকের তজ্জাতীয় চিন্তাস্রোত আসিয়া সেই চিন্তাবীজের গায়ে ঘাত প্রতিঘাত লাগে,—তাই ধারাবাহিকরূপে মানুষ স্বপ্ন দেখে। কিন্তু এগুলির প্রায়ই মূলে কিছু থাকে না।

সত্য স্বপ্ন—নিদ্রাকালে মানুষের আত্মা সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া বাহির হন। শ্যেনপক্ষী পায়ে রজ্জু করিয়া যেমন আকাশে উড়ে, আত্মাও তেমনি

অপান বায়ুর সূত্র লইয়া বাহির হন,—এবং সেই সময় যাহা দর্শন করেন, মানুষ তাহা স্বপ্ন দেখে বলিয়া জ্ঞান করে। ইহা কিন্তু সত্য হয়। আত্মা বাহির হইয়া যে লীলা করেন,—তাহা জগতের লীলার ন্যায়, সৎও বলা যায়, অসৎও বলা যায়।

সত্য স্বপ্ন কম লোকে দেখে। আত্মা যাহাদের যত আবদ্ধ, তাহারা সে স্বপ্ন তত কম দেখে।

কমলা ভাবিল, হয়ত আমার এ স্বপ্ন সত্য। হয়ত গোলোকনাথ আসিতেছে। তখন তাহার মনে আর এক চিন্তার উদয় হইল। সে তখন করতালি প্রদান করিল।

অবনত মস্তকে এক দাসী আসিয়া কমলার সম্মুখে দাঁড়াইল।

কমলা বলিল,—"একখানা পাল্কী ডাকিতে বল। আর ত্রিশ জন সৈন্যকে সজ্জিত হইতে আদেশ কর। আমি রাজপ্রাসাদে যাইব।"

দাসী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"পাল্কী ও সৈন্যেরা বাহিরে অপেক্ষা করিতেছে।"

কমলা বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া বাহির হইল এবং বাহকদিগকে রাজপ্রাসাদে গমন করিতে অনুমতি করিয়া পাল্কীতে আরোহণ করিল। সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া বাহকগণ পাল্কী লইয়া পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে গমন করিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কমলার পাল্কী রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল।

রাজা দেবীর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সিংহ-দরোজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কমলা পাল্কী হইতে অবতরণ করিলে পুনঃপুনঃ অভিবাদনপূর্ব্বক মন্ত্রণাগারে লইয়া গেলেন।

রাজা তখনই মন্ত্রীদিগকে ডাকিতে পাঠাইলেন। তিন জন মন্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা আসন গ্রহণ করিলেন। কমলা পূর্ব্বেই এক প্রধান আসনে উপবিষ্ট হইয়াছে;—মন্ত্রিগণ দেবীকে অভিবাদন করিয়া স্ব স্ব আসনে উপবেশন করিলেন।

রাজা বিনীতস্বরে বলিলেন,—"দেবি, সহসা আপনার আগমনে আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি।"

কমলা। ভয়ের আপাততঃ কোন কারণ নাই। যে জন্য আসিয়াছি—শোন।

রাজা। আজ্ঞা করুন।

কমলা। তুমি আমাকে প্রকারান্তরে বন্দী করিয়াছ।

রাজা। না মা,—অমন কথা মুখেও আনিবেন না। আপনার ক্ষমতা অসীম,—আপনি ইচ্ছা করিলে, আমার সমস্ত রাজ্য বিদ্যুদগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। আমি কোন ছার যে, আপনাকে বন্দী করিব?

কমলা। তবে আমি আমার পিতামাতার নিকটে যাইবার জন্য পুনঃপুনঃ প্রস্তাব করিতেছি—তুমি সে সকল প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতেছ কেন?

রাজা। না মা, আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। তবে বড় বিপদের আশঙ্কা করিয়াই আপনাকে এখানে রাখিতেছি।

কমলা। আমাকে এখানে রাখিলেই তোমাদের রাজ্যের অমঙ্গল হইবে।

রাজা। মাতা আগে যতই ভয় দেখান, সম্মুখে থাকিলে কখনই সন্তানের বিপদ দেখিতে পারেন না।

কমলা। আমি নিশ্চয়ই পিতামাতার নিকটে যাইব।

রাজা। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন—নদীর জল অত্যন্ত স্ফীত হইয়াছে।

কমলা। ও কথাগুলি তোমার ছলনা মাত্র।

রাজা। আপনি অন্তর্য্যামিনী, সবই বুঝিতে পারেন।

কমলা। ভাল, আমি আর পনর দিন এখানে অবস্থান করিব। তার পরে যদি তুমি আমার গমনে বাধা দাও,—তখন তোমাকে উপযুক্ত দণ্ড দিয়া আমি প্রস্থান করিব।

রাজা বিস্মিতনয়নে প্রধান মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন,—কমলা দেখিল, মন্ত্রী রাজাকে নয়নেঙ্গিতে কি বলিল, রাজা নীরব হইলেন।

কমলা বুঝিল, তাহার প্রস্থান-প্রস্তাবেরই কি একটা কুটিল পরামর্শ করিবে, তাহারই ইঙ্গিত করিল। তখন অনন্যোপায় হইয়া কমলা অন্য কথা পাড়িল। বলিল,—"আর একটা কথা।"

রাজা বিনীতস্বরে বলিলেন—"আজ্ঞা করুন।"

কমলা। খুব শীঘ্রই একটি যুবক কয়েকজন পার্ষদসহ তোমাদের রাজ্যে আগমন করিবে।

রাজা। কত দিন মধ্যে?

কমলা। ঠিক নাই—আ'জ হইতে দশ দিনের মধ্যে আসিতে পারে।

রাজা। কেন?

কমলা। বাণিজ্য করিতে।

রাজা। কথাটা ভাল নয়। মুসলমানের গুপ্তচরও হইতে পারে।

কমলা। তিনি বাঙ্গালী,—আর তাঁহার সঙ্গে মুসলমানও থাকিতে পারে।

রাজা। তাহাদের কি মস্তক কাটিয়া আপনার চরণে উপহার দিতে আজ্ঞা করিতেছেন?

কমলা। না না,—তাহাদিগকে সসম্মানে আনিয়া আমার ওখানে পাঠাইতে হইবে। তাহাদের একটি কেশ যদি তোমার লোকের দ্বারা স্থানচ্যুত হয়, নিশ্চয় জানিয়ো তখনই—সেই মুহূর্ত্তেই আমার আজ্ঞায় বিদ্যুতের আগুণে তোমার সমস্ত রাজ্য ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

রাজা। খুব সম্ভব তাহারা গুপ্তচর।

কমলা। আমার আদেশ,—তাহারা যাহাই হউক, সযত্নে আমার নিকটে পঁহুছাইয়া দিবে। তারপরে যে ব্যবস্থা হয়, আমি করিব।

ঠিক এই সময়ে এক ভৃত্য আসিয়া রাজাকে অভিবাদন করিয়া বলিল,—"নদী-কিনারের কোটাল একজন দূত পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন,—"এই স্থানেই তাহাকে ডাকিয়া আন্।"

ভৃত্য গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। দূত অভিবাদন করিয়া বলিল—"নদী-কিনারের কোটাল মহারাজের নিকটে অধীনকে পাঠাইয়াছেন।"

রাজা। সংবাদ কি?

ভৃত্য। গতকল্য রাত্রে একজন বাঙ্গালী যুবক ও আটজন যোদ্ধাপুরুষ নদী পার হইবার চেষ্টা করিতেছিল। কোটাল তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছেন,—এক্ষণে মহারাজের কি আদেশ হয়, জানিতে পাঠাইয়াছেন।

কমলার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল—"রাজা, তোমার কর্ম্মচারীরা কেবল পুরাতন সংবাদই বহন করিতে পারে। আমি যাহাদিগের কথা বলিতেছিলাম, তাহাদেরই সংবাদ লইয়া আসিয়াছে। আমার আজ্ঞা স্মরণ কর,—তাহাদিগকে সসম্মানে ও সাবধানতার সহিত আনিয়া আমার নিকট পাঠাও।"

রাজা মন্ত্রিগণের মুখের দিকে চাহিলে, তাহারা সম্মতি-সূচক ইঙ্গিত করিল। রাজা বলিলেন—"আপনার আদেশমতই কার্য্য হইবে।"

পরে দূতকে বলিলেন,—"কোটালকে গিয়া বল, সেই মানুষগুলিকে সসম্মানে দেবীর নিকট পাঠাইয়া দেয়।"

দূত অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

কমলা বলিল,—"আমি এখনই যাইব।"

রাজা ও মন্ত্রিগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কমলা বাহির হইল,—তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-দরোজা পর্য্যন্ত গমন করিলেন।

কমলা পাল্কীতে উঠিলে—বাহকগণ পাল্কী তুলিল, তখন রাজা ও মন্ত্রিগণ পুনঃ পুনঃ অভিবাদন করিতে করিতে কিয়দ্দূর শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। তারপরে কমলার আদেশ লইয়া প্রাসাদে ফিরিলেন।

প্রান্তর বহিয়া কমলার পাল্কী চলিয়াছে। হু হু করিয়া প্রান্তরের মুক্ত বায়ু আসিয়া পাল্কীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। কমলা ভাবিতেছে, তবে কি সত্য সত্যই গোলোকনাথ আসিয়াছে! আমার স্বপ্ন কি তবে সত্য? তারপরে তাহার মনে হইল,—আমি গতকল্য শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম, তাহারা কা'ল পরামর্শ করিতেছে—কা'ল রাত্রে গোলোকনাথ সেখান হইতে যাত্রা করিতেছে,—তবে কা'ল তাহারা নদী-কিনারে আসিবে কি করিয়া? তারপরে সে ভাবিল—স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে অতীত ঘটনা স্বপ্নে বর্ত্তমানবৎ দেখা যাইবে, তাহারই বা বিচিত্রতা কি! কিন্তু যদি গোলোকনাথ না হইয়া অপর কেহ হয়? হয় তা' কি করিব। যেমন আছি, তেমনই থাকিব। ভবিতব্যতা যাহা রচনা করিতেছে, তাহা হইবেই।

ক্রমে তাহার শিবিকা পার্ব্বত্য প্রাসাদে প্রবেশ করিল। সে অবতরণ করিয়া প্রাসাদ-মধ্যে প্রবেশ করিল।

তখন দিবা অবসান হইয়াছিল। সন্ধ্যার আঁধার ধীরে ধীরে সমগ্র মেদিনী গ্রাস করিল। মৃদুমন্দ সান্ধ্যসমীরণ তাহার দেহ স্নিগ্ধ ও মনে বল আনয়ন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন দিবা একপ্রহরের সময় কমলা স্নানাহারাদি সম্পন্ন করিয়া তাহার শয়নকক্ষে পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেছিল, এমন সময় নতমস্তকে এক দাসী আসিয়া তথায় প্রবেশ করিল। তাহার দিকে চাহিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল,—"সংবাদ কি ?"

অভিবাদন করিয়া দাসী বলিল,—"কয়েকজন বন্দীকে লইয়া জনকয়েক সৈন্য আসিয়াছে। বন্দিগণের প্রতি কি আজ্ঞা হয়, তাহাই জানিতে চাহে।"

কমলার বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বন্দী কয়জন ?"

দাসী। দশ জন।

কমলা। সবাই কি একজাতি।

দাসী। আমি ঠিক বলিতে পারি না। তবে দূত বলিয়াছিল, একজন বাঙ্গালী—অপর নয় জন বিভিন্ন জাতি। বাঙ্গালীটি ভদ্র যুবক।

কমলা। বাঙ্গালী যুবককে নিরস্ত্র করিয়া এখানে আনয়ন কর। অপর কয়জনকে নিরস্ত্র করিয়া সবিশেষ ভদ্রতার সহিত আমাদের অতিথি-শালায় প্রেরণ করিতে বলিয়া আইস। যেন সেখানে রীতিমত প্রহরী থাকে।

দাসী অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই একজন সাহসী যুবককে সঙ্গে লইয়া কমলার কক্ষে প্রবেশ করিল।

পর্দ্দা সরাইয়া সেই যুবক যেমন গৃহে প্রবেশ করিল, আর একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ যেন কমলার শিরায় শিরায় নৃত্য করিয়া ফিরিয়া গেল। কমলা বিস্মিতনয়নে দেখিল,—সে গোলোকনাথ।

গোলোকনাথ দেখিল—এতদিন যাহাকে চিন্তা করিয়া আসিয়াছে, সম্মুখে সেই ধ্যানের প্রতিমা কমলা।

গোলোকনাথ আবেগভরে কি বলিতে যাইতেছিল,—নয়নেঙ্গিতে কমলা নিষেধ করিল, গোলোকনাথ নীরব হইল।

কমলা দাসীকে একখানা চৌকি আনিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে বলিল। দাসী আদেশ প্রতিপালন করিল।

তখন আবেগ-কম্পিতকণ্ঠে কমলা বলিল,—"গোলোকনাথ, তুমি এখানে কি প্রকারে আসিলে? কতদিন তোমার সংবাদ পাই নাই। আমি সেই যে পলাইয়া আসিয়াছিলাম,—তারপর তোমার আর কোন সংবাদই পাই নাই,—কিন্তু আমি প্রতিদিন আশা করিতাম, তুমি আসিবে। তোমায় আমায় আবার সাক্ষাৎ হইবে।"

গোলোকনাথ পুলক-পূর্ণিতস্বরে কহিলেন,—"কমল, তুমি সেই দুর্দ্দান্ত দস্যুকরে পড়িয়া বিবিধ প্রকারে লাঞ্ছিত হইয়া কি প্রকারে কোথায় গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিলে, অথবা বন্য পশুর গ্রাসভুক্ত হইয়া জীবলীলা সম্বরণ করিলে, তাহা জানিতে পারিলাম না। কিন্তু সেই অবধি আমি শান্তি-সুখ হারাইয়াছি। আমার বুকের মধ্যে তোমার সেই বিষাদ-চঞ্চলমূর্ত্তি নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাকে বড় চঞ্চল—বড় কাতর করিত।"

কমলা। কেন আমাকে ভুলিতে চেষ্টা কর নাই?

গোলোক। চেষ্টা করিয়াছি—পারি নাই। পাষাণে একবার দাগ পড়িলে, আর তাহা উঠে না।

কমলা। তারপরে?

গোলোক। দিল্লী হইতে মহম্মদ খাঁ আসিয়া শ্রীহট্টে অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেখান হইতে বিতাড়িত হইয়া সদলে এইদিকে আগমন করেন। যে দস্যুগণ তোমাকে ধৃত করে, আমার সাহায্যে মহম্মদ খাঁ তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি অপহরণ করেন। আমি উঁহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছি, সুসভ্য মুসলমান নায়ক আমাকে অত্যন্ত কৃপা করেন। তারপরে আমার চেষ্টা হইল, তোমার সন্ধান করা। চারিদিকে তোমার সন্ধানে দূত প্রেরণ করি।

কমলা। দূতেরা আমার মৃত্যু-বারতা তোমাকে দিতে পারে নাই বলিয়া অবশ্য দুঃখিত হও নাই?

গোলোক। কমলা, দূর হইতে যেমন চন্দ্র-সূর্য্যের মণ্ডল দেখা যায়, তেমনি যদি মানুষের মন দেখা যাইত, তাহা হইলে বড় ভাল হইত।

কমলা। আমি কিন্তু তোমার কথা একদিনও বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

গোলোক। আমার চেয়ে ভাগ্যবান্ মানুষ আর নাই। যাক্, তোমাকে তখন যেমন দেখিয়াছিলাম, এখন তার চেয়ে আরও সুন্দরী দেখিতেছি,—কলিকা বুঝি ফুটিতেছে।

কমলা। তোমার সব কথাই ব্যঙ্গমাখা। তুমি এখানে আসিবে, তাহা আমি আগেই জানিতে পারিয়াছিলাম, এবং সেইজন্য রাজাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম,—যে বিদেশী এখানে আসিতেছেন, তাঁহাকে অতি সম্মানে আমার নিকটে পাঠাইবে এবং কোন প্রকারে যেন তিনি ও তাঁহার সঙ্গী লোকজনেরা কষ্ট না পান।

গোলোক। তাই কমলা, আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন! প্রথমে আমাদিগকে নদী-কিনারের কোটাল বন্দী করিয়াছিল,—কিন্তু তাহার প্রেরিত দুত রাজাদেশ লইয়া গেলে আমাদিগকে সসম্মানে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

কমলা। যখন কোটালের দুত রাজার নিকটে আসে, আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

গোলোক। তুমি কি করিয়া জানিতে পারিলে আমি আসিতেছি?

কমলা। স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম।

গোলোক। আমাকেও কি এ দেশের লোক ভাবিতেছ? স্বপ্ন কি সত্য?

কমলা। অনেক স্বপ্ন বেদবাক্যের ন্যায় নিশ্চয় সত্য। তুমি আসিবে স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম—তাহা কি মিথ্যা হইল?

গোলোক। আমার বোধ হয় মনস্তত্ত্ববাদের কোন ভাবে উহা অবগত হইতে পারিয়াছ?

কমলা। জড়বাদটা সহজে বিশ্বাস করিতে পার, আর আধ্যাত্মিকতাটাকে মোটে বুঝিতে পার না কেন? বাবার মুখে শুনিয়াছিলাম—জীবাত্মা নিদ্রাকালে বাহিরে গিয়া যাহা দর্শন করেন, আমরা তাহাকেও স্বপ্ন বলিব। স্বপ্ন আত্মা বা জীবের একটা অবস্থা।

গোলোক। ভাল, আমি আসিব জানিতে পারিয়াছিলে, কোথা হইতে আসিতেছি—উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে তুমি কিছু জানিতে পারিয়াছ কি?

কমলা। তাও জানিয়াছি।

গোলোক। বল দেখি?

কমলা। যায়গার নাম কি জানি না,—রাত্রিকালে একটা জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া তোমরা অনেকগুলি মানুষে কথা কহিতেছিলে। তার মধ্যে একজনের নাম মহম্মদ খাঁ—একজনের নাম রমজান খাঁ।

গোলোক। আশ্চর্য্য কথা! তারপর?

কমলা। তারপরে এই রাজ্যের মধ্যে তুমি আসিলে এখানকার সর্ব্বনাশ করিতে। আপাততঃ মহাজন বলিয়া সৈন্যের রসদ সংগ্রহ হইবে, আর ইহা-দের অবস্থা দর্শন করা হইবে।

গোলোক। অদ্ভুত—অদ্ভুত! ভাল, কি উদ্দেশ্যে এখানে আমার আসা?

কমলা। অধিনীকে দর্শন দিতে।

গোলোক। তাহা হইলে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল?

কমলা। কি ধারণা?

গোলোক। আমাদের ধারণা ছিল,—তোমার দেবীসদৃশ অপরূপ রূপ দেখিয়া এ দেশের অসভ্য মানুষেরা মুগ্ধ হইয়া দেবী বলিয়া পূজা ও সম্মান করিতেছে। এখন তোমার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া, আমারও জ্ঞান হইতেছে, তুমি দেবী।

কমলা হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তুমি কি এ সকল দৈবী ব্যাপার বলিয়া মনে কর?"

গোলোক। মানুষে কি এমন জানিতে পারে?

কমলা। সবাই পারে—তবে কেহ বিশ্বাস করিয়া মনে রাখে না। যারা মনে রাখে, তারা বলিতে পারে। চিত্তটা একটু পরিষ্কার হইলেই সব হয়।

গোলোক। এ দেশের রাজা তোমাকে দেবী বলিয়া বন্দী করিয়াছে,—আমিও দেবী বলিয়া পরিচয় পাইতেছি—আমি বন্দী করিতে পারিব না। কিন্তু কমলা—এ ক্ষুদ্র হৃদয়ের দেবমন্দিরে অনেকদিন আগেই তোমার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেছি।

কমলা। তা' যার যেমন ইচ্ছা, সে তেমনই করিবে,—কিন্তু তোমার বোধ হয়, খাওয়া হয় নাই?

গোলোক। না,—তোমার কৃপায় কোটাল আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়া আহারাদি করাইয়া তবে পাঠাইয়া দিয়াছে। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব?

কমলা। হুকুম চাই?

গোলোক। কাজেই, যাহার আজ্ঞায় বন্দী মুক্ত হয়, মুক্ত মানব ফাঁসিতে ঝুলে, তাহার হুকুমের প্রয়োজন বৈ কি।

কমলা। (হাসিয়া) হুকুম দেওয়া গেল,—যাহা বলিবার থাকে, নির্ভয়ে বলিতে পার।

গোলোক। এইরূপেই কি জীবনের লীলা-খেলা করিবে, না আর কিছু করিবে?

কমলা। কি করিব?

গোলোক। তোমার পিতামাতার নিকটে যাইবে না?

কমলার চক্ষু জলভারাকীর্ণ হইল। বলিল,—"যাইবার উপায় নাই গোলোকনাথ, আমি প্রকারান্তরে বন্দিনী।"

গোলোক। আমি সে কথা মহম্মদ খাঁর গুপ্তচরের নিকটে শুনিয়াছি। কিন্তু উদ্ধারের উপায় শীঘ্রই হইবে।

কমলা। কি প্রকারে?

গোলোক। মহম্মদ খাঁর সৈন্য অতি নিকটে আসিয়া পঁহুছিয়াছে। কেবল সৈন্যগণের আহার্য্য নাই বলিয়া নগরে আসা হইতেছে না। আমি মহাজনরূপে এখানে আসিয়াছি—ব্যবসায় করিব বলিয়া খাদ্য দ্রব্য কিনিয়া বিদেশে রপ্তানীর নাম করিয়া কিছু আহার্য্য নদীপারে তাহাদের নিকটে পাঠাইব—বাকি এখানে সংগ্রহ করিয়া রাখিব। তখন মহম্মদ খাঁ সৈন্য লইয়া আসিয়া এ রাজ্য দখল করিবে।

কমলা। এ রাজ্য দখল করিয়া মুসলমান সেনাপতির কিছুমাত্র লাভ হইবে না।

গোলোক। কেন?

কমলা। ইহাদের মণি-মাণিক্যাদি কোন সম্পত্তি নাই। থাকিবার মধ্যে পশু আর বন্য ফল,—সেই সকল আহরণ ও বিক্রয় করিয়া ইহারা রাজ্য রক্ষা ও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

গোলোক। মহম্মদ খাঁ দৃঢ় সংকল্পী—যাহা মনে করিয়াছে, তাহা না করিয়া ফিরিবে না।

কমলা। ইহারা আমার অনুগত।

গোলোক। তা' বলিয়া মহম্মদ খাঁর কোন বাধা হইবে না।

কমলা। মহম্মদ খাঁর বাধা না হউক, মহম্মদ খাঁর প্রেরিত মহাজনের হইতে পারে।

গোলোক। কিন্তু তাহার অর্থে প্রতিপালিত হইয়া যে কার্য্য করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছি, তাহা না করিলে পাতক হইবে।

কমলা। আর আমাকে যাহারা বিপদুদ্ধারের জন্য পূজা করিয়া আসি-

তেছে, আমি জানিয়া শুনিয়াও যদি তাহাদের সর্ব্বনাশ করি, তাহা হইলে আমারও কর্ত্তব্যকর্ম্মে ক্রুটী হইবে।

গোলোক। তুমি যদি তাহা কর, আমি নিশ্চয়ই বিপদে পড়িব।

কমলা। তাহাও বুঝিতেছি, কিন্তু গোলোকনাথ কর্ত্তব্যকর্ম্ম অপালনে মহাপাতক হইবে।

গোলোক। উভয়ের সম্বন্ধেই সে কথা।

কমলা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কার্য্য করিব।

গোলোক। যাহা ভাগ্যে আছে—তাহাই ঘটিবে। হয় ত জীবনে আর দেখা হইবে না। কমলা, একটা কথা শুনিবার জন্যে অনেকদিন মনে বাসনা আছে—জিজ্ঞাসা করিব?

কমলা। কর।

গোলোক। তুমি কি বিবাহিতা?

কমলা। না।

গোলোক। আমরা একদেশী—একজাতি।

কমলা হাসিয়া বলিল,—"এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাঁচিলে তবে সে সব কথা হইবে।"

গোলোকনাথ কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া বলিল,—"সকলই ভগবানের ইচ্ছা। যাহারা ভাগ্যহীন—জীবনের সুখ-শান্তি পরিশূন্য এবং ঘটনা-স্রোতে ভাসমান,—তাহাদের বুঝি এমন সুখমিলনেও শান্তি নাই।"

কমলা। এখন তুমি কি করিতে চাহ?

গোলোক। তোমার নিকটে থাকা আমার স্বর্গবাসের চেয়েও অধিক সুখকর।

কমলা। সে সুখভোগে অনিচ্ছুক কেন?

গোলোক। মহম্মদ খাঁর নিকটে যাহা করিব বলিয়া আসিয়াছি—আমাকে কার্য্যে নিয়োগ করিয়া সে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে,—কাজেই আপনার হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে আগুণে আহুতি দিয়াও আমাকে সেই কার্য্য আগে সম্পাদন করিতে হইবে।

কমলা। এখন কোথায় যাইবে?

গোলোক। নগর-মধ্যে।

কমলা। আমি তোমাকে এখনই বন্দী করিতে পারি।

গোলোক। যদি তাহা কর, আমার উপায় নাই, কিন্তু তোমায় আমি ভালবাসি।

কমলা। স্বকর্ম্মচ্যুত করান ভালবাসা নয়, সে ভালবাসা পশুর—মানুষের নয়। তবে যাও।

গোলোক। একটি কথা শুনিয়া যাইব।

কমলা। কি কথা?

গোলোক। যদি বাঁচি—যদি পুনরায় দেখা হয়,—আমাকে ভালবাসিবে কি?

কমলা। এখনও ভালবাসি—এবং পরেও ভালবাসিব। তুমি বাঁচিলেও ভালবাসিব—মরিলেও ভালবাসিব। আমি মরিলেও ভালবাসিব। তবে যাও, আপন কর্ত্তব্যকর্ম্ম করগে।

গোলোক। আবার কবে দেখা হইবে?

কমলা। ভবিষ্যৎ কে জানিতে পারে?

গোলোকনাথ বড় বিষণ্নমুখে বিদায় হইয়া ধীরে ধীরে গৃহের বাহির হইয়া গেলেন। যতক্ষণ তাহাকে দেখা গেল, কমলা একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপরে সজোরে করতালিধ্বনি করিল।

দুইজন দাসী অবনত-মস্তকে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলা বলিল,— "একজন দূতকে এখনই রাজপ্রাসাদে পাঠাইয়া দাও, এবং বলিয়া দাও, রাজা যেন প্রধান মন্ত্রীর সহিত অদ্য রাত্রেই আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

দাসী-দ্বয় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

প্রাণের তান।

ছিঁড়ে গেল যদি হৃদয়ের তার
কি ফল বল গো বাজিয়ে ;
তান মান সুরে বিবাদ বাধিলে
কি হবে সে গান গাহিয়ে ?
থাকে যদি তব পরাণের ব্যথা,
পার যদি গাও হৃদয়ের কথা,
অন্তরের পুরে অস্ফুট-বারতা,
উঠুক তবে গো ধ্বনিয়ে।
হৃদয়ের দ্বার দেও দেখি খুলে,
মলয়-মদিরা দিয়ে যা'ক্ ঢেলে,
আঁধারের পাখী যা'ক্ ডানামেলে
আলোকের পথে ছুটিয়ে।
লও তবে ভাঙ্গা বীণাটি তুলিয়ে,
ছেঁড়া তারগুলি লও জোড়া দিয়ে,
কম্পিত ওকরে দেওনা ছাড়িয়ে,
যা'ক্ সাধ তার পুরা'য়ে।
অপরের চোখে ধারা যদি বয়,
বীণাটীরে যেন ছাড়া নাহি হয়,
দে'খো যে ভু'লে ও ভাঙ্গা গলায়
বেসুরে উঠে না গাহিয়ে।
পরাণ তোমার মল্লার তানে,
সুখ যদি পায় কাঁদিয়ে,
কাজ কি তোমার সাহানা বাহারে,
দূর কর পিক মলয়ে।

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

ধর্ম্মের কথা।

বহুকাল হইতেই সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের নিকট নানারূপ কটূক্তি সহ্য করিয়া আসিতেছে এবং তাঁহাদের প্রদত্ত আঘাত সহ্য করিয়াও আত্ম মহিমায় অটল-ভাবে দণ্ডায়মান আছে। চারিদিক হইতেই বক্তৃতায় ও লিখিত প্রবন্ধাদিতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া স্বধর্ম্মের গৌরব কীর্ত্তনে উদ্‌যোগিগণের উৎসাহের সীমা নাই। হিন্দুধর্ম্মকে যে কোন প্রকারেই হউক আঘাত করিতে পারিলেই - হিন্দুর প্রাণে বেদনা দিতে পারিলেই যেন তাঁহাদের পরম পুরুষার্থ প্রকাশ পায়! নিশ্চল হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্ববিধ অত্যাচারই অম্লানবদনে সহ্য করিয়া, বিধর্ম্মীর ব্যবহারে বিচলিত না হইয়া, তাঁহাদের কৃতকর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। সে যদি আত্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া ভিন্ন-ধর্ম্মিগণের ন্যায় বিশ্বের বাজারে আপনাকে প্রচার করিত—সে যদি যা'কে তা'কে যখন তখন আপনার আশ্রয়ে স্থান দিতে যত্নবান্ হইত, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতে পারি, আ'জ কা'লকার বড় বড় ধর্ম্মপ্রচারকগণকে ম্লানমুখে "ঘর সাম্‌লাইবার চেষ্টায়" ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত! সৌভাগ্যবশতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম এ বিষয়ে চির-দিনই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে।

খৃষ্টধর্ম্মাশ্রিত নূতন মহাদেশ যে দিন একজন ভারতবর্ষীয় যুবক-বৈদান্তি-কের বক্তৃতা সোৎসুক-কর্ণে শুনিয়াছিল,—যে দিন সে দেশের লোক অধ্যাত্ম-তত্ত্বের নূতন বাণী শ্রবণ করিয়া শতমুখে বক্তার ও বক্তব্য বিষয়ের প্রশংসা-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক নিনাদিত করিয়া তুলিয়াছিল, চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেই সেই দিন বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মের শক্তি কি অসীম! যে দিন খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী কতকগুলি শিক্ষিত লোক, খৃষ্টধর্ম্মের দ্বারা শান্তি ও তৃপ্তি-লাভ না হওয়ায়, নাস্তিক্য-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া অজ্ঞেয়বাদের প্রচার করিতে-ছিলেন, যে দিন তাঁহাদের আদর্শে নানাজনের মন সন্দেহ-দোলায় আন্দো-লিত হইতেছিল, সে দিন হিন্দুধর্ম্মের বংশীধ্বনিতেই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে মত পরিবর্ত্তন করেন এবং সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারই মহিমা প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেন। হিন্দুসমাজ যদি

এই সকল ভিন্ন দেশী ও ভিন্ন ধর্ম্মী ব্যক্তিগণকে অবাধে গ্রহণ করিতে পারিত, তাহা হইলে স্রোত বিপরীত দিকে বহিত—য়ুরোপ, আমেরিকায় বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠার নবযুগের আবির্ভাব হইত!

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী যে সকল লোকের মধ্যে ভিন্ন-ধর্ম্মী প্রচারকগণ ধর্ম্ম প্রচার করেন, সে সকল লোক স্বধর্ম্মের তত্ত্বও রাখে না, প্রচারকদের ধর্ম্মের তত্ত্বও জানে না। সুতরাং প্রচারকদিগের ইচ্ছানুরূপ ব্যাখ্যায় তাহাদিগের মনে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয় না, তাহাও বলা যায় না। প্রচারকগণ আপনাদিগের ধর্ম্মে পণ্ডিত এবং সুবিধার জন্য পরধর্ম্মের আলোচনা করিয়া তদ্বিষয়েও কিছু জ্ঞান লাভ করেন। এরূপ অবস্থায় যাহারা কিছুই জানে না, তাহাদের কাছে তাহাদের ধর্ম্মের অপব্যাখ্যা দ্বারা স্বধর্ম্মের গৌরব জ্ঞাপন করা অধিক আয়াসসাধ্য কর্ম্ম নহে।

যে সকল কারণে হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করা হয়, মূর্ত্তি-পূজা তাহাদের মধ্যে অন্যতম; হিন্দু যে "পৌত্তলিক" নহে, হিন্দু যে জড়বাদী নহে, হিন্দু যে জানে এবং মানে "সদ্বস্তু এক, তাঁহাকে বহুরূপে ব্যক্ত করা হয়।" এ কথা অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি যুক্তিযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, সুতরাং সে বিষয়ের পুনরুল্লেখ না করিয়া অন্য বিষয়ের আলোচনা করিব।— মৌখিক নিরাকার বাদীরাও যে মনে মনে নিরাকারের আকার খাড়া করেন, তাহা বুঝিবার এবং বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী খৃষ্টীয় ধর্ম্মকেই গ্রহণ করিলাম।

খৃষ্টীয়ানের ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম "বাইবেল।" এই গ্রন্থ দুইভাগে বিভক্ত, "আদি নিয়ম" ও "নূতন নিয়ম।" আদি নিয়মের উপরেই খৃষ্ট-প্রচারিত নূতন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত। খৃষ্টবাদীরা বলেন, "ঈশ্বর নিরাকার" এবং তিনি "অনন্ত ও সর্ব্বশক্তিমান্।" আবার তাঁহাদের শাস্ত্রেই দেখিতে পাই,—ঈশ্বর, ঈশ্বরের পুত্র ও পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের এই তিন অংশ। যাহার অংশ আছে, তাহার আকারও আছে এবং অংশ কখনই "অনন্ত" হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরের এই ত্রিভাব ব্যতীত জগতে আর একজন আছে, সে "সয়তান।"— ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই সয়তানই পাপের জনক। তবেই দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর পুণ্য, সয়তান পাপ। যে স্থানে দুইটি বস্তু আছে, তথায় নিশ্চয়ই প্রত্যেকটির সীমা আছে। যাহা সসীম তাহা কখনও "অনন্ত" হইতে পারে না এবং তাহার আকার নাই এমন কথাও বলা যায় না।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্টবাদীরা তাঁহাদের ঈশ্বরকে মুখে নিরাকার বলেন বটে, কিন্তু মনে মনে তাঁহার সাকারত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

খৃষ্টবাদীর ঈশ্বর যে প্রকৃতই সাকার—এই তোমার আমার মতই হস্ত-পদ-বিশিষ্ট সাকার, তাহার প্রমাণও তাঁহাদেরই ধর্ম্মপুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেন না, ঈশ্বর স্বর্গের রাজা। স্বর্গ, নরক ও পৃথিবী হইতে একটি পৃথক্ স্থান। স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া তিনি রাজত্ব করেন। স্বর্গ যখন কয়েক-টির মধ্যে একটি স্থান, তখন তাহা যত বড়ই হউক "অনন্ত" কখনই নহে। সুতরাং সেই সসীম স্বর্গের একপার্শ্বে বসিয়া যিনি রাজত্ব করেন, তিনি নিশ্চয়ই সসীম। কেন না, সসীমের মধ্যে অসীমের কল্পনা হইতে পারে না। বিশে-ষতঃ স্বর্গের একস্থানে একখানি সিংহাসন, সেই সিংহাসনের উপর ঈশ্বর এবং সিংহাসন-পার্শ্বে ঈশ্বরের পুত্র ও স্বর্গীয় দূতগণ অবস্থিত; যখন মানুষ এইরূপ কল্পনা করে, তখন কি এই দৃশ্য একজন পার্থিব সম্রাটকে স্মরণ করাইয়া দেয় না?

এখন "আদি নিয়ম" পুস্তকের সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে খৃষ্ট ধর্ম্মের ঈশ্বরের সাকা-রত্ব আলোচনা করা যাউক। লেখা আছে,—ছয়দিনে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন। ১ম দিন ঈশ্বর "আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন" এবং দীপ্তিদান করিয়া দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। ২য় দিবসে জলকে দুই ভাগ করিলেন এবং ঊর্দ্ধ ও অধস্থ জলের মধ্যবর্ত্তী বিতানের নাম আকাশ রাখিলেন। ৩য় দিবসে জল ও স্থল পৃথক্ করিয়া স্থলে বৃক্ষাদির সৃষ্টি করিলেন। ৪র্থ দিবসে সূর্য্য, চন্দ্র ও আকাশমণ্ডলে জ্যোতির্গণের সৃষ্টি করিলেন। ৫ম দিবসে জলজ প্রাণী ও পক্ষিগণের সৃষ্টি করিলেন। ৬ষ্ঠ দিবসে প্রথমে স্থলচর পশুসকল, পরে আদি মনুষ্য আদমকে সৃষ্টি করিলেন। ৭ম দিনে বিশ্রাম। এখন এই ৬ষ্ঠ দিনের মনুষ্য সৃষ্টির কথাই আমাদিগের আলোচ্য বিষয়। বাইবেল গ্রন্থে লিখিত আছে—"পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আপনাদের প্রতিমূর্ত্তিতে ও আপনাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি।"

সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর "আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে" এই বহুবচনার্থক শব্দ প্রয়োগ করায় বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বর একজন মাত্র নহেন, অন্য ব্যক্তিও আছেন এবং ঈশ্বরও সেই সকল ব্যক্তির আকার একই প্রকারের। সে আকার কিরূপ? সৃষ্ট মনুষ্যকে দেখিয়া বোধ হয়, সে আকার মনুষ্যেরই

মত হস্তপদ-চক্ষু-কর্ণাদি-বিশিষ্ট ; কেন না, সৃষ্ট মনুষ্য তাঁহাদেরই "প্রতিমূর্ত্তি !" এবং তাঁহাদেরই "সদৃশ !"

যাঁহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরকে এইরূপ মানবাকারে কল্পনা করা হইয়াছে, তাঁহারাই ব্রহ্মবিদ্যা-প্রকাশক হিন্দুদিগকে সাকারবাদী বলিয়া—জড়োপাসক বলিয়া নিন্দা করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না ! এ জন্য খৃষ্টের কথায় আমরাও কি বলিতে পারি না যে, "হে কপটি ! অগ্রে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাঠ বাহির করিয়া ফেল, তাহা হইলে তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে কুটা বাহির করিবার নিমিত্ত পরিষ্কার দেখিতে পাইবে।" মথি, ৭।৫।

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাবে যেইদিন।

এত ভুল ! একি ভুল বল দেখি প্রিয়া,
যেতে চাও সরস চুম্বন দুটী দিয়া !
আলিঙ্গিয়া সুকোমল বাহুলতা-পাশে,—
চাহ বুঝি বাঁধিবারে চির মোহ-ফাঁসে !
অমল ধবল দন্তে হাসি সুধা হাসি,
বলিলে আসে না সে যে সুধু ভালবাসি,
চঞ্চল কটাক্ষ ওই ভুবনে অতুল,
নাহি ওতে চিত্র তার, নয়নের ভুল।
নহে অগ্নি, নহে তেজ, নহে বায়ু, বারি,—
অথচ হৃদয় জুড়ে অধিকার তারি !
প্রেম বুঝি তার নাম, সতত নির্ম্মল,—
অবিশ্বাস অনাদর জানে না সকল।
নির্লোভ ধরম তার দোষ-চক্ষু হীন ;—
বেসোভাল তারে এনে পাবে যেইদিন !

শ্রীজগৎ প্রসন্ন রায়

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

(রামায়ণ)

লঙ্কাপুরী ইতিহাস।

ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে স্থিত সুবেল গিরির উচ্চতর পাদ ত্রিকূট পর্ব্বতের মধ্যম শিখরে লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ করেন। (রাম ৭।৫)

লঙ্কাপুরী নিরালম্ব এবং এই দেবদুর্গ অতি ভয়াবহ। (৬।৩) (১)

সেই পুরীর পার্শ্বে পাণ্ডুর মেঘ-সন্নিভ উচ্চ গোপুর স্থল অবস্থিত আছে। এই গোপুর স্থলে গোপুর শৃঙ্গ ও গোপুর বেদি বিরাজমান আছে। (৬।৩৯-৪০)

সন্ধ্যা দুহিতা সালকটঙ্কটার পুত্র শিশু সুকেশ রাক্ষস মহাদেবের বরে অমরত্ব ও আকাশলপুর লাভ করিয়া গন্ধর্ব্ব দুহিতা দেববতীর পাণি গ্রহণ করিলেন। উমার বরে রাক্ষসজাতির সদ্য গর্ভধারণ, সদ্য প্রসূতি এবং সদ্য মাতৃবয়ঃ প্রাপ্তি বিধান হইল। (৭।৪)

সুকেশ ও দেববতীর পুত্রত্রয় মাল্যবন্ত, সুমালি এবং মালি ব্রহ্মার বরে অমরত্ব ও অজেয়ত্ব লাভ করিল। এবং তাহারা বিশ্বকর্ম্মার পরামর্শে ইন্দ্রের লঙ্কা দুর্গে সহস্র অনুচর সহ বসতি করিল। (৭।৫)

লঙ্কার রাক্ষসগণের দৌরাত্ম্যে দেবগণ ভীত হইয়া দেবদেব কামারির শরণ লইলেন। ত্রিপুরারি সুকেশ-সন্তানগণকে নিজের অবধ্য মনে করিয়া দেবগণকে বিষ্ণুর শরণ লইতে মন্ত্রণা দিলেন। (৭।৬)

বিষ্ণুর সংগ্রামে রাক্ষসগণ লঙ্কা ত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় লইল। (৭।৮)

তৎপরে ধনেশ বৈশ্রবণ পিতৃ-আদেশে শূন্যা লঙ্কাপুরীতে যক্ষ রক্ষ আদি সহস্র নৈঋতগণের সহিত বসতি করিলেন। (৭।৩)

কিন্তু শ্লেষ্মাতক বনবাসী (৭।১০) "নৈঋতঃ রাবণঃ নাম" ত্রিকূটে আসিয়া ভয় প্রদর্শনে লঙ্কা অধিকার করিয়া লইলে নৈঋতরাজ ঐলবিল লঙ্কা ত্যাগ করিয়া যক্ষগণের সহিত কৈলাসে আশ্রয় লইলেন। (৭।১১।৪৪)

---

(১) লঙ্কাপুরী নিরালম্বা দেবদুর্গ-ভয়াবহা।

রাবণি রণে ইন্দ্রকে বন্দী করিয়া লঙ্কায় আনিয়াছিলেন। প্রজাপতির অনুরোধে ইন্দ্র বন্ধনমুক্ত হইলেন। (৭।৩৪—৩৫)

পঞ্চবটী বনে রাবণ সীতাকে (রামায়ণ) অথবা ছায়াকে (অধ্যাত্ম্য-রামায়ণ) হরণ করিয়া লইয়া লঙ্কার অশোকবনে ত্রিজটা ও সরমা আদি রাক্ষসীগণের জিম্বা করিয়া দিলেন। (৩।৫৪)

মহাভারত মতে ব্যাঘ্র সীতার রক্ষক হইয়াছিল। (৩।২৭৮)

সীতার অন্বেষণে লঙ্কাগত হনুমান্‌রূপী রুদ্রদেব (২) লঙ্কাদগ্ধ করিলেন। (৫।৫৪)

শ্রীরাম সমুদ্রে "নল সেতু" বন্ধন করিয়া লঙ্কায় সসৈন্যে উপনীত হইলেন। (৬।২২) এবং তিনি সুবেল গিরি আরোহণ করিয়া ত্রিকূটের দিবি-স্পৃশ শিখরে (৩) স্থিত লঙ্কাদর্শন করিবার কালে গোপুর শৃঙ্গস্থিত রাবণকে দেখিলেন। (৬।৪০) তখন গোপুর বেদি মধ্যে সুগ্রীব রাবণে মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হইল। এবং রাবণ-রাজার চিত্র মুকুট আকর্ষণ করিয়া বানর-সেনাপতি ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন। (৬।৪০)

তৎপরে বানর সৈন্য লঙ্কা অবরোধ করিল।

আত্ম সমর্পণে শরণ গ্রহণ জন্য রাবণের নিকট—শ্রীরাম তারেয়কে দূত প্রেরণ করিলেন। (৬।৪১)

শ্রীরাম লক্ষ্মণের সহিত রাবণ-রক্ষিত লঙ্কার উত্তর দ্বারে রাবণের প্রতি-যোদ্ধারূপে অবস্থিতি করিলেন। (৬।৪২)

রাবণ নিহত হইলে শ্রীরামের আজ্ঞায় লক্ষ্মণ স্বীয় অমাত্য বিভীষণকে নৈঋ‌ত-রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। (৬।১১)

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

আকাশে উত্তর ধ্রুব হইতে দক্ষিণ ধ্রুব পর্য্যন্ত মণ্ডলাকার ছায়া পথ ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টন করিয়া আছে। বৃশ্চিক রাশির উর্দ্ধে ও উত্তরে এবং গরুড় (Aquila) মণ্ডলস্থিত শর আকৃতি শ্রবণানক্ষত্রের তলে ও দক্ষিণে ছায়াপথ (যমের জাঙ্গাল) ছিন্ন ভিন্ন রহিয়াছে। কেবল একটী অপ্রশস্ত যোজক

---

(২) জানামি ত্বাম্ কপিতনো সাক্ষাৎ দেবম্ মহেশ্বরম্ (বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ ১।২০।৩৩)

(৩) শিখরং তু ত্রিকূটস্ত প্রাংশু চৈকং দিবি স্পশম্ (৬।৩৯ ।

অবশিষ্ট আছে। এই যোজক শ্রবণ পর ও বিচৃত নক্ষত্র সংযোজিত করিয়াছে।

নিরুক্তমতে আকাশ "সগর সমুদ্র" নামদ্বয় ধারণ করে। ছায়াপথের এই যোজক আকাশ সমুদ্রের সেতুরূপে শোভা পায়। অবেস্তা মতে এই "চিম্বড সেতু" যমের কুকুরগণ রক্ষা করে। (ফার্গার্ড ১৩।৯)

আবার এই ছায়াপথে পর্ব্বতদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই পর্ব্বত মহাভারতের শ্বেত পর্ব্বত এবং ইহার গুহায় গুহদেবের জন্ম হয়। এই পর্ব্বত শিখর বাইবেলের পবিত্র দিব্য পর্ব্বত (The Holy Hill of Heaven)। এবং এই পর্ব্বত-শিখরে জরাথুস্ত্র অসুর মস্‌ড দেবের সহিত কথোপকথন করিতেন। এই শ্বেত পর্ব্বতের সুন্দর বেলা ভূমি (Valley) বিচিত্র নক্ষত্র-ভূষিত।

দক্ষিণ আকাশ-সমুদ্রের তীরস্থিত এই সুবেল পর্ব্বতোপরি বৃশ্চিক রাশি প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু তারা বৃশ্চিকের নখর পর্ব্বতোপান্তে পড়িয়াছে। বৃশ্চিক রাশির মধ্যে বৃশ্চিক-তুণ্ডে চতুস্তারাময় সর্প বা শল্য ( ) আকৃতি মিত্র-দৈবত অনু-রাধা নক্ষত্র বৃশ্চিক বক্ষে এক তারাময়। ইন্দ্র-দৈবত লঙ্কাফল-লোহিত প্রাচীন রোহিণীনক্ষত্র (৪) বা আধুনিক জ্যেষ্ঠ নক্ষত্র এবং বৃশ্চিক পুচ্ছে "পিতরঃ" (৫) দৈবত প্রাচীন দ্বিতারাময় বিচৃত নক্ষত্র বা আধুনিক নির্ঋতি দৈবত পঞ্চ তারাময় শঙ্খ আকৃতি মূল নক্ষত্র অবস্থিত আছে।

মূল নক্ষত্রের পূর্ব্বভাগে ধনুরাশিতে চতুস্তারাময় চতুষ্কোণ বেদি আকৃতি "আপঃ" দৈবত পূর্ব্বআষাঢ়া নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত আছে। এবং "আপঃ" দেবতা নভঃ সরিৎরূপে এই নক্ষত্র প্লাবিত ও আবৃত করিয়া রহিয়াছে।

এই তারা বেদির সার দক্ষিণে দক্ষিণ কিরীট মণ্ডল (Corolla) শোভা পাইতেছে।

বৃশ্চিকের দক্ষিণে শার্দ্দূল মণ্ডল (Lupus) অধিষ্ঠিত আছে। শার্দ্দূল মণ্ডলে ব্যাঘ্র নক্ষত্র অবস্থিত আছে।

তারা শার্দ্দূল পার্শ্বে ছায়াপথ বিরাজ করিতেছে।

---

(৪) ইন্দ্রস্য রোহিণী। তৈঃ ব্রাঃ ১।৫।৪)

(৫) পিতৃপতি বলিয়া যম এই নক্ষত্রের অধিপতি। "বিচৃতঃ যমস্য" (অঃ বেঃ ৬।১১০।২)

পুরাণমতে ছায়াপথ-স্থিত "সোমধারা নভঃ সরিৎ" "আকাশ গঙ্গা" নাম ধারণ করেন। এবং ইহার পূর্ব্বভাগ সীতা আখ্যা পাইয়াছেন। (৬)

রবিমার্গ—অনুরাধা নক্ষত্র ভেদ করিয়া জ্যেষ্ঠা, মূলা ও পূর্ব্ব আষাঢ়া নক্ষত্রত্রয়ের উত্তরে ছায়াপথের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বৃশ্চিক রাশি কাম দৈবত (৭) মঙ্গল গ্রহের গৃহ বা নাক্ষত্রিক প্রতিমা। (৮) কাম-মঙ্গল ত্রিবিধ শর্ম্ম বিধানে লোক পালন করেন বলিয়া বেদে "ত্রিত" নামে গীত ও অর্চ্চিত হইয়াছেন।

(১) কাম মঙ্গল অগ্নি বা শত্রু হন্তা মিত্র।

(২) কাম—মঙ্গলদাতা বা মঘবান্ বাসব।

(৩) এবং কাম—মঙ্গল মৃত্যুদেব যম বা নরকাসুর।

এই ত্রি-মূর্ত্তিতে কাম-মঙ্গল বা ত্রিত দেব স্বীয় নাক্ষত্রিক প্রতিমা বৃশ্চিক রাশিস্থিত অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা নক্ষত্রে সন্নিবেশিত হইয়াছেন।

এবং ঋক্ বেদমতে (৯।৩৭।৪) এই পর্ব্বতাকার বৃশ্চিক রাশি ত্রিত দেবের সানু। (৯)

এবং অনু-রাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা এই নক্ষত্রত্রয় এই সানুমানের কূটত্রয় বা শিখরত্রয়। এবং এই কূটত্রয় হইতে ত্রিতদেবের প্রতিমা বৃশ্চিক রাশি "ত্রৈতন" "ত্রিপুর" এবং "ত্রিকূট" নাম উপহার পাইয়াছে। এবং এই তিন নক্ষত্রবাসী ত্রৈতনগণ (The Fitans) ত্রিপুরগণ আদি খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ছয় হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বৃশ্চিক আকাশের দেবভাগে অবস্থিত ছিল। তৎকালে ত্রিত দেব দেবরাজের পরম মিত্র মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ক্রমে বৃশ্চিক অসুর-ভাগে নামিতে আরম্ভ করিল। শারদীয় ক্রান্তি পাত (antumual Equinox) বৃশ্চিক পুচ্ছে অধিষ্ঠান করিল এবং "ত্রিতের

(৬) পূর্ব্বস্যাম্ দিশি সীতা স্বম্। (বৃঃ দেঃ পুঃ ১।৫।৮৮)

(৭) কামদেবস্য বীজম্ তু মন্ত্রম্ ভৌমস্য কীর্ত্তিতম্ (কালিকাপুরাণ)

(৮) গ্রীসদেশে ইরঃ (Eros) অর্থাৎ কামদেব আরঃ (Ares) অর্থাৎ মঙ্গলগ্রহের পুত্র। এবং রোমদেশে কুপিড (Cupid) অর্থাৎ কামদেব মারঃ (Mars) দেবের পুত্র। ভারতে মঙ্গলগ্রহ অপুত্রক এবং স্বয়ংই যুদ্ধদেব, কামদেব এবং মৃত্যুদেব। "মদনঃ মন্মথঃ মারঃ" ইতি অমরঃ।

(৯) ত্রিতস্য অধি সানবি......ঋঃ বেঃ ৯।৩৭।৪।

গুহা” খ্যাতি লাভ করিল। তৎকালে সু-মেরুবাসী ঋষিগণ দেখিতেন যে, মৃগশিরা নক্ষত্রে সূর্য্য উদিত হইয়া ষট্‌মাসব্যাপী দেবদিনের অবসানে বৃশ্চিক-পুচ্ছে “ত্রিতের গুহায়” নির্ঋতির ক্রোড়ে শয়ান হইলেন। (১০) সূর্য্যের রশ্মিসহস্র রাক্ষসসহস্রে আক্রান্ত হইল। ক্রমে সূর্য্য প্রভাহীন হইয়া “কৃষ্ণদ্রপ্‌স” (১১) রূপে কৃষ্ণ রজঃ ময় পারাবারে নিমগ্ন হইলেন। এবং ষট্‌মাস-ব্যাপী দেব-রাত্রি আরম্ভ হইল।

সহস্র বর্ষ গতে শারদীয় ক্রান্তিপাত বৃশ্চিক-বক্ষে সমাগত হইল। এবং ত্রিতের গুহা ইন্দ্র-দৈবত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে সরিয়া আসিল। তৎকালে সুমেরু-বাসী ঋষিগণ দেখিতেন যে, প্রজাপতি-দৈবত রোহিণী নক্ষত্রে সূর্য্য উদিত হইয়া ষট্‌মাস-ব্যাপী দেব-দিনের অবসানে বৃশ্চিক-বক্ষে ত্রিতের গুহায় শয়ান হইলেন। সূর্য্যের রশ্মি-সহস্র রোহিণীপতি ইন্দ্রের অনুচর সহস্র ত্রৈতন রাক্ষসগণে আক্রান্ত হইল। ক্রমে সূর্য্য প্রভাহীন হইয়া—কৃষ্ণদ্রপ্‌স রূপে কৃষ্ণরজঃময় পারাবারে নিমগ্ন হইলেন এবং ষট্‌মাস-ব্যাপী দেবরাত্রি আরম্ভ হইল। এই জ্যোতিষিক ব্যাপার ঋক্‌বেদের ১০।৪৩।৫ এবং ৮।৮৫।১৩—১৫ মন্ত্রে বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু মন্ত্রত্রয়ের মূলে যে জ্যোতিষিক ব্যাপার নিহিত আছে, তাহার প্রতি ভাষ্যকারগণ লক্ষ্য না করায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষ্যকারগণের মধ্যে ঘোর বিতণ্ডা বাধিয়াছে।

আবার সহস্র বর্ষ গতে ত্রিতের গুহা বৃশ্চিক-তুণ্ডে অনু-রাধা নক্ষত্রে (১২) আসিল। তখন সুমেরুবাসী ঋষিগণ দেখিলেন যে, কৃত্তিকা নক্ষত্রে সূর্য্য উদিত হইয়া ষট্‌মাস-ব্যাপী দেবদিনের অবসানে বৃশ্চিক তুণ্ডে ত্রিতের গুহায় শয়ান হইলেন। সূর্য্য প্রভাহীন হইলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই জ্যোতিষিক ব্যাপার হইতে বৃশ্চিক পুল, বৃশ্চিক পুচ্ছস্থিত মূলানক্ষত্র

---

(১০) পুরূরবা নির্ঋতির ক্রোড়ে এই শয়নের ভয়—উর্ব্বশীকে দেখাইয়াছিলেন। (ঋঃ বেঃ ১০।৯৫।১৪)

(১১) ৮।৮৫।১৩ ঋ

(১২) এই গুহাত্রয় হইতে বৃশ্চিকরাজ্য ত্রিগর্ত্ত নাম এবং বৃশ্চিকপতি মঙ্গল গ্রহ ত্রিবিধ শর্ম্ম হইতে সুশর্ম্মা নাম পাইয়াছে। মহাভারতে “ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা” সুপরিচিত আছে।

এবং মূলাপতি "নিঋ'তি রাক্ষসেশ্বর" (১৩) সূর্য্যের প্রভার অপহর্ত্তা হইলেন।

বেদমতে সূর্য্যের প্রভা সূর্য্যের পত্নী সূর্য্যা। ছায়াপথ এই সূর্য্যার নাক্ষত্রিক প্রতিমা। সূর্য্যার প্রতিমা নিঋ'তি রাক্ষসেশ্বরের গৃহ (মূলানক্ষত্র) আলোকিত করিয়া রহিয়াছে।

এবং তারা শার্দ্দূল ও ব্যাঘ্র নক্ষত্র উভয়ের পার্শ্বে এই ছায়া বন্দীভাবে অবস্থিতি করিতেছে।

"আপঃ" দেবতা হইতে পূর্ব্ব-আষাঢ়া নক্ষত্র "গোপুর স্থল" খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এবং এই নক্ষত্রের প্রধান সর্ব্বোচ্চ তারা "গোপুর শৃঙ্গ" খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এবং এই নক্ষত্রের চতুষ্কোণ ক্ষেত্র রামায়ণে "গোপুর বেদি" আখ্যা লাভ করিয়াছে।

আপঃ দৈবত পূর্ব্বআষাঢ়া নক্ষত্র হইতে ত্রিত দেব "আপ্ত্য" খ্যাতি এবং মঙ্গল গ্রহ "পূর্ব্ব-আষাঢ়াভব" খ্যাতি উপহার পাইয়াছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণমতে (১।৫।২।৬) অনু-রাধা হইতে ভরণী পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ নক্ষত্রকে "যম-নক্ষত্র" বলে। (১৪) বিচৃত নক্ষত্রপতি নরকাসুর যম হইতে এই নামকরণ হইয়াছে। এবং মূলাপতি নিঋ'তি নরকাসুর হইতে দঃ পঃ কোণ "নৈঋ'ত কোণ" নাম উপহার পাইয়াছে।

চতুর্দ্দশ যম নক্ষত্র ক্ষিতিজের উপরে থাকিলে অনু-রাধা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা এই নক্ষত্রত্রয় নৈঋ'ত কোণে পড়ে।

নৈঋ'ত কোণস্থিত এই নক্ষত্রত্রয়বাসী বেদোক্ত ত্রৈতন অসুরগণ পুরাণে নৈঋ'ত উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কি ভারতে কি গ্রীসদেশে দেব-অসুর সমরে এই ত্রৈতনগণ (The Titans) অসুরপক্ষের নেতা।

মহাভারতে "নরক" অসুর (১৫) "কর্ণ" নাম গ্রহণে এবং তাহার সারথি অনুরাধাপতি মিত্রদেব ( ) "শল্যরাজ" নামগ্রহণে কৌরব সেনার নেতা। বেদমতে (অঃ বেঃ ৩।২৯।৭) "কামঃ দাতা" বলিয়া কর্ণ দাতা হইয়া "দাতা-কর্ণ" নাম ধারণ করেন। এবং মাতুল শল্যরাজ পাণ্ডবগণের আন্তরিক হিতৈষী।

(১৩) শব্দকল্পদ্রুম।

(১৪) অনু-রাধা প্রথমম্। অ। ভরণী। উত্তমম্। তানি যম-নক্ষত্রাণি।

(১৫) হতস্য নরকস্য আত্মা কর্ণমূর্ত্তিম্ উপাশ্রিতঃ (মহা ৩।২৫১।২০)

দেবগণ আকাশের অসুরভাগে থাকিলে এবং অসুরগণ আকাশের দেব-ভাগে থাকিলে দেবত্ব ও অসুরত্ব উভয় প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। এই জ্যোতিষিক পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বেদের ভাষ্যকারগণ দেবকে "অসুর" নাম দিলে অসুর শব্দে "বৃহৎ দেব" বুঝিতে চাহেন।

সলিল-সম্ভব প্রজাপতি আপঃ সৃষ্টি করিয়া তাহার রক্ষার্থে জীবগণ সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্ট জীবগণ কেহ কেহ "রক্ষামঃ" কেহ কেহ বা "যক্ষামঃ" শব্দে প্রজাপতির অনুজ্ঞা গ্রহণ করায় রক্ষ ও যক্ষ নাম পাইল। ইহারা দেবযোনি মধ্যে গণ্য। (৭।৪)

এবং যক্ষ ও রক্ষগণ আকাশের নৈঋ‌র্ত কোণস্থিত বৃশ্চিকরাশির নক্ষত্র-ত্রয়বাসী বলিয়া নৈঋ‌র্ত উপাধি পাইয়াছে। এবং কাম-দৈবত মঙ্গল গ্রহ কামরূপ তারা (Variable Star) বলিয়া বৃশ্চিক রাশিবাসী নৈঋ‌র্তগণ সকলেই কামরূপধর হইল। (৬।৮) এবং কাম-মঙ্গল ময়দানব দুহিতা মায়ার পতি বলিয়া নৈঋ‌র্তগণ মায়িন্‌ ও মায়াজাল এবং অয়ঃ জাল (১৬) সমন্বিত হইয়াছে। এবং কাম-ইন্দ্র ইন্দ্র-জালে সমন্বিত হইয়াছেন। বিত্তেশ বৈশ্রবণ "নৈঋ‌র্তরাজ" উপাধি ধারণ করেন। (৭।১১।২২) এবং দশগ্রীব "নৈঋ‌র্তঃ রাবণঃ নাম" রাক্ষসেশ্বর নামে খ্যাত।

বিচৃত নক্ষত্রের সুদৃশ্য তারাদ্বয় (১৭) বিচৃতপতি যমের পথরক্ষক শ্যাম শবল নামে কুকুরদ্বয়। (১৮) এবং তাহারা মূলানক্ষত্র-স্থিত যমালয়ের উত্তর দ্বারে ছায়াপথের বা "যমের জাঙ্গালের" মুখে বসিয়া আছে।

রুদ্রদূত প্রহর্ষণ (বুধ) গ্রহ পুরাণে নন্দীনাম ধারণ করে। তারেয়—(বুধগ্রহ ও অঙ্গদ) পুরাণে ও রামায়ণে বানরমুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বেদোক্ত "অধঃ রামঃ সাবিত্রঃ" রবিমার্গে বিচরণ করিতে করিতে মূলা নক্ষত্রের উত্তরে উপনীত হইলে শ্যাম-শবল কুকুর-যুগল-সমন্বিত নরকাসুর যমের সম্মুখীন হন।

---

(১৬) নরকাসুর যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ মুর (মূল ?) অসুরের অয়ঃজাল (ছায়াপথ) ছিন্ন করেন। তদবধি শ্রবণা শর হইতে নরকাসুর-নিকেতন মূলা পর্য্যন্ত ছায়াপথ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে।

(১৭) অমী যে সুভগে বিচৃতৌ নাম তারকে (তৈঃ আঃ ২।৬।৩)

(১৮) যৌ তে শ্বানৌ যম ! রক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষী (ঋঃ বেঃ ১০।১৪।১১
অতি দ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ (ঋঃ ১০।১৪।১০)

নলবনের নলে শর নির্ম্মিত হয় বলিয়া নলবন "শরবন" খ্যাতি পাইয়াছে। ষ্টীল পেনে শরকাটির কলম দেশছাড়া করিয়াছে। তাই নলবনের শরকাটি অপরিচিত।

উপপত্তি।

আমরা চিরন্তন সংস্কারের প্রতিবাদ করিয়া সময় নষ্ট করিতে চাহি না। আধিদৈবিক রামলীলার অপূর্ব্ব চিত্রের পূর্ব্ব স্মৃতি হিন্দুর চিত্তে জাগাইয়া দিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

অগ্রহায়ণ মাসের সায়ংকালে আকাশের নৈর্ঋত কোণে নেত্রপাত করিলে সুবিমল ছায়াপথ দৃষ্টিপথে পড়িবে। ঐ ছায়াপথে সুন্দর বেলাভূমি-সমন্বিত যে বৈমানিক পর্ব্বত অধিষ্ঠিত আছে, তাহাকেই রামায়ণের সুবেল পর্ব্বত বলিয়া জানিবে। সুবেল গিরি-পরে পর্ব্বতাকার তারা বৃশ্চিক শোভা পাইতেছে।

নক্ষত্রত্রয় সমন্বিত বৃশ্চিক রাশি সুবেল গিরির উচ্চতর পাদ এবং ত্রিকূট নাম ধারণ করে। কূটত্রয়ের মধ্যম শিখরে অর্থাৎ ইন্দ্রদৈবত লঙ্কাফল লোহিত রোহিণী নক্ষত্রে ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত স্বর্ণপ্রাকার-বেষ্টিত লঙ্কা-পুরী শোভা পাইতেছে।

ভ্রাতৃত্রয় মাল্যবন্ত, সুমালি ও মালি সহস্র রাক্ষসসহ বিশ্বকর্ম্মার উপদেশে এই লঙ্কাপুরীতে বসতি করিলেন। দেবদ্বেষী রাক্ষসগণের উৎপাত নিবারণের জন্য স্বয়ং বিষ্ণু রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা লঙ্কা ত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় লইল।

বিশ্রবার পুত্রত্রয়—বৈশ্রবণ, রাবণ ও বিভীষণ বিভূবসু তনয় (১৯) ত্রিত দেবের প্রতিমাত্রয় মাত্র।

জ্যেষ্ঠ বৈশ্রবণ সহস্র নৈর্ঋতগণের সহিত জ্যেষ্ঠানক্ষত্রস্থিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন। শ্লেষ্মাতক বনবাসী "নৈর্ঋতঃ রাবণঃ নাম" রাক্ষসেশ্বর ত্রিকূটে আসিয়া ভয় প্রদর্শন করিলে নৈর্ঋতরাজ যক্ষগণের সহিত দেবদুর্গ লঙ্কা ত্যাগ করিলেন। রাবণ রাক্ষসগণ সহ লঙ্কায় প্রবেশ করিল (২০)

(১৯) ঋঃ বেঃ ১০।৪৬।৩ বিভুবসু।

(২০) এই অপরাধে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র "জ্যেষ্ঠঘ্নী" উপাধি পাইল। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জাত পুত্র রাক্ষস বলিয়া পরিগণিত হইল এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হন্তা বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। এই বিশ্বাস-গুণে হিন্দু জগতে গণ্যমান্য হইতে চাহেন।

মিত্রদৈবত অনু-রাধা অনু-জ মিত্র বিভীষণের আবাস হইল। এবং নির্ঋতি-দৈবত রবশীল তারা শশ্ব রাবণের আবাস হইল (২১) দেবদুর্গ লঙ্কা রাক্ষস-দুর্গ হইল।

লঙ্কাপুরীতে নৈঋতগণ মধ্যে রোহিণীপতি অসুর ইন্দ্র বন্ধনদশায় অবস্থিতি করিতেছেন।

"অধঃ রামঃ সাবিত্রঃ" (নিরুক্ত) রবিমার্গে পরিভ্রমণ করিতে করিতে বৃশ্চিক কবলে ত্রিতের বক্ত্রে পতিত হইলে প্রভাহীন হয়। ঐতিহাসিক বলেন,—রাক্ষসেশ্বর সূর্য্যপত্নী সূর্য্যা বা সীতা হরণ করিলেন। তারা-শার্দ্দূল পার্শ্বে যমালয়ের শোকরহিত বনে সীতা বন্দী আছেন। মহাভারত মতে "সীতা ব্যাঘ্ররক্ষিতা"। রামায়ণে তারা শার্দ্দূল ত্রিজটা হইয়াছেন।

রুদ্রদেব ত্রিপুর দগ্ধ করিয়া ত্রিপুর-অরি নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সেই অনুকল্পে হনুরূপী রুদ্রদেব সীতার অন্বেষণে লঙ্কায় আসিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিলেন। বাল্মীকির ভ্রমক্রমে উপাধি বিতরণকালে হনুর নাম গেজেটে উঠে নাই। মুখটী কৃত্তিবাস তাহাকে "ঘরপোড়া" খেতাব দিয়া ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন।

সোমরাজ (সিনী)-বালীর পুত্র যুবরাজ তারেয় সূর্য্য-নারায়ণের দৌত্য-কার্য্যে লঙ্কায় গমন করেন। আদিত্য-দৈবত শ্রবণাশর ইতিহাসের অগ্নিপুত্র নল। ইনি "নল-সেতু" নির্ম্মাণ করেন।

রাশিচক্র পরিভ্রমণ কালে অগ্রহায়ণ মাসে লঙ্কার উত্তর দ্বারের অদূর উত্তরে "অধঃ রামঃ সাবিত্রঃ" সুবেল গিরি আরোহণ করিয়া লঙ্কা সন্দর্শন করিতে করিতে গোপুর শৃঙ্গস্থিত রাবণের দর্শন পাইলেন। বৃহস্পতি-মঙ্গলের ভ্রাতৃব্যতা সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। দাতাকর্ণ অর্জ্জুনের আজন্ম বৈরী। তাই সুগ্রীব নরক রাবণকে গোপুর-শৃঙ্গে আক্রমণ করিলেন। এবং গোপুর বেদিতে উভয়ের মল্লযুদ্ধ হইল। সুগ্রীব রাবণ রাজার (যমরাজ) মুকুট ছিন্ন করিয়া ভূতলে ফেলিলেন। হয় না হয় পূর্ব্ব আষাঢ়া নক্ষত্রের প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর। দেখিবে যে, গোপুর বেদিতলে তারামুকুট (Corolla) অদ্যাপি চক্‌মক্‌ করিতেছে। (২২)

(২১) নরক রাবণের আবাসভূত মূলা নক্ষত্র মূল বর্হণী উপাধি ধারণ করিল। এজন্য হিন্দু বিশ্বাস করেন যে "মূলনক্ষত্রম্ হি মূলোন্ মূলন করণম্।" ইতি সায়ন আচার্য্য।

(২২) এই তারা বেদি তলস্থিত মুকুট হিরণ্যকশিপুর (নক্ষত্র ভূষিত নিশার) মস্তক হইতে পূর্ব্বে একবার খসিয়া পড়িয়াছিল। যথা—"মুকুটম্ বেদি সামীপ্যে পতিতম্ যুধ্যতঃ ভুবি। হিরণ্যকশিপোঃ পূর্ব্বম্ যব পূর্ব্ব-পিতামহাৎ॥" (রাম ৭।২৪)

বেদমতে লঙ্কার উত্তর দ্বারে যমদেব শ্যাম শবল কুকুরদ্বয়ের সহিত অবস্থিতি করেন। রামায়ণ মতে রাক্ষসেশ্বর শুক শারণ সহ অবরুদ্ধ লঙ্কার এই দ্বার রক্ষায় স্বয়ং ব্রতী হইলেন।

সুধীর পাঠক! উপনিষদ মতে আধিদৈবিক সৃষ্টির অনুকল্পে আধিভৌতিক সৃষ্টি হইয়াছে।

লঙ্কাপুরী।

(১) দিবিস্পৃশ শিখরে অবস্থিত।

(২) নৈঋর্তকোণবাসী নৈঋর্তগণের আবাসভূমি।

(৩) নিরালম্ব—

(৪) দেবদুর্গ—

(৫) এবং ত্রিকুট পর্ব্বতের মধ্যম শিখরোপরে ইন্দ্রের আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা-বিনির্ম্মিত।

এই বর্ণনে কোন অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি নাই। এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর লঙ্কাপুরী পৃথিবীতে অমিল বলিয়াই মহর্ষি বাল্মীকি ইতিহের খাতিরে গরজে পড়িয়া ভারতের সার দক্ষিণে স্থিত সিংহল দ্বীপে লঙ্কা স্থাপন করিয়াছেন।

মানবতা, স্থানীয়তা ও কালীয়তা ইতিহের মেরুদণ্ড। তাহাদের অভাবে ইতিহ মোটেই জমে না। নতুবা মহাকবি অতিশয় উক্তির ঘোর কলঙ্কের আশঙ্কা—তুচ্ছ করিতেন না। এবং পৃথিবীর নৈঋর্তকোণে স্থিত লঙ্কাপুরী ভারতের সার দক্ষিণে বসাইতেন না।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

মুগ্ধা।

উষার আলোয় ফুলটী ফোটে
দুপুরবেলা ম্লান আঁখি;
সন্ধ্যাবেলা ঝরিয়া গেলে
(আমি) অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকি।

শ্রীমতী সুরবালা মিত্র।

কোহিনুরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কোহিনুর একখানি জগদ্বিখ্যাত ও সুবৃহৎ সমুজ্জ্বল হীরক। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হীরকখণ্ড কতকাল হইল পাওয়া গিয়াছে, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। অনেকে বলেন, দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের "কৌস্তভ" নামে যে একখানি মণি ছিল, ইহা তাহাই। কিন্তু আমরা তাঁহাদের এই-মতে আস্থা স্থাপন করিতে পারিলাম না। কেন পারিলাম না যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তরে আমরা এই বলিব যে, এই কোহিনুরই যে শ্রীকৃষ্ণের কৌস্তভমণি ছিল, ইহারই বা প্রমাণ কি? সেইজন্য আমরা অতদুর না গিয়া, আমাদিগের ইতিহাসে এই কোহিনুরের সম্বন্ধে যাহা কিছু বর্ণিত আছে, তাহাই সংক্ষেপে "অবসরের" পাঠক-পাঠিকাগণকে বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

প্রথমে এই অমূল্য হীরকখণ্ড মালবের পরমার বংশীয় হিন্দুরাজগণের সম্পত্তি ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কে সর্ব্বপ্রথমে ইহা কোথা হইতে ও কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

১৩০৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলিজী মালব অধিকার করিলে, এই হীরকখানি তাঁহার হস্তগত হয়। তৎপরে কোনক্রমে উহা গোয়ালিয়াধিপতি প্রবল পরাক্রমশালী বিক্রমাদিত্যের উপভোগ্যে আইসে। মোগল সম্রাট্ বাবর ইহা তাঁহার নিকট হইতে উপঢৌকন-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তদবধি অর্থাৎ ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা মোগল সম্রাট্গণের অধিকারে ছিল। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন পারস্য সম্রাট্ নাদিরশাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন, তখন যমুনার নিকটে একটি যুদ্ধে দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের সৈন্য পরাস্ত হয়, তৎপরে নাদির দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া সেই নগর বহ্নি ও অসি দ্বারা ছারখার করিলেন এবং অন্যূন দশকোটী টাকা ও বহুমূল্য টাকার সুবর্ণ, রৌপ্য ও রত্ন এবং এই অমূল্যনিধি কোহিনুর ও অন্যান্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। এই নাদির শাহই ইহার নাম "কোহিনুর" রাখেন।

তৎপরে কাবুলাধিপতি আহম্মদ শাহ অধিকারী-সূত্রে ইহা প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহা সুজার হস্তগত হয়। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে শাহ-সুজা যখন কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের

শরণাপন্ন হন, সেই সময় রণজিৎ সিংহ তাঁহার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে তাঁহার ভরণ-পোষণের জন্য একখানি বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন, এই রত্ন সর্ব্বদা রণজিতের দক্ষিণ বাহুর বাজুতে বিরাজ করিত। কথিত আছে, একদা একজন ইংরাজ তাঁহাকে উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দেন "পাঁচ জুতা" অর্থাৎ তিনি একজনকে পাঁচ জুতা মারিয়া উহা আনিয়াছেন। অপর কেহ ক্ষমবান্ হইলে, তাঁহাকে পাঁচ জুতা মারিয়া লইয়া যাইতে পারে ; নচেৎ উহার মূল্য হয় না।

পঞ্জাবাধিকারের পর উহা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে আইসে এবং বিখ্যাত রাজপুরুষ জন্ লরেন্সের জিম্বায় দেওয়া হয়। অনবধানতা বশতঃ তিনি উহা কৌটাবদ্ধাবস্থায় ওয়েষ্ট-কোটের পকেটে রাখিয়া ভুলিয়া যান। তাহার দেড়মাস পরে লর্ড ডালহৌসির অনুসন্ধানে অনেক উদ্বেগ ও কষ্টের পর, লরেন্স্ সাহেবের সর্দ্দার বেহারার নিকট হইতে উহা পাওয়া যায়। মূর্খ বেহারা জানিত না যে, ঐ সাধারণ কৌটার মধ্যে ওরূপ অমূল্যরত্ন রক্ষিত। সে যাহা হউক, অতঃপর ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে উহা হিন্দু, তুর্ক, মোগল, পারস্য, আফগান ও শিখপ্রাসাদ হইতে একেবারে ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রাসাদে উপনীত হয়, রত্ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ক্রুষ্টরের উপদেশানুসারে ভিক্টোরিয়াপতি প্রিন্স্ আলবার্ট উহাকে কাটাইয়া পূর্ব্ব অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট করিয়া ফেলিয়াছেন। এক্ষণে এই অমূল্যরত্ন ইংলণ্ডেশ্বরী মেরীর মুকুটের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে।

শ্রীমনুজকুমার মজুমদার।

ছোট! বড়!!

ধরুব আমি আকাশের চাঁদ
বামন হে'কে কয়।
ছোট মুখে বড় কথা
তাও কি কখন সয়!
এমন ধারা ব'ল না কেউ
উঁচু হবার তরে।
উঁচু তুমি হবে সেদিন
(যে দিন) বল্‌বে উঁচু পরে॥

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ব্যাকরণতীর্থ।

পিশাচ-লীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রহস্য জাল।

অনাদিদেব কালভৈরবের জটাজাল-বিহারিণী জহ্নু-কন্যা জাহ্নবীর উদাত্তাদিস্বর-মুখরিত তরঙ্গমালা-চুম্বিত তীর্থশ্রেষ্ঠ বারাণসী আজি প্রকৃতির ভীষণ প্লাবনে সন্ত্রস্ত। বরুণা ও অসির হৃদি-বিহারিণী পুণ্যভূমি কাশীধামের নিত্য নির্ম্মল গগন আজি ঘন ঘনরাজি-সমাকুল! সন্ধ্যার পর হইতে প্রবল-বেগে বারিপাতে ও দামিনী-দীপ্তিতে পথিক ভীত-চকিত। কড় কড় নাদে বজ্রপাতে কাশীবাসীর শ্রবণ-বিবর রুদ্ধপ্রায়। এই ভীষণ দুর্য্যোগে কাশীর বাঙ্গালীটোলার একটী ত্রিতল বাটীতে একটী বৃদ্ধ মৃত্যুশয্যায় শায়িত। পার্শ্বে বসিয়া বৃদ্ধের ষোড়শী রূপসী স্ত্রী উদাস-নয়নে স্বামীর রোগ-পাণ্ডুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। অদূরে বৃদ্ধের দূর সম্পর্কে ভাগিনেয় মোহনলাল এবং মোহনলালের ভগিনী রমাবাইয়ের সহিত ম্লানমুখে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে তিমিরবসনা ভীমঘোরা প্রকৃতির তাণ্ডবলীলা দর্শন করিতেছে।

গৃহ নিস্তব্ধ,—অদূরে একটী স্তিমিত দীপশিখা রহিয়া রহিয়া এক একবার উজ্জ্বলভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে,—আবার অধিকতর স্তিমিত হইয়া বাহিরের অন্ধকারের দ্বিগুণ অন্ধকার বর্দ্ধিত করিতেছে। শোকে মুহ্যমান গৃহীদিগের অন্তর-ব্যথা প্রকাশ জন্য আজি দীপশিখা আভাহীন। গৃহের প্রতি দ্রব্যেই যেন শোকের একটা গাঢ়-কৃষ্ণ ঘনচ্ছায়া পতিত হইয়াছে। গৃহমধ্যে একখানি খট্টাঙ্গোপরি অমল ধবল শয্যার উপর বৃদ্ধ শায়িত।

গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মরণোন্মুখ বৃদ্ধ কাতর বচনে স্ত্রীর প্রতি চাহিয়া বলিল,—"রাক্ষসী মতিয়া; তোর জন্য আজ আমার প্রাণ গেল।"

স্ত্রী। না না, এমন কথা বলোন', আমি তোমার প্রতি অবিশ্বাসিনী নহি।

"মিথ্যা কথা"—কাতরাইতে কাতরাইতে বৃদ্ধ গম্ভীরস্বরে বলিল—"মিথ্যা-কথা—মতিয়া তোর মিথ্যাকথা! তুই আর তোর জার, দুজনে মিলে আমায় বিষ দিয়ে মারচিস্—তুই পতিঘাতিনী।

এই কথার পর বৃদ্ধের গলা ঘড় ঘড় করিতে লাগিল এবং অল্পক্ষণ পরে তাহার প্রাণ-বায়ু উড়িয়া গেল। বৃদ্ধের আকস্মিক মৃত্যু দর্শনে যুবতী শয্যা হইতে মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অপর পক্ষে বৃদ্ধের ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী মস্তকে করাঘাত করিয়া উচ্চশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিল।

বৃদ্ধের নাম ছক্কনলাল আগরওয়ালা। কাশীর একজন বৰ্দ্ধিষ্ণু মহাজন। বয়স প্রায় ৬৫ বৎসর। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধের পত্নী-বিয়োগ হওয়ায়, নিঃসন্তান হেতু বৃদ্ধ ষোড়শী মতিবিবির পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিবাহের ফলে ছক্কনলালের নিকটআত্মীয়দিগের ধন-প্রাপ্তির সদ্য আশা তিরোহিত হওয়ায় তাহার আত্মীয় স্বজনেরা বৃদ্ধের মুখ দর্শন একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিল; অপর পক্ষে দরিদ্র বংশসম্ভূতা মতিবিবির দূর সম্পর্কে মিহিরলাল নামক একজন আত্মীয় ব্যতীত অপর কেহ না থাকায় এ বিবাহে কেহই লোভ প্রকাশের কোন কারণ পায় নাই। যদিও বৃদ্ধের আত্মীয়েরা পূর্ব্বে একবারও বৃদ্ধের খোঁজ খবর লইত না, তথাপি তিনি রোগে শয্যাগত হইবা মাত্র, ভাগিনেয় মোহনলাল বিধবা ভগিনী রমাবাইয়ের সহিত বৃদ্ধের সেবা করিবার জন্য তাহার বাটীতে সমাগত হইয়াছিল। মতিবিবি বৃদ্ধের আত্মীয়বর্গের এই আকস্মিক মমতায় সন্দেহ করিবার কোন কারণ পায় নাই বলিয়া তাহাদের আগমনে বরং উল্লাসিতই হইয়াছিল। কিন্তু দুই একদিনের পরই সরল-হৃদয়া মতিয়া বুঝিল যে, কি কালসর্পকে আশ্রয় দিয়াছে। মতিয়ার আত্মীয় মিহির লালের নামোল্লেখ করিয়া দুর্ব্বৃত্ত মোহনলাল বৃদ্ধকে নানাকথা শুনাইয়া দেওয়ায় বৃদ্ধের মনে বিশ্বাস হইল যে, মতিয়া বিশ্বাসহন্ত্রী; সেইজন্য মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে বৃদ্ধ ছক্কনলাল প্রায়ই মতিয়াকে তিরস্কার করিত। মতিয়া পরমা রূপসী—রূপের প্রভায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ উচ্ছ্বসিত। বৃদ্ধ রোগ-শয্যায় এই রূপের দিকে চাহিয়াই আরও কাতর হইয়া পড়িয়াছিল।

ছক্কনলালের প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া যাইবার অব্যবহিত পরেই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া একটী বাঙ্গালী যুবক চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে গৃহ-প্রবেশ করিল। যুবকের বয়স ৩০।৩৫ বৎসর। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, দৃষ্টি হৃদয়ভেদী এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক। যুবকের আকৃতিতে এমন একটু মধুরভাব ছিল, যাহাতে সহজেই তাহার মনের উচ্চ ভাবগুলি লোক-লোচনের পথবৰ্ত্তী হইত। যুবককে দেখিয়া মোহনলাল মস্তকে

করাঘাত করিয়া বলিল—নীরদবাবু! নির্দ্দয় বিলম্ব। আমি আরও সত্বর আপনার আগমন আশা করিয়াছিলাম। আমার মামার নিজমুখ হইতে তাহার অন্তরের গুহ্য কথাগুলি শুনাইবার জন্যই আপনাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলাম। যুবকের নাম নীরদবরণ সেন,—ডিটেক্‌টিভের কার্য্যে সুদক্ষ। আমার বিশেষ একটা কাজ থাকায় আমি গতকল্য আসিতে পারি নাই বলিয়া নীরদবাবু আর একবার গৃহ-মধ্যস্থ সকল দ্রব্যের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। মোহনলাল উদাসভাবে মতিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—নীরদবাবু! এই পাপিনী সম্পর্কে আমার মাতুলানী—মামা মৃত্যুকালে ইহাকে ও ইহার জার মিহিরলালকে হত্যাকারী নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; আমি স্বকর্ণে এই কথা শুনিয়াছি।

"না না, মিথ্যাকথা" বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিতা মতিয়া উঠিয়া বসিল।

নীরদবাবু মতিয়ার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই বলিলেন—"মোহনবাবু! এখন আমাকে কি করিতে হইবে?"

মোহন। আমি পাপিনী ও তাহার পাপ-সহচরকে হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। পাপীর দণ্ড সর্ব্বথা প্রার্থনীয়।

নীরদ। আপনার মাতুলানীর উপপতির বিষয় আপনি কি করিয়া জানিলেন?

মোহন। মামা বলিয়াছেন—আর আমিও উভয়কে একত্র প্রেমালাপ করিতে দেখিয়াছি।

নীরদ। উপপতির নাম কি?

মোহন। মিহিরলাল।

মতিয়া ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল—"একেবারে ভিত্তিহীন কথা—আপনি বিশ্বাস করিবেন না। আমি নিরপরাধিনী।"

নীরদবাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—"এখন আমি কিছুই বলিতে চাহি না।"

মতিয়া রোদন করিতে করিতে বলিল—"আমার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের দিনে—আমি ভগবান বিশ্বনাথের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, নীরদবাবু আমি কোন দোষে দোষী নহি—আপনি পাপীর দণ্ড বিধান করুন।"

মতিয়ার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া মোহনলাল বলিল—"আমি গুহ্যতত্ত্বের

সু-মীমাংসার জন্য নীরদবাবুকে এবং করোণারকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি। নীরদবাবু! ব্যাপার বড়ই সমস্যাপূর্ণ। ডাকিনীর মায়া-কান্না দেখিয়া ভুলিবেন না। সুন্দরীর আঁখিজল যুবকদিগের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র। দেখিবেন যেন কর্ত্তব্য কার্য্য ভুলিবেন না।"

মোহনলালের দীর্ঘ-বক্তৃতায় মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেও নীরদবাবু সহাস্যে বলিলেন—"না, সে ভয় নাই। ডিটেক্‌টিভের কার্য্য আমার পক্ষে নূতন নহে। বহু কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়া আজ আমি সরকার বাহাদুরের নিমকের ভৃত্য।"

নীরদবাবুর মুখের কথা শেষ হইতে না হইতেই করোণার ও ডাক্তার বাবু সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মোহনলাল, মাতুলের শব পরীক্ষার জন্য পূর্ব্বে ইহাদিগকেও সংবাদ দিয়াছিল। তাহারা গৃহে প্রবেশ করিলে মতিবিবিকে গৃহান্তরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আলুলায়িত-কুন্তলা, রোরুদ্যমানা মতিবিবি গৃহান্তরে যাইয়া আকুলভাবে রোদন করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল—"হে পতিতপাবন! বিনা কারণে আমার নামে দোষারোপ হইয়াছে, আপনি অন্তর্য্যামী—আপনি সকলই বুঝিতেছেন। হে হরি! যেন বিনা দোষে আমার নামে কলঙ্ক স্পর্শিত না হয়।"

ইহার অল্পক্ষণ পরেই মতিবিবির গৃহদ্বারে বাহির হইতে করাঘাত হইল। মতিবিবি তাড়াতাড়ি দ্বার উন্মুক্ত করিবামাত্র একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান দেখিল।

আগন্তুক নিজের পরিচয় দিয়া বলিল,—"আমি থানার প্রধান ইন্‌স্পেক্টার—করোণারের আদেশে আমি পতিহত্যার জন্য আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।"

মতিবিবির চক্ষু ক্রোধে প্রজ্বলিত হইল। ধীরস্বরে বলিল—"কে আমার নামে দোষারোপ করিতে সাহসী হইয়াছে জানিতে চাহি।"

ইনস্। শব ব্যবচ্ছেদ দ্বারা ডাক্তার বাবু জানিতে পারিয়াছেন, মরফিয়া সেবনে আপনার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে এবং মরফিয়া আপনিই তাহাকে সেবন করাইয়াছেন।

মতিয়া। কি, এতদূর! আমি নিজের হাতে স্বামীকে বিষ দিয়াছি! অতি বড় পিশাচিনীরও যাহা চিন্তার অতীত, আমি তাহাই করিয়াছি!

ইনস্। ঘটনা-পরম্পরাগত প্রমাণ—আপনার বিরুদ্ধে অতীব প্রবল।

আপনাকে আমার সহিত থানায় যাইতে হইবে। বিলম্ব করিবেন না। আমি সরকারী ভৃত্য। আমার অনেক কাজ।

মতিয়া। তবে চলুন।

এই বলিয়া ইন্‌স্‌পেক্টার বাবুর সহিত থানায় যাইবার জন্য উপর হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিবার সময় মৃদু স্বরে কে যেন বলিল—"ভয় নাই, আমি তোমাকে রক্ষা করিব।" মতিয়া ফিরিয়া দেখিল—অন্যমনস্কভাবে অদূরে নীরদবাবু দাঁড়াইয়া আছেন। সে যেমন তাঁহার সহিত কথা কহিবার উপক্রম করিতেছে—অমনি নীরদবাবু চক্ষুর ইঙ্গিতে তাহাকে বাক্যালাপ করিতে নিষেধ করিলেন। মতিবিবি ওরফে মতিয়া সজল-নয়নে নীরবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থানায় চলিয়া গেল। কিন্তু নীরদবাবু তখনও বাটীতে রহিলেন। তিনি অন্যান্য গৃহগুলি পরীক্ষা করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"হতভাগা ছক্কনলাল যে বিষ সেবনে দেহত্যাগ করিয়াছে, ইহা শব পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। তবে এখন এ কার্য্য কাহার দ্বারা সমাধা হইয়াছে—ইহাই সমস্যা। বর্ত্তমানে মতিবিবির বিরুদ্ধে যেরূপ প্রমাণ উপস্থিত, তাহাতে তাহাকে দোষী না ভাবিয়া কোন-মতেই থাকা যায় না। তবে আমার মনে হয়—হতভাগিনী নিরপরাধা। গভীর চক্রান্তে বিপদ্‌গ্রস্ত। দেখা যা'ক্ আমি কি করিতে পারি।"

এই ভাবিতে ভাবিতে নীরদবাবু থানার অভিমুখে আসিবার সময় শুনি-লেন—এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড নানাভাবে পল্লবিত হইয়া কাশী সহরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। নানাজনে নানাভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করিয়া মতিয়াকেই হত্যাকারিণী নির্দ্দেশ করিতেছে। নীরদবাবু থানায় আসিয়া দেখিলেন—মিহিরলালও হত্যাকারিণীর সহায়তা-করণাপরাধে ধৃত হইয়া হাজত বাস করিতেছে।

বলিতে ভুলিয়াছি,—প্রত্যূষে নীরদবাবু যখন ছক্কনলাল বাবুর বাটী হইতে চলিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময়ে মোহনলাল তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া-ছিল—"নীরদবাবু, আপনাকে আমার আর প্রয়োজন নাই, আপনার পারি-শ্রমিক কত বলুন।"

নীরদ। কেন, আপনি কি আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হন নাই?

মোহন। খুব হইয়াছি—তবে কি জানেন—পুলিশ যখন সকল কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছে, তখন আর বৃথা অপব্যয় কেন?

নীরদ। কিন্তু মতিয়া বিবি ত নির্দ্দোষও হইতে পারেন, সুতরাং তৎ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত নহে কি ? বাটীর মধ্যে আপনিই যখন পুরুষ ও অভিভাবক তখন এটা আপনারই কর্ত্তব্য।

মোহন। কি মতিয়া নির্দ্দোষ—অসম্ভব! নিশ্চয়ই সেই পতিহত্যাকারিণী।

নীরদ। ভাল, মোহনলাল বাবু এই সামান্য কার্য্যের জন্য আমার আর কোন পারিশ্রমিকের প্রয়োজন নাই। আমি এখন বিদায় হই।

এই বলিয়া নীরদবাবু বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

করোণারের তদন্ত।

ছক্কনলাল বাবুর মৃত্যুর পরদিনই করোণারের তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। আজ করোণার-কোর্ট জনতায় পূর্ণ। শত শত ব্যক্তি যুবতীঘটিত এই রহস্য-পূর্ণ হত্যাকাণ্ডের সবিশেষ ঘটনা জানিবার জন্য আদালতের কার্য্যারম্ভের বহুপূর্ব্বেই আদালতগৃহে স্থান সংগ্রহ করিয়াছে। যথাস্থানে পাহারাওয়ালারা দাঁড়াইয়া গোলমাল থামাইবার অছিলায় বৃথা চীৎকার করিয়া গোলমাল বৃদ্ধি করিতেছে। দর্শকগণের মুখে একটা ঔৎসুক্যের চিহ্ন ফুটিয়া বাহির হইতেছে; যেন তাহারা আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। ক্রমে বেলা দশটা বাজিল। করোণার সাহেব আদালতে প্রবেশ করিয়া জুরি নির্ব্বাচন করিলেন।

সরকারী উকিল হাঁকিলেন—ডাক্তার রতিকান্ত রায়। সাক্ষী কাটগড়ায় প্রবেশ করিলে আসামী মতিয়া ও মিহিরলালকে কাটগড়ায় হাজির করা হইল। উভয়ের মুখশ্রী মলিন এবং বিষাদক্লিষ্ট।

উকিলবাবু প্রশ্ন করিলেন—

প্র। আপনিই ছক্কনলাল বাবুর চিকিৎসা করিয়াছিলেন ?

উ। হাঁ, করিয়াছিলাম।

প্র। আপনি কি মরফিয়া মিশ্রিত কোন ঔষধ সেবন করিতে দিয়াছিলেন।

উ। হাঁ।

প্র। কি ভাবে দিয়াছিলেন ?

উ। অপরাপর কয়েকটী ঔষধের সহিত অর্দ্ধ গ্রেণ মাত্রায় মরফিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

প্র। আপনি শব-ব্যবচ্ছেদকালে উপস্থিত ছিলেন?

উ। হাঁ।

প্র। কি দেখিয়াছিলেন?

উ। শবদেহের মধ্যে তিন গ্রেণ মরফিয়া পাওয়া গিয়াছিল।

প্র। কাহাকে ঔষধ সেবন করাইবার উপদেশ দিয়াছিলেন?

উ। ছক্কনলাল বাবুর পত্নীকে।

প্র। ছক্কনলাল বাবুর পত্নী—স্বামীকে ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন কি না আপনি জানেন?

উ। হাঁ, ছক্কনলাল বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন।

প্র। মৃতের গৃহে টেবিলের উপর যে ঔষধ ছিল, তাহা কি আপনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন?

উ। হাঁ।

প্র। তাহাতে কোন দোষ দেখিয়াছিলেন?

উ। না, সকল ঔষধই পূর্ব্বাবস্থায় ছিল, কোনটীতেই অপর ঔষধ মিশ্রিত করা হয় নাই।

উকিলবাবু বলিলেন—"বেশ হইয়াছে—আর আপনাকে প্রয়োজন নাই।"

দ্বিতীয় সাক্ষী হররাম বাবু সরকারী উকিলের প্রশ্নোত্তরে বলিলেন—"আমি একজন ঔষধবিক্রেতা।"

প্র। আপনি আসামী মিহিরলাল বাবুকে জানেন?

উ। হাঁ, বহুদিন হইতে আমার সহিত আলাপ আছে।

প্র। আপনি কি কখন তাহাকে মরফিয়া বিক্রয় করিয়াছিলেন?

উ। হাঁ।

প্র। কতদিন পূর্ব্বে?

উ। প্রায় ছয়মাস।

প্র। কোন প্রেসকিপসনের জন্য দিয়াছিলেন কি?

উ। না।

প্র। তবে কি ভাবে দিয়াছিলেন বলুন?

উ। মিহিরবাবু এক রাত্রিতে আমার ডিসপেন্‌সারিতে আসিয়া বলেন যে, আমার পেটে হঠাৎ একটা ফিক্ ব্যথা হইয়াছে—বড়ই যন্ত্রণা পাইতেছি। ডাক্তার মরফিয়া খাইতে বলিয়াছেন। আমায় একটু মরফিয়া দিউন। আমি মিহিরলাল বাবুকে মরফিয়া দিয়াছিলাম।

এইখানে মতিয়ার পক্ষীয় উকিলবাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এ প্রশ্নের অর্থ বুঝিলাম না।"

সরকারী উকিল বলিলেন—"আমরা বলিতে চাহি—মিহিরলাল বাবুর ক্রীত বিষেই ছক্কনলাল বাবুর প্রাণ সংহার করা হইয়াছে।"

ইহার পর মতিয়ার পক্ষীয় উকিলবাবু সাক্ষীর জেরা করিলেন। জেরার মুখে সাক্ষী নানাপ্রকার অবান্তর কথা বলিয়া শেষে বলিতে বাধ্য হইল—"মিহিরলাল বাবু যে কারণে ঔষধ লইয়াছিলেন, তাহা সত্যও হইতে পারে। আর মরফিয়া সেবনে ফিক্ ব্যথা আরামও হয়।"

এইবার মোহনলাল বাবু সাক্ষ্য দিতে সাক্ষীর আসনে দাঁড়াইলেন। মোহনলাল বাবুর বয়স প্রায় ৪০ বৎসর। দিব্য লম্বা মানানসই গঠন, এক জোড়া খুব লম্বা গোঁপ ও চক্ষুর্দ্বয় দিব্যায়ত। তিনি উকিলবাবুর প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"আমি মৃত ছক্কনলাল বাবুর ভাগিনেয় এবং তাহার কারবারের ম্যানেজার।"

প্র। আপনার মামীকে পূর্ব্বে চিনিতেন?

উ। না—বিবাহের পর হইতে চিনিয়াছি।

প্র। কখন কি তাহার সহিত বিবাদ করিয়াছেন?

উ। না, বরং তাহার সম্মান করিয়া থাকি।

প্র। আপনি কি কখন আপনার মাতুলকে ঔষধ সেবন করাইয়াছিলেন?

উ। না।

প্র। কে খাওয়াইত?

উ। আমার মামী—মতিবিবি।

উ। সাক্ষীর মুখ হইতে এই ভীষণ কথা বাহির হইবামাত্র আদালতস্থ দর্শকগণ ক্রোধে বিচলিত হইয়া উঠিল। অপরপক্ষে ক্ষোভে ঘৃণায় মতিবিবি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু উকিলবাবুর ইসারায় তাহা হইতে বিরত হইলেন।

পুনরায় প্রশ্ন হইল—"আপনার মাতুলের মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে তাহার সহিত কি আপনার কোন কথাবার্ত্তা হইয়াছিল?"

উ। হাঁ।

প্র। কি কথা বলুন।

উ। সেইদিন বেলা দশ ঘটিকার সময় মতিবিবি কার্য্যব্যপদেশে গৃহান্তরে গমন করিলে, মাতুল ক্ষীণস্বরে বলিলেন—“আমার স্ত্রীর একটী জার আছে—সেই জারের নাম মিহিরলাল। তিনি দূর সম্পর্কে আমার স্ত্রীর আত্মীয়।”

প্র। তিনি কেমন করিয়া এই সকল ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাও কি বলিয়াছিলেন?

উ। হাঁ, উভয়কে বহুবার গোপনে একত্র দেখিয়াছিলেন।

প্র। আর কিছু বলিয়াছিলেন?

উ। হাঁ, তিনি বলিলেন—“আমার সন্দেহ হইতেছে যে, আমার স্ত্রী আমাকে বিষ সেবন করাইতেছে—তুমি একজন ডিটেক্‌টিভকে সংবাদ দাও এবং একজন ডাক্তার ডাকিয়া আন।”

প্র। আপনি কি সে আদেশ পালন করিয়াছিলেন?

উ। হাঁ, আমি ডিটেক্‌টিভকে সংবাদ দিয়া, ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তখন তিনি বাটীতে ছিলেন না, সেইজন্য আনিতে পারি নাই। পরদিন ভোর রাত্রিতে মাতুলের মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুকালেও মাতুল আমার সমক্ষে মতিবিবিকে হত্যাকারিণী বলিয়া গিয়াছিলেন।

প্র। আপনি কি মতিবিবির গুহ্যতত্ত্বের অন্বেষণ করিতেন?

উ। (বিরক্তি সহকারে) না।

প্র। তাহার উপর আপনার রাগের কোন কারণ নাই?

উ। না,—কিছুই না।

সাক্ষী কাঠগড়া হইতে নামিয়া যাইতেছে দেখিয়া মতিবিবির উকিল একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন—“মোহনলাল বাবু, অত তাড়াতাড়ি কেন? আমারও দুই একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।” মোহনলাল বাবু পুনরায় কাঠগড়ায় প্রবেশ করিলে; উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—“আপনিই না বলিয়াছেন যে, আপনি ছক্কনলাল বাবুর ভাগিনেয় এবং কারবারের ম্যানেজার?”

উ। আজ্ঞে হাঁ।

প্র। ভাল কথা, কিন্তু তিনি যে উইল করিয়া গিয়াছেন—তাহাতে আপনাকে বা আপনার ভগিনীকে এক কপর্দ্দকও দিয়া যান নাই?

সাক্ষী এই প্রশ্নের জবাব না দিয়া আমতা আমতা করিতে থাকায় উকিল বাবু বলিলেন—প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দিন। বলুন—আপনার মাতুল শুদ্ধ তাহার স্ত্রীকেই তাহার বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়া গিয়াছেন কি না?

উ। আমার বিশ্বাস তাই।

প্র। আপনি কখন সে উইল দেখেন নাই?

উ। একবার মাত্র দেখিয়াছি।

প্র। কখন, কোথায় এবং কবে?

উ। মাতুলের মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে, যখন তিনি উইলখানি নষ্ট করিয়া ফেলেন—সেই সময়ে।

প্র। উইল নষ্ট করিবার সময়ে কে কে তথায় উপস্থিত ছিল?

উ। আমি এবং আমার ভগিনী রমাবাই।

প্র। কেন তিনি উইলখানি নষ্ট করিয়াছিলেন জানেন?

উ। তিনি বলিয়াছিলেন—তাঁহার পরিণীতা পত্নী বিশ্বাসহন্ত্রী—সেইজন্য তাহাকে এক পয়সাও দিবেন না।

প্র। তিনি অন্য কোন উইল করিয়াছিলেন?

উ। হাঁ।

প্র। সেই উইলে কাহাকে সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন?

উ। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি বিতরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

প্র। সে উইলখানা কোথায়?

উ। আমার নিকটে আছে।

প্র। তিনি উইলের নিম্নে স্বাক্ষর করিয়াছেন কি?

উ। না, সময় পান নাই—প্রভাতে স্বাক্ষর করিবার কথা ছিল; কিন্তু গুপ্তহন্তার হস্তে পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্র। তাহা হইলে উইলে ছক্কনলাল বাবুর স্বাক্ষর নাই?

উ। না।

প্র। আপনি কি কখন মতিবিবির চরিত্র-সম্বন্ধে আপনার মাতুলের নিকটে অনুযোগ করিয়াছিলেন?

উ। আমি—আমি—না কখন না।

প্র। তবে কেন আপনি বিচলিত হইতেছেন?

উ। আমি প্রথমে আপনার প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারি নাই—সেইজন্য।

প্র। ভাল, তাহা হইলে আপনি মতিবিবি-সম্বন্ধে কোন কথাই আপনার মাতুলের নিকটে বলেন নাই?

উ। কখন না।

প্র। আপনি কি তাহাকে দোষী বলিয়া মনে করেন?

উ। আমার বিশ্বাস যে, মাতুল যদি তাহার পত্নী-সম্বন্ধে কোনরূপ চাক্ষুষ প্রমাণ না পাইতেন, তাহা হইলে কখনই এরূপ কঠোর ব্যবস্থা করিতেন না।

প্র। আপনার মাতুলের কত টাকার সম্পত্তি?

উ। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা।

প্র। ইহার মধ্যে আপনাকে কত টাকা দিয়া গিয়াছেন?

উ। অৰ্দ্ধেক।

ইহার পর উকিলবাবু বলিলেন—"আচ্ছা আপনি যাইতে পারেন। সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হইলে করোণার জুরিদিগকে মামলার অবস্থা বুঝাইয়া দিলেন। জুরিরা পরামর্শ করিবার জন্য আদালত হইতে উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে সমস্ত গৃহ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল—সকলেই নিরুদ্ধশ্বাসে জুরিদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অৰ্দ্ধঘণ্টা পরে জুরিরা আদালত গৃহে প্রবেশ করিয়া উভয় আসামীকেই বিষপ্রয়োগে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিলেন। করোণারও জুরিদিগের সহিত একমত হইয়া হত্যাপরাধে অভিযুক্ত করিয়া উভয়কে পুলিশের হেপাজাতে হাজতে পাঠাইয়া দিলেন।

আসামীদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকেরা আদালত গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দর্শকগণের সহিত বিখ্যাত গোয়েন্দা—নীরদবরণ বাবুও গম্ভীরবদনে বাহির হইয়া গেলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅর্জ্জুনচন্দ্র বসু।

সেকাল ও একাল।

আজকাল সকলেরই মুখে শুনা যায়, সংসারে একদণ্ড শান্তি নাই। কাহারও বা অর্থকষ্ট, কেউ বা রোগক্লিষ্ট, কেউ বা চিন্তাজ্বরে জীর্ণ। সংসারের অভাব কিছুতেই সঙ্কুলান হয় না। দিবা রাত্রি কেবল অশান্তি বিরাজ করিতেছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে টাকায় একমণ চাউল বিক্রয় হইত, সরিষার তৈলের সের দেড় আনা দুই আনা ছিল, দেশীয় লবণ দ্বারা রন্ধন ক্রিয়া সমাপ্ত হইত। প্রাচীনারা স্বহস্তে কার্পাসতুলা হইতে, সূতা বাহির করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতেন ; সেই মোটা কাপড়ে সে সময়কার শীত, গ্রীষ্ম সমভাবে রক্ষিত হইত। গৃহস্থেরা বাজার করিতে গেলে, ধান্য চাউল বিনিময়ে, মৎস্য, তরকারী ইত্যাদি আবশ্যকীয় সামগ্রী আনিত। রোগের সংখ্যা অতি বিরল ছিল। যদি চ কাহারও রোগ হইত, তবে সামান্য হাঁতুড়ে বৈদ্য দ্বারা তাহার প্রতিকার হইতে পারিত। বিদ্যাশিক্ষার পথ একেবারেই ছিল না ; দশ, বিশ গ্রাম অন্তর, কোন ভদ্র গৃহস্থের বাটীতে গুরুমহাশয় পাঠশালা করিতেন, তথায় কোন কোন অভিভাবক, স্ব-ইচ্ছা-বশবর্ত্তী হইয়া বালককে শিক্ষা করিতে দিতেন। মোট কথা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের এ জন্মভূমি বসুমতী, অতি সুখে অবস্থিতি করিয়াছেন, তাঁহার কিছুরই অভাব ছিল না। সাধারণ গৃহস্থলোকে, সাংসারিক খরচ পত্র করিয়াও বাৎসরিক দুই একশত টাকা জমাইতেন।

ইদানীং যুবক সম্প্রদায়, পূর্ব্বেকার এ সমস্ত কথা শ্রবণ করিলে, আরব্য উপন্যাস বলিয়া মনে করেন। এখন টাকায় ছয়সের চাউল, তৈলের মূল্য আট নয় আনা সের। খাদ্য সামগ্রীর মূল্য যে কিরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা সংসারী মাত্রেই অনুভব করিতে পারিতেছেন। মৎস্যের মূল্য এত বৃদ্ধি হইয়াছে, সাধারণ লোকের ক্রয় করিবার উপায় নাই। আজকাল হা অন্ন, হা অন্ন, রব চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

সংসারে এত পরিবর্ত্তন হইবার কারণ কি, অনেকেরই মনে এরূপ ধারণা য়, এরূপ অভাব অনটন কেন হইল ? প্রথমতঃ লোক সংখ্যা নির্ণয় করিতে হইবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে সেন্‌সাস্ হিসাবে যত লোক হইয়াছিল, গত ১৯১১ খৃষ্টাব্দের সেন্‌সাসে, তদপেক্ষা বহুলোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। পঞ্চাশ ৎসর পূর্ব্বে যে সমস্ত জমিগুলি পতিত ছিল, অধুনা তাহাতে ফসল করা

হইতেছে। বড় বড় নদী, খাল, ডোবা বাঁধিয়া নানারূপ শস্যোৎপাদন হইতেছে। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে পাটের চাষ হইয়া, কৃষকেরা বিস্তর টাকার মুখ দেখিতে পাইতেছে; তাহারা এত টাকা জীবনে কখনও দেখে নাই। এত টাকা এবং দিবা রাত্রি পরিশ্রম, তাতেও কাহার দিন গুজরাণ হইতেছে না; অধিকাংশ কৃষক, মহাজনের নিকট বিস্তর টাকার ঋণী রহিয়াছে।

সংসারের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। পল্লীগ্রামে এমন দরিদ্র কৃষক আছে, যাহারা দিনান্তে একবার খাইয়া পরিবারের ভরণ পোষণ যোগাড় করিতেছে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে। এত পরিবর্ত্তন হইবার হেতু এই যে, পূর্ব্বে জমিতে যেরূপ ফসলোৎপন্ন হইত, আজকাল তাহা হয় না। পূর্ব্বে যে জমিগুলিতে ফসল হইত, আজকাল সেই জমি এবং পতিত জমির ফসল, উভয়েই পূর্ব্বের ফসলের সমান। আবার বঙ্গদেশ হইতে বহু শস্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়, তাহাতে কত লোকের খাদ্যের অভাব হইতেছে, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে এদেশে যত শস্য উৎপাদন হইত, সমস্তই দেশের লোকের উদরান্নের জন্য সংস্থাপিত হইত, অধুনা বহু শস্য অন্য দেশে রপ্তানী হইয়া, আমাদিগকে আরও দরিদ্র করিয়া দিতেছে। এদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হেতুও খাদ্যের অকুলান পড়িয়াছে।

পূর্ব্বে কোন পূজার সময়, সাধারণ সকল লোকেই আচার, ব্যবহার, ব্রতপালন করিত, আজকাল সে সমস্ত একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের দিকে পূর্ব্বে সাধারণের যেরূপ লক্ষ্য ছিল, এখন তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। পূর্ব্বে বালক বালিকাদিগের টীকা দিবার সময়ে, কতরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত; সমস্ত পরিবারটাকে, অধিকন্তু প্রসূতিকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নিয়ম পালন করিতে হইত। আজকাল বালক বালিকারা টীকা পরিয়া, মৎস্য, মসুর, পোড়া দ্রব্য, নিয়মিত ভাবে যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেছে; প্রসূতির ত সেদিকে লক্ষ্যই নাই! এত অত্যাচারেও বালক বালিকার টীকা পরিয়া কোন বিঘ্ন হয় না। এইরূপ কত বিষয়ে যে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা বলা যায় না! লোকে আজকাল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য বলিয়া একটী জিনিষ আছে, তাহা আদৌ ভাবে না। অত্যাচার, পরদ্রব্য হরণ, পরদার হরণ, চৌর্য্যবৃত্তি, মিথ্যা কথা প্রভৃতিতে সংসার আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মের বিনিময়ে, অধর্ম্ম সুখে স্বচ্ছন্দে বিরাজ করিতেছে।

এই সব অত্যাচারে, বসুমতী উর্ব্বরাশক্তি হীন হইয়াছে। গাছে আর পূর্ব্বের ন্যায় ফল জন্মে না। পূর্ব্বের যে সমস্ত প্রাচীন সহকার মস্তক উত্তোলন করিয়া, চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে, তাহারা আর ফল প্রসব করে না। সামান্য দুই চারিটা মাত্র লোকে দেখিতে পায়। আম, জাম, নারিকেল, কাঁটাল, বেল, তাল, বঙ্গদেশে কত যে বৃক্ষ রহিয়াছে, তাহার সীমা নাই; কিন্তু এত বৃক্ষ থাকিতেও লোকে তাহার ফল খাইতে পায় না। ধর্ম্ম কি এবং অধর্ম্ম কি, তাহা সকলেই ইহা হইতে সহজে অনুমান করিতে পারেন। খাদ্য দ্রব্যের বিষয়ে যতদুর বিনিময় হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

এখন পোষাক পরিচ্ছদের বিষয় দেখুন। পূর্ব্বে মোটা কাপড় পরিয়া, সকলের শীত, গ্রীষ্ম, লজ্জা নিবারণ হইত, এখন মিহি বিলাতী বস্ত্র বিনা পিন্ধন হয় না। দেশী কাপড় মোটা, গায়ে ফুটে। কাজেই দেশীয় তন্তুবায় সম্প্রদায় বস্ত্র নির্ম্মাণ কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। বিলাতী কাপড় যে একবার ব্যবহার করিয়াছে, সে দেশী কাপড়ের নাম গন্ধ শুনিতে পায় না। কাজেই সকলে বাবুগোছের হইয়া পড়িয়াছে, সৌখিনতার প্রতি দৃষ্টি হইয়াছে। আজকাল একক্রোশ রাস্তা চলিলে, গা দিয়া ঘাম পড়ে, এক-ঘণ্টা রৌদ্রে থাকিলে বিষম জ্বর আসে। বহুবিধ কারণে শরীরের পেশী-সমূহ নিস্তেজ হইয়া, নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। যেমন বহুবিধ রোগের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ আবার প্রতীকারের ঔষধ বাহির হই-য়াছে। সামান্য একটু অসুখ হইলে, শিশি লইয়া ডাক্তার বাড়ীতে দৌড়া-ইতে হয়। অর্থ কতদিকে যে অনর্থ নষ্ট হইতেছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন? পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এবং আজ কত তফাৎ হইয়াছে, তাহা সুধী-মাত্রেরই বিবেচ্য। পূর্ব্বকালের যে সমস্ত বৃদ্ধেরা এখন জীবিত আছেন, তাঁহারা এখন দেখিয়া শুনিয়া পাগল হইয়াছেন। স্বপ্নের অলীকতার ন্যায়, তাঁহাদের স্মৃতিপটে ভ্রম জন্মে। ভবিষ্যৎ পঞ্চাশ বৎসর পরে, কিরূপ হইবে, তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন? ভবিষ্যতের কথা ভাবিলে, শরীর কণ্টকাকীর্ণ হয়। পঞ্চাশ বৎসর অতীতের কথা যেমন উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়, পঞ্চাশ বৎসর ভবিষ্যতের কথা, সেইরূপ উপন্যাস বলিয়া ভ্রম হইবে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসিবে, লোকে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইবে।

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র দাস।

নাট্যসাহিত্যে সেক্সপিয়র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ২৪ বৎসর কাল ধরিয়া মহামতি সেক্সপিয়র নিম্নলিখিত নাটকগুলি প্রণয়ন করিয়া তৎকালীন নাট্য-জগৎকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিলেন ; ইহা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র যে, সেই সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তাঁহার রচনার আধিপত্য দিন দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। নাটকগুলি সাধারণতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়া উল্লেখ করিলেই সাধারণের বোধগম্য হইবে, সেই নিমিত্ত পাঁচভাগে বিভাগ করিয়া উল্লেখ করিলাম।

(ক) করুণ রসাত্মক মিলনান্ত হাস্যরসপূর্ণ নাটক ঃ—

(১) ভেরোণার দুই সম্ভ্রান্ত (২) কৌতুকাবহ ভ্রম (৩) কর্কশতায় ধীরতা (৪) প্রণয়ে নৈরাশ (৫) শেষ সুখ পরম সুখ (৬) নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন (৭) অলীক কর্ম্মে আড়ম্বর (৮) উইণ্ডজরের সুখ-পরিবার (৯) দ্বাদশ রজনী।

(খ) বিয়োগ ও মিলনান্ত নাটক ঃ—

(১) ভিনিস নগরের বণিক (২) যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল (৩) ট্রই-লস ও ক্রিসেডা (৪) টাইমন।

(গ) ঐতিহাসিক নাটক ঃ—

(১) রাজা ষষ্ঠ হেনিরীর জীবনের ১ম,২য় ও ৩য় পর্ব্ব (৪) রাজা জনের জীবনী (৫) রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের জীবনী (৬) রাজা তৃতীয় রিচার্ডের জীবনী (৭) রাজা চতুর্থ হেনিরীর জীবনীর প্রথম ও (৮) দ্বিতীয় পর্ব্ব (৯) রাজা পঞ্চম হেনিরীর জীবনী (১০) রাজা অষ্টম হেনিরীর জীবনী।

(ঘ) অদ্ভুত ঘটনাবলী সম্বলিত নাটক ঃ—

(১) পিরাক্লিসের উপাখ্যান (২) সিম্বেলীন রাজার উপাখ্যান (৩) যাদৃশী ভাবনা তাদৃশী ঘটনা (৪) শীত ঋতুর উপাখ্যান (৫) ঝটিকা।

(ঙ) বিয়োগান্ত নাটক ঃ—

(১) টিটাস এণ্ড্রনিকাশ (২) রোমিও জুলিয়েট (৩) হামলেট

(৪) ওথেলো (৫) রাজা লিয়রের জীবনী (৬) ম্যাকবেথ (৭) কোরিও-লেনাস (৮) জুলীয়স সীজর (৯) এণ্টনী ও ক্লীওপেট্রা।

শেষোক্ত তিনখানি নাটক রোমান ট্রেজিডিস বা রোমদেশীয় ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটক নামেই অভিহিত।

যদিও সেক্সপিয়রের জীবদ্দশায় এই ৩৭খানি নাটক গ্রন্থাবলীরূপে একত্রে মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে ১৮খানির মুদ্রণ ও প্রচার তিনি স্বয়ং দেখিয়া গিয়াছিলেন।

নাটক লিখিয়া কোন নাট্যকবি সেক্সপিয়রের মত এরূপ সৌভাগ্যবান্ ও পৃথিবীর সর্ব্বস্থানের বরেন্দ্র সমাজে আদরণীয় হইতে পারেন নাই। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতাবলে তিনি জর্ম্মণীতেও Herder, Goethe, Schlegel, Tieck Gervinus, Ulrici প্রভৃতি জর্ম্মণ মহাকবিগণের নিকটেও আদরণীয়। সুবিখ্যাত ফরাসী-কবিগণও সেক্সপিয়রের রচনা-লালিত্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার অনেক নাটক ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ফরাসীদেশেও তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে স্বদেশী বিদেশী স্বধর্ম্মী বিধর্ম্মী বন্ধুবর্গ কর্ত্তৃক সমানভাবে আদৃত হইয়া তাঁহার গ্রন্থাবলী কত যে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা বিদ্বৎসমাজে কাহারও অবিদিত নাই। সর্ব্ববিধ্বংসী কাল তাঁহার সুখময় স্মৃতির সকলই গ্রাস করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন; কিন্তু তাঁহার এই দিগন্ত পরিব্যাপ্ত যশঃ-সৌরভ, যাহাতে এতাবৎকাল পৃথিবীর প্রায় সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ই বিমুগ্ধ, সেই অপ্রতিহত কীর্ত্তির স্থায়িত্ব যতদিন জগতে বিদ্যার আদর ও চর্চ্চা থাকিবে ততদিন তাঁহার অমরত্ব গুণজ্ঞমাত্রেই সর্ব্বদা অনুভব করিবেন।

শ্রীননীলাল সুর।

দেবীগড়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ভ্রান্তি।

সে দিন পর্ব্বতের উপরে,—অতি ঊর্দ্ধে আকাশের গায়ে বড় মেঘের সঞ্চার হইতেছিল। বায়ু নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল,—পার্ব্বত্যপ্রদেশে শীতকালে মেঘের সঞ্চার বিশেষ বিপদ্‌সূচক। সকলেই সেদিন ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় সময় কাটাইতেছিল।

কমলা প্রাসাদ-কক্ষে একা বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। চিন্তা তাহার সে দিন শতমুখী।

সে কখনও ভাবিতেছিল, তাহার জীবনে আর কখনও স্বাধীনতা আসিবে না। কেন না, ঘটনা যেরূপ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহাতে মুক্ত হইবার আশা তাহার আর নাই। কখনও ভাবিতেছে, তাহার পিতামাতার সহিত আর হয়ত জীবনে সাক্ষাৎ হইবে না। কেন না, যখনই সে চলিয়া যাইবার কথা বলে, তখনই রাজা ছলনা করিয়া তাহার গমনে বাধা দেয়। তাহার পিতামাতার কি হইল, তাঁহারা জীবিত আছেন কি না, অথবা সেই আশ্রমেই আছেন কি না,—এ যাবৎকাল তাহার কোনই সংবাদ মিলিল না। কখনও মিনিয়ার কথা মনে হইতেছে,—এই বিদেশে এই অসভ্যগণের মধ্যে সেই তাহার একমাত্র সহায় ও বন্ধু ছিল,—তাহাকে অসভ্যগণ ছলনা করিয়া কোথায় পাঠাইয়া দিল, সে বোধ হয় আর ফিরিবে না। সকলের উপর তাহার চিন্তনীয় বিষয় হইয়াছিল,—গোলোকনাথের কথা!

গোলোকনাথ যদি দেখা না দিত,—না আসিত, তবে হয়ত ভাল হইত! গোলোকনাথ তাহাকে ভালবাসে, তা নাই বা বাসুক—সেত ভালবাসে। কিন্তু এখন এক বিষম সমস্যা। তিনি আসিয়াছেন, রাজার সর্ব্বনাশ করিতে। আর আমি তাহা জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া নিস্তব্ধে থাকি? কিন্তু যদি ইঙ্গিতেও তাঁহার কথা রাজাকে জানাই, নিশ্চয়ই গোলোকনাথের মস্তক বর্ষাফলকে বিদ্ধ হইবে। অতএব উভয় কূল রক্ষার উপায় কি!

এই সময় এক দাসী অবনত মস্তকে সেখানে আগমন করিল।

কমলা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—"সংবাদ কি ?"

দাসী অভিবাদন করিয়া বলিল,—"আপনার আদেশ অবগত হইয়া রাজা ও মন্ত্রী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

কমলা। তাঁহারা কোথায় ?

দাসী। প্রাসাদের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।

কমলা। ডাকিয়া আন।

দাসী পুনরায় অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা ও প্রধান মন্ত্রী অবনত মস্তকে তথায় আগমন করিলেন।

কমলা যেথানে বসিয়াছিল, তাহার সম্মুখে তিন চারি খানি আসন পাতা ছিল। কমলা আদর-আহ্বানে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া তথায় উপবেশন করিতে বলিল।

অগ্রে রাজা অভিবাদন করিয়া তাহার পুরোভাগস্থ আসনে উপবেশন করিলে, তৎপরে মন্ত্রী কমলাকে অভিবাদন করিল এবং তদনন্তর রাজাকে অভিবাদন করিয়া রাজার পশ্চাৎভাগের আসনে বসিয়া পড়িল।

রাজা বিস্ময়-দৃষ্টিতে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া ব্যগ্র ও বিনীতস্বরে বলিলেন,—"দেবি, আমাদিগকে ডাকিয়াছেন কেন ?"

কমলা গম্ভীরস্বরে বলিল,—"আমি এক অভিনব সংবাদ পাইয়াছি, তোমাদিগকে তাহাই বলিব।"

রাজা। সে সংবাদ কি রাজ্যের অমঙ্গলজনক ?

কমলা। মঙ্গলামঙ্গল সমস্তই ঈশ্বরের হাত। মানুষ কার্য্য করিতে আসিয়াছে,—ফলাফল চিন্তা না করিয়াই যাহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহাই করিবে।

রাজা। ঈশ্বর কি পদার্থ, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। আপনি আমাদের দেবী—আমরা আপনাকেই চিনি—আপনাকেই বুঝি। আমাদের ভালমন্দ আপনারই হাতে। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, আমরা তাহাই করিব।

কমলা। এই রাজ্য অতি সত্বরেই মুসলমানেরা আক্রমণ করিবে।

রাজা। অতি অমঙ্গলের সংবাদ। কিন্তু দেবী আমাদের জয় কি পরাজয় হইবে, তাহার কথা বলুন।

কমলা। সে কথা আগেই বলিয়াছি ;—সে সম্বন্ধে এখন আর কোন কথাই বলিতে চাহি না।

রাজা। এখন যদি মুসলমানে এ রাজ্য আক্রমণ করে, আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে আমাদের কখনই পরাজয় হইবে না।

কমলা। কেন?

রাজা। আপনি যখন উপস্থিত আছেন, তখন নিশ্চয়ই বিদ্যুৎ ডাকিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন।

কমলা। সে বিষয়ের কোন নিশ্চয়তা নাই।

রাজা। কেন দেবী? আমরা আপনার উপাসক,—আশ্রিত ও শরণাগত।

কমলা। তাহারাও দেবতার দ্বারা রক্ষিত। তাহাদের দেবতাও বিদ্যুৎ ডাকিতে জানে,—আমার প্রেরিত বিদ্যুৎ নষ্ট করিতে পারে।

রাজা। তবে কি আমাদের পরাজয় হইবে?

কমলা। আমার পিতামাতাকে যদি এই সময় এখানে আনিতে পার, তবে উপায় হইতে পারে।

রাজা। কি প্রকারে তাঁহারা রাজ্য রক্ষা করিবেন?

কমলা। আমার পিতা দেবতার দূত। যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ—যিনি ঈশ্বর—যিনি সর্ব্বশক্তিমান্—আমার পিতা সেই ঈশ্বরের দূত। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদিগকে সকল বিরুদ্ধশক্তি হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন।

রাজা মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন। কমলা দেখিল, সে চাহনী যেন কেমন একরূপ ভাবে মিশান। মন্ত্রী বলিল,—"দেবি, সিংহ তাহাদিগের পরীক্ষা করিতে গিয়াছে।"

কমলা চমকিয়া উঠিল। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। একটা অমঙ্গল বিভীষিকা যেন হঠাৎ আসিয়া তাহার হৃদয় পূরিয়া বসিল। বলিল,—"সিংহ! সিংহ কাহার আদেশে আমার পিতামাতার নিকট গমন করিল?"

রাজা কিছু ভীত হইলেন। বিনয়-নম্রস্বরে বলিলেন,—"আমি তাহাকে কোনরূপ আদেশ প্রদান করি নাই।"

কমলা। তবে সে কাহার আদেশে সেখানে গেল?

রাজা। আপন ইচ্ছাতেই গিয়াছে।

কমলা। তবে তোমরা কি প্রকারে জানিতে পারিলে যে, সে আমার পিতামাতার নিকটে গিয়াছে এবং তাঁহাদিগকে পরীক্ষা করিবে?

রাজা অধোবদনে রহিলেন। কোন কথা কহিলেন না। কমলা গম্ভীর অথচ রুক্ষস্বরে বলিল,—“শোন রাজা, তুমি আমার সহিত অনেক প্রকার ছলনা করিতেছ,—অনেক মিথ্যা বলিতেছ,—কিন্তু ইহার প্রতিফলের সময় আসিয়া পড়িয়াছে।”

রাজা তথাপি নিরুত্তর। তাঁহার ভাব দেখিয়া কমলা বুঝিতে পারিল, তিনি কিঞ্চিৎ ভীত হইয়াছেন।

রাজা কোন উত্তর না করায় মন্ত্রী একবার রাজার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, তৎপরে করযোড় করিয়া কমলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, —“আপনার পিতামাতা নাই, তাই সেই যাদুকরদিগকে আমরা এদেশে আনিব না।”

কমলা অধিকতর রুক্ষস্বরে বলিল—“কে বলিল, আমার পিতামাতা নাই? কেই বা বলিল,—তাঁহারা যাদুকর?”

মন্ত্রী। আমাদের পুরোহিতগণ শাস্ত্র দেখিয়া বলিয়াছেন,—আপনি বিদ্যুৎ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন, আবার বিদ্যুৎ বহিয়াই চলিয়া যাইবেন।

কমলা। ইহা হইতে পারে না। যাহাদের রক্ত-মাংস আছে, তাহারাই মাতৃগর্ভে জন্মে।

মন্ত্রী। আপনার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাহার ব্যতিক্রম আছে।

কমলা। আমার কথা তোমরা বিশ্বাস কর না কি?

মন্ত্রী। আপনি দেবী,—অনন্ত শক্তিসম্পন্না; আপনার কথা কে না বিশ্বাস করে?

কমলা। আমি বলিতেছি, তাঁহারা আমার পিতামাতা এবং তাঁহাদের অনেক শক্তি আছে।

মন্ত্রী। আমাদের পুরোহিতগণ শাস্ত্র দেখিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি অনুগ্রহ করিয়া শোনেন, তবে বলিতে পারি।

কমলা। পুরোহিতগণ কি বলিয়াছেন, শীঘ্র বল।

মন্ত্রী। তাঁহারা বলিয়াছেন, শাস্ত্রে আছে—দেবী বিদ্যুৎ হইতে পৃথিবীতে নামিয়া এক যাদুকরের দ্বারা পালিত হইবেন। যাদুকর যাদুবিদ্যার দ্বারা তাঁহার দয়া মায়া ও কিঞ্চিৎ শক্তি আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে।

কমলা। তবে আমি তোমাদের দেবী নহি। তাঁহারা আমার পিতা-মাতা—দয়া করিয়া আমাকে তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দাও।

মন্ত্রী। আপনি নিশ্চয়ই আমাদের দেবী;—তবে তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিতে হইলে আরও কয়েকদিন সময়ের আবশ্যক।

কমলা। কেন?

মন্ত্রী। সিংহ আপনার পিতামাতার নিকট গিয়াছে;—তাঁহাদের পরীক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলে, তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে বিবেচনা হয় করা যাইবে।

কমলা। শোন রাজা, শোন মন্ত্রী,—সিংহের দ্বারা বা তোমাদের দ্বারা যদি আমার পিতামাতার মাথার একগাছি কেশও স্থানচ্যুত হয়,—নিশ্চয়ই জানিয়ো, এক মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎদ্বারা তোমাদের সমস্ত রাজ্য ধ্বংস করিয়া দিব।

রাজা একবার মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন মাত্র,—কিন্তু রাজা বা মন্ত্রী সে সম্বন্ধে কোন উত্তরই করিলেন না।

কমলা তারপরে বলিল,—"তোমাদের রাজ্যমধ্যে মুসলমানের দূত প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু সাবধান, তাহাদের গাত্রের এক বিন্দু রক্ত যদি তোমাদের বর্শা বা কোন অস্ত্রদ্বারা মাটীতে পড়ে, তবে রাজ্য ছারেখারে যাইবে। কিন্তু সাবধানে থাকিয়ো—বিদেশী লোকদিগের গতিবিধির উপরে যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে।"

রাজা মস্তক নত করিয়া সম্মতি জানাইলেন।

তারপরে আরও নানাকথার পরে রাজা ও মন্ত্রী চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পলায়নের পরামর্শ।

রাজা ও মন্ত্রী চলিয়া গেলে, কমলা সেই স্থানে বসিয়াই চিন্তা করিতে লাগিল।

রাজার আদেশে সিংহ তাহার পিতামাতার পরীক্ষা করিতে গিয়াছে। কি পরীক্ষা করিবে? কমলা সে পরীক্ষার পরিণাম চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত ও চঞ্চলিত হইয়া উঠিল। সে স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিল, সিংহ নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করিবে, হয়ত তাঁহাদিগকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে। কিন্তু উপায় কি!

তাহার মনে হইল, এই সময় কোনপ্রকারে যদি তাঁহাদিগের নিকটে গমন করা যায়, তবেই যদি রক্ষা হয়। কিন্তু যাইবে কি প্রকারে? রাজা ও মন্ত্রী যেরূপ যাহা বলিলেন, তাহাতে যাইবার কোন উপায়ই নাই।

তখন তাহার মনে পড়িল, পিতামাতার অনিষ্ট নিবারণ জন্য সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্য অবহেলাতেও পাতক নাই। বিশেষতঃ রাজা তাহার সহিত এ সকল বিষয়ে নিশ্চয়ই কাপট্য অবলম্বন করিয়াছে।

কমলা তখনই করতালি ধ্বনি করিল। পার্শ্বের কক্ষ হইতে অবনত মস্তকে এক দাসী আসিয়া অভিবাদন করিয়া কমলার সম্মুখে দাঁড়াইল।

কমলা বলিল,—"প্রধান রক্ষীকে ডাকিয়া দাও।"

দাসী তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে প্রধান রক্ষীকে সঙ্গে লইয়া তথায় আগমন করিল।

প্রধান রক্ষী নতমস্তকে গৃহে প্রবেশ করিয়া কমলাকে অভিবাদন করিয়া আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কমলা বলিল,—"তুমি এখনই নগরমধ্যে গমন কর এবং বিদেশী একজন মহাজন নগরে আসিয়াছেন, তাঁহাকে সসম্মানে আমার এখানে লইয়া আইস।"

রক্ষী করযোড় করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি তাঁহাকে কি প্রকারে চিনিতে পারিব?"

কমলা। তিনি সবে আ'জ নগরে আসিয়াছেন।

রক্ষী। তিনি কোন্ দেশীয় মানুষ?

কমলা। বঙ্গদেশীয়।

রক্ষী। কি করিতে আসিয়াছেন?

কমলা। খাদ্য দ্রব্যের খরিদ বিক্রয় করিতে আসিয়াছেন।

রক্ষী। ওঃ,—আ'জ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না।

কমলা। কেন?

রক্ষী। তিনি এদেশের নিয়মানুসারে আ'জ বন্দী হইয়াছেন।

কমলা। বন্দী হইবার কারণ?

রক্ষী। বিদেশী লোক এখানে ব্যবসায় করিতে আসিলে, এখানকার রাজবিধান অনুসারে তাঁহাকে সাতদিন বন্দী অবস্থায় থাকিতে হয়। তাঁহার কোন অসৎ উদ্দেশ্য নাই,—তাহা ঐ সাতদিনের মধ্যে প্রমাণ করিতে পারিলে

তবে রাজকীয় ছাড়ের সহিত তাঁহাকে মুক্ত ও ব্যবসায় করিবার অধিকার দেওয়া হয়।

কমলা। তুমি আমার লিপি লইয়া যাও, তিনি যেখানেই বন্দী থাকুন, রাজাদেশ আনিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিবে।

রক্ষী। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। কিন্তু ঐ সকল কার্য্য সমাধা করিয়া যদি আজ তাঁহাকে লইয়া উপস্থিত হইতে না পারি, আমায় ক্ষমা করিবেন।

কমলা। যত শীঘ্র পার, তাঁহাকে লইয়া আসিবে।

রক্ষী সম্মত হইয়া লিপি লইয়া অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল।

কমলা মনোযোগ সহকারে এতদিনে তাহাদের ভাষার লিখন-প্রণালী শিক্ষা করিয়া লইয়াছিল।

কমলা সে দিবস অত্যন্ত চিন্তাতেই কাটাইয়া দিয়াছিল। রক্ষী সে দিবস ফিরিয়া আসে নাই।

পরদিবস মধ্যাহ্নকালে গোলোকনাথকে সঙ্গে লইয়া রক্ষী কমলার প্রাসাদে উপস্থিত হইল।

গোলোকনাথকে পঁহুছাইয়া দিয়া রক্ষী অভিবাদন করত আদেশ প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলা তাহাকে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলে, সে চলিয়া গেল।

তখন গোলোকনাথ মৃদু হাসিয়া বলিল,—"হুকুম কি ?"

কৃষ্ণতার দীর্ঘনয়নের করুণ দৃষ্টি গোলোকনাথের মুখের উপরে সংস্থাপন করিয়া কমলা বলিল,—"ব'স, বলিতেছি। বড় বিপদে পড়িয়াছি।"

গোলোকনাথ ব্যগ্রস্বরে বলিল,—"হঠাৎ কি বিপদ হইল, কমলা ?"

কমলা। ব'স না,—সব বলিতেছি।

গোলোকনাথ পার্শ্বের আসনে উপবেশন করিল।

কমলা বলিল,—"এদেশের লোকেরা সকলেই ঘোর অসভ্য। ইহাদের স্বাধীন জ্ঞান মাত্র নাই। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন,—প্রেতযোনি আর সূক্ষ্মদেহী দেবতার ভয় করে। এদেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পুরোহিতগণ যাহা প্রচার করে, রাজা তাহাই ধ্রুব বিশ্বাস করে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকে।"

গোলোক। তোমার দেবীত্বে বর্ত্তমানে সন্দেহ করিয়া কোন নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছে নাকি ?

কমলা। না।

গোলোক। তবে ?

কমলা। শোন বলিতেছি। এদেশে একজন বাঙ্গালী যুবক অনেকদিন হইতে বাস করিতেছে। তাহার আসল নাম এখানে প্রকাশ নাই, লোকে সিংহ বলিয়া জানে। এখানে সে অনেক সম্পত্তি ও প্রভূত ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে। সে নিতান্ত নিষ্ঠুর ও চতুর। রাজা তাহার কথা শুনিয়া কাজ করে। তাহার ইচ্ছা, সে আমাকে বিবাহ করে।

গোলোক। বেশ ত,—উত্তম কথা।

কমলা। উত্তম কথা হউক, আর অনুত্তম কথা হউক, সে ব্যবস্থা তোমার কাছে চাহিতেছি না। তারপরে শোন,—সে আমাকে বাবার কাছে দেখে,—তখন এদেশের লোক আমাকে দেখিয়া আসিয়াছে এবং আমার বন্দুকের লক্ষ্যও দেখিয়া আসিয়াছে,—এদেশের লোকে আমাকে ইহাদের দেবী বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছে। সিংহ বলপ্রকাশে আমার কিছু করিলে, এদেশের লোকের দ্বারা নিহত হইবে ভাবিয়া রাজাকে নানাকথা বলিয়া আমাকে এখানে আনাইয়া বন্দী করিয়াছে। তাহারই কৌশলে রাজা আমাকে ছাড়িয়া দিতেছে না।

গোলোক। সে এখন কোথায় ?

কমলা। সেদিন তুমি আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলে, রাজা ও মন্ত্রীকে এখানে ডাকাইয়াছিলাম।

গোলোক। কেন ?

কমলা। যাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট না হয়, তাহারই ব্যবস্থা করিতে। কিন্তু বাপমায়ের কাছে যাইবার কথাও বলিয়াছিলাম—তাহাতে তাহারা বলিল, আপনার বাপ মা নাই—আপনি দেবী। বিদ্যুৎ হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। যাহাকে আপনি বাপ বলিতেছেন, সে যাদুকর। সিংহ তাহার পরীক্ষা করিতে গিয়াছে, ফিরিয়া না আসিলে, আপনার সম্বন্ধে কোন নূতন বন্দোবস্ত হইবে না।

গোলোক। সে সেখানে গিয়া কি পরীক্ষা করিবে ?

কমলা। আমার বিশ্বাস,—আমাকে লাভ করিবার জন্য সেই পাষণ্ড সিংহ তাঁহাদিগকে বিতাড়িত বা নিহত করিতে পারে। সে হয়ত ভাবিয়াছে, এই দূরদেশে—অসভ্য পাহাড়ীয়াদের কাছে আমি কিছু চিরদিন থাকিতে পারিব না। সে বাঙ্গালী—ভবিষ্যতে আমি তাহার কবলস্থ হইব।

গোলোকনাথ কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"হইতে পারে। কিন্তু সে কি সেখানে পঁহুছিয়াছে?"

কমলা। না, এখনও সে নদীতীরে ছাউনী করিয়া আছে, গত কল্য আমি এ সংবাদ পাইয়াছি।

গোলোক। তবে চল, আমরা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে যাই।

কমলা। ইহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর দুর্দ্ধর্ষজাতি। পথে যদি আমাদিগকে হত্যা করে।

গোলোক। পিতামাতার হত্যাসম্ভব জানিয়া কে কবে নিজে নিহত হইবে ভাবিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে?

কমলা করুণ দৃষ্টিতে একবার গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"গোলোকনাথ, এমন না হইলে কি তুমি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।"

গোলোকনাথ বলিল,—"আমি শ্রেষ্ঠ কিসে, নিকৃষ্ট। ভাগ্যহীন—ঘটনা-স্রোতে ভাসমান যুবক। যাক্,—যাবে?"

কমলা। যাব। তোমার সঙ্গিগণ কোথায়?

গোলোক। তাহাদিগকেও বন্দী করিয়া কোথায় রাখিয়াছে।

কমলা। তোমার কাছে বন্দুক আছে?

গোলোক। দুইটা ভাল পিস্তল আছে।

কমলা। আমার কাছেও দুইটা আছে। এদেশের লোক পিস্তলকে বড় ভয় করে।

গোলোক। আর বিলম্ব করিলে তাঁহাদিগকে রক্ষা করা যাইবে না।

কমলা। রাজাকে একেবারে না বলিয়া গেলে, বিশেষ বিপদ ঘটিবে। আমাকে তাহারা যথেষ্ট ভয় করে,—এখনই একখানা ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিয়া রাজার নিকট পাঠাই,—তাহার উত্তর আসিলেই চলিয়া যাইব।

গোলোকনাথ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,—"তবে তাই। কিন্তু বিলম্ব করিয়ো না।"

কমলা তখনই ভূর্জ্জপত্রে একখানা পত্র লিখিয়া দাসীদ্বারা রক্ষীর নিকট পাঠাইয়া দিল এবং বলিয়া দিল অদ্যই এর উত্তর আনা চাই।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

ত্রিধারা।

প্রতীক্ষা।

পূর্ণিমানিশি ভালে রাকা শশী
নয়নে ঘুমের ঘোর,
নীলনভ-কোলে, যায় ঢলে ঢলে,
নিশা হয় হয় ভোর।

মলয়ের থরে অনুরাগ ভরে
পিয়াসে বসে চকোর;
অমিয় আশায় শশী পানে চায়
নিশা হয় হয় ভোর।

নীরব নিথর আছে চরাচর
পাখী শাখী নাহি গায়;
তারা জ্যোতি-ধারা, যেন দিশে হারা
বহে কি না বহে বায়।

মীলিত নয়নে, যেন কি ধেয়ানে,
জগৎ ভরিয়া আছে;
যেন কি স্বপন, করে বিচরণ
জগতের আগে পাছে।

মধু নিধুবনে বেতস-বিতানে
পাবে বলে মনচোর,
যাপিছে যামিনী রাধা বিনোদিনী
নয়নে বহিছে লোর।

কুসুমের থরে, সাজায়ে বাসরে
মলয়জ লিখি তনু;

কুসুম-শয়নে রচি সযতনে
কাম-ফুলশর ধনু।

সেফালি মালতী তুলি সাধে অতি
গাঁথি বিনা সূতা-হার,
উপজিল চিতে কানুরে ধরিতে
অনুরাগ সে রাধার।

চৌদিকে নিরখি আর যত সখী
ঘুমে আছে অচেতন,
একা জাগি রাই, ভাবিছে সদাই
চিত্তচোরা শ্যামধন।

মণিহারা ফণি মনে দুখ গণি
হতাশে যেমতি চায়,
বিহনে মুরারী তেমতি সে প্যারী
দুটি আঁখি ভেসে যায়

"আসিব বলিয়ে গেল আশা দিয়ে
সে শ্যাম সুন্দর মোর,"
শ্যামের ধেয়ানে, চাহি চাঁদ পানে
রজনী করিনু ভোর।

মৃদু বায়ু ভরে পাতা মরমরে
থমকে থমকে চাই।
ভাবি দাসী-বাসে আসে পীতবাসে
হরষে হেরিতে ধাই।

পিক-কলস্বনে, ভাবি মনে মনে
বাঁশরী বাজিল ওই।
মুরলী বদন কোথা প্রাণধন
কই শ্যাম মোর কই?

চিত্ত মনোহারা পাগলিনী পারা
আমি যেন মোর নই—
না দেখি নাগরে সরমের ভরে
মরমে মরিয়ে রই।

শিখীপাখাচূড় রতন নূপুর
সাধের মোহন বাঁশী—
সাজাইব বলে বড় কুতূহলে
গাঁথিনু মালার রাশি।

তিতাইনু তায়, আঁখিনীরে হায়
গেল তবু শুকাইয়া
সে যে কমহার রাধা সম তার
নহেত কঠিন হিয়া।

মাতি প্রেমরঙ্গে লিখিতে শ্রীঅঙ্গে
অলকা তিলকা চাঁদ—
আনিনু হরষে মলয়জ-রসে
বিধাতা সাধিল বাদ।

কাল প্রাতে হায় দিব যমুনায়
ভাসায়ে কুসুম-সাজ
বিনা সেই কালা কুসুমের মালা
মলয়জে কিবা কাজ!

শ্যাম নাম ধরি শ্যামরূপ স্মরি
ডুবিব যমুনাজলে
বলে যাব তারে সঁপিতে আমারে
মোর শ্যাম-পদতলে।

শ্রীদেবকণ্ঠ বাক্‌চী

জাপানে শিক্ষা। *

যেদিন প্রবল প্রতাপান্বিত রুষঋক্ষকে পরাজিত করিয়া জগতের সম্মুখে জাপান আপন বিজয়-ভেরী নিনাদ করিল, সেই দিন সমগ্র জগত বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে জাপানের আকস্মিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। জগত বুঝিল, জাপান আর "অসভ্য জাপান" নয়—বিশ্বের মধ্যে সে আপন স্থান নির্দ্দেশ করিতে উদ্যত।

জাপানের আকস্মিক উন্নতির মূলীভূত কারণ যে, তদ্দেশে শিক্ষার বিস্তৃতি ও প্রসারতা, তদ্বিষয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সুধামণ্ডলী একমতাবলম্বী, বস্তুতঃ এক শিক্ষার প্রভাবেই আজ জাপান সভ্য জগতের সম্মুখে সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়া বিজয়-দুন্দুভি বাজাইতেছে—শিক্ষার প্রভাবেই "অসভ্য জাপান" সভ্য সমাজের অনুকরণীয় হইয়াছে।

জাপানের শিক্ষাবিভাগ মন্ত্রণা সভার একটি অংশ বিশেষ। এই বিভাগ তিনজন প্রধান ব্যক্তি, কয়েকজন শিক্ষাবিভাগীয় লোক ও সভাপতিরূপে একজন মন্ত্রীদ্বারা পরিচালিত হয়। মন্ত্রীর অধীনে চারিজন সেক্রেটারী, সাতজন সভ্য এবং নয়জন স্কুল ইনস্পেক্টর আছেন। এতদ্ভিন্ন উচ্চ শিক্ষার জন্য আর একটি সভা আছে; সেই সভায় আটচল্লিশ জন সভ্য আছেন। যে তিনজন প্রধান ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষাবিভাগ পরিচালিত হয়, তাঁহাদের কার্য্য-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—

(ক) স্বতন্ত্র শিক্ষাবিভাগ। Special educational department) এই বিভাগ উপাধি বিতরণ করেন, বিদেশে শিক্ষালাভার্থ ছাত্র প্রেরণ করেন এবং ইঁহাদেরই কর্ত্তৃত্বাধীনে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহ, লাইব্রেরী, মিউজিয়াম, জ্যোতিষ বিদ্যালয় ও গবেষণা সম্বন্ধীয় সভা পরিচালিত হয়।

---

* এই প্রবন্ধটী প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র East and West নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত Education in Japan নামক ইংরাজী প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ। ইহার লেখক মিঃ M. Tokiyeda একজন জাপানবাসী।

(খ) সাধারণ শিক্ষাবিভাগ। এই বিভাগ নর্ম্মাল স্কুল, মধ্য ইংরাজী স্কুল, সাধারণ স্কুল, কিণ্ডার গার্টেন স্কুল, উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিচালনা করেন; এতদ্ভিন্ন অন্ধ ও মূক বিদ্যালয় (Deaf and dumb school) শিল্প বিদ্যালয়, কৃষি বিদ্যালয় বাণিজ্য বিদ্যালয় প্রভৃতি পরিচালনা করেন।

উল্লিখিত তালিকা শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিদ্যাগারের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ভিন্ন ভিন্ন শাখার উপর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভার অর্পিত রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ Noble's school এর বিষয় এস্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই স্কুলটি সাক্ষাৎভাবে রাজকীয় পারিবারিক বিভাগ দ্বারা পরিচালিত। Home department এর উপর পুলিশও জেল বিভাগের শিক্ষার ভার ন্যস্ত। এইরূপে আবার নৌ ও সৈন্য বিভাগের উপর Post Telegraph, ও জাহাজ নির্ম্মাণের শিক্ষা-ভার অর্পিত। কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা জাপানের যে সমুদয় বিদ্যালয় Educational department এর সাক্ষাৎ কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত, আমরা কেবল তাহারই উল্লেখ করিব।

স্কুল সমূহকে অনেক ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু প্রধানতঃ সে গুলি তিন ভাগে বিভক্ত। যথা;—

(১) পাব্লিক্ স্কুল (Public institution) ইহারা আবার তিনভাগে বিভক্ত।

(ক) গবর্ণমেণ্ট স্কুল যেমন University.

(খ) শিক্ষাবিভাগ দ্বারা পরিচালিত স্কুল সমূহ। যথা;—উচ্চ স্কুল, নর্ম্মালস্কুল, উচ্চবাণিজ্য সম্বন্ধীয় স্কুল, উচ্চ চিকিৎসা সম্বন্ধীয় স্কুল।

(গ) স্থানীয় বিভাগের অধীনস্থ স্কুল। এই স্কুল সমূহকে মধ্য ও নর্ম্মাল স্কুল, সহর ও গ্রাম্য স্কুল অর্থাৎ প্রাথমিক স্কুলে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(২) কোয়েসী পাব্লিক্ ইন্‌ষ্টিটিউসন্‌স্। এই স্কুল সমূহ যদিও বেসরকারী লোক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, তত্রাচ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত।

নিম্নে আমরা ১৯০১ সালের বাজেটের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম, ইহা পাঠে সকলেই জাপানের রাজকীয়ষ্টেট্ হইতে প্রতি বৎসর কত খরচ হয়, তাহার একটি মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন।

স্কুলের নাম	মোটব্যয়	সাহায্য
	ইয়েন	
টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়	১০৩৭৪১৭	৮০২৫৫২
কিওটো "	৪৪১৯০৯	৩৮৫৯৩৮
উচ্চ নর্ম্মালস্কুল সমূহ	১৮১২৮৮	১৬৫৮৪৭
উচ্চস্কুল	৪৬৫০৪১	৩১৩৪১২
টোকিও টেক্‌নিকালস্কুল	১৩৭৫৬০	১১২৪০৮
সাধারণ শিক্ষা	অনিশ্চিত	১৫০০০০০
টেক্‌নিকাল শিক্ষা	"	২৭০০০০

এক্ষণে আমরা জাপানে কি ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। জাপানে কতিপয় Kinder garden স্কুল আছে, কিন্তু সেই সমস্ত কিণ্ডার গার্টেন বিদ্যালয়ে কেবল অবস্থাপন্ন লোকের ছেলেরাই শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। বালকেরা প্রথমতঃ কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে পড়িবার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারিবৎসর কাল পড়ে। যদি কোন বালকের অভিভাবক স্বীয় দারিদ্র্য প্রযুক্ত আপন আপন পুত্রকে এই সামান্য শিক্ষা দানটুকু করিতেও সক্ষম না হয়, তবে জাপানে একপ্রকার সভা আছে; সেই সভা ঈদৃশ অক্ষম বালকের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর ক্রমান্বয়ে মধ্য স্কুল (Middle schools) উচ্চস্কুলে পড়িয়া পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। (Higher schools preparatory for the university) সেখানে ৩।৪ বৎসর পড়িবার পর কৃতকার্য্য Candidate বা পরীক্ষার্থীরা উপাধি ভূষণে ভূষিত হয়। বলা বাহুল্য এই উপাধিকে (degree) জাপানে "গাকুসী" বলে।

প্রত্যেক বৎসরই জাপান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনধিক পনর জন ছাত্র বিদেশে ২।৩ বৎসরের জন্য শিক্ষালাভার্থ প্রেরিত হয়। অবশ্য তাহাদের সহিত এই চুক্তি থাকে যে, তাহারা বিদেশ হইতে শিক্ষালাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে জাপান গবর্ণমেণ্ট যাহাকে যে পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, তাহাকে সেই পদে যত বৎসর তিনি বিদেশে অবস্থান করিয়াছেন, তাহার দ্বিগুণতর বৎসর কার্য্য করিতে হইবে। ১৯০১ সালে জাপান হইতে ১১৪ জন পুরুষ ও ২ জন স্ত্রীলোক শিক্ষাবিভাগ কর্ত্তৃক বিদেশে শিক্ষালাভার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। জাপান গবর্ণমেণ্ট প্রধানতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী,

অষ্ট্রিয়া, ইতালী, সুইজারল্যাণ্ড, স্পেন, ইংলণ্ড, বেল্‌জিয়াম, আমেরিকা ও কোরিয়াতে ছাত্র প্রেরণ করেন। শুধু শিক্ষাবিভাগ নহে, জাপানের বাণিজ্য ও নৌ বিভাগেও বিদেশে ছাত্র প্রেরণ করেন।

এক্ষণে জাপানের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক (Compulsory Subjects) পাঠ্য হইল—নীতি সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, কম্পোজিসন্‌ ও জাপানী ও চৈনিক ভাষাশিক্ষা এবং গণিত ও কুস্তীশিক্ষা। তবে বালকেরা ইচ্ছা করিলে জাপানী ইতিহাস ও ভূগোল পাঠ করিতে পারে। সঙ্গীত ও বয়ন কেবল স্ত্রীলোকদিগকেই শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চ বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক বিষয় হইল—নীতি-সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, কম্পোজিসন্‌ পাঠ, গণিত, জাপানী ভূগোল ও ইতিহাস, পৃথিবীর ভূগোল ইত্যাদি। চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত ও বয়ন কেবল স্ত্রীলোক দিগেরই জন্য।

মধ্যস্কুলে (Middle school) বাধ্যতামূলক শিক্ষা হইল—নীতি সম্বন্ধীয় বক্তৃতা, জাপানী ও চৈনিক ভাষা, বৈদেশিক ভাষা, কৃষিকার্য্য, ভূগোল, ইতিহাস, গণিত, প্রাকৃতিক ইতিহাস, (প্রাণীতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব সহ), রসায়ন, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যা, কুস্তী ইত্যাদি। এইরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবেশিকা বিদ্যালয়ে (Higher school preparatory to literature, college of the university) ও মধ্যস্কুলের সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।

এই ভাবে অনুসন্ধান করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, জাপানে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার ফল অতি শুভময়। বস্তুতঃ জাপানের শিক্ষা-প্রণালী আজ সমগ্র সভ্য জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

আবেগ।

(১)

ছুটিয়াছি—ছুটিতেছি—কতদিন ঊর্দ্ধশ্বাসে
শোকভরা শূন্য প্রাণ নিয়ে ;
কেন যাই জানিনাকো—কার তরে—কিবা আশে
—ছুটি তবু বিদগ্ধ হৃদয়ে ॥

(২)

অতীতের মধুময় কত প্রেমকথা মোর
অনন্তের টানে গেছে মুছে ;
আবরিছে সে কিরণ অমার তমিস্রা ঘোর
— স্মৃতি টুকু শুধু পড়ে আছে ॥

(৩)

মনে পড়ে—একদিন—হৃদয়-আসনখানি
সাজাইনু কত প্রেমহারে ;
বসাইয়ে তারে তায়—ইষ্টদেব সম মানি
পূজা দিনু কত উপচারে ॥

(৪)

সে পূজা—অতুল পূজা—নশ্বর জগতে, হায় !
নাহি তাহে ফুল্ল ফুলচয় ;
বিনিময় ক'রেছিনু তুচ্ছ প্রাণ তারি পায়
—তবু সেটী হ'ত মধুময় ॥

(৫)

কতদিন প্রাবৃটের নব নভোরাজি-তলে
খেলেছিনু—বসেছিনু, হায় !
আত্মহারা পড়িতাম তারি পায় সবি ভুলে
— এবে সব শূন্য নীলিমায় ॥

(৬)

ক্ষণপ্রভা সৌদামিনী হেরি আকাশের কোলে,
লভিতাম আনন্দ অপার ;
আঁকিতাম সুখছবি—কত কল্পনার বলে
—মুছে গেছে এবে সব তার ॥

(৭)

শুনে তার মধুকথা—হেরি তার ফুল্লানন
ব'য়ে যেত প্রবাহ শিরায় ;
ধরিতাম কভু বাহু—মৃণাল-লাঞ্ছন
—এবে মোর শূন্য সব হায় !

(৮)

শারদী চাঁদিনী রাতে তটিনীর ঊর্ম্মিমালা
খেলে যায় অকুলের পানে ;
হেরি তাহা ভুগি কত নিত্য বিরহের জ্বালা
—চারিদিকে চাহি শূন্যপ্রাণে ॥

(৯)

তারপর—ছুটে যাই—সদা অজানিত পথে
নাহি জানি—এবে কিবা আশ ;
এত প্রহেলিকা ঘেরা ;—ছুটি, অহো, কার সাথে ?
—আর, সখে, করোনা নিরাশ ॥

(১০)

মিটাবে কি আশ, সখা, চাহিবে কি—নাহি জানি
—ভ্রমিব সতত তব আশে ;
স্মৃতি-তুলিকায় তব প্রেমের প্রতিমাখানি
এঁকে নেব মানসে—মানসে ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়।

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

কুবের।

বনপর্ব্ব ২৭২—

ব্রহ্মার মানসপুত্র পুলস্ত্যের ঔরসে গবীর গর্ভে বৈশ্রবণ নামে পুত্র জন্মে। পিতামহের বরে বৈশ্রবণ অমরত্ব, ধনেশত্ব, লোকপালত্ব, ঈশানের সহিত সখ্যভাব, যক্ষগণের আধিপত্য, রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কাপুরী ও কামগামী পুষ্পক রথ লাভ করেন। ধনদান লোকপাল ধনেশ্বরের ব্রত। ইন্দ্র ধনেশকে যজ্ঞের অধীশ্বর করিয়া দিলেন।

রাবণ ভ্রাতা কুবেরকে আক্রমণ করিয়া ত্রিকূটস্থিত লঙ্কা ও পুষ্পকরথ অধিকার করিয়া লইলেন। ধনদ যক্ষ রাক্ষসগণের সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। তথায় "অন্তরীক্ষচর" (১) অলকাপুরী তাঁহার রাজধানী হইল। গন্ধজীবী গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর অপ্সর ও কিন্নরগণ তাঁহার ধনমণিপূর্ণ সভা শোভিত ও ধ্বনিত করিল।

ধার্ম্মিক বিভীষণ কুবেরের অনুগমন করিলেন। এবং কুবের তাঁহাকে যক্ষ রাক্ষসগণের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

বনবাসকালে ভীমসেন অলকাপুরীর পঞ্চবর্ণ পুষ্প উদ্যানে প্রবেশ করিলে কুবের-কিঙ্করগণের সহিত তাঁহার সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে কুবের-সেনাপতি মণিময় নিহত হয়।

কুরুক্ষেত্রে কুবের ভূরিশ্রবারূপে অভিনয় করিয়াছিলেন।

উত্তরকাণ্ড মতে কুবের পুলস্ত্যপুত্র মহর্ষি বিশ্রবা ও দেববর্ণিনীর পুত্র। রাবণ অলকাপুরী আক্রমণ করিলে কুবের-সেনাপতি মাণিভদ্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। রাবণের প্রহারে তাঁহার মুকুট ভ্রষ্ট ও পার্শ্বগত হইল। তদবধি মাণিভদ্র পার্শ্বমৌলী হইলেন। তৎপরে ধনদ স্বয়ং পদ্মশঙ্খ সমাবৃত হইয়া শুক্র প্রোষ্ঠ পদদ্বয়ের সহিত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন (২) তিনি সমরে পরাজিত হইলে রাবণ জয়লব্ধ পুষ্পকরথ লইয়া প্রস্থান করিল।

---

(১) মহা ২।১০।

(২) ততঃ দূরাৎ প্রদদৃশে ধনাধ্যক্ষঃ গদাধরঃ।
শুক্রপ্রোষ্ঠপদাভ্যাম্ চ পদ্মশঙ্খ সমাবৃতঃ॥
(রাম ৭।১৫।১৬।)

মরুত্ত রাজের যজ্ঞে রাবণ উপনীত হইলে ভয়ে বরুণদেব হংসমূর্ত্তি, যমদেব কাকমূর্ত্তি, ইন্দ্রদেব ময়ূরমূর্ত্তি এবং কুবের কৃকলাসমূর্ত্তি গ্রহণে জীবনরক্ষা করিলেন।

কৃকলাস কামরূপ জন্তু। ইহার মস্তক কাঞ্চনবর্ণ। কিন্তু ইহার দেহ পর্য্যায়ক্রমে নানাবর্ণ হয়। ঠাণ্ডা ও অন্ধকার ঘরে কৃকলাস কটাবর্ণ থাকে। ঘরে আলোক প্রবেশ করিলে কৃকলাস ঈষৎ হইতে গাঢ় পীত, হরিত ও লোহিতবর্ণ পর্য্যায়ক্রমে দেখায়। এবং ইহার নিকটস্থ বস্তুর বর্ণও গ্রহণ করে। এই বর্ণ পরিবর্ত্তন ইহার মেজাজের উপর নির্ভর করে।

পদ্মপুরাণমতে কুবের বিশ্রবা ও মন্দাকিনীর পুত্র।

মতান্তরে কুবের বিশ্রবা ও ইলবিলার পুত্র। ইলবিলাসুত বলিয়া কুবের ঐলবিল আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। (৩)

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

নভঃসরিতের (The Milky way) পূর্ব্বশাখার পূর্ব্বতটে কৃকলাস মণ্ডল (Delphinos) (৪) অবস্থিত আছে। এই তারামণ্ডলে মর্দ্দল-আকৃতি শ্রবিষ্ঠ ওরফে ধনিষ্ঠনক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই নক্ষত্রের অধিদেবতা বসুগণ। এই তারামণ্ডলের তারাগুলি এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে, দেখিতে দেখিতে হারাইয়া যায়। এই নক্ষত্র ধনরক্ষক নৈর্ঋতগণের অর্থাৎ অদৃশ্যন্ত যক্ষ রাক্ষসগণের আবাসভূমি।

"দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি" এই বেদবাক্যের বলে অদৃশ্যন্ত দেবযোনিগণ এই কষ্টদৃশ্য নক্ষত্রে স্থান পাইয়াছে।

তারা কৃকলাসের অদূর পূর্ব্বে ইহার ধ্বজস্বরূপ যূপাকৃতি ভাদ্রপদ ওরফে প্রৌষ্ঠপদ নক্ষত্র যুগল স্থাপিত আছে। এবং তারা কৃকলাসের আড়পারে নভঃসরিতের পশ্চিমতটে বীণামণ্ডল (Lyra) মধুরধ্বনি করিতেছে।

পাশ্চাত্যে বীণামণ্ডলে কচ্ছপ ও গরুড় (Eagle) প্রতিষ্ঠিত ছিল। বুধগ্রহ (Hermes) কচ্ছপ বিদ্ধ করিয়া কচ্ছপকঙ্কালে কাচ্ছপী বীণা নির্ম্মাণ করেন।

---

(৩) যক্ষ এ কপিঙ্গ ঐলবিল.........

(ইতি অমরঃ)

(৪) ডলফিন মৎস্য শুশুকের মত নাসিকা দ্বারা জল ছিটায়। এবং জল হইতে উঠাইলে পর্য্যায়ক্রমে ইহার নানাবর্ণ লক্ষিত হয়।

তদবধি পাশ্চাত্যে এই তারামণ্ডল কচ্ছপ (Xelus) নামের পরিবর্ত্তে বীণা (Lyra) নাম গ্রহণ করিয়াছে। এবং এই তারামণ্ডলের প্রধান তারা নীল-মণি (Vega) (৫) গরুড়ের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

হস্তীর আবাসভূমি ভারতবর্ষে গরুড় ও কচ্ছপের সহিত তারা হস্তী এই মণ্ডলে স্থাপিত হইয়াছিল। (৬) এবং এই তারামণ্ডল গরুড়ের গজ কচ্ছপ ভক্ষণের ও অমৃত আহরণের রঙ্গভূমি বলিয়া পরিকল্পিত হইয়াছে। এই প্রদেশে বুধের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত উত্তরকাণ্ডে আছে। কিন্তু কাচ্ছপী বীণা প্রগঠনের কোন আভাস নাই। গ্রন্থান্তরে বীণা তালিকায় "সরস্বত্যাঃ চ কাচ্ছপী" বচন দৃষ্ট হয়। সরস্বতী নভঃসরিতের নামান্তর। এবং তাঁহার ধ্যানে "বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে" আছে। তারা বীণার পার্শ্বে কলহংস (Cygnus) অশ্বমুণ্ডধারী দধ্যাচ নামে অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। (৭)

ঐ বীণামণ্ডল বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব, অপ্‌সর্‌ ও কিন্নরগণের যোগ্য আবাসভূমি। কারণ ইহারা দেবযোনি এবং "দেবগৃহাঃ বৈ নক্ষত্রাণি" এই বেদবাক্যের বলে স্বর্গের নর্ত্তক ও গায়কগণ অন্য কোন্‌ নক্ষত্রে স্থান পাইতে পারে? দধ্যাচ মুনির অশ্বমুণ্ড কিন্নরগণ প্রাপ্ত হইয়াছে।

বীণামণ্ডলে তারাত্রয় নির্ম্মিত শৃঙ্গাটক আকৃতি অভিজিৎনক্ষত্র স্থাপিত আছে। অভিজিৎ বজ্রের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। (৮)

বেদমতে ঋঃ বেঃ (১।১১৬।১২) বজ্র পাথর। কাজেই বজ্রকে মণিভদ্র বা মণিশ্রেষ্ঠ বলিতে হয়।

তেরহাজার বর্ষ পূর্ব্বে অভিজিৎ নক্ষত্রের প্রধান তারা নীলমণি বসিষ্ঠ-নামে ধ্রুবতারা ছিল এবং তারা জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিত অর্থাৎ সর্ব্বোত্তরে থাকিত। সহযোগী তারাদ্বয় নীলমণির তলে ও দক্ষিণে থাকিত। নীলমণি ধ্রুবপদ হইতে চ্যুত হইলে শীর্ষস্থানীয় নীলমণি অভিজিতের পার্শ্বে আসিয়া পড়িল। এবং অভিজিতের ধ্রুবরাজ্যের রাজমুকুট খসিল।

(৫) তাতার রাজ্যেশ্বর উলগ বেগের "Al-nesr-al-wake" (the Falling Eagle) তারা স্পেনরাজ আল্‌ফনসোর তারা-তালিকায় wega নাম পাইয়াছিল। বর্ত্তমান য়ুরোপের খেয়ালে পড়িয়া তারাটী Vega হইয়াছে।

(৬) এই দিব্য হস্তী হইতে হস্তিনা নগরের নাম করণ হইয়াছে।

(৭) ঋঃ বেঃ ১।১১৬।১২।

(৮) মহর্ষি দধ্যাচের অস্থি দ্বারা বজ্র অভিজিৎ নির্ম্মিত হয়। ঋঃ বেঃ ১।৮৪।১৩।

বেদমতে (ঋঃ বেঃ ১।১৩১।৩) (৯) ইন্দ্র বজ্রসহ জন্মা। যেখানে বজ্র বা অভিজিৎ সেইখানেই ইন্দ্র বর্ত্তমান।

বেদমতে (১০) ইন্দ্র-প্রক্ষিপ্ত বজ্র আকাশ ভেদ করিয়া যে মণ্ডলাকার রেখা অঙ্কিত করে তাহাই অর্য্যমার (সূর্য্য) পথ হইল। এই অর্য্যমাপথে অর্থাৎ ছায়াপথে অমৃত ও নভঃ সরিৎ প্রবাহিত হইল। "ছায়াপথঃ দেবপথঃ সোমধারা নভঃসরিৎ"। ইতি অমরঃ।

এই বীণামণ্ডল সোমধারা ও নভঃসরিতের মূল পীঠস্থান। এই পীঠস্থান ঋক্‌বেদে (১।১২৮।১) ইলঃ পদম্ (১১) আখ্যা লাভ করিয়াছে। রামায়ণ মতে ইল কর্দ্দম ঋষির পুত্র। পঙ্কে প্রস্রবণ উৎপন্ন হয় তাহা সকলের বিদিত আছে। ইলঃ পদ নিস্থত মন্দাকিনী বেদের ইলাদেবী। এবং পুরাণের ইলবিলা। ঋক্‌বেদমতে (১।১৪৩।৪) ইলঃ পদম্ পৃথিবী ও ভুবনের নাভি (১২) অর্থাৎ ধ্রুবপদ। বেদে এই ধ্রুবপদ মহামেরু নাম পাইয়াছে। এবং কশ্যপ অর্থাৎ বীণামণ্ডলস্থিত কচ্ছপ (১৩) এই মহামেরুতে বিদ্ধ ছিল বেদমতে (১৪) এবং পুরাণমতে এই কশ্যপ হইতে দেব অসুর আদি সৃষ্ট হইয়াছিল।

পাশ্চাত্যে এই ইলঃ পদম্ (Olynupus) মেঘদেব বজ্রধর জুপিটরের (বৃহস্পতি) মূল আধিদৈবিক পীঠস্থান বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। জুপিটরের হস্তে মহামেরুর (Axis of the world) অগ্রভাগ দণ্ড (Sceptre) নামে এবং অপর হস্তে অভিজিৎ বজ্র এবং তাহার পদতলে ও দণ্ডাগ্রে গরুড় (Eagle) শোভা পায়। (১৫)

---

(৯)...বজ্রম্ ইন্দ্র ! সচাভুবম্ ॥

(১০) ইন্দ্রঃ বৃত্রায় বজ্রম্ উদযচ্ছৎ। সঃ দিবম্ অলিখ্যৎ। সঃ অর্য্যম্নঃ পন্থা অভবৎ॥
তৈঃ ব্রাঃ ১।৭।৬।৬।

(১১)...পরিবীত ইলস্পদে ॥

(১২) নাভা পৃথিব্যাঃ ভুবনস্য ॥

(১৩) কশ্যপঃ কচ্ছপঃ। সঃ যৎকূর্ম্মঃ নাম। তস্মাৎ আহুঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্যঃ ॥
(শতপথ ব্রাহ্মণ।)

(১৪) কশ্যপঃ অষ্টমঃ সঃ মহামেরুম্ ন জহাতি। তৈঃ আরণ্যক। ১।৭।১।

(১৫) এই শুন বিলাতি নজির :—

"Jupiter is usually represented ... ... holding in one hand the bolts

এই ইলঃ পদ হইতে বৃহস্পতির (ইন্দ্রের) ও জুপিটরের বজ্র গর্জ্জন করিত (১৬)। এবং এই ইলঃ পদে ইলাদেবীর গর্ভে এবং বুধের ঔরসে পুরূরবার (বজ্রের) জন্ম হয়।

এই ইলঃ পদে বৃহস্পতি ইন্দ্র অমৃত চোর গরুড়কে বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন।

এই ইলঃ পদে স্থিত হস্তিনারাজ্যে যুধিষ্ঠির বজ্রকে অভিষিক্ত করিয়া এবং পরীক্ষিতকে ইন্দ্রপ্রস্থে (চিত্র শিখণ্ডিমণ্ডলে) অভিষিক্ত করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন।

বেদমতে (অঃ বেঃ ৯।২।১৬) কামদেব ত্রিবিধ শঙ্খ দ্বারা লোক রক্ষা করেন। দানবীর সমরবীর এবং নরক অসুর। ত্রিমূর্ত্তিধর কামদেব মঙ্গলগ্রহের অধিদেবতা। (১৭) এবং বৃশ্চিকরাশি মঙ্গলগ্রহের গৃহ বা নাক্ষত্রিক প্রতিমা। এজন্য কামদেব মঙ্গলগ্রহ এবং বৃশ্চিকরাশি বেদে ত্রিত নামে গীত ও স্তুত হইয়াছেন। (১৮)

রামলীলায় ত্রিত দেবের ত্রিমূর্ত্তি কুবের, রাবণ এবং বিভীষণে সুব্যক্ত আছে।

---

to hurl and in the other a sceptre, while an Eagle stands at his feet. At olympia his statue bore a crown and the Eagle was perched on the top of his sceptre.

তুলনা কর:—বিষ্ণু বলিলেন, গরুড় তুমি আমার বাহন হইবে। গরুড় তথাস্তু বলিয়া বিষ্ণুকে বলিল, আমি তোমার উপরে থাকিব। বিষ্ণু তথাস্তু বলিলেন।—মহা।

(১৬) থেশলী দেশীয় অলিম্পস্ পর্ব্বত গ্রীকগণের আধিভৌতিক ভূ-স্বর্গ।

Olympos, says Max Muller as the home of Zeus was the home of the mountains on the northern frontier of Thessaly, though afterwords it was often used as synonymous with sky.

(১৭) কামদেবস্য বীজম্ তু
মন্ত্রম্ ভৌমস্য কীর্ত্তিতম্ ॥

(কালিকা পুরাণ)

(১৮) তুঃ "He (Trita) has also been identified with lightening, with Agni, Vaya, Soma and Indra."

(Mx. Muller.)

অথর্ব্ববেদে (৮।১০।২৮) কুবেরের আদি উল্লেখ দৃষ্টিগোচর হয়। তথায় বৈশ্রবণ কুবের অদৃশ্যস্ত যক্ষ রাক্ষসগণের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত আছে মাত্র; বনপর্ব্বমতে যক্ষরাজ মায়াবী ইন্দ্রজিতের দর্শন জন্য শ্রীরামকে দিব্য বারি প্রেরণ করেন।

উত্তরকাণ্ড মতে ব্রহ্মা আপঃ (নভঃ সরিৎ জল) রক্ষার্থে যক্ষ রক্ষগণের সৃষ্টি করেন। ক্রমে যক্ষপতি কুবের ব্রহ্মার বরে ধনেশত্ব আদি মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া ত্রিমূর্ত্তিধর কামদেবের দানবীরত্ব পদে অভিষিক্ত হইলেন। যক্ষ রক্ষগণ ধনরক্ষক হইল। লোকপাল কুবের ধনদানে জগৎ পালনের ভার পাইলেন। সুতরাং কুবের "কামঃ দাতা" এই বেদবাক্যের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ এবং দাতাকর্ণের ভ্রাতৃবা ভ্রাতা।

উত্তর ধ্রুবচক্রের চতুর্দ্দশ তারা প্রত্যেকেই ন্যূনাধিক দ্বিসহস্র বর্ষ ধ্রুবপদে থাকিয়া সিংহাসনচ্যুত হয়, ছাব্বিশ হাজারবর্ষ গতে আবার ধ্রুব সিংহাসন অধিকার করে।

বসিষ্ঠ তারার (Vega) পরে নহুষ সর্পের শিরস্থ স্পর্শমণি (Etanim) তারা ধ্রুব সিংহাসন আরোহণ করে।

"সোমধারা নভঃ সরিৎ" কৃকলাস ও বীণামণ্ডলের মধ্য দিয়া বৃশ্চিক-রাশিতে পড়িয়াছে।

উপপত্তি।

মেধাবী পাঠক সহজেই বুঝিবেন যে, বিশ্রবা পত্নী গবী দেববর্ণিনী ইলবিলা এবং মন্দাকিনী ইহারা সকলেই নভঃ সরিৎ ইলাদেবীর নামান্তর মাত্র। এবং পুল-স্ত্য ও বি—শ্রবা বর্ষণকারী সূর্য্যের ঐতিহাসিক নাম। পুল-স্ত্য আদি সপ্তঋষি সূর্য্যের সপ্তরশ্মি মাত্র। (১৯)

মঙ্গলগ্রহের জনক সূর্য্য (২০) বি-শ্রবা নামে রাবণ, কুবের ও বিভীষণ এই ভ্রাতৃত্রয়ের জনক। ভ্রাতৃত্রয় ত্রিত মঙ্গলের মূর্ত্তিত্রয় এবং বৃশ্চিকরাশিস্থ নিঋ্ঋতি দৈবত মূলানক্ষত্রে ইন্দ্রদৈবত জ্যেষ্ঠানক্ষত্রে এবং মিত্র দৈবত অনুরাধানক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধনপতি কুবের মঘবান্ ইন্দ্রের প্রতিবিম্ব।

কামরূপ কৃকলাস কামরূপ তারাগ্রহ মঙ্গলের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। তাই

(১৯) সপ্ত ঋষয়ঃ সপ্ত আদিত্য রশ্ময়ঃ ইতি বদন্তি নৈরুক্তাঃ। নিরুক্ত ১।১।৫

(২০) উপেন্দ্র বীর্য্যা পৃথ্ব্যাম্ তু মঙ্গলঃ সমজায়ত ॥

কুবের অন্তরীক্ষচর কৃকলাস মণ্ডলে (২১) স্থাপিত হইয়াছেন। এবং ধনেশ্বর ধনিষ্ঠ বা শ্রবিষ্ঠ নক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শঙ্খ পদ্ম আদি ধনেশ্বরের অঙ্গভূষণ, তাহা গুরু মহাশয়ের পোড়োগণের অবিদিত নাই। অতি উজ্জ্বল প্রোষ্ঠপদ নক্ষত্রদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাময়—তারা কৃকলাসের জাজ্বল্যমান কেতু বা নিশানা; তারা কৃকলাস প্রকাশ্যে নভঃ সরিৎ পৃষ্ঠে অন্তরীক্ষে বিচরণ করেন। ঐতিহাসিক ভাষায় জলবিন্দুবর্ষী নভঃ সরিৎ "পুষ্পক বিমান" আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন। কুবের সেনাপতি মণিমৎ, মণিময়, মণিভদ্র ও মাণিভদ্র সকলেই অভিজিতের নামান্তর মাত্র।

অভিজিতের শীর্ষ তারা নীলমণি এখন আর তারা জগতের শিরোমণি নাই - অভিজিতের পার্শ্বে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এক কটাক্ষেই তাহার উপলব্ধি হয়। ধ্রুব সিংহাসন চ্যুত অভিজিতের রাজ্য শেষ হইলে মাণিভদ্রের মুকুট পার্শ্বগত হইল। মাণিভদ্র পার্শ্বমৌলি হইলেন। রাবণের দুর্জ্জয় প্রহারে মাণিভদ্রের মুকুট বা মুণ্ড চূর্ণ বিচূর্ণ হইল না। কারণ তের-হাজার বর্ষ পরে অভিজিতের মুকুট ও মুণ্ড আবার ঝাড়া দিয়া উঠিবে এবং অভিজিৎ আবার ধ্রুব সিংহাসনে বসিবেন। আবার রাজ-মুকুট অভিজিতের মাথায় শোভা পাইবে। আবার অভিজিৎ শর্ব্বরের শিরোভূষণ হইবে। আবার ব্যোমদেবের কেশে নিশাকালে নীলমণি ধক্ ধক্ করিবে।

প্রোষ্ঠপদ মাসের সন্ধ্যাকালে দর্শকের মাথার উপর যমের জাঙ্গাল উত্তর দক্ষিণ লম্বমান থাকে। তাহার উত্তর ভাগে কৃকলাস এবং দক্ষিণ ভাগে মূলা নক্ষত্র দেখিতে পাইবে। তারা কৃকলাসের পুষ্পকরথে মূলাধিপতি "নির্ঋতি রাক্ষসেশ্বর" অধিষ্ঠিত দেখিবে। এবং তারা কৃকলাসের পূর্ব্ব ভাগে—তারা চৌকার (২২) চারি কোণে প্রোষ্ঠপদের চারি তারা দেখিবে।

আকাশে রাবণ ভ্রাতা অমর কুবেরের বহুতর অক্ষয় ও অভ্রান্ত চিহ্ন দীপ্ত রহিয়াছে। যথা :—তারা কৃকলাস, প্রোষ্ঠপদ নক্ষত্রদ্বয় এবং অন্তরীক্ষচর অলকাপুরী ইত্যাদি। আধিদৈবিক কুবেরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে কোন অমর কুবের থাকিলে ইতিবৃত্তবাদী তাহার সন্ধান অবশ্যই রাখেন।

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

(২১) কামরূপ কৃকলাসের দেহ ভয়াবহ, সুতরাং কুৎসিত। এ জন্য বৈশ্রবণ কু-বের নাম পাইয়া থাকিবেন।

(২২) Square of Pegasus.

সর্ব্বস্ব।

বৈশাখের খর রৌদ্রে এস তুমি আজ,
আমি আছি পথ চেয়ে ছাড়ি সব কাজ।
শ্রাবণের বারিপাতে ভরা বরিষায়,
আজিকে হৃদয়খানি চাহিছে তোমায়।
শরতের মধুমাখা চাঁদের কিরণ,
এস তুমি এর মাঝে আমার জীবন।
হেমন্তের স্নিগ্ধবায়ে পুলকিত মন,
এস তুমি এর মাঝে সরবস্ব ধন।
শীতের কুহেলিমাখা হিমানী নিশায়,
বড় সাধ একবার দেখিতে তোমায়।
বসন্ত এসেছে লয়ে কুসুম সম্ভার,
এস তুমি এর মাঝে সর্ব্বস্ব আমার।
বসে আছি পথ চেয়ে তোমারি আশায়
তুমি তো এলে না সখা বর্ষ হল সায়।

শ্রীমতী রেণুকণা দত্ত।

পরিতাপ।

কাল যাদু ধূলা কাদা মাখি
এসেছিলি আঁচল ধরিতে
'দূর হও হতভাগা' বলি
অশ্রুজল দেখেছি ঝরিতে।
তাই বুঝি অভিমান ভরে
চলে গেলে কোন দূরদেশে
আমি আজ সারাটি ধরণী
খুঁজে মরি অশ্রুনীরে ভেসে॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

পিশাচ-লীলা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ছদ্মবেশ।

নীরদবাবু আদালত হইতে বাহির হইয়া প্রথমে নিজাবাসে গমন করিলেন। বাটী হইতে কয়েকটা ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টার পর ধীরে ধীরে হাজত-গৃহে —যেখানে মতিবিবি বন্দীভাবে অবস্থান করিতেছেন সেই-খানে গমন করিলেন। তিনি হাজতে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন. ধূল্যবলুণ্ঠিতা-বস্থায় মতিবিবি ভূমিতলে শায়িত রহিয়াছেন। তিনি মতিবিবিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি আপনাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। আশা করি, আপনি আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিবেন। আমার স্থির বিশ্বাস আপনি নিরপরাধিনী সেই জন্য আপনার সাহায্যার্থ আসিয়াছি।

মতিবিবি তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া উঠিয়া বলিল,—"আপনার এ ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না।"

নীরদবাবু। ঋণের কথা চুলোয় যাক। আমি যখনই কোন নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে চক্রান্তে পড়িয়া আইনের কবলিত হইতে দেখি, তখনই আমার এই হস্ত যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য-জন্য অগ্রসর হয়। তখন আমার পরিচিত অপরিচিত জ্ঞান থাকে না।

মতিবিবি। ভগবান আপনার মঙ্গল করিবেন।

নীরদবাবু বলিলেন "এই রহস্য-পূর্ণ ভীষণ হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্বরাত্রিতে আপনি কি উক্ত বাটীর একটা নিভৃত প্রাঙ্গণে মিহিরলাল বাবুর সহিত দেখা করিয়াছিলেন।"

মতি। না মিথ্যা কথা। আমি গত দশ দিনের মধ্যে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই।

নীরদ। একমাত্র আপনিই কি আপনার স্বামীকে ঔষধ খাওয়াইতেন না অপর কেহ খাওয়াইত?

মতি। মোহনলাল বাবুও বহুবার তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইয়াছিল।

নীরদ। মিহিরলাল বাবু কি কখন আপনাকে মরফিয়া দিয়াছিলেন?

মতি। হাঁ, দিয়াছিলেন।

নীরদ। যখন দেন তখন বিষ বলিয়া দিয়াছিলেন কি ?

মতি। হাঁ,

নীরদ। সে বিষ এখন কোথায় ?

মতি। আমার ঘরে একটা বাক্সের মধ্যে আছে।

নীরদ। কখন কি উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন ?

মতি। হাঁ, খুব অল্পমাত্রায় অধিকাংশই পড়িয়া আছে।

নীরদ। বাটীর দাসীকে কি কখন দিয়াছিলেন ?

মতি। হাঁ, একবার তাহার ফিক্ ব্যথা হওয়ায় দিয়াছিলাম।

নীরদ। আপনার স্বামীর ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ীর সঙ্গে কখন কোন কারণে কি বচসা হইয়াছিল ?

মতি। না, কখন হয় নাই। আমি কখন তাহাদের মন্দ কথা বলি নাই।

নীরদ। আপনার স্বামীর নূতন উইল-সম্বন্ধে আপনি কি কিছু শুনিয়াছেন ?

মতি। আমি নূতন কি পুরাতন কোন উইলের কথাই শুনি নাই। আমাকে যে তিনি তাঁহার বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছিলেন, তাহাও আমি জানিতাম।

নীরদবাবু মতিবিবির নিকট হইতে বিদায় লইয়া মিহিরলালের কক্ষে গমন করিলেন। মিহিরলাল তাহাকে দেখিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিলেন।

নীরদবাবু প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন, "হত্যাকাণ্ডের পূর্ব্ব রাত্রিতে আপনি কোথায় ছিলেন ?"

উ। সেদিন আমার এক বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণ থাকায় রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত সেখানে ছিলাম, পরে বরাবর বাটীতে আসিয়াছিলাম।

প্র। আপনার সহিত মতিবিবির দেখা হইয়াছিল কি ?

উ। না, আজ ১০।১২ দিন হয় নাই।

প্র। আপনি কি ঔষধের দোকান হইতে মরফিয়া কিনিয়া আনিয়াছিলেন ?

উ। হাঁ কিনিয়াছিলাম।

প্র। আপনি কি তাহা মতিবিবিকে দিয়াছিলেন ?

উ। হাঁ।

প্র: দিবার সময় বিষ বলিয়া দিয়াছিলেন ?

উ। হাঁ।

প্র। ইহাই সমস্যার বিষয়।

মিহিরলাল, নীরদবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি মতি-বিবিকে দোষী মনে করিবেন না। তাহাতে কোন পাপ নাই।"

নীরদবাবু বলিলেন "না, আমি যদি আপনাদের উভয়কে দোষী মনে করিতাম, তাহা হইলে কখনই কোনরূপে সাহায্য করিতাম না। আপনার মরফিয়ার শিশিটা কোথায় ?"

উ। আমার শয়নঘরে টেবিলের উপর আছে।

"আমি সেইটা দেখিতে চাহি" বলিয়া নীরদবাবু প্রস্থান করিবার উপক্রম করিলে মিহিরলাল বলিলেন—"আপনি আমার ঘরের চাবি লইয়া যাউন, দেখিবেন আমার কথা সত্য কিনা ?" এই বলিয়া তিনি চাবিটা নীরদবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন। নীরদবাবু হাজতগৃহ হইতে বাহির হইয়া বরাবর মিহিরলাল বাবুর বাটীতে গমন করিলেন। মিহিরলাল বাবুর স্ত্রীলোকেরা তখন স্থানান্তরে থাকায় বাটীতে চাবি বন্ধ ছিল। নীরদবাবু বাটীতে যাইয়া দেখিলেন—সদর দ্বার ভগ্ন—মিহিরলালবাবুর গৃহে মরফিয়ার শিশি নাই। তিনি মহাসমস্যায় পড়িলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন—ব্যাপারটা ক্রমেই গুরুতর রহস্য-জালে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। আমার আসিবার পূর্ব্বেই নিশ্চয়ই কেহ এই বাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু সে ব্যক্তি কে ? মিহিরলালের শত্রু না মিত্র ? মিত্র নহে শত্রুই। বোধ হয় মরফিয়ার শিশিটা হস্তগত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। আর না হয় পুলিশ এই বাটীতে তদন্ত করিয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, আমি এই জটিল সমস্যার মীমাংসা করিবই করিব। কাশীর বড় বড় গুণ্ডা আমার দ্বারা জেলে প্রেরিত হইয়াছে—আর এই তুচ্ছ কাজটা আমার দ্বারা সংসাধিত হইবে না ? ভাল দেখা যাক শেষে কি দাঁড়ায়। কাশীর বদমাইস বড়, কি গোয়েন্দা পুলিশ বড় আর একবার তাহার মীমাংসা হইবে।

মিহিরলাল বাবুর বাটীতে নীরদবাবু একটা ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন। মুখে কি একটা তরল পদার্থ মাখাইয়া একটা দাড়ি করিলেন। তাহার পর থানার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। থানায় প্রবেশ করিয়া একজন পাহারা-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'ইনেস্‌পেক্টার বাবু কোথায় ?' পাহারাওয়ালা

বশেষভাবে নীরদবাবুকে চিনিলেও এক্ষণে ছদ্মবেশ থাকায় চিনিতে পারিল পুলিশ সুলভ গম্ভীর বচনে বলিল,—"আপনার কি প্রয়োজন? তিনি এক্ষণে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত আছেন।"

নীরদবাবু একটু চড়া মেজাজে বলিলেন,—"তিনি থানায় আছেন কি না জানিতে চাহি।"

পাহারাওয়ালা নীরদবাবুর অপেক্ষা মেজাজ আরও একটু রুক্ষ করিয়া বলিল,—"কি কাজ আমায় বলিতে পারেন, তাঁহার সহিত এখন দেখা হইবে এখানে বাজে গোল করিবেন না।"

নীরদবাবু সহাস্যে বলিলেন,—"ভাল, ইনেস্‌পেক্টারবাবু যদি কার্য্যে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে আমি এই স্থানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিব। কাজ শেষ হইলে আমি দেখা করিব।"

অল্পক্ষণ পরে ইনেস্‌পেক্টার বাবু আসিয়া নীরদবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নীরদবাবুর সহিত ইনেস্‌পেক্টারের পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় ছিল—সুতরাং সাঙ্কেতিক চিহ্ন প্রকাশ করিবামাত্র তিনি নীরদবাবুকে বলিলেন,—"আমার দ্বারা আপনার কি কার্য্য হইবে বলুন।"

নীরদ। আমি কোন বিষয়ে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।

ইনে। অনুমতি করুন।

নীরদ। আমি ছক্কনলাল বাবুর মৃত্যুর রহস্যোদ্ঘাটন-জন্য চেষ্টা করিতেছি। সেই বিষয়ে আমি আপনার সাহায্য চাই।

ইনে। কেন আসামীদ্বয়ের অপরাধের ত যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং আবার আপনার প্রয়োজন কি?

নীরদ। না, আমি আসামীদিগের পক্ষ হইতেই নিযুক্ত হইয়াছি।

ইনে। বলেন কি? তাহা হইলে এইবার আপনার সুবিমল যশে কলঙ্ক স্পর্শিত হইবে।

নীরদবাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"না বর্ত্তমানে সে ভয় নাই।"

ইনে। আপনি হয়ত জানেন না, অদ্য আমার একজন কর্ম্মচারী মতিবিবির গৃহ অনুসন্ধান করিয়া দুই গ্রেণ মরফিয়ার একটা শিশি পাইয়াছে।

নীরদ। আমি সেই শিশির কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। মিহিরলাল বাবুর নিকটে শুনিলাম যে, তাহার শয্যাগৃহে দুই গ্রেণ

মরফিয়া আছে—আমি সেই মরফিয়ার অনুসন্ধান জন্য তাহার বাটীতে গিয়াছিলাম।

ইনে। গিয়া দেখিলেন—মিহিরলাল বাবুর মিথ্যা কথা।

না, বরং সত্য। আমি দেখিলাম, আমার যাইবার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি তাহার শয়নগৃহের দ্বার ভঙ্গ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

ইনে। সত্য নাকি?

নীরদ। আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনারই আদেশে পুলিশ খানাতল্লাস করিয়াছে। সত্য মিথ্যা জানিবার জন্যই আপনার নিকটে আসিয়াছি।

ইনে। না, আমি খানাতল্লাসী করি নাই।

"তা হ'লে ব্যাপারটা বুঝুন" বলিয়া নীরদবাবু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন,—"মিহিরলাল বাবুর গৃহের মরফিয়ার শিশিটা কি মৃত ছক্কনলাল বাবুর গৃহে রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই? যাহা হউক, এখন আমি ছদ্মবেশ পরিধান করিতে চাহি। আপনি আমাকে একটা নির্জ্জন গৃহ দেখাইয়া দিউন" বলিয়া নীরদ বাবু গৃহান্তরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

অল্পক্ষণ পরে মাথায় হিন্দুস্থানী টুপি, চুড়িদার পাঞ্জাবী এবং মিহি ধুতি পরিধান করিয়া একটি যুবক থানা হইতে বাহির হইয়া গেল।

যুবকের বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর—দেখিলেই উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব বলিয়া মনে হয়। যুবক বরাবর থানা হইতে মোহনলালবাবুর মহাজনী গদিতে গমন করিলেন। মোহনলালবাবু তখন একজন খাতককে টাকা কর্জ্জ দিয়া তৎপ্রদত্ত বন্ধকী অলঙ্কারগুলি সিন্দুকের মধ্যে তুলিয়া রাখিতেছিলেন। তিনি যুবককে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন,—"মহাশয়ের কি প্রয়োজন?"

যুবক। বিশেষ প্রয়োজন আছে. আমি একটু নির্জ্জন স্থানে কথাবার্ত্তা কহিতে চাহি।

মোহন। এইখানেই বলুন—অন্যত্র যাইবার প্রয়োজন নাই।

যুবক। আমি মুজাপুরের টহলরামের নিকট হইতে আসিতেছি।

টহলরামের নাম শুনিয়া মোহনলালবাবুর ভাববিপর্য্যয় ঘটিল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন,—"পূর্ব্বেই ত তাহার নাম করিতে পারিতেন, টহলরাম তবে ভাল আছেন।"

যুবক। আজ্ঞে হাঁ।

মোহনলালবাবু সাদরে যুবকের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন,—"চলুন

আমরা গৃহান্তরে যাই।” এই বলিয়া গদির একটা নির্জ্জন গৃহে গমন করিলেন। যুবক গৃহান্তরে গমন করিয়া মোহনলালবাবুকে বলিলেন,—“আমি টহলরামের দলের লোক—পূর্ব্বে পিতৃ-পিতামহের কিছু সম্পত্তি ছিল, সেটা দলে মিশিয়া আমোদ করিতেই দুই দিনে উড়িয়া গিয়াছে। আর মৃজাপুরের পুলিশের দৌরাত্ম্যে আমাদের কাজ কর্ম্ম একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে।”

মোহন। তাহা হইলে আপনি নূতন কার্য্যক্ষেত্র খুঁজিতেছেন! যদি এখানে কাজ চালাইতে পারেন, তাহা হইলে মাল পাচার করিবার ভাবনা নাই, আমি সে পক্ষে আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করিব।

যুবক। সে কথা পরে হইবে, এখন আর একটা বিশেষ কাজ আছে।

মোহন। কি বলুন?

যুবক। মৃজাপুরে দূর সম্পর্কে আমার একটি আত্মীয় স্ত্রীলোক আছেন। তাহার বিশ পঁচিশ হাজার টাকার সম্পত্তি আছে। তাহার মৃত্যুর পর টাকাটা আমার পাবার আশা আছে।

মোহন। তবে আর আপনার ভাবনা কি?

যুবক। দাঁড়ান মশায়! ব্যাপারটা যত সহজ মনে করিতেছেন, সেটা তত সহজ নহে। আমার মিহিরলাল নামে একজন সম্পর্কে ভাই আছেন, সম্পর্ক হিসাবে উক্ত বৃদ্ধার টাকাটা তাহারই প্রাপ্য। এখন তাকেই আমি সরাতে চাই।

“তবে ত আপনার একাদশে বৃহস্পতি। আপনি শুনেন নাই—মিহিরলাল এখন খুনের দায়ে কাশীর হাজতে রহিয়াছে। তার অকাট্য ফাঁসি হইবে—” এই বলিয়া মোহনলাল বাবু হো হো শব্দে হাস্য করিতে লাগিলেন।

যুবক। সত্যি নাকি, কই আমি ত কিছুই শুনি নাই—ব্যাপারটা সব খুলে বলুন দেখি।

মোহনলাল বাবু ছক্কনলাল বাবুর মৃত্যু সম্বন্ধীয় সকল ঘটনা একে একে বিবৃত করিয়া পরে বলিলেন,—“যদি একান্তই আইনের হাত থেকে রক্ষা পায়, তা'হলেও আমার হাতে রক্ষা নাই, যে ক'রে পারি সাবাড় করবো।”

যুবক অপাঙ্গভঙ্গীতে মোহনলালবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—“তবে ত দেখছি উভয়েই এক পথের পথিক—উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। মিহিরলালের জীবনের উপর * * *

এমন সময়ে সদর দ্বারে শব্দ হইল। মোহনলাল বাবু উঠিয়া দরজা

খুলিতে যাইলেন। যুবক মনে করিল—তিনি এখনি ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু মোহনলাল বাবুর ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া নিজেই সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইলেন। সদরে যাইয়া দেখিলেন,—মোহনলালবাবু কাশীর বিখ্যাত গুণ্ডা, দস্যুদলনায়ক বীরচাঁদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি বাহির হইবার অভিপ্রায়ে মোহনলালবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"আমি তবে এখন চলিলাম। সময় মত দেখা করিব।"

এই বলিয়া তিনি মোহনলালবাবুর গদি হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। যুবককে বাহিরে যাইতে দেখিয়া বীরচাঁদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

মোহনলাল বলিল—"মির্জাপুর হইতে নূতন আমদানী, টহলরামের আড্ডার লোক। এখানে একটা শীকার যাল করিতে আসিয়াছে।"

বীরচাঁদ। কি করিয়া জানিলে যে যুবক, টহলরামের লোক? কোন চিঠিপত্র আনিয়াছে কি?

মোহন। না।

বীরচাঁদ। যুবকের নাম কি?

মোহন। তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়াছি।

বীরচাঁদ। তবে তুমি জাহান্নমে যাও, এ নিশ্চয়ই নীরদ গোয়েন্দা। তুমি হয়ত ওকে অনেক গুহ্য কথা ব'লেচ?

মোহন। না, একটীও না।

বীরচাঁদ। তবেই রক্ষা। যাক্ এখন বাজে কথা; আসল কথা কওয়া যাক্। তুমি নীরদ গোয়েন্দাকে খুন ক'র্‌তে চাও?

মোহন। হাঁ।

বীরচাঁদ। বুঝতেই পার—কাজটা সহজ নহে। কাশীর বড় বড় গুণ্ডারা এই কার্য্যের ভার লইতে চাহে না।

মোহন। তবে উপায়!

বীরচাঁদ। উপায় আছে—তবে কিছু বেশী খরচ ক'রতে হবে।

মোহন। কত শুনি?

বীরচাঁদ। পাঁচ হাজার টাকা। যদি রাজী হও—তাহ'লে আজই সব টাকা দিতে হ'বে। আগুড়ি টাকা না পেলে আমি এ কাজে নেই।

মোহন। ঢের টাকা বীরচাঁদ—ঢের টাকা। এত টাকা দিতে পারবো না।

বীরচাঁদ। কিন্তু নীরদ গোয়েন্দাকে পৃথিবী থেকে সরাতে না পারলে তোমার আর নিস্তার নেই। যখন পেছু নিয়েছে তখন শেষ না ক'রে ছাড়বে না।

মোহনলালবাবু ক্ষণেক গম্ভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা তাই দিব। কিন্তু অগ্রিম সব টাকা দিতে পারিব না। আজ অর্দ্ধেক' পরে কাজ হাসিল হইলে অর্দ্ধেক। কেমন রাজী ত ?"

বীরচাদ আর রাজী না হ'য়ে কি করি। মাঝে মাঝে এ গরিবকে স্মরণ কর্‌লেই আমরা প্রতিপালিত হ'ব।

মোহনলালবাবু দশটাকার খুচরা নোটে আড়াই হাজার গণিয়া দিলে বীরচাঁদ তাঁহাকে "রাম রাম" বলিয়া প্রস্থান করিল।

[ক্রমশঃ।

শ্রীঅর্জ্জুনচন্দ্র বসু।

স্মৃতি।

পলকে প্রলয়! এ হৃদয় দলি,'
এ জন্মের মত গিয়াছে সে চলি';
জ্বলিয়াছে চিতা, দীপ্ত চিতায়
সব পুড়ে হ'ল খাক্‌!
তা'ও যা'ক্‌, তা'ও যা'ক্‌!
শুধু চির সুন্দর স্মৃতিটুকু তা'র,
পরাণে জড়ায়ে থাক্‌!

না পূরিতে সাধ, না মিটিতে আশা,
ভেঙে চুরে গেল কল্পনার বাসা;
অশনি আঘাতে সোণার দেউল
হ'য়ে গেছে দুই ভাগ!
তা'ও যা'ক্‌, তা'ও যা'ক্‌!
শুধু চির সুন্দর স্মৃতিটুকু তা'র,
পরাণে জড়ায়ে থাক্‌!

কুসুমিতা চারু উদ্যান-লতা,
ঝঞ্ঝা-আঘাতে ধূলি-লুণ্ঠিতা ;
কর্দ্দমমাখা ফুলগুলি সব,
মলিন অঙ্গরাগ !
তা'ও যা'ক্, তা'ও যা'ক্ !
শুধু চির সুন্দর স্মৃতিটুকু তা'র
পরাণে জড়ায়ে থাক্ !

জ্যোৎস্না ধৌত ফাগুনী নিশায়,
কুহুতান ভাসে মৃদু মৃদু বায় ;
কাঁদিয়া দিয়াছি অনন্ত বিদায়,
প্রেম, প্রীতি, অনুরাগ।
তা'ও যা'ক্, তা'ও যা'ক্ !
শুধু চির সুন্দর, স্মৃতিটুকু তা'র,
পরাণে জড়ায়ে থাক্ !

ঊর্দ্ধে আকাশ, পদতলে ধরা,
অসীম বিশ্ব সুষমায় ভরা ;
নয়নে আমার, সকলি আঁধার,
কিছু নাই, সব ফাক !
তা'ও যা'ক্, তা'ও যা'ক্ !
শুধু চির সুন্দর স্মৃতিটুকু তা'র,
পরাণে জড়ায়ে থাক্ !

দীপ্তিবিহীন গ্রহ তারা সব,
শূন্য ভবন, জগৎ নীরব ;
তৃষিতকণ্ঠ, সোহাগ-সরসী
শুকায়ে হ'য়েছে পাঁক !
তা'ও যা'ক্, তা'ও যা'ক্ !
শুধু চির সুন্দর স্মৃতিটুকু তা'র,—
পরাণে জড়ায়ে থাক্ !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একতা

—*—

আর্য্যগণের বৈজ্ঞানিক বিচারে ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূত ও আধুনিক রসায়নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর সু-সূক্ষ্ম বিচারে ৬৪টী উপকরণে জগতের রচনা হইয়াছে। পরমেশ্বর এক, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপাদান, মানুষের কল্পনাতীত। পদার্থ সমূহের আকৃতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও পরস্পর মিলন ব্যতীত কোন দ্রব্য নির্ম্মাণ বা কোন ক্রিয়ার সমাধান সম্ভবপর নহে।

একটি বস্তুর শক্তি অপেক্ষা দুইটি বস্তুর মিলন-বল যে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ, একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন; সুতরাং কার্য্য সমাধান পক্ষে শক্তি ও সংযোগই সবিশেষ ফলোপধায়ক। পৃথিবীর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তির পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্টই প্রতীত হয় যে, উহার প্রকাণ্ড অবয়ব কতকগুলি ধূলিকণার সমষ্টি মাত্র। দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, নানাবিধ প্রাণী, উদ্ভিদ, পর্ব্বত, সাগর ও গ্রহাদির সম্মিলনে এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড; জলকণা সকলের মিলনে প্রকাণ্ড মেঘমালা, অগণিত জলবিন্দুর যোগে সাগরশরীর, নানা দ্রব্যের মিশ্রণে খাদ্য, সূক্ষ্ম কার্পাস তন্তুর মিলনে বিস্তৃত বসন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমাবেশে শরীর, নানা বর্ণ সংযোগে সুশোভন আলেখ্য, নানা দ্রব্যের মিশ্রণে বিচিত্র পাত্র, নানা দ্রব্যের সংমিশ্রণে প্রাণ-রক্ষক ঔষধ, নানাবর্ণ সংযোগে ভাব-বিকাশক ভাষা, নানা বাক্যের পরস্পর যোজনে উপাদেয় গ্রন্থ, তৃণকাষ্ঠের যথারীতি যোজনে বাসগৃহ, অল্প অল্প সংগৃহীত প্রজাধনে রাজ-ভাণ্ডার, প্রকৃতি পুঞ্জের শক্তিসঞ্চয়ে মহতী রাজ-শক্তি পরিচালিত হইতেছে। লঘু তৃণগুচ্ছে মত্ত মাতঙ্গের যথেচ্ছগতির রোধ, যন্ত্রাদির বহু অবয়ব সঞ্জাত স্বর-সংহতিতে শ্রুতিমধুর যন্ত্রধ্বনির উৎপত্তি হয়। ফলতঃ সংযোগই শক্তি, বিয়োগই দুর্ব্বলতা। এক্ষণে অনুমেয়, একতার শক্তি কত?

“একতা” কথাটীও যেমন শ্রুতিমধুর, ইহার ক্ষমতাও তেমনি অদ্ভুত। একতার সমকক্ষ শক্তি এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুতে আছে কিনা,—জানিনা। নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। একতার বলে কি না সাধিত হয়? ইহার সমান ক্ষমতা অপরে দুর্ল্লভ। কিন্তু এই দুর্ল্লভ ক্ষমতা লাভ করা কি সাধ্যায়ত্ত নহে? কে বলিল, সাধ্যায়ত্ত নহে? অনায়াসে ইহা লাভ করা যায়। এত অল্প আয়াসে যে অদ্ভুত ক্ষমতা ধারণ করা যায়, তাহা

ধারণ করিতে চেষ্টা করা কি আমাদের উচিত নয়? অবশ্য উচিত, কিন্তু আমরা অজ্ঞান, তাই এই অপূর্ব্ব ক্ষমতায় অমনোযোগী। এইরূপ অবহেলা করা কি আর্য্য-বংশোদ্ভবদের কর্ত্তব্য? না—না—কখনই না, তবে আমরা করি কেন? কারণ আছে, আমরা বুঝিয়াও এই অমূল্য রত্ন হেলায় বিসর্জ্জন দিয়াছি। একদিন ছিল, কিন্তু সে দিন অতীত, আর সে সুখ-রশ্মি নাই, আজ তাহার সেই শক্তি সমন্বিত রশ্মি বিহীনে আমরা ঘোর অন্ধকারে বসিয়া রহিয়াছি, আর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বিসর্জ্জনের হাহারব বুক হইতে নামাইতেছি। কিন্তু সে যাতনা নামিবার নয়, কমিবার নয়, সে যাতনা উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতেছে, নিশ্বাসের সঙ্গে কমিবে কি, আরও বর্দ্ধিত হইতেছে।

আবার যদি আমরা এখন সেই অপূর্ব্ব ক্ষমতার আশ্রয় লই, তবে নিশ্চয়ই পৃথিবী-মধ্যে সুনামখ্যাত হইতে পারিব, তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু পারিব কি? পরম পিতা পরমেশ্বর দিন দিবেন কি?

বাস্তবিক একতার ক্ষমতা অধিক ও অদ্ভুত। বাল্যকাল শিক্ষার মূল, এই সময় হইতে এই অদ্ভুত ক্ষমতা আয়ত্ত করা সকলেরই উচিত। সংসার অসার,—এই অসার সংসারে দুঃখের ভারই অধিক। সুখ যে না আছে তাহা নহে, থাকিলেও তাহা দুঃখবর্জ্জিত নয়। এই সংসারে সততই সাবধানে থাকিতে হয়। বিপদ আমাদের পদে পদে ধাবিত, এই বিপদ-সমাকীর্ণ সংসারে থাকিতে হইলে অনেকগুলি গুণ আয়ত্ত থাকা প্রয়োজন। তন্মধ্যে একতাও একটি গুণ। ইহা করতলগত করিয়া রাখিতে পারিলে, এই সুখ-দুঃখপূর্ণ সংসারে অনায়াসে কালাতিপাত করা যায়। একতা যদি করতলগত থাকে, তবে অন্যে তোমার অনিষ্ট করিবে এভাব মনে আসিবে না এবং কেহ অনিষ্ট করিতেও পারিবে না।

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অগ্রে মহাপুরুষ, যাঁহারা জগত আলো করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা নয়ন-পথে পতিত হন। তাঁহাদের উন্নতির বিষয় চিন্তা করিলে দেখা যায়, একতা ইহাঁদের করতলগত ছিল। তাহারা একতার বলে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমরাও তদ্রূপ যদি একতাকে করতলগত করিতে পারি, তবে অবশ্যই জগতে মহাপুরুষদের ন্যায় আদর্শ রাখিয়া মরিতে পারিব।

ইতিহাস একতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ

পাওয়া যায়। এই পৃথিবীতে যত জাতির অধঃপতন লক্ষিত হইতেছে, সমস্তেরই একমাত্র কারণ—একতার অভাব। একতার অভাবই তাহাদের পতনের কারণ। আবার একতার প্রবল প্রতাপই প্রত্যেক জাতির উন্নতির কারণ।

যে আরববাসী একদা একতার বলে বলীয়ান হইয়া যুগপৎ গোয়াডাল কুইভার তীর পর্য্যন্ত আপনাদের অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিল, আজ তাহাদের সে ক্ষমতা কোথায়? আজ তাহাদের সে সিংহ-বিক্রম কই? নাই; আজ একতার অভাবে তাহাদের সে বিক্রম, সে শৌর্য্য, সে বীর্য্য সবই সরিৎ-পতির অতলস্পর্শি শীতল পয়োমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আজ তাহাদের জাতীয়-জীবন উপন্যাস প্রায়।

এমন মনোহর তরুলতা-পূর্ণ শিখরমালা, এমন শ্যামল-মন্দ-মারুত-আন্দোলিত শস্যক্ষেত্র, এমন ধীর-গভীর-প্রবাহিত-ধার-নদনদী, এমন শাল-তাল-তমাল-সঙ্কুল বিজন কানন, এমন পবিত্র-পয়ো-নিঃসরণকারী—প্রস্রবণ, সেই বিদ্যুদ্দাম-দীপ্ত-ঘন-ঘটা-পূর্ণ মুষলধার-স্রাবী বর্ষার আকাশ-মণ্ডল, আর সেই চূতমুকুল-সৌরভপূর্ণ, পাপিয়া-কোকিল-কুল-আরাধিত বসন্তকাল যে দেশে বিরাজিত, সেই দেশের কি শোচনীয় অবস্থা! কেন এই সাগর-ভূধর-পরিবেষ্টিত, সহস্র পর্ব্বতাবয়বে তরঙ্গায়িত দেহ, সহস্র-নদী-প্রবাহে বিধৌত-মল, শস্যশ্যামল, বনরাজিসঙ্কুল, রত্নগর্ভ উর্ব্বর ভূম, অনন্তকোটীর বিচরণস্থল, ত্রিংশৎ কোটী মানবের আবাসভূমি ভারতবর্ষের এত দুর্দ্দশা? একতার অভাবেই এর একমাত্র নিত্য দুর্ভিক্ষ, নিত্য মহামারী, নিত্য অভাব! একতাই এ সকলের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

আমাদের ন্যায়বান্ ব্রিটিশরাজ সমগ্র ভারতের দৈন্য দুঃখ দারিদ্র্য এবং জন-বিধ্বংসি-ব্যাধির জ্বালা দূর করিবার জন্য সতত সচেষ্ট, তথাপি দূর হইতেছে না কেন? তাহাও আমাদের একতার অভাবে। আমরা সম্পূর্ণভাবে এই মহৎ পদার্থটী হারাইয়া ফেলিয়াছি। দেশের কথা ছাড়িয়া দাও, নগরের কথা ভুলিয়া যাও, পল্লীর কথা দূরে রাখ,—একটি ক্ষুদ্র পরিবারের সংসারের দিকে চাহিয়া দেখ, সেখানেও একতা নাই। অর্থোপার্জ্জনের জন্য একে যাহা বলিবে, অপরে তাহা শুনিবে না। মিতব্যয়ের জন্য কেহ কাহারও নিষেধ-বিধির মধ্যে থাকিবে না, স্বাস্থ্যরক্ষা ও ব্যাধি-নিবারণ-কল্পে একে যাহা বলিবে, অপরে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে,—এইরূপেই আমাদের সর্ব্বস্ব যাইতে বসিয়াছে।

এই অধঃপতিত দেশ ভিন্ন উন্নতিশীল যে কোন দেশের দিকে চাহিবে, দেখিবে দশজনে একত্র হইয়া যে কার্য্য করিবে, সকলেই তাহাতে প্রাণপণ করিবে। চিন্তাশীলের চিন্তা, শিল্পীর শিল্প-প্রণয়ন-কৌশল-শিক্ষা, চিকিৎসকের স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ সে সকল দেশে ব্যর্থ যায় না। আমাদের দেশে স্ব স্ব প্রধান, আর একতাহীনের ক্ষুদ্রতা যেন আলোকহীন অমাবস্থার অন্ধকারের মত প্রত্যেকের হৃদয় যোড়া হইয়া বসিয়া গিয়াছে।

যে দেশের প্রচলিত প্রবাদ-বাক্য "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিনি নাহি লাজ" সে দেশে আ'জ একতা শূন্যতা। যত দিন আবার সেই অমূল্য রত্ন একতা আমাদের হৃদয়ে পরিপূর্ণ শারদীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় সমুদিত না হইবে, ততদিন ক্ষুদ্রতার অন্ধকার বিদূরিত হইবে না।

শ্রীযদুনাথ বসু রায়।

প্রার্থনা।

—*—

পারি না থাকিতে তোর প্রেম-রাজ্যে
দুঃখ-অশ্রু ল'য়ে নয়নে :
পাপের এ বোঝা বহিতে বহিতে
কেঁদে কেঁদে সারা জীবনে॥
তপ্ত আঁখি-জল দে মা মুছাইয়ে
কৃপা-বারি দেগো তারিণী।
পথ দেখাইয়ে দেগো দয়াময়ি!
সুপথে চালাই তরণী॥

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

দেবীগড়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাজাদেশ।

যথাসময়ে প্রহরী কমলার পত্র লইয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইল। রাজা পত্র পাঠ করিয়া পত্রের মর্ম্ম মন্ত্রিগণকে শুনাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল,—

"আমি একবার আমার পিতামাতার নিকটে যাইব, যে বিদেশী বণিক্‌কে বন্দীশালা হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছি, তিনি আমার সঙ্গে যাইবেন। আমাদের গমনের জন্য মুক্তিপত্র প্রদান করিবে। কদাচ তাহার অন্যথা না হয়,—যদি আমাদের গমনে তুমি কিম্বা তোমার সৈন্য বা কোন প্রজা বাধা প্রদান করে, তবে বিদ্যুৎ-প্রবাহে তোমার রাজ্য ধ্বংস করিয়া দিয়া চলিয়া যাইব।"

মন্ত্রিগণ এবং পুরোহিতগণ সে পত্রের মর্ম্ম অবগত হইলেন। প্রধান পুরোহিত অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"না না, অত চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। দেবী তাহার ভক্তগণের বিনাশ করিতে পারেন না। মুখে তিনি যতই ভয় দেখান, কাজে অনিষ্ট করিতে পারিবেন না। তবে আমাদের সম্মান প্রদর্শনে ক্রটী না হয়,—এইরূপ বিবেচনা করিয়া যেরূপ কার্য্য করিতে হয়, মন্ত্রিগণ তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য কর।"

মন্ত্রিগণ অনেকক্ষণ বাদানুবাদ ও আন্দোলন-আলোচনা করিলেন। একজন বলিলেন,—"দেবী যদি যাইবার জন্য নিতান্ত জিদ করেন, রাখিবার প্রয়োজন নাই। যদি রাগ করিয়া বিদ্যুদগ্নিতে রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেন, তখন কি করা যাইবে?"

তদুত্তরে অপর মন্ত্রী বলিলেন,—"পুরোহিত যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম কি গ্রহণ কর নাই? দেবী সৃষ্টি নাশ করেন না। তাঁহার পিতামাতাও নাই—ছলনা করিয়া চলিয়া যাইবেন মাত্র। দৃঢ়ভাবে ধরিয়া না রাখিলে দেবতারা স্থির ও প্রসন্ন থাকেন না।"

১ম-মন্ত্রী। তিনি যাইবার জন্য জিদ করিতেছেন, এস্থলে তবে কি করা যাইবে ?

২য়-মন্ত্রী। হাঁ, তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা হইবে না। যাবেন যান। কিন্তু একটা কথা আছে।

১ম-মন্ত্রী। কি ?

২য়-মন্ত্রী। আমি খুব ভাবিয়া দেখিয়াছি, আমার মনে একটা তত্ত্বের এই উদয় হইয়াছে যে, ওপারে যে বৃদ্ধ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কি এক নবধর্মের প্রচার করিতেছে, অর্থাৎ যাহার গৃহে দেবী কিছুদিন পালিত হইয়াছিলেন এবং বর্ত্তমানে পিতা বলিয়া পরিচয় দিয়া যাহার নিকটে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন—বাস্তবিক কিছু সে দেবীর পিতা নহে।

এই সময় প্রধান পুরোহিত বলিয়া উঠিলেন,—"তা'ত নয়ই, তা'ত নয়ই।"

২য়-মন্ত্রী। পিতা নয়, কিন্তু ভক্ত। আমি শুনিয়াছি, ভক্তই দেবতার বাপ, ভক্তই দেবতার মা, ভক্তই দেবতার সব।

প্রধান পুরোহিত ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—"সেত শাস্ত্রেরই কথা, সেত শাস্ত্রেরই কথা।"

২য়-মন্ত্রী। আমার মনে হয়, দেবী এখন তাহারই উপরে প্রসন্না—তাহার ঘরে গেলে সেই হয়ত এ দেশের রাজা হইতে পারিবে।

রাজার বক্ষস্থল কাঁপিয়া উঠিল। ব্যগ্রস্বরে বলিলেন,—"তবে উপায় ? কিসে দেবীকে এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় ? তিনি যে, আজই যাইবেন।"

১ম-মন্ত্রী। তাঁহার গমনে বাধা দিলে বিপদ ঘটিতে পারে, তিনি রাগ করিতে পারেন, বিদ্যুৎ ডাকিয়া আমাদিগকে ভস্মীভূত করিতে পারেন, কিন্তু দ্বিতীয় মন্ত্রী মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন তর্ক চলিতে পারে না, অতএব—

রাজা বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"ছাড়িয়া দাও, আমি অতএব, অবশ্য, সুতরাং—ও সকল বাজে কথা শুনিতে চাহি না। কি করিতে হইবে, একদমে বলিয়া ফেল,—যাহাতে দেবী সেই হতভাগ্য যাদুকর বৃদ্ধের সহিত না মিশিতে পারেন, তাহারই উপায় বল।"

প্রধানমন্ত্রী চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"সিংহ যে, সেই যাদুকরকে আনিতে গিয়াছিল, তাহার কি হইল ?"

রাজা কর্কশস্বরে বলিলেন,—"সংবাদ পাইলাম, সেই অকর্ম্মণ্য কুকুর এখনও সেখানে পঁহুছিতে পারে নাই। লুনি নদীর জল স্ফীত হওয়ায় তাহার তীরে ছাউনী করিয়া বসিয়া আছে।"

মন্ত্রী। দেবীকে গমনের জন্য মুক্তিপত্র এখনই লিখিয়া দিন, আর সেই কুকুরকে একখানি পত্র দিন, যাহাতে সে পত্র পাঠমাত্র গিয়া যাদুকরকে আনয়ন করে। অর্থাৎ দেবী সেখানে না পঁহুছিতে পঁহুছিতে যদি যাদুকর এখানে আসিয়া পঁহুছে, তবে আর কোন গোলযোগ ঘটিবে না।

সেই পরামর্শ ই তখন সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিয়া গৃহীত হইল।

প্রথম দেবীকে একখানি পত্র লেখা হইল। তাহাতে লিখিত হইল,—

"আপনি এ রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে পারে, এমন কেহ নাই। আপনার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য! আপনার যদি ইচ্ছা হইয়া থাকে, যাইবেন। কিন্তু মা, আমরা পুরুষানুক্রমিক আপনার ভক্ত,—আমাদের উপরে আপনার চির করুণা, সে করুণায় যেন বঞ্চিত না হই।"

যে দেবীর নিকট হইতে পত্র আনিয়াছিল, তাহাকে সেই পত্র দিয়া বিদায় করা হইল। তৎপরেই সিংহকে একখানি পত্র লেখা হইল। তাহাতে যাহা লিখিত হইল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

"আমি তোমার বিলম্ব জন্য অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি। এই পত্র প্রাপ্তিমাত্র যে প্রকারেই পার, নদী পার হইয়া সত্বর সেই যাদুকরকে এখানে আনয়ন করিবে। কারণ, দেবী এক বিদেশী বণিকের সহিত সেই যাদুকরের নিকটে যাইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে অবশ্য সৈন্যও অনেক থাকিবে। পথে যদি দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হয়, আর তাঁহার পিতামাতাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন, তাহা হইলে যেন তাঁহার আদেশ পালন করা না হয়। আর যদি বিদেশী বণিক্ তোমার কার্য্যে বাধা দেয়, তাহাকে বাঁধিয়া আমার নিকটে পাঠাইবে। তুমি যদি সত্বর এই সকল আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে তোমাকে মৃত্যু-দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। দেবী অদ্যই রওনা হইবেন,—তাঁহার আগেই তোমার পঁহুছান চাই।"

একজন অশ্বারোহী বেগবান্ অশ্বে আরোহণ করিয়া সিংহের পত্র লইয়া গেল।

———

নবম পরিচ্ছেদ।

নিষ্ঠুর হত্যা।

যথাসময়ে পত্র সিংহের হস্তগত হইল। সিংহ পত্র পাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িল।

কমলাকে লাভ করাই এখন তাহার জীবনের একমাত্র ব্রত স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই হতভাগ্য বণিক্ কোথা হইতে আসিয়া একদিনেই কমলার প্রিয় হইয়া দাঁড়াইল? ইহার সঙ্গে কি কমলার পূর্ব্বে কোনরূপ পরিচয় ছিল? অথবা এই হতভাগ্যই হয়ত কমলার পূর্ব্ব-পরিচিত প্রিয় যুবক। হয়ত ইহাকেই কমলা মনে মনে ভালবাসে, ইহারই জন্য হয়ত কমলা সিংহকে বিবাহ করিতে অসম্মত,—হয়ত কমলার অনুসন্ধানেই বণিকবেশে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন, তাই রাজার এমন সুমতি উপস্থিত। রাজার আদেশ-বলেই সে হতভাগ্য বণিক্কে অতি নৃশংসভাবে নিহত করিতে সক্ষম হইবে। যদিও রাজা বাঁধিয়া পাঠাইতে আদেশ করিয়াছেন, তথাপি হত্যা করা যাইবে। কেন না, যুদ্ধ বাধিলে না বাঁধিতে পারিলে, হত্যা করাও যাইতে পারে!

তাহার মনে হইল, এই সুযোগে কমলার পিতামাতাও তাহার করায়ত্ত হইবে, আর হতভাগ্য বণিকবেশী যুবকও নিহত হইবে, তারপর?—তারপরে কমলা আর যায় কোথায়? কিন্তু আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। কমলা আসিয়া উপস্থিত হইতে না হইতে তাহার পিতামাতাকে বন্ধন করিয়া আনা কর্ত্তব্য। তারপরে রাজাদেশ আছে, কমলা শত অনুরোধ করিলেও আর তাহাদিগকে ছাড়িব না। এদেশের সৈন্যগণ যদি দেবীর কথা শুনিয়া কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তখনই রাজার লিখিত পত্র তাহাদিগকে দেখাইব।

সিংহ আর বিলম্ব করিল না। তাহার সঙ্গী সৈন্যগণকে ডাকিয়া তখনই রাজাদেশ শুনাইল এবং নদীপার হইবার উদ্যোগ করিল।

অনেক কষ্টে তাহারা নদীপার হইল। নদীর স্রোতোবেগে অনেকগুলি পশু ভাসিয়া গেল। তিন চারিজন সৈন্য ডুবিয়া মরিল। অপরেরা অনেক কষ্টে পরপারে উত্তীর্ণ হইল।

পরপারে উপস্থিত হইয়া সকলে বিশ্রাম করিল,—তদনন্তর আহারাদি সমাপ্ত করিয়া গমন করিতে লাগিল।

যেখানে কমলার পিতা আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানে অনেকগুলি পার্ব্বত্য জাতি আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কমলার পিতা তাহাদিগকে বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহারা সেই নব ধর্ম্মের মধুর রসাস্বাদনে নিত্যানন্দ লাভ করিতেছিল। হিংসা দ্বেষ কুটীলতা পরিত্যাগ করিয়াছিল।

সহসা বহু রাজসৈন্যের আগমন দেখিয়া তাহারা ভাবিল, হয়ত রাজা আমাদের এই নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার কথা শুনিয়া, আমাদিগকে ধৃত করিবার জন্য এই সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা অত্যন্ত ভীত হইল এবং তদ্দণ্ডেই পুত্র-কলত্রাদি লইয়া আশ্রম পরিত্যাগ করতঃ পলায়ন করিল। দেখিতে দেখিতে আশ্রম জনশূন্য হইয়া পড়িল।

সিংহ সে সংবাদ পাইয়া সৈন্যগণকে বলিয়া দিলেন, কোন প্রকারে যেন প্রজাগণের অনিষ্ট না হয় এবং সর্ব্বত্র অভয় ঘোষণা করিল, কিন্তু তাহাতে আশ্রমবাসিগণ শান্ত হইতে পারিল না। সকলে দূরে পলায়ন করিল।

তখন দিবা অবসানোন্মুখ—সূর্য্যাস্তের অধিক বিলম্ব ছিল না।

সিংহ কমলার পিতার আবাসের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, দ্বার উন্মুক্ত; সে তখন কয়েকজন বিশ্বস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সিংহ কয়েকবার সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,—সে গৃহগুলির দিকে চাহিয়া দেখিল, সমস্তগুলিই জনশূন্য! দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইল।

তারপরে একটি প্রশস্ত গৃহমধ্যে দৃষ্টিক্ষেপ করায় দেখিতে পাইল, কমলার মাতা রুগ্নাবস্থায় শয়ন করিয়া আছেন। তাঁহার অদূরে একখানা হরিণের ছালের উপরে বসিয়া কমলার পিতা হস্তলিখিত একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছেন। গৃহখানি সম্পূর্ণ নীরব—সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

সিংহ তাড়াতাড়ি সসৈন্যে সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

বর্ম্মধারী সৈন্যসহ সিংহকে সেইরূপভাবে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কমলার পিতা চমকিয়া উঠিলেন এবং পূর্ণগর্ভ বন্দুক তুলিয়া বলিলেন,—"তোমার এই অভদ্রোচিত ব্যবহারের দণ্ড গ্রহণ কর।"

সিংহ বলিল,—"ক্ষান্ত হও। আমার কথা শোন। আমি তোমার কন্যার নিকট হইতে আসিতেছি।"

তাহাদিগের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া কমলার মাতা ভীত হইয়া উঠিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পারিলেন না, আবার শুইয়া পড়িলেন।

কমলার পিতা সেইরূপ অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"কি সংবাদ বল? অনেক দিন তাহার কোন সত্য সংবাদ পাই নাই,—নানা লোকে নানা কথা বলে।"

সিংহ। তিনি সে দেশের দেবীরূপে খুব সমাদরে ও সুখে আছেন।

ক-পিতা। ছাই সুখ! সেই অসভ্যদিগের মধ্যে একা বাস করা কি দ্বীপান্তর-বাসের চেয়েও কষ্টকর নয়?

সিংহ। হাঁ, এতদিন একাই ছিল বটে, এখন একটি সঙ্গী যুটিয়াছে।

ক-পিতা। সে দেশে সঙ্গী! কে সঙ্গী?

সিংহ। না না সে দেশের লোক নয়। সে বাঙ্গালী; সবে মাত্র কয় দিন বণিক্‌বেশে সেখানে গমন করিয়াছে। সে তাহার ছদ্মবেশ—বোধ হয় কমলার সহিত তাহার পরিচয় আছে।

কমলার পিতা স্ত্রীর দিকে চাহিলেন। ভীত-চকিত নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কমলার মাতা বলিলেন,—"আমি সেদিন স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়াছিলাম। কমলা যাহার কথা বলিয়াছিল, সে সেই গোলোক-নাথ। তাহারা উভয়ে উভয়ের জন্য জন্মিয়াছে। দুইটী একত্র না হইলে পূর্ণ হইবে না! এখন আমি নিশ্চিন্ত মনে মরিতে পারিব।"

কমলার পিতা সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"তাহারা এখন কোথায়?" তাহারা কি এখানে আসিতেছে?

সিংহ বলিল, "না না, তাহারা এখানে আসিবে কেন? রাজা তাহা-দিগকে এখানে আসিতে দিবে না। আপনাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইবার জন্য রাজার আজ্ঞা হইয়াছে, আমি লইতে আসিয়াছি।"

কমলার পিতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলি-লেন,—"অসম্ভব!"

সিংহ কর্কশকণ্ঠে কহিল,—"সম্ভব হউক আর অসম্ভব হউক—রাজার আদেশ যাইতেই হইবে। দু'দণ্ডের মধ্যে প্রস্তুত হউন, নতুবা এ সৈন্যগণ বৃথা আসে নাই।"

ক্রুদ্ধস্বরে কমলার পিতা বলিলেন,—"এ অবস্থায় ইনি কি প্রকারে যাইবেন?"

সিংহ ব্যঙ্গস্বরে বলিল,—"তা জানি না। এখনই প্রস্তুত হউন, নতুবা উহাঁকে কম্বলে জড়াইতে আদেশ করিব।"

কমলার পিতা হাতের বন্দুক উর্দ্ধে তুলিয়া অতিশয় রোষ-কর্কশস্বরে বলিলেন,—"যে ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আসিবে, তাহাকে গুলি করিব।"

সিংহ সে কথায় কর্ণপাতও করিল না। সে সৈন্যদিগের পানে চাহিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—"রাজার আদেশ, ঐ যাদুকরকে বাঁধিয়া লও, আর ঐ রুগ্না রমণীকে মাদুরে জড়াইয়া তুলিয়া লও।"

ঘোর অসভ্য হইলেও তাহারা মানুষ। সিংহের দৃঢ় আদেশ পাইলেও কমলার মাতার মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে তাহারা সক্ষম হইল না, নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সিংহ রাগিয়া উঠিল। সৈন্যগণের উপরে গালিবর্ষণ করিতে লাগিল, এবং রাজাদেশ অমান্য করিবার শাস্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিল।

সৈন্যগণ উত্তেজিত হইয়া মুমূর্ষুর শয্যার নিকটে গমন করিল।

কমলার মাতা চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বসিতে চেষ্টা করিলেন,—পারিলেন না, অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল।

পত্নীর এই নৃশংস-ভাবে মৃত্যু দেখিয়া প্রাচীন ধীর স্থির শান্ত ও বৈষ্ণবের প্রাণও ক্রোধে অধীর হইল। এতক্ষণও নরহত্যা হইবে ভাবিয়া তিনি বন্দুক ছুড়িতে পারেন নাই, ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া এবার বন্দুক ছুড়িলেন,—অনল-গুলি একজন সৈন্যের ললাট ভেদ করিল, সে চীৎকার করিয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। সিংহের আদেশে আর কয়জন লাফ দিয়া বৃদ্ধকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি সিংহকে লক্ষ্য করিয়া তন্মুহূর্ত্তে গুলি ছুড়িলেন, গুলি সিংহের কর্ণের পার্শ্ব দিয়া গিয়া একজন সৈন্যের বক্ষোভেদ করিল,—সে পড়িয়া গেল। ক্রোধে একজন সৈন্য বর্শাফলকে বৃদ্ধের বক্ষোদেশ ভেদ করিল মৃতা স্ত্রীর বক্ষের উপর পড়িয়া কমলার পিতা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ সিংহ ও সৈন্যগণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একজন সৈন্য বলিল,—"যাহাদিগকে লইতে আসিয়াছিলাম, তাহারাত মরিয়া গেল, এখন আমরা কি করিব?"

সিংহ বলিল,—"তোমরা দেশে যাও।"

সৈন্য। তুমি?

সিংহ। ইহারা তোমাদের দেবীর পিতামাতা,—ইহাদিগকে নিহত করিয়া সেখানে গেলে আমার দশা কি হইবে, ভাবিয়া দেখিতেছ না?

সৈন্য। আর আমাদের?

সিংহ। তা' আমি বলিতে পারি না। যদি পথে তোমাদের দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সব কথা বলিয়ো।

সৈন্য। সে আর আমাদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে না। যে কয়-দিন দেবী এ সব কথা শুনিতে না পান, সেই কয়দিন সুখে মস্তক লইয়া ঘোর।

সৈন্যগণ চলিয়া যাইতেছিল,—আহত সৈন্য কাতরস্বরে বলিল,—"আমাকে ফেলিয়া চলিলে?"

একজন তাহার দিকে ফিরিয়া তাঁহার ক্ষত পরীক্ষা করিল। তারপরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না ভাই, কোন আশা নাই। এমন কষ্ট পাওয়ার চেয়ে তোমার হাতে বর্শা আছে, কোথায় মারিতে হয় তাও জান, হাতেও এখন বল আছে। যাহা করিতে হয়, শীঘ্র করিয়া ফেল, তোমার ছেলেকে যাহা বলিতে বলিয়াছ, তাহা ভুলি নাই,—নিশ্চয় বলিব।"

তারপর তাহারা চলিয়া গেল। আহত সৈনিক বর্শা তুলিয়া হৃদয়ে বিদ্ধ করিল, তীরবেগে রক্ত ছুটিল,—সে চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিল।

সিংহ ত্বরিতপদে বাহিরে গমন করিল। চারিদিক্ জনশূন্য—সন্ধ্যার অন্ধকার দিকে দিকে ঘনাইয়া বসিয়াছে!

সিংহ এক স্থানে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতেছিল। হঠাৎ তাহার বোধ হইল, কমলার পিতা তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি যেন সিংহকে অভিসম্পাত করিবার জন্য হস্ত উত্তোলন করিয়া আছেন। তাঁহার আরক্ত চক্ষুদ্বয়, ভ্রূকুটী-কুটীল আনন—যেন ক্রোধের পূর্ণমূর্ত্তি! সিংহের ভয় হইল, থর থর করিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল,—সে দৌড়িয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

সে একটা বৃক্ষের মূলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ চিন্তার পরে সে প্রকৃতিস্থ হইল। তাহার মনে হইল, রাজার পত্র সৈন্যগণ অবগত আছে,—বিদেশী বণিককে ধৃত করিবার আদেশপত্র আমার নিকটে আছে। কমলার সঙ্গে যে সকল সৈন্য আছে, তাহারাও রাজার—রাজার পত্র দেখিলে

বাধা দিবে না। আমি তাহাকে ধৃত করিব, তারপরে নিহত করিব—তখন কমলা একা! একা আমার কি করিতে পারিবে? ক্রমে বশীভূতা হইয়া পড়িবে।

সে বংশীধ্বনি করিল, যে সকল সৈন্য বাহিরে ছিল, তাহারা আগমন করিল।

সিংহ বলিল, "তোমরা বনের মধ্যে লুক্কায়িত থাক, প্রয়োজন হইলে ডাকিব।"

একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"যে কাজে আসা হইয়াছে, তাহার কি হইল?"

সিংহ। তাহারা উভয়েই মারা পড়িয়াছে।

সৈন্য। কি সর্ব্বনাশ! ভাগ্যে তুমি নির্দ্দোষ। নতুবা দেবীর ক্রোধে তুমি ভস্ম হইয়া যাইতে। কিন্তু এখন তবে আমরা এখানে থাকিয়া কি করিব?

সিংহ। তোমাদের দেবী এখানে আসিতেছেন, তাঁহাকে রক্ষা করিতে হইবে।

সৈন্য। সে কি! তিনি নিজে অনন্ত ক্ষমতা-শালিনী, তাঁহার সঙ্গে হাজার হাজার সৈন্যও আছে,—আমরা কেন থাকিব?

সিংহ। আছে,—বিশেষ প্রয়োজন আছে। যখন জানিবে, তখন বুঝিতে পারিবে। এখন যাও, লুক্কায়িতভাবে থাকগে। রাজাদেশে তোমরা এখন আমার অধীন,—আমি যাহা বলিব, তাহাই শুনিবে।

সৈন্যগণ জঙ্গলের মধ্যে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

চক্ষুলজ্জা।

নেড়ে দাড়ি চরণ জুড়ি চালিয়ে সজোরে।
সাকরেৎ নিয়ে হকিম সাহেব যাচ্চেন রোজগারে॥
সকল রোগে ধন্বন্তরী পল্লীজুড়ে নাম।
পসার ভারি রোগীর বাড়ী সবাই দেয় সেলাম॥
এমন দাওয়াই রোগী খাওয়াই ইস্তমাল করে।
একেবারে রোগ সারে গোরের ভিতরে॥
বাঁকাউল্লা বড় হকিম পীর প্যাগম্বর।
সবার মুখে এই কথা বিধান দেন জবর॥
ডাকলেই বলে নিদেনকালে কেন ডাক মোরে।
দিলাম দাওয়াই বাঁচতে পারে নসীবের জোরে॥
পুঁজিপাটা বড়িগুলি লাল আর কাল।
যখন যেমন ভাল বোঝেন ব্যবস্থা সরল॥
বাঁচ যদি সুনাম গাবে মর ক্ষতি নাই।
দাওয়াই নিয়ে হাতে হাতে দাম চুকান চাই॥
সাকরেৎ নিয়ে হকিম সাহেব পথে আনমনে।
ভুলক্রমে হঠাৎ এসে পড়লেন গোরস্থানে॥
গোরস্থান দেখে তাঁর ভ্রম ভেঙ্গে গেল।
অমনি রুমাল লয়ে মুখে ঢাকা দিল॥
সাকরেৎ এরূপ দেখি কারণ জিজ্ঞাসে।
হকিম সাহেব কহেন ধীরে তাহার সকাশে॥
"শুন বাবা কোন লজ্জা নাহিক আমার।
চক্ষুলজ্জা হ'তে কিন্তু না পেনু নিস্তার॥
দেখ এই গোরস্থানে যত মৃত আছে।
আমার দাওয়াই গুণে অনেকে এসেছে॥
নেমক হালাল আমি হারামতো নই।
পেটত চলেনি বাবা তাদের অর্থ বই॥
সেই হেতু এ সময় ব্যথিত অন্তরে।
রুমালে ঢেকেছি চক্ষু লজ্জার খাতিরে॥

শ্রীননীলাল সুর।

আহোমদিগের বিবাহ-প্রথা।

আহোমদিগের বিবাহপ্রথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আহোমদিগের সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা এস্থানে বলা আবশ্যক। আহোমগণ আসামবাসী হইলেও প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বে আসামে তাহাদের নাম গন্ধও ছিল না। ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত "পঙ্" নামক রাজ্য আহোমদিগের প্রাচীন বাসস্থান। তাহারা ব্রহ্মদেশের বর্ত্তমান "শান জাতির" অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৃহবিবাদ হওয়ায় তাহারা পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ করে ও পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া কিছুদিন "পাটকৈ" পর্ব্বতে বাস করে, পরে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসামে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের সঙ্গে তাহাদের রাজা চুকাফাও আসিয়াছিলেন। আহোমদিগের বর্ত্তমান বাসস্থান শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর জেলার দক্ষিণাংশে। কালক্রমে আহোমগণ আসাম অধিকার করিলে একে একে অনেকগুলি আহোমবংশীয় রাজা আসামে রাজত্ব করেন। আহোমগণ যখন আসাম প্রদেশ জয় করে, তখন তাহাদের রীতি নীতি, ধর্ম্ম এবং ভাষা হিন্দুদিগের রীতি নীতি, ধর্ম্ম এবং ভাষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। কিন্তু কালক্রমে আহোমগণ হিন্দু রীতি নীতি, ও ভাষা এমন কি ধর্ম্ম পর্য্যন্তও গ্রহণ করে। সুতরাং বর্ত্তমানে তাহাদের সকলেই খাঁটী হিন্দু (১) এবং হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহাদের সমস্ত ব্রত নিয়মাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। কেবলমাত্র তাহাদের বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুসারে হয় না, এই বিষয়ে তাহারা তাহাদের প্রাচীন নিয়মাদিই রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। তথাপি অনেকের মধ্যে বিবাহের আনুসঙ্গিক কতগুলি ক্রিয়া যথাসম্ভব হিন্দুদিগের মতই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আহোমদিগের ঔদ্বাহিকক্রিয়া অত্যন্ত সাদাসিধা ধরণের ও এরূপ গোপনভাবে সম্পন্ন হয় যে, ভিন্ন জাতীয় লোক যাহাতে দেখিতে না পারে। বিবাহ দিনের বেলায় সম্পন্ন হয়। পুত্র কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ পিতা মাতাই স্থির করেন। আহোমদিগের মধ্যে বিবাহের পাত্রী স্থির করিবার নিয়ম এই—বরের পিতা বা অভিভাবক কন্যার পিতা বা অভিভাবকের নিকট বস্ত্রাচ্ছাদিত সাতটী 'টুয়ের' মধ্যে সুপারী প্রেরণ করেন। বালিকার

(১) কিন্তু বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে তাহারা আহোম জাতিই লিখিয়া থাকেন।

অভিভাবকগণ যদি অনুরোধ রক্ষা করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে উভয় পক্ষীয় সমাগত ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে সম্মতি প্রদানেরচিহ্ন স্বরূপ ট্রেয় সাতটীর আবরণ উন্মুক্ত করেন। ইহাতেই বালিকার বিবাহার্থ সম্বন্ধ-বিধান হইয়া থাকে। এই অনুষ্ঠান সর্ব্বত্র অপরিহার্য্য নহে ; কোন কোন স্থলে ইহা ব্যতীতও বালিকাদের বাগ্দান হইয়া থাকে।

ঔদ্বাহিক উৎসব বিবাহের দিনের নয়, সাত, পাঁচ অথবা তিনদিন পূর্ব্ব হইতেই আরম্ভ হয়। উল্লিখিত কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে পাত্রের অভিভাবকগণ কন্যার বাড়ীতে কাপড়, অলঙ্কার, দধি খই প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য তৈল সিন্দূর এবং মাটীর কলসীতে আরও দুই কলসী ঘোল প্রেরণ করেন। পাত্রপক্ষের অনেক স্ত্রী পুরুষ এই সমস্ত দ্রব্যবাহকদিগের সঙ্গে ক'নের বাড়ীতে অনুগমন করিয়া থাকেন। তাহারা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলে কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিত মহিলাগণ কাপড় এবং অলঙ্কারগুলি ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া লন। এবং কন্যাকে তথায় আনয়ন করিয়া কাপড় এবং অলঙ্কারগুলি তাহাকে পরাইয়া দেন ও অল্প একটু সিন্দূর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া হুলুধ্বনির সঙ্গে কপালে ফোঁটা দেন। এই অনুষ্ঠানে পুরুষগণ অনুপস্থিত থাকেন। খাদ্য দ্রব্যগুলি সমাগত উভয় পক্ষীয় স্ত্রী পুরুষ সকলকে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দুই কলসী ঘোলের একটী কন্যাপক্ষকে প্রদান করা হয়। অপরটী কন্যা স্পর্শ করিলে পাত্রপক্ষের বাড়ীতে ফিরাইয়া লওয়া হয়। এই উৎসবের পরে বিবাহের পূর্ব্বে উল্লেখযোগ্য আর কোন উৎসব নাই। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ ও অধিবাস ব্যতীত বিবাহের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের মতই কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ড হইয়া থাকে। নান্দীমুখ ও অধিবাসের কথা তাহাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত হয় নাই।

বিবাহের দিবস বর, কন্যার বাড়ীতে পৌঁছিলে তাহাকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে বর কন্যাকে একত্র উপবেশন করাইয়া তাহাদের সম্মুখে দুইটি আবৃত ট্রেয় স্থাপন করে। প্রত্যেক ট্রেয়ের আচ্ছাদনের ভিতরে এক বাটী মিষ্টান্ন, কিছু সুপারী ও একগাছি কুশ থাকে। ট্রেয়ের আচ্ছাদন সরাইয়া বর তাহার পুরোহিতের আদেশ মত মিষ্টান্নের বাটী গ্রহণ করিয়া কন্যার সম্মুখে রাখে। কন্যাও তাহার পুরোহিতের আদেশ মত অপর ট্রেয় হইতে মিষ্টান্নের বাটী বরের সম্মুখে স্থাপন করে। বর বাটী হইতে কিছু মিষ্টান্ন লইয়া কন্যার মুখে দেয় এবং কন্যাও কিছু মিষ্টান্ন লইয়া বরের মুখে

প্রদান করে। পরে হাত ধুইয়া সুপারীও এইরূপ আদান প্রদান করিয়া থাকে। এই কার্য্য সমাধা হইলে পুরোহিত বর কন্যার বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় কুশদ্বারা বন্ধন করিয়া পুনরায় খুলিয়া ফেলেন। ইহার পর বরপক্ষীয়গণ কন্যাপক্ষীয়-গণকে এবং কন্যাপক্ষীয়গণ বরপক্ষীয়গণকে একটী অঙ্গুরী পুষ্পহার এবং একটী ছুরিকা প্রদান করেন। পরে কন্যাপক্ষীয়গণ একটী বাটীতে কতগুলি চাউল ও তন্মধ্যে একটী কুশ-নির্ম্মিত অঙ্গুরী লুকাইয়া রাখিয়া বরকে প্রদান করে। বর চাউলের ভিতর হইতে অঙ্গুরীটি বাহির করিয়া পুনরায় চাউলের ভিতর রাখিয়া কন্যাকে প্রদান করে; কন্যাও চাউল হইতে অঙ্গুরীটী বাহির করিয়া বরের অঙ্গুলিতে পরাইয়া দেয়। ইহার পর কন্যাপক্ষের কোনও জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তি স্বামী স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলে বিবাহ শেষ হয়। বিবাহের পরেই বধূ শ্বশুরগৃহে গমন করে। উল্লিখিত ঔদ্বাহিক উৎসবের নাম "শাকলং" উৎসব।

বিবাহের পর বরপক্ষ হইতে একটী ভোজ প্রদান করিবার প্রথা আছে, ইহার নাম "অথমঙ্গল-ভোজ।" প্রধানতঃ সম্ভ্রান্ত আহোমগণই এই ভোজ প্রদান করেন। নিম্ন জাতীয় আহোমদিগের মধ্যে এই প্রথা বিরল। কিন্তু "শাকলং উৎসব" সকলের মধ্যেই একরূপ।

আহোমগণ মেয়ে বয়স্থা না হইলে বিবাহ দেয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া ছেলেকেও অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতে হয়। আহোমদিগের মধ্যে অনেকে এইরূপ স্থির করিয়াছেন যে, সম্প্রদান ব্যতীত কেবল "শাকলং" উৎসব দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। যাহারা এখন সম্প্র-দানের পর "শাকলং" উৎসব করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে অধিবাস ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধও হইয়া থাকে। যদিও আহোমগণ বিবাহের পর হোমের প্রথাটা অত্যাবশ্যকীয় বলিয়া মনে করেন, তথাপি উহা এখনও গৃহীত হয় নাই।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী।

শৌচাচার।

অনেকের মতে বাহিরে মানুষ যেমন আচারই করুক, তাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না, চিত্তশুদ্ধিই ধর্ম্মের মূল। কথাটা বাস্তবিক সঙ্গত নহে। বহিঃশুচি ব্যতীত অন্তঃশুদ্ধি হইতে পারে না। তাই শাস্ত্রে শৌচাচারের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্র বলেন—

শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যঃ শৌচমূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচার বিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ॥—দক্ষসংহিতা।

শৌচবিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন করিবে, যে হেতু শৌচই দ্বিজত্বের মূল। শৌচাচার বিহীন ব্যক্তির সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল॥

শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরস্তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরং॥—দক্ষসংহিতা।

শৌচ দ্বিবিধ,—বাহ্য শৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ, মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা যে শৌচ তাহাকে বাহ্য শৌচ বলে, আর ভাবশুদ্ধি রূপ যে শৌচ তাহাকে আন্তর শৌচ বলে।

বলা বাহুল্য, চিত্তশুদ্ধি এই আন্তর শুচির অপর।

অশৌচাদ্ধি বরং বাহ্যং তস্মাদাভ্যন্তরং বরং।
উভাভ্যাঞ্চ শুচির্যস্তু স শুচির্নেতরঃ শুচিঃ॥—দক্ষসংহিতা।

অশুচি অপেক্ষা বাহ্য শুচি ভাল, বাহ্য শুচি অপেক্ষা আন্তর শুচি ভাল; কিন্তু উভয় বিধ শৌচাচারী ব্যক্তিই যথার্থ শুচি,—নচেৎ শুচি মধ্যে গণ্য নহে।

বসা-শুক্রমসৃঙ্মজ্জা মূত্রবিট্ কর্ণবিন্নখাঃ।
শ্লেষ্মাস্থি-দূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃনাং মলাঃ॥—অত্রিসংহিতা।

বসা (মাংস তৈল), শুক্র, অসৃক (রক্ত), মজ্জা (অস্থি মধ্যগত ধাতু), মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল, নখমল, শ্লেষ্মা, অস্থি, নেত্রমল ও ঘর্ম্ম মনুষ্যের এই দ্বাদশ-বিধ শারীরিক মল আছে।

অত্যন্ত মলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্র সমন্বিতঃ।
স্রবত্যেষ দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানং বিশোধনং॥—দং সং।

নবছিদ্র বিশিষ্ট মানবদেহ অত্যন্ত মলিন। দিবসে—বিশেষতঃ রাত্রিকালে ঐ সকল মল নিঃসৃত হয়, তৎসমুদয় প্রাতঃস্নান দ্বারা বিশোধিত হইয়া থাকে।

প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টপরং হি তৎ।
সর্ব্বমর্হন্তি পূতাত্মা প্রাতঃস্নায়ী জপাদিকং ॥—দক্ষসংহিতা।

প্রাতঃস্নান প্রশংসনীয়,—কেন না, ইহা দৃষ্ট ও অদৃষ্ট উভয়বিধ ফলদান করে। প্রাতঃস্নায়ী শুদ্ধাত্মা মানব জপাদি সমস্ত কর্ম্মেই অধিকারী হয়েন।

গুণা দশ স্নানপরস্য সাধো রূপঞ্চ পুষ্টিশ্চ বলঞ্চ তেজঃ।
আরোগ্যমায়ুশ্চ মনো বিরুদ্ধং দুঃস্বপ্নঘাতশ্চ তপশ্চ মেধাঃ॥
দক্ষসংহিতা।

হে সাধো! স্নানবিষয়ে তৎপর ব্যক্তির রূপ, পুষ্টি, বল, তেজঃ, আরোগ্য, আয়ুঃ, মনঃ, স্থৈর্য্য, দুঃস্বপ্ননাশ, তপস্যা ও মেধা এই দশটি গুণ লাভ হয়।

উষস্যুষসি যৎ স্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতে রবৌ।
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনং ॥—গরুড় পুরাণ।

প্রতিদিন উষাকালে, সন্ধ্যাসময়ে ও সূর্য্যোদয় কালে স্নান করিলে প্রাজাপত্যের তুল্য ফল হয় এবং মহাপাতক বিনাশ পায়।

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ক্রিয়াঙ্গং মলকর্ষণং।
মার্জ্জনাচামাবগাহাশ্চাষ্ট স্নানং প্রকীর্ত্তিতং ॥—গরুড় পুরাণ

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ক্রিয়াঙ্গ, মলাপকর্ষণ, মার্জ্জন, আচমন এবং অবগাহন এই অষ্ট প্রকার স্নান কথিত আছে।

অস্নাতস্তু পুমান্নার্হো জপাগ্নিহবনাদিষু।
প্রাতঃস্নানং তদর্থন্তু নিত্যস্নানং প্রকীর্ত্তিতং ॥

অস্নাত ব্যক্তি জপপূজাদি কার্য্যে অনধিকারী,—অতএব প্রাতঃস্নান করা বিধেয়। ইহাকেই নিত্যস্নান বলে।

চাণ্ডালশববিষ্ঠাদীন্ স্পৃষ্ট্বা স্নানং রজস্বলাং।
স্নানার্হস্তু যদা স্নাতি স্নানং নৈমিত্তিকং হি তৎ ॥—গরুড় পুরাণ।

চণ্ডাল, শব, বিষ্ঠাদি অশুচি দ্রব্য ও রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়; ইহাকেই নৈমিত্তিক স্নান বলে।

পুষ্যস্নানাদিকং স্নানং দৈবজ্ঞ-বিধিচোদিতং।
তদ্ধি কাম্যং সমুদ্দিষ্টং নাকামস্তৎ প্রযোজয়েৎ ॥—গরুড় পুরাণ।

দৈবজ্ঞেরা যে নক্ষত্রযোগে ফলাধিক্য প্রযুক্ত স্নানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, সেই সকল যোগ-স্নানকে কাম্যস্নান বলে। নিষ্কামী ব্যক্তিগণ এই কাম্য-স্নান করিবে না।

জপ্তু কামঃ পবিত্রাণি অর্চ্চিষ্যন্ দেবতাতিথীন্।
স্নানং সমাচরেদ্যত্তু ক্রিয়াঙ্গং তচ্চ কীর্ত্তিতং ॥—গরুড় পুরাণ।

জপহোমাদি করিবার জন্য কিম্বা দেবতা ও অতিথিপূজনার্থ যে শুদ্ধি স্নান করে, তাহাকে ক্রিয়াঙ্গ স্নান বলে।

স্নানমেব ক্রিয়া যস্মাৎ ক্রিয়া স্নানমতঃ পরং।
অদ্ভির্গাত্রাণি শুদ্ধ্যন্তি তীর্থস্নানাৎ ফলং লভেৎ ॥—গরুড় পুরাণ।

কেবল স্নানমাত্রই যাহার উদ্দেশ্য, তাহাকেই ক্রিয়া স্নান বলে। কেবল জলাবগাহনে শুদ্ধি বোধ হইলে, তীর্থস্নানের ফল লাভ হইয়া থাকে।

মার্জ্জনান্মজ্জনৈর্ম্মন্ত্রৈঃ পাপমাশু প্রণশ্যতি।
নিত্যং নৈমিত্তকঞ্চাপি ক্রিয়াঙ্গং মলকর্ষণং।
তীর্থাভাবে তু কর্ত্তব্যমুষ্ণোদকপরোদকৈঃ ॥—গরুড়পুরাণ।

স্নানকালে মার্জ্জন, মজ্জন ও মন্ত্র পাঠ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ বিনষ্ট হয়। নিত্য, নৈমিত্তিক, ক্রিয়াঙ্গ ও মলাপকর্ষণ এই সকল স্নানকালে তীর্থাদির অভাব হইলে উষ্ণোদক দ্বারা অথবা অপর কোনরূপ পুষ্করিণী প্রভৃতির জলে স্নান করিতে হইবে।

পঞ্চপিণ্ডাননুদ্ধৃত্য ন স্নায়াৎ পরবারিষু।
স্নায়ান্নদী- দবখাত-হ্রদ-প্রস্রবণেষু চ ॥—যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

যে জলাশয় সর্ব্বপ্রাণীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় নাই, (উৎসর্গ হয় নাই) তাহাতে স্নান করিতে হইলে পঞ্চপিণ্ড মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া তবে স্নান করিবে। * নদী, দেবখাত (দেবনির্ম্মিত জলাশয় যেমন পুষ্করাদি নদ), হ্রদ, পার্ব্বতীয় প্রস্রবণ এই সকলে সকলেরই অধিকার আছে, উহাতে স্নান করিতে মৃত্তিকা উদ্ধার করিতে হয় না।

ভূমিষ্ঠাদুদ্ধৃতং পুণ্যং ততঃ প্রস্রবণাদিকং।
ততোপি সারসং পুণ্যং তস্মান্নাদেয় মুচ্যতে ॥—গরুড়পুরাণ।

ভূমিগত জল হইতে উদ্ধৃত জল পবিত্র, উদ্ধৃত জল হইতে প্রস্রবণ জল, প্রস্রবণ জল হইতে সরোবরের জল, সরোবর জল হইতে নদীজল, নদী-

* উদ্দেশ্য, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় লোকে অর্থব্যয় করিয়া কাটাইয়া যদি সর্ব্ব-ভূতোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া না দেয়, তবে তাহাতে অপরের অধিকার হয় না, স্নান করিতে হইলে, পঞ্চপিণ্ড মৃত্তিকা তুলিয়া দিয়া তাহার একটু কাজ করিয়া তবে স্নান করিতে হয়।

জল হইতে তীর্থজল, এবং সর্ব্বপ্রকার তীর্থজলের মধ্যে গঙ্গাজলই পবিত্র। গঙ্গাজল মরণান্তিক পাপ বিনাশ করে।

গয়ায়াঞ্চ কুরুক্ষেত্রে যত্তোয়ং সমুপস্থিতং।
তস্মাত্তু গাঙ্গমপরং জানীয়াত্তোয়মুত্তমং॥—গরুড়পুরাণ।

গয়া এবং কুরুক্ষেত্রে যে জল বিদ্যমান আছে, তাহা হইতেও গঙ্গাজল উত্তম বলিয়া জানিবে।

পুত্রজন্মনি যোগেষু তথা সংক্রমণে রবেঃ।
রাহোশ্চ দর্শনে স্নানং প্রশস্তং নিশি নান্যথা॥—গরুড়পুরাণ।

পুত্রজন্মকালে, যোগসময়ে, রবিসংক্রমণকালে, রাহু-দর্শনে অর্থাৎ চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণকালে, রাত্রিকালে স্নান প্রশস্ত ;—এতদন্যথায় রাত্রিকালে যে স্নান, তাহা স্নানই নহে।

মৃত্তিকানাং সহস্রেষু চোদকুম্ভশতেন চ।
ন শুধ্যন্তি দুরাত্মানো যেষাং ভাবো ন নির্ম্মলঃ॥—দক্ষসংহিতা।

যাহাদিগের ভাব বা অন্তর নির্ম্মল নহে, সেই দুরাত্মব্যক্তিগণ সহস্রভার মৃত্তিকা শতকুম্ভ জলেও শুদ্ধ হয় না।

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যা-তপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥—মনুসংহিতা।

অবগাহন দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্য বাক্য দ্বারা মন, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্মা এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

আত্মা নদী সংযমপুণ্যতীর্থা সত্যোদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র ন বারিণা শুধ্যতি চান্তরাত্মা॥—মহাভারত।

আত্মা নদী স্বরূপ, ইন্দ্রিয়-সংযম পুণ্যতীর্থ স্বরূপ, সত্য উদক স্বরূপ, শীল তট স্বরূপ এবং দয়া উর্ম্মি স্বরূপ,—হে পাণ্ডুপুত্র, সেই নদীতেই অভিষেক কর,—জলেতে অন্তরাত্মা শুদ্ধ হয় না।

মৃত্তোয়ৈঃ শুধ্যতে শোধ্যং নদী বেগেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা সংন্যাসেন দ্বিজোত্তমঃ॥—মনুসংহিতা।

মলিন বস্তু সকল মৃত্তিকা ও জলের দ্বারা শুদ্ধ হয়, নদী স্রোতের দ্বারা শুদ্ধ হয়, স্ত্রীলোক যদি কচিৎ মনোদ্বারা অন্য পুরুষাকাঙ্ক্ষিণী হয়, তবে ঋতুস্নান দ্বারা শুদ্ধ হয় এবং ব্রাহ্মণ যে কোন পাপাচরণ করিলে সংন্যাস দ্বারা শুদ্ধ হয়।

আসনং বসনং পাত্রং শয্যাং যানং নিকেতনং।

গৃহকং বস্তুজাতঞ্চ স্বচ্ছাৎ স্বচ্ছং প্রশস্যতে ॥—মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

আসন, বসন, পাত্র, শয্যা, যান, গৃহ, গৃহসামগ্রী এই সমুদয় যত পরিষ্কার হইবে, তত প্রশস্ত।

তাম্রায়ঃ কাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।

শৌচং যথার্হং কর্ত্তব্যং ক্ষারাম্লোদকবারিভিঃ ॥—মনুসংহিতা।

তাম্র, লৌহ, কাংস্য, পিত্তল, রঙ্গ ও সীসা, ইহারা ভস্মজল অম্লজল ও জলদ্বারা যথাক্রমে শুদ্ধ হয়, অর্থাৎ তাম্র ও পিত্তল অম্লোদ্বারা, লৌহ জল দ্বারা কাংস্য, রাং ও সীসা ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয়।

প্রোক্ষণাত্তৃণকাষ্ঠঞ্চ পলালঞ্চৈব শুধ্যতি।

মার্জ্জনোপাঞ্জনৈর্বেশ্ম পুনঃ পাকেন মৃণ্ময়ং ॥—মনুসংহিতা।

তৃণ, কাষ্ঠ ও পলাল (খড়) জল সেচন দ্বারা, গৃহ, মার্জ্জন ও গোময়াদি বিলেপন দ্বারা এবং মৃণ্ময়পাত্র পুনঃ পাক দ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

ফলন্তু ক্ষালনাৎ শুধ্যেৎ গোময়েন গৃহন্তথা।

ক্ষারযোগেন বস্ত্রঞ্চ দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি ॥—স্মৃতি।

ফল প্রক্ষালন করিলে শুদ্ধ হয়, গৃহ গোময়ের দ্বারা শুদ্ধ হয়, বস্ত্র ক্ষার-যোগে শুদ্ধ হয় এবং অন্যান্য দ্রব্য সকল মূল্য দানেই শুদ্ধ হয়।

মার্জ্জার-মক্ষিকাকীট-পতঙ্গ-কৃমিদর্দ্দুরাঃ।

মেধ্যামেধ্যং স্পৃশন্ত্যেব নোচ্ছিষ্টান্ মনুরব্রবীৎ ॥

পরাশর সংহিতা।

মার্জ্জার, মক্ষিকা, কীট, পতঙ্গ, কৃমি ও ভেক ইহারা সর্ব্বদাই পবিত্র ও অপবিত্র দ্রব্য সকল স্পর্শ করিয়া থাকে, সুতরাং ইহাদের দ্বারা কোন বস্তুই অস্পৃশ্য হয় না—মনুও একথা স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীঃ——

প্রাক্তন।

ললিতা গরিবের মেয়ে, তাহার পিতা শ্রীরামচন্দ্র বসু জেনারেল পোষ্টাফিসে ৩০৲ টাকা বেতনে কাজ করেন। আয় সামান্য, পোষ্য অনেকগুলি; কিন্তু বুদ্ধিমতী অন্নপূর্ণার বুদ্ধিতে স্বল্প আয়েও কেহ কখনও তাহাদের সংসারে কোনরূপ অনাটন দেখে নাই। এই স্বল্প আয়ে যদিও সংসার শান্তিপূর্ণ ছিল, কিন্তু এ সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কেন না—ললিতা দ্বাদশ উত্তীর্ণ হইয়া ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। তার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুখময় শান্তি-নিকেতনে অশান্তির ছায়া দেখা দিল, এবার অন্নপূর্ণা—সহসা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন; সঙ্গে সঙ্গে মানসিক বল হারাইলেন, তিনি সারা জগৎ অন্ধকারময় দেখিলেন। যখনই সময় পান অন্নপূর্ণা স্বামীর নিকটে ললিতার বিবাহের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র বসু মহাশয়ের যে স্বল্প আয় তাহা সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। তিনি এক পয়সা সঞ্চয় করিতে পারেন নাই,—সুখময় শান্তি-নিকেতনে শান্তিপূর্ণ-হৃদয়ে এতকাল সংসারের আতপত্রছায়ে অতিবাহিত করিলেন, একটী দিনের জন্য লোকে তাঁহার-হাসিমুখ বিমর্ষ দেখে নাই; আজ অন্নপূর্ণার একটী কথায় তিনি চমকিত হইয়া দেখিলেন—কত ঝড় ঝঞ্ঝাবাত তাহার মস্তকের উপর দিয়া বহিতেছে, ভাবনায় আহার কমিল,—নিদ্রা ভয়ে পলায়ন করিল,—তাহার সেই সৌম্য-শান্ত-ভাব তাহার সেই সস্মিত আননে বিষাদ-রেখা পতিত হইল।

অনেক অনুসন্ধানে যদিও একটী পাত্র মিলিল,—কিন্তু সামর্থ্যে তাহা কুলায় না। বরপক্ষের লোকের অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া, কিছু কমে রাজী করিলেন, কিন্তু টাকা কোথায়? অন্নপূর্ণার গাত্রে তিনি একখানিও অলঙ্কার এ তাবৎ দিতে পারেন নাই, যদি তাহা থাকিত তাহা হইলে বিক্রয় করিয়া কোনরূপে তিনি ললিতার বিবাহ দিতেন—কিন্তু তাহা নাই! কি হবে?

আর কোনরূপ উপায় না দেখিয়া পরিশেষে বাস্তুভিটা বাঁধা দিয়া সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন, ললিতার আজ গাত্রহরিদ্রা বাটীতে ধূম পড়িয়া গিয়াছে (সামান্য গৃহস্থের বাটীতে যেরূপ ধূমধাম হয় সেইরূপ) ললিতার সমবয়সীগণ তাহাকে লইয়া নানাপ্রকার হাস্য-পরিহাস করি-

তেছে—আর ললিতা তাহার সেই ঈষদারক্তিম সলজ্জ-বদনখানি লজ্জাবতী লতার ন্যায় নত করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরেই বরের বাটী হইতে গাত্র-হরিদ্রার দ্রব্যাদি আসিল—মেয়েরা ললিতাকে ফেলিয়া. সেই সব দ্রব্যাদি দেখিতে ছুটিয়া যাইল।

সন্ধ্যার ঘনান্ধকার যখন ধীরে ধীরে দিনের আলোর উপর পতিত হইয়া একটু একটু করিয়া হ্রাস করিতেছিল—তখন রামচন্দ্র বসুর বাটীর ছাদে ললিতা ও তাহার সমবয়সী শৈলবালা উভয়ে বেড়াইতেছে।

শৈল, ললিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সই আর কি আমাদের মনে থাকিবে ?"

ললিতার সেই ডাগর ডাগর চক্ষু দু'টি জলে পূর্ণ হইল. তাহার সেই পক্কবিম্ব-সম ওষ্ঠ দু'টি ঈষৎ কাঁপিল—ধরা ধরা গলায় বলিল "সাধ্য কি ?" দুইজনে বসিয়া কত সুখ দুঃখের কথা হইল, তারপর ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া যাইল।

আর অর্দ্ধ ঘণ্টা পর লগ্ন. ঐ সময় অতিক্রম হইয়া যাইলে ললিতাকে এক জনের সুখ দুঃখের সমান ভাগ লইতে হইবে। হঠাৎ বহির্দ্বারে কিসের কোলাহল উত্থিত হইল, সকলেই বহির্দ্বারের দিকে আকুল প্রাণে ছুটিল। অন্নপূর্ণার মনটা তখনই চঞ্চল হইয়া উঠিল, তিনিও ছুটিলেন, দেখিলেন যে, রামচন্দ্র বসু দুই হস্তে তাহার মস্তকের চুল ছিঁড়িতেছেন ও বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে "সর্ব্বনাশ হইল, জাতি গেল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন। অন্নপূর্ণা স্বামীর এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া চেতনাশূন্য হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ললিতা ও শৈলবালা নীচে আসিয়া অন্নপূর্ণার অবস্থা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামচন্দ্র বসুর চীৎকারে পাড়ার কেহ অগ্রসর হইলেন না ; হয়ত মনে করিতেছিলেন—যে, রামচন্দ্র যদি তাঁহাদের নিকটে কোন সাহায্য চায়। কিন্তু পৃথিবীর সকল লোক একপ্রকৃতির হয় না। রামচন্দ্রের আর্ত্তনাদ আর একজনের কর্ণে প্রবেশ করিল।

হরিহরপুরের জমীদার-পুত্র সুশীলকুমার এম এ, পরীক্ষা সন্নিকট দেখিয়া অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, হঠাৎ আর্ত্তনাদ শুনিয়া চমকিত হইলেন, তারপর পুস্তক রাখিয়া দ্রুতপদে রামচন্দ্রের বাটীতে প্রবেশ করিলেন। অনেকক্ষণ সান্ত্বনা প্রদান করিবার পর সুশীলকুমার অবগত হইলেন যে, রামচন্দ্রের কন্যার সহিত যাহার বিবাহ স্থির হইয়াছিল, তাঁহার পিতা এক মিথ্যা কলঙ্ক বাহির করিয়া, বিবাহ ভঙ্গ করিয়া পত্র দিয়াছেন। এক্ষণে কন্যার নান্দীমুখ হইয়া গিয়াছে, এত শীঘ্র তিনি অন্য পাত্র কোথায়

পাইবেন, অথচ আজ কন্যার বিবাহ দিতে না পারিলে সমাজচ্যুত হইবেন। সুশীলকুমার কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিলেন, পরে একবার রামচন্দ্রের অশ্রুসিক্ত মুখখানির দিকে চাহিলেন, হৃদয় সহানুভূতিতে গলিল।

সুশীলকুমার বলিলেন "আমি হরিহরপুরের জমিদার—শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র। এখানে এম এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, স্বভাবের সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে পারিলাম না, এরূপ পাত্রের হস্তে কন্যাদান করিতে আপনার ইচ্ছা আছে? রামচন্দ্র স্বর্গের চাঁদ হাতে পাইলেন,—সুশীলকুমারের দিকে বিস্মিত নয়নে চাহিয়া বলিলেন, তুমি আমার জাতি রাখিবে?

সুশীলকুমার দৃঢ়তার সহিত বলিল "হাঁ, আপনি অনুমতি করিলে আমি আপনার জাতি রাখিব।

এই বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া হরিহরপুরে পিতাকে সমস্ত ঘটনা জানাইয়া টেলিগ্রাফ করিলেন. আর সেই শুভদিনে মহেন্দ্রক্ষণে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে সুশীলকুমার ললিতার উপাস্য-দেবতা হইলেন।

পরদিন যথাসময়ে হরিহরপুর হইতে সুশীলকুমারের পিতা আসিয়া সমস্ত কথা শুনিয়া আনন্দে পুত্র ও পুত্রবধূ সঙ্গে হরিহরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সুশীলকুমারের মাতা বরণ করিবার সময় ললিতার সেই সুন্দর মুখখানি দেখিলেন, যৌতুকের পর সুশীলকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা এ রত্ন কোথায় পাইলে, আর কেমন করিয়া পাইলে?"

মাতার কথায় সুশীলকুমারের মুখ লজ্জায় অবনত হইল, ইঙ্গিতে ললাটে হস্ত প্রদান করিলেন।

মা বুঝিলেন "প্রাক্তন"।

শ্রীযামিনীচন্দ্র ঘোষ।

আবাহন।

এস বিশাল বিশ্বে নিঃস্ব জনের ভরসা ;
শঙ্কিত জনে শান্তি দানিতে
জুড়াইতে প্রাণ তরসা।

এস শান্তির ধারা ক্লান্তির মাঝে ঢালিতে ;
মানবচিত্তে শত আনন্দ
ঝরণার মত গলিতে।

এস পরের অশ্রুবিন্দুতে নিজে ভুলিয়া ;
সান্ত্বনাভরে অশ্রু মুছায়ে
আশ্বাস দিতে তুলিয়া।

এস পুণ্য সলিলে সিক্ত করিতে ধরণী ;
তোমার অতুল দীপ্তিতে হবে
উজ্জ্বল হেমবরণী।

এস অজ্ঞানতার গর্ব্ব করিতে চূর্ণ ;
দিব্য মধুর জ্ঞানের কিরণে
ধরণী করিতে পূর্ণ॥

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

আবেদরজা

শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত লাউড় নামক স্থানে আবেদরজা রাজা ছিলেন। ইনি মুসলমান এবং দিল্লীর সম্রাটের করদ রাজা ছিলেন,—আবেদরজা লাউড়ে একটি প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন, তাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার স্মৃতি বুকে করিয়া পড়িয়া আছে। আবেদরজার পুত্র উমেদরজা। পার্ব্বতীয় জাতিগণের প্রবল আক্রমণ হইতে নগরবাসিগণকে রক্ষাকল্পে উমেদরজা বিস্তৃত পরিখা খনন করাইয়া ছিলেন। এখনও ইহাঁদের বংশধরগণ এই স্থানে বাস করিতেছেন।

আবেদরজার পিতা পিতামহ মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন। মিষ্টার গেইট সাহেব তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন,—"আরঙ্গজেবের সময়ে লাউড়ের রাজা গোবিন্দসিংহ দিল্লীতে গিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া আসেন।" স্যার উইলিয়ম হণ্টারও তাঁহার গ্রন্থে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া গিয়াছেন।

লাউড়ের রাজা গোবিন্দসিংহ কোন্ বংশোদ্ভব এবং কি কারণে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তাহা তদ্দেশবাসিগণের মধ্যে প্রাচীনগণের মুখে এখনও কিম্বদন্তীরূপে শুনিতে পাওয়া যায়। তবে গল্পকথায় প্রকৃত সত্যের কোথাও অঙ্গহানি হইতে পারে। যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল। ভরসা করি, অবসরের কোনও পাঠক এতৎ সম্বন্ধে অধিক বা অন্যরূপ প্রামাণিক বিষয় অবগত থাকিলে, লিখিয়া বাধিত করিবেন।

পূর্ব্বকালে শ্রীহট্ট, গৌড়, লাউড় ও জয়ন্তিয়া এই তিনটী ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত ছিল। এবং এই তিন ক্ষুদ্ররাজ্য কয়েক জন রাজার অধীনে ছিল। তন্মধ্যে ত্রিপুরার রাজার অধীনে শ্রীহট্টের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশের সমস্ত স্থান ছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন, বর্ত্তমান করিমগঞ্জ ও মৌলভিবাজারের সমস্ত এবং হবিগঞ্জের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশের সমস্তই ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যান্তর্গত ছিল।

৬৪১ খৃষ্টীয়াব্দে (৫১ ত্রৈপুরাব্দে) ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ধর্ম্মপাল একটি যজ্ঞকরণাভিপ্রায়ে মিথিলাধিপতি বলভদ্রসিংহের নিকট পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করেন।

মিথিলাধিপতি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সে কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু শ্রীহট্ট অনার্য্যদিগের বাসভূমি বলিয়া প্রথমে সেখানে যাইতে কেহই স্বীকৃত হন না।

তৎপরে যখন তাঁহারা জানিতে পারিলেন, ত্রিপুরেশ্বর চন্দ্রবংশোদ্ভব ক্ষত্রিয়, এবং সিদ্ধপীঠ কামাখ্যার সীমান্তবর্ত্তী স্থান, তখন পাঁচজন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপালের যজ্ঞ সম্পাদন জন্য গমন করেন।

রাজা ধর্ম্মপাল তাঁহাদের দ্বারা এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। যেখানে সে যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল, এখনও তাহা বর্ত্তমান আছে। সেখানে যজ্ঞকুণ্ড আছে, এবং ঐ যজ্ঞে মহারাজের মঙ্গল হইয়াছিল বলিয়া গ্রামের নাম মঙ্গলপুর হইয়াছে। মঙ্গলপুর মৌলভিবাজার সবডিবিসনের অধীন।

যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে আসিয়াছিলেন, মহারাজ তাঁহাদিগকে বিস্তৃত ভূসম্পত্তি দান করিয়া তথায় বাস করিতে অনুরোধ করেন। সেই দানপত্রের প্রতিলিপি এইঃ—

ত্রিপুরঃ পর্ব্বতাধীশো শ্রীশ্রীযুক্তাদি ধর্ম্মপা।
সমাজ্ঞং দত্ত পত্রঞ্চ মৈথিলেষু তপস্বিষু॥
বৎস্য-বাৎস্য-ভরদ্বাজ-কৃষ্ণাত্রেয় পরাশরাঃ।
শ্রীনন্দানন্দগোবিন্দ শ্রীপতি পুরুষোত্তমাঃ॥
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাঞ্চ বক্রগা ক্রোশিরা নদী॥
দক্ষিণস্যাঞ্চ পূর্ব্বস্যাং হাঙ্কলা কৌকিকাপুরী॥
এতন্মধ্যাৎ সশস্যা যা টেঙ্করি-কুকি-কর্ষিতা।
প্রাগ্‌লব্ধা তদ্ভূমির্দত্তা তেষু পঞ্চতপস্বিষু।
মকরস্থে রবৌ শুক্লে পক্ষে পঞ্চদশী দিনে।
ত্রিপুরা চন্দ্র বাণাব্দে প্রদত্তা দত্তপত্রিকা॥

যে পঞ্চ খণ্ড ভূমি চৌহদ্দী চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হয়, কালে তাহা পাঁচটি পরগণায় পরিণত হয়। ঐ বিস্তৃত স্থানের উত্তর পশ্চিমে ক্রোশিরা নদী, এবং দক্ষিণ পশ্চিমে হাঙ্কলা কুকীদিগের গ্রামসমূহ অবস্থিত। ক্রোশিরা নদী বর্ত্তমানে কুশিয়ারা বলিয়া পরিচিত। আর খুবসম্ভব 'হাকালুকি' 'হাঙ্কলা' শব্দ হইতেই হইয়াছে,—এই হাকালুকির দক্ষিণে 'জলভুব' নামে একটি স্থান আছে,—ঐস্থান সুমিষ্ট এবং বৃহৎ জাতীয় আনারসের জন্য প্রসিদ্ধ।

শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম এই পাঁচজন মৈথিলী ব্রাহ্মণ ত্রিপুরেশ্বর ধর্ম্মপালের নিকট সমাদর ও প্রভূত ভূসম্পত্তিলাভ করিয়া

তথায় বসতি আরম্ভ করেন। দেশ হইতে তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্র সেই স্থানে আনয়ন করেন এবং আরও মিথিলা হইতে পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সপরিবারে আসিয়া তাঁহাদের সহিত শ্রীহট্টের অধীন তাঁহাদের ঐ দানপ্রাপ্ত স্থানমধ্যে বাস করিতে থাকেন।

কাত্যায়ন-কাশ্যপাশ্চ মৌদ্‌গল্যাঃ স্বর্ণকেশিকাঃ।
গৌতমা বৈদিকাঃ সর্ব্বে মিথিলাঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
চতুর্দ্দশগুণৈর্মিশ্রা মহামান্যা স্তপাস্বিনঃ।

কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্‌গল্য, স্বর্ণকেশিক আর গৌতম মৈথিলী সম্প্রদায়-ভুক্ত এই পাঁচজন তাহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া পশ্চাৎ আগমন করেন। তাঁহারা রাজার নিকট কোনপ্রকার ভূসম্পত্তি দান পাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায় না। তাঁহারা প্রজার ন্যায়ই বাস করিতেন। তবে কালক্রমে তাঁহাদের বংশধরগণ শ্রীহট্টের মধ্যে প্রভূত ধনশালী ও ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিদ্যাবত্তাতেও একসময়ে ইহাঁরা যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়া-ছিলেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টের এই বৈদিকবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

আনন্দের বংশধর নিধিপতি ৭৫৪ খৃষ্টীয়াব্দে ত্রিপুরেশ্বর সুধর্ম্মপালের নিকটে এক বিস্তৃত ভূখণ্ড দানপ্রাপ্ত হন। তদীয় বংশোদ্ভব ভানুনারায়ণ অত্যন্ত বীরপুরুষ ছিলেন। ত্রিপুরার শত্রু অমিততেজস্বী রাজা চন্দ্রসেনকে যুদ্ধে পরাজিত, নির্জ্জিত ও ধৃত করিয়া দিয়া ত্রিপুরার রাজার নিকটে রাজা উপাধির সহিত বহুপ্রদেশ রাজ্যস্বরূপ প্রাপ্ত হয়েন।

সেই দানপ্রাপ্ত সম্পত্তি এখনও তাঁহার স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য 'ভানুগাছ' পরগণা নামে অবস্থান করিতেছে। ভানুনারায়ণ পরে ভানুগাছ পরগণা ব্যতীত আরও অনেক স্থান নিজ অধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন। রাজনগর তাঁহার রাজধানী ছিল। এখনও রাজনগরে পরিখা, প্রাচীর ও প্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ আছে। অনেকগুলি পুরাতন পুষ্করিণী তাহার বিগত গৌরবের কাহিনীরূপে অবস্থিত আছে। রাজবাড়ীর ভগ্নস্তূপের সম্মুখে নীলসলিলভরা এক দীর্ঘিকা এখনও অবস্থিত এবং সেই দীর্ঘিকার তীরেই এখন ইংরেজ-রাজের 'রাজনগর পুলিশ থানা' সংস্থাপিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, কেশবমিশ্র নামক অপর একজন ব্রাহ্মণ উত্তর পশ্চিমা-

ঞ্চল হইতে আসিয়া বাণিয়াচঙ্গের নিকট লাউড়ে বসতি করেন। কিন্তু প্রাচীন প্রবাদ ও মুসলমান কবির একখানি প্রাচীন পুস্তকে জানা যায়, কেশবমিশ্র কাত্যায়নের বংশোদ্ভব।

আবার কেহ কেহ বলেন, আগে কেশবমিশ্র এবং পরে তাঁহারই বংশধর দিব্যসিংহ প্রভৃতি রাজত্ব করেন, তৎপরে কাত্যায়নবংশীয় কোন এক ব্যক্তি সেই রাজ্য বলদ্বারা জয় করিয়া লয়েন, কিন্তু এমন ব্যাপারটী যিনি সম্পাদন করিলেন, তাঁহার নামাদির বিবরণ, তাঁহারা কোনপ্রকারেই সন্ধান করিতে বা উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মতে তিনি যিনিই হউন, তাঁহারই বংশধর রাজা গোবিন্দসিংহ দিল্লীর বাদসাহের সঙ্গে এক মহা-সমরে প্রবৃত্ত হয়েন।

কিন্তু অপর পক্ষীয়েরা বলেন, গোবিন্দসিংহ দিব্যসিংহেরই বংশধর। দিব্যসিংহ ও গোবিন্দসিংহের মধ্যবর্ত্তী সময়ে এই রাজবংশের মধ্যে কোন যুদ্ধ বিগ্রহাদির সংবাদ পাওয়া যায় না, বা কেহ বিদ্রোহী হইয়াছিল, তাহার নাম সংগ্রহ কোনপ্রকারেই হয় না, তখন গোবিন্দসিংহ যে দিব্যসিংহেরই বংশধর, তাহাতে সন্দেহ করা যাইতে পারে না। এবং দিব্যসিংহ যে কেশব-মিশ্রের অধস্তন বংশধর, তাহাত সর্ব্ববাদিসম্মত। কাজেই কাত্যায়ন-বংশীয় বলিয়া যে গোবিন্দসিংহের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে কেশবমিশ্রও যে কাত্যায়নবংশীয়, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নাও হইতে পারে।

কেশবমিশ্র লাউড়ে বাস করিতেন। সে দেশে এক প্রবাদবাক্য মুখে মুখে প্রচলিত আছে যে,—কোনও এক বণিক নৌকাযোগে দূরদেশ হইতে বাণিজ্যার্থ পণ্য সম্ভার লইয়া ঐ পথে যাইতেছিলেন। বণিক্ কালীভক্ত—তাঁহার নৌকামধ্যে ক্ষুদ্র একখানি শিলাময়ী কালিকাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ছিল। সেদিন রাত্রে লাউড়ের সন্নিকটে একটি বাঁওড়ে নৌকা নঙ্গর করাইয়া অব-স্থান করিতেছিলেন। রাত্রে কালী বণিক্‌কে স্বপ্নাদেশে বলেন,—"এখান হইতে আমার আর যাইবার ইচ্ছা নাই। আমাকে এই স্থানে নামাইয়া রাখিয়া তুই বাণিজ্যার্থ যা, তোর মঙ্গল হইবে। আমি এখানকার এক ব্রাহ্মণকে রাজা করিব।"

বাণিয়া প্রভাতে উঠিয়া সেখানে ক্ষুদ্র একটু চর দেখিতে পাইল, এবং তথায় চঙ্গ (মাঝি) দিগের সাহায্যে কালীমূর্ত্তিখানিকে ঐ চরে নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

বাঁওড় অল্পদিনেই শুকাইয়া স্থলে পরিণত হইল এবং কেশবমিশ্র ঐ স্থান অধিকার করিয়া ক্রমে ক্রমে তদ্দেশের রাজা হইলেন। কালীমূর্ত্তিকে তিনি রাজ্যাধিষ্ঠাত্রী ও পরমেষ্ঠিদেবীরূপে মহাসমারোহে নিত্য পূজা করিতেন। বাণিয়া (বণিক্) চঙ্গ (মাঝি) হইতে ঐ স্থানের উদ্ভব বলিয়া উহার নামকরণ বাণিয়াচঙ্গ হইয়াছিল।

দুর্দ্দান্ত খসিয়া জাতিকে কেশবমিশ্র সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং তাহারা যাহাতে কোন সময়ে তাঁহার রাজধানীমধ্যে অতর্কিতভাবে প্রবেশ করিয়া অনিষ্ট করিতে না পারে, এজন্য একটি বৃহদাকার দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কেশবমিশ্রের বংশধর দিব্যসিংহ খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লাউড়ের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার সময়েও কালিকাদেবীর মূর্ত্তি মহাসমারোহে ও পরমেষ্ঠিদেবীরূপে পূজিতা হইতেন।

বঙ্গদেশবাসী কুবের পণ্ডিত নামক এক পণ্ডিত এই দিব্যসিংহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কুবের পণ্ডিতের পুত্র বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান প্রচারক নিত্যানন্দ মহাপ্রভু।

নিত্যানন্দ প্রভু বাল্যজীবনের অধিকাংশ সময়ই লাউড়ে কাটাইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার পিতা সপরিবারেই সেখানে বসতি করিতেন। এই কালীবাড়ী, কালীমূর্ত্তি, নিত্যানন্দ প্রভু, রাজা দিব্যসিংহ ও তদীয় বালকপুত্র সম্বন্ধীয় অনেক কথা বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে,—সময়ে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই বংশে গোবিন্দসিংহের জন্ম হয়। গোবিন্দসিংহের রাজত্বকালে দিল্লীর বাদশাহের শ্রীহট্টের ফৌজদারের সহিত সীমানির্দ্ধারণ লইয়া মনোবাদ আরম্ভ হয়। ক্রমে মনোবিবাদ প্রগাঢ় হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ সংঘটন হয়। তৎপরে রাজাকে কৌশলে মুর্শিদাবাদে লইয়া যাওয়া হয়।

প্রবাদ আছে, মুর্শিদকুলী খাঁ এই বলিয়া পাঠান যে, মহারাজা সেখানে গমন করিলে, তিনি তাঁহাকেই শ্রীহট্টের মুসলমান অধিকারের স্থানগুলি পর্য্যন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিবেন। তবে উভয়ের সাক্ষাতে মৌখিক আলোচনায় সমস্ত সর্ত্তাদি স্থির করিয়া লইতে হইবে। সরল বিশ্বাসে রাজা গোবিন্দসিংহ মুর্শিদাবাদে গমন করিলে, তাঁহাকে বন্দী করা হয়। তৎপরে তাঁহার উপরে নানাবিধ অত্যাচার করা হয়। এই অত্যাচার হইতে অব্যা-

হৃতি পাইবার অন্য কোন উপায় করিতে না পারিয়া, তিনি মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মুসলমানশক্তির আশ্রিত রাজারূপে মুক্তিলাভ করতঃ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। তাহার সহিত এক মৌলভি ও মৌলভির শরীর রক্ষার্থে অনেকগুলি সৈন্যও লাউড়ে আনেন।

মৌলভি সাহেবের আগমনের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য এই যে, গোবিন্দসিংহের পরিবারস্থ সকলে যাহাতে মুসলমান হয়েন তাহাই করা।

মৌলভি সবিশেষ দম্ভ ও বলের সহিত লাউড়ের রাজপরিবারের সকলকেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

প্রবাদ আছে, কালীদেবীর পূজক সদানন্দ ব্রহ্মচারী কিছুতেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই,—তাঁহার উপরে অনেক প্রকার অমানুষিকী অত্যাচারের আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু শেষে তিনি পলায়ন করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করেন। তদীয় বিংশ বর্ষ বয়স্ক দয়ানন্দ নামক এক পুত্র ছিল, সে গোবিন্দসিংহের কন্যা চন্দ্রাবতীর গুরু ও শাস্ত্রশিক্ষা দিত। কথিত আছে, চন্দ্রা তাহারই পরামর্শে জ্বলন্ত অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছিল, তথাপি ধর্ম্মত্যাগ করে নাই, কিন্তু মৌলভির আজ্ঞায় এই যুবকের জীবন্তে কবর হইয়াছিল। *

গোবিন্দসিংহ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া কি নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা কোন প্রকারেই জানিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহার যুবক পুত্র মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া 'আবেদরজা' নাম গ্রহণ করেন,—অবশ্য মৌলভিসাহেবই তাঁহার নামকরণ করেন।

আবেদরজার সময়ে (১৭৪৪ খৃঃ—অনুমান) খাসিয়া জাতিগণ অত্যন্ত উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা আবেদরজার রাজ্যান্তর্গত গ্রাম জ্বালাইয়া দিতে লাগিল, প্রজা মারিয়া পশু ও রমণী লুঠিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করিতে লাগিল। আবেদরজা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারিলেন না। তখন বাদশাহের সৈন্য-সাহায্য লইয়া খাসিয়াদিগকে বিতাড়িত করিলেন, এবং খাসিয়াদিগের ভবিষ্যৎ আক্রমণ হইতে রাজধানী রক্ষার জন্য বাণিয়াচঙ্গের সংস্কার সাধন ও দৃঢ় প্রাচীর ও উৎকৃষ্ট প্রণালীর

* এই সকল ঘটনা লইয়া পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, অভিসার নামক তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তিময় উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

বাড়ী-ঘর-দুয়ার প্রস্তত করাইয়াছিলেন। এই সময় আবেদরজা বাদশাহকে করস্বরূপ প্রতিবৎসর আটচল্লিশ খানি সুন্দর ও মূল্যবান নৌকা প্রদান করিতেন। আবেদরজা লাউড়ে যে একটি বৃহত্তম দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এখনও তাহার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে।

আবেদরজার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র 'উমেদরজা' রাজা হন, এবং নানাপ্রকারে রাজ্যের উন্নতি ও স্থায়িত্ব সাধনের জন্য চেষ্টা করেন। তিনিই বাণিয়াচঙ্গের চতুর্দ্দিকে উন্নত প্রণালী পরিখা নির্ম্মাণ করান। তাঁহার সময়ে কেবল নৌকা করস্বরূপে আর চলিত না, রাজ্যের যে আয় হইত, তাহার এক নির্দ্দিষ্ট অংশ করস্বরূপে দিল্লীর রাজকোষে পাঠাইয়া দিতে হইত।

আবেদরজার বংশধরগণ এখনও বাণিয়াচঙ্গে বসতি করিতেছেন।

শ্রী—

শৈশবের স্মৃতি।

জীবন-প্রভাতে বসি ভবিষ্য আঁধারে
আঁকিতাম কল্পনায় স্বপ্নময়ী ছবি ;—
সংসারের শত কাজে জীবন-অম্বরে
অলক্ষ্যে উদয় হবে মধ্যাহ্নের রবি।
আজ কেন হেরি হায় জীবন-সন্ধ্যায়
অলীক সকলি তার নাহি কিছু মূল ;
গভীর তিমিরে মগ্ন শূন্য নীলিমায়
'শৈশবের স্মৃতি' মম আকাঙ্ক্ষা বিপুল।

শ্রীমতী সুরবালা মিত্র

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

সরণ্যু ও সবর্ণা
সংজ্ঞা ও ছায়া
এবং
সীতা ও ছায়া

ঋক্‌বেদের মন্ত্রদ্বয়ে (১০।১৭।১—২) সরণ্যু ও সবর্ণার উপাখ্যানের আদি উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা ঃ—

ত্বষ্টা স্ব-দুহিতার বিবাহ ঘোষণা করিলে জগৎ (জন) সমবেত হইল। মহান্ বিবস্বানের পরিণীত জায়া যমের মাতা নিরুদ্দেশ হইলেন। তাঁহারা অমৃতাকে মর্ত্ত্যলোক হইতে গোপন করিলেন এবং সবর্ণাকে নির্ম্মাণ করিয়া বিবস্বানকে দিলেন। সরণ্যুর দুই অশ্বি যুগল হইলে তিনি তাহাদিগকে ত্যাগ করিলেন। (১)

মূল ইতিহে ক্রমে ক্রমে শাখা পল্লব সংযোজিত হইয়া কিরূপে ইতিহ প্রকাণ্ড দেহ ধারণ করে, তাহা এই উপাখ্যানের পরিবর্দ্ধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

বেদ মন্ত্রদ্বয়ের ব্যাখ্যায়—নিরুক্তে (১২।১০—) প্রকাশ যে "ত্বাষ্ট্রী সরণ্যু আদিত্য বিবস্বান্ হইতে দুই যম মিথুন লাভ করেন। তিনি স্ব-স্বরূপা অশ্বীরূপ ধারণে ছুটিলেন। সেই আদিত্য বিবস্বান্ অশ্বরূপ ধারণে তাহার অনুসরণ করিলেন। তাহাতে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হইল। সবর্ণা গর্ভে মনু হইলেন।"

বৃহৎ দেবতা মতে "ত্বষ্টার যমজ সন্তান ছিল। সরণ্যু এবং ত্রিশিরা। তিনি বিবস্বানকে সরণ্যু সম্প্রদান করেন। তাহাদের যমজ সন্তান যম এবং যামী হইল। পতির পরোক্ষে সরণ্যু তাহার সদৃশী স্ত্রী সৃষ্টি করিয়া মিথুন সন্তান তাহার হস্তে ন্যস্ত পূর্ব্বক অশ্বারূপ গ্রহণে প্রস্থান করিলেন। না জানিতে পারিয়া বিবস্বান্ সেই সদৃশী স্ত্রীতে মনুকে জন্ম দেন। সেই মনু রাজর্ষি এবং পিতার তুল্য তেজস্বী হইলেন। আত্মরূপিণী সরণ্যুকে অপক্রান্ত জানিয়া বিবস্বান্ সলক্ষণ অশ্বরূপ ধারণে তাহার অনুসরণ করিলেন। সরণ্যু অশ্বরূপী

---

(১) ভাষ্যকারগণ এই মন্ত্রদ্বয়ের নানা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে সে সব তর্ক তুলিবার কোন আবশ্যক হইবে না।

বিবস্বান্‌কে চিনিতে পারিয়া সহবাস কামনায় সমীপস্থ হইলেন। ইত্যাদি ইত্যাদি * * * * * * * * * এইরূপে কুমারদ্বয় নাসত্য ও দস্র জন্মিল। ইহারা অশ্বিনামে খ্যাত হইল।”

বিষ্ণু পুরাণ আদি বহু পুরাণে এই ইতিহ পুনরুত্থিত হইয়াছে। পুরাণে সরণ্যূ সংজ্ঞা নাম এবং সবর্ণা ছায়া নাম ধারণ করেন। এবং ছায়াসুত মনু মনু-সাবর্ণি আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং পুরাণ বিশেষে ছায়ার পুত্র শনি ও কন্যা সাবিত্রী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

রামলীলায় ত্বাষ্ট্রী সরণ্যূ জানকী সীতা নাম এবং সবর্ণা ছায়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। সরণ্যূর ন্যায় সীতা প্রবাসে মিথুন প্রসব করেন। সরণ্যূ অশ্বি দ্বয়কে ফেলিয়া যান, সীতা কুশীলবকে ত্যাগ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করেন।

সীতা-হরণের প্রাক্‌কালে তাহার জনক অগ্নিদেব পঞ্চবটীর কুটীরে ছায়াকে রাখিয়া স্ব-দুহিতা সীতাকে লইয়া যান। ঐশুন জনক অগ্নি শ্রীরামকে কহিতেছেন।

“মৎ প্রসূম্ মযি সংন্যস্য
ছায়াম্ রক্ষ অন্তিকে তব ॥—(অধ্যাত্ম্য রামায়ণ।)

সীতার পার্শ্বে ছায়া দেবীকে বসাইলে ইতিহের অর্থবাদ অতীব ভাসা ও হাল্‌কা হইয়া পড়ে এবং পাঠকের কৌতূহল মাটি হয় বলিয়া রামায়ণে ছায়া দেবীর নাম স্পষ্ট উল্লেখ নাই। রামায়ণে ছায়াদেবী মায়াসীতা নাম গ্রহণ করিয়াছেন।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

হিন্দু ইতিহ বুঝিতে হইলে সুমেরুবাসী ঋষিগণ যে চক্ষে আকাশ দর্শন করিতেন, সেই চক্ষে আকাশ দেখিতে হইবে। এবং আকাশের যে চিত্র ঋষিগণের চিত্তপটে অঙ্কিত হইত, সেই চিত্র স্বীয় চিত্তপটে কল্পনা দ্বারা অঙ্কিত করিতে হইবে। এবং নিঘণ্টুতে ইতিহের নাম গুলির যে অর্থ আছে, সেই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। তবেই বেদোক্ত ও পুরাণোক্ত ইতিহের মর্ম্ম গ্রহণে পাঠক সমর্থ হইবেন, নতুবা নহে। কেবল সাপের মন্ত্র পাঠ হইবে মাত্র।

সুমেরুবাসী ঋষিগণ আকাশের উত্তর অর্দ্ধ মাত্র দেখিতে পাইতেন। এবং ক্ষিতিজের তলে সমস্তই একার্ণব পারাবার বলিয়া অনুমান করিতেন। তাঁহারা দেখিতেন যে, বিস্ফারিত ছত্রবৎ আকাশ-অর্দ্ধ তাঁহাদের মাথার উপর ঝুলি-তেছে। এবং মাথার ঠিক উপরে ধ্রুবতারা জ্বলিতেছে। এবং উত্তর ধ্রুব

হইতে দক্ষিণ ধ্রুব পর্য্যন্ত বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টক ছায়াপথের উত্তর অর্দ্ধ মাত্র তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। এই অর্দ্ধ ছায়াপথের এক মুখ বৃষ ও মিথুন রাশির সন্ধিস্থলে ছিল। এবং তথায় বাসন্তিক দ্বার (Vernal Equinox) অবস্থিত ছিল। এবং অপর মুখ বৃশ্চিক ও ধনু রাশির মধ্যস্থলে ছিল। এবং তথায় শারদীয় গুহা (Autumnal Equinox) অবস্থিত ছিল।

এক মুখে বাসন্তিক দ্বারে "পুনর্বসু" নক্ষত্রের তারাযুগল এবং অপর মুখে শারদীয় গুহায় বিচৃত নক্ষত্রের শ্যাম শবল নামক তারাযুগল অবস্থিত ছিল। বেদে প্রভাতী তারাদ্বয় (বুধ ও শুক্রগ্রহ) ও সন্ধ্যা তারাদ্বয় (বুধ ও শুক্রগ্রহ) অশ্বিদ্বয় নামে গীত ও স্তুত হইয়াছে। এবং ঐ দুই তারা-যুগল মূল অশ্বিদ্বয়ের নাক্ষত্রিক প্রতিমা বলিয়া বেদে অশ্বি নামে গীত হইয়াছে।

সুমেরুবাসী ঋষিগণ আরও দেখিতেন যে, সূর্য্য প্রভাতী তারাদ্বয় সহ দেবদিনের ঊষাকালে দেবপথমধ্যে বাসন্তিক দ্বারে উদিত হইতেন। এবং ছয়মাস পরে দেবদিনের অবসানে সূর্য্য সন্ধ্যা তারাদ্বয় সহ দেবপথ মধ্যে শারদীয় গুহায় ছয় মাসের জন্য পারাবারে নিমগ্ন ও অস্তগত হইতেন। এবং তখন দেবরাত্রি আরম্ভ হইত।

প্রথমতঃ তাঁহারা মনে করিতেন যে, দেবপথ সূর্য্যের কক্ষা। কিন্তু ক্রমে তাঁহারা জানিলেন যে, সূর্য্য উদয়ের পরে কিয়ৎ দিন মাত্র দেবপথে গমন করেন। তৎপরে সূর্য্য পথান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে বৃশ্চিক রাশিতে সংক্রমণ করিয়া দেবপথের সহিত মিলিত হয়। এবং আবার কিয়ৎদিন মাত্র দেবপথে গমন করিয়া শারদীয় গুহায় নিমগ্ন ও অস্তগত হয়।

সূর্য্যের এই কক্ষা বা দেবপথ সূর্য্যা নামে গীত হইয়াছে। এবং সূর্য্যা প্রাতঃ সন্ধ্যার নাক্ষত্রিক প্রতিমা। এবং "পুনর্বসু" নক্ষত্রের তারাদ্বয় প্রভাতী তারাদ্বয়ের নাক্ষত্রিক প্রতিমা। প্রাতঃসন্ধ্যা বা ঊষা প্রভাতী তারাদ্বয়কে বক্ষে ধারণ করেন। সূর্য্যা পুনর্বসু নক্ষত্রের তারাযুগলকে বক্ষে ধারণ করেন। আবার সূর্য্যা সায়ংসন্ধ্যার নাক্ষত্রিক প্রতিমা। সায়ংসন্ধ্যা সন্ধ্যা তারা-দ্বয়কে বক্ষে ধারণ করেন। সূর্য্যা শ্যাম শবল তারাদ্বয়কে বক্ষে ধারণ করেন।

বেদমতে ঊষা (২) বা সূর্য্যা সূর্য্যের পত্নী। (৩)

(২) বাজিনীবতী সূর্য্যস্য যোষা॥ (ঋঃ বেঃ ৭।৭৫।৫)

(৩) সূর্য্যা সূর্য্যস্য দুহিতা "সা পুনঃ সূর্য্যস্য পত্নী" (নিরুক্ত)

সুমেরুবাসী ঋষিগণ দেখিতেন যে, সূর্য্য উষার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করেন (ঋঃ বেঃ ১।১১৫।২) এবং সূর্য্য সূর্য্যাকে আশ্রয় করিয়া জগৎ পরিভ্রমণ করেন। এজন্য উষা ও সূর্য্যা সরণ্যু আখ্যা পাইতে পারে।

সায়ংসন্ধ্যা প্রাতঃসন্ধ্যার বা উষার "সবর্ণা" বটে।

বেদে সূর্য্য অশ্ব নাম ধারণ করেন। সুতরাং ইতিহে সূর্য্য-পত্নী অশ্বী হইয়াছেন।

ব্রহ্মাণ্ড বেষ্টক দেবপথে "সোমধারা নভঃ সরিৎ" প্রবাহিত আছে। বেদ ও পুরাণ মতে নভঃ সরিৎ চারি শাখায় চারি নামে বিভক্ত আছে। পূর্ব্ব-শাখা সীতা আখ্যা ধারণ করে। "পূর্ব্বস্যাম্ দিশি সীতাখ্যম্"।

(বৃঃ দেঃ পুঃ)

এই পূর্ব্ব শাখায় শ্যাম শবল তারাযুগল অবস্থিত আছে। সীতার ক্রোড়ে শ্যাম শবল তারাযুগল।

বেদে মনুর উল্লেখ আছে। পুরাণে চতুর্দ্দশ মনু ও ইন্দ্রের উল্লেখ আছে। (শ্রীমৎভাগবত) এই মনু ইন্দ্র উপাধি ধারণ করেন।

চতুর্দ্দশ মনু বা ইন্দ্র ধ্রুবচক্রের (Polar cirb) চতুর্দ্দশ ধ্রুবতারা। এক ধ্রুবতারা সিংহাসন চ্যুত হইলে পার্শ্ববর্ত্তী অপর ধ্রুবতারা সিংহাসনে আরোহণ করে। এই ধ্রুবান্তরকে মন্বন্তর (মনু+অন্তর) বলে। মনু—ইন্দ্র সায়ংসন্ধ্যা কালে উদিত হয় বলিয়া মনু সায়ংসন্ধ্যার বা সবর্ণার পুত্র বলিয়া গণ্য ও পরিকল্পিত হইয়াছে।

উপপত্তি।

চিন্তাশীল পাঠক দেখিতেছেন যে, বেদোক্ত মূল ইতিহে শাখা পল্লব সংযোজিত হইয়া রামলীলার সুবৃহৎ উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। বেদমতে ইন্দ্রের বজ্র বিদারিত রেখা হইতে দেবপথ উৎপন্ন হয়। রামায়ণ মতে জনক অগ্নির হলকর্ষণ মতে সীতার উৎপত্তি হইল।

বেদমতে সরণ্যু অশ্বীরূপে পতিগৃহ ত্যাগ করেন। কালক্রমে রমণীর পতি-গৃহত্যাগ অপ্রশস্ত হইল। রামায়ণে শ্রীরাম সীতাকে বনবাসে পাঠাইলেন।

প্রবাসে সরণ্যুর শ্যামশবল অশ্বিযুগল হইল। প্রবাসে বাল্মীকির আশ্রমে সীতার গর্ভে কুশীলব জন্ম লইল। সরণ্যু শ্যামশবল রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। সীতা কুশীলবকে ফেলিয়া ভূবিবরে প্রবেশ করিলেন।

সীতা-হরণের যে শাখা সংযোজিত হইয়াছে। তাহার ব্যাখ্যা ক্রমশঃ হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

ঊষা ও প্রভাত।

(১)

নিশিগন্ধার গন্ধামোদিত
নিঝুম নিশির শেষে ;
বিলাস-শয্যা তেয়াগিয়া ঊষা,
তারা ঘেরা ব্যোম দেশে।
গুছায়ে পরিলা স্খলিত বস্ত্র,
শিশিরে ধুইলা মুখ ;
তখনো প্রভাত শয্যা উপরে
ভুঞ্জে স্বপন-সুখ !

(২)

কণ্ঠে পরিলা কুসুমের হার,
কুসুমমুকুট শিরে ;
কুসুম-কোমল অঙ্গ তখন
কুসুমে লইলা ঘিরে।
জড়তা নাশিতে ফুল-মধু ভরা
পাত্রেতে দিলা মুখ ;
তখনো প্রভাত শয্যা উপরে
ভুঞ্জে স্বপন-সুখ !

(৩)

এরূপে তাহার লাস্যলীলার,
শেষ হ'ল যদি সজ্জা ;
বাহির হইতে জগতের মাঝে,
বাধা দিল আসি লজ্জা।
কে বুঝি কোথায় লকাইয়া দেখে,
দুরু দুরু কাঁপে বুক ;

তখনো প্রভাত শয্যা উপরে
ভুঞ্জে স্বপন সুখ ;

(৪)

চোরের মতন চারিদিক চাহি'
সুপ্ত প্রভাত-মুখে ;
আগ্রহে উষা চুম্বিলা আসি'
আবেগ পূর্ণ বুকে।
টুটিল তন্দ্রা, ছুটিল স্বপ্ন,
প্রভাত খুলিল আঁখি,
চঞ্চল পদে পলাইলা উষা,
হাসিটি ছড়ায়ে রাখি' !

(৫)

ডাকিল প্রভাত, ফিরিল না উষা ;
প্রভাত চলিল পিছে ;
ধরিতে আঁচল, কত আগ্রহ !—
হায়, তা'র আশা মিছে !
রঙ্গ দেখিয়া, ব্যঙ্গ করিতে
চারিদিকে ডাকে পাখী ;
চঞ্চল পদে ধায় উষা লাজে,
হাসিটি ছড়ায়ে রাখি' !

(৬)

হাসিয়া ঢলিয়া পড়িল শেফালি,
তারারা ঢাকিল মুখ ;
এলো সমীরণ, পরিমল পিয়ে,
উল্লাস ভরা বুক।
ধরি ধরি ক'রে ধরিতে পারে না,
প্রভাতকে দিয়া ফাঁকি,
চঞ্চল পদে পলাইলা উষা,
হাসিটি ছড়ায়ে রাখি !

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দী।

(ইংরাজী হইতে)

"আপনি বোধ হয় এবার সব গোপন ব্যবসায়ীদের শিক্ষা দিবেন ? কি বলেন ? বেশ রীতিমত শিক্ষা !"

তাহার এ শ্লেষ উক্তি আমার একান্ত অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। আমি তাহার বিশাল কায়া ও শারীরিক সামর্থ্যের একটা কল্পনা করিয়া লইলাম। তখন সবে আমি শুল্ক বিভাগের গোপন ব্যবসা রোধ করিবার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমার কর্ম্ম স্থান তখন বারগেট্ নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লী। ইতি পূর্ব্বেই পূর্ব্বোক্ত লোকটির কথা আমার জানা ছিল। যুবক রসেট সেই পল্লীর স্কোয়্যার রসেটের একমাত্র পুত্র ; তাহার শারীরিক ক্ষমতা ও পালয়ানীর জন্য বেশ একটা খ্যাতি ছিল। আরও আমি কোন বিশ্বাসী লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, এই যুবক উক্ত গোপন ব্যবসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত।

আমি বলিলাম,—"যুবক রসেট, তোমার নিকট আমি এ সুরের কথা আশা করি নাই ; ভবিষ্যতের জন্য সাবধান থাকিও।" এই বলিয়া আমি আবার গন্তব্য পথে চলিতে লাগিলাম।

তখনও অধিক দূর যাই নাই, পশ্চাতে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি শুনিতে পাইলাম। অতি কষ্টে আত্ম-সম্বরণ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সত্য কথা বলিতে কি, আমার শারীরিক অনিষ্টের কোন আশঙ্কা ছিল না।—প্রহারের আশঙ্কায় যে আমি ক্রোধ সম্বরণ করিলাম এ কথা যেন কেহ না মনে করেন। কারণ যুবক রসেট আমার অপেক্ষা লম্বায় চার পাঁচ ইঞ্চি বেশী ও ভীষণ আকৃতি হইলেও খুব সম্ভব আমি তাহা অপেক্ষা অধিক বলশালী ছিলাম। আমার বেশ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তাহার মত হাতে বহরের লোক দুইজন আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও আমার বিশেষ কোন অনিষ্টের আশঙ্কা ছিল না। আরও সে অঞ্চলে তাহার কুস্তিগীর বলিয়া একটা খ্যাতি থাকিলেও আমিও কুস্তিতে বিশেষ অপারদর্শী ছিলাম না। বরং আমার বিশ্বাস সে কুস্তিতে আমার অপেক্ষা হীন ছিল, কেননা আমি বহুবর্ষ ধরিয়া কুস্তির অশেষবিধ চাতুরী অভ্যাস করিয়াছিলাম। আমার দেশে এমন একজন পালয়ানও ছিল না, যাহাকে আমি কুস্তিতে হারাইতে পারি নাই। এই সব নানা কারণে

আমি তাহার শারীরিক ক্ষমতা ও খ্যাতিতে ভীত হই নাই। অনর্থক একটা বিবাদ বাধাইয়া আমি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতে ইচ্ছা করি নাই। বারগেটে তখন গোপন ব্যবসাটা এত অধিক পরিমাণে চলিয়াছিল যে, কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়াছিল। এই জন্যই আমি আরও কয়েকজন কর্ম্মচারীর সহিত ইহার দমনে আসিয়াছিলাম। আমিও প্রাণপণে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ পালন করিতেছিলাম। ইতি মধ্যেই আমি কয়েক দলকে ধরিয়াছি। সেই পাড়ার আরও তিন দলের সন্ধান পাইয়াছিলাম, শীঘ্রই ধরিব স্থির করিয়াছি। অতএব বুঝিয়া দেখুন, স্কোয়্যার পুত্রের তাবৎ মানগর্ব্ব তখন আমার মুষ্টির ভিতর।

তবু তাহার এই ব্যবহারে আমি বড়ই কষ্ট অনুভব করিলাম। কারণ বৃদ্ধ স্কোয়্যারের ছয়টী কন্যা ছিল। তাহার মধ্যে,—লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, তাহার নাম মিস্ রাথ—একজন গত রবিবার গির্জ্জায় ভজনার সময় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই দিন হইতে অন্ততঃ দশবারও তাহার কথা আমার মনে জাগিয়াছে;—কিছুতেই সে কথা ভুলিতে পারি নাই।

আজ যেন আমি সকল প্রকার অপমান সহ্য করিবার জন্যই যাত্রা করিয়াছিলাম; আর কিছুদূর যাইবার পর দেখিলাম, অনতিদূরে স্কোয়্যারের ছয় কন্যা বেড়াইয়া আসিতেছে; ইঁহাদিগের সহিত সেই রবিবারেই আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাহারা নিকটে আসিলে অভিবাদন করিয়া রাস্তার একদিকে আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু তাহারা এমনি অবজ্ঞা ভরে আমার কাছদিয়া চলিয়া গেল যে, যেন আমি রাস্তার কেউকেটা একটা অপদার্থ! একবার ফিরিয়াও আমার দিকে কেহ চাহিল না। অতি নির্ব্বোধ আমি, তাই সে রবিবার মিস্‌রাথের চাহনিতে বন্ধুত্ব দেখিতে পাইয়াছিলাম,—এখন তাহারই এই ব্যবহার!

কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুসারে বিনাশুল্কের ব্যবসায়ীদিগের নৌকা ধরায় এবং তাহাদিগকে হাজতে পাঠানে মারগেটের লোকেরা যে আমায় কিরূপ শত্রু বলিয়া মনে করিত, তাহা পাঠক ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইবেন। অবশেষে আমার পৈত্রিক প্রাণটা লইয়াও টানাটানি পড়িয়াছিল। পল্লীবাসীরা ভাবিত এইরূপ গোপন ব্যবসা যতই অনিষ্টকর হউক না কেন, তথাপি ইহাকে বে-আইনী বলা যাইতে পারে না। এই জন্যই তাহারা দল বাঁধিয়া আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল,—অপরাধী ধরা পড়িলে গ্রামবাসীর চক্ষু ফাটিয়া

সহানুভূতির অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। আমার একান্ত বিশ্বাস রসেটের কন্যাগণ তাহাদিগের ভ্রাতার গোপন ব্যবসার কথা সম্পূর্ণভাবে জানিত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহাদিগের আকার ইঙ্গিতেও সে কথা প্রকাশ পাইত না। সেই জন্যই এই ব্যবসাবিরোধীকে তাহারা আপনাদিগের শত্রুর মতই মনে করিত। গোপন ব্যবসার আরও একটা এই সুবিধা ছিল যে, নগদ টাকা বেশ দুইপয়সা ঘরে আসিত। সত্য বটে স্কোয়্যার রসেট একজন ধনী লোক কিন্তু হইলে কি হয়, টাকার মায়ায় তখনও তিনি পাগল! বৃদ্ধের হাতটানও শুনিয়াছি যথেষ্ট আছে।

রসেট পরিবারের এই অসৎ ব্যবহারের সময় আমি আমার কর্ত্তব্যের অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। কিন্তু বৃদ্ধ রসেট্ কখনও আমার সহিত অসৎ ব্যবহার করেন নাই। সর্ব্বদাই বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। আমার কার্য্যতৎপরতায় শীঘ্রই আরও দশজন অপরাধী ধরা পড়িল এবং শ্রীঘরে প্রেরিত হইল। পল্লীর গোপন ব্যবসায়ীরা তখন বুঝিতে পারিল যে, আমি বাস্তবিকই তাহাদের ব্যবসার উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হইয়াছি।

পল্লীবাসীরা আমায় দমন করিতে কয়েকবার বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিল। দুইবার অন্ধকারে আমায় লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিল। আর একদিন সন্ধ্যায় আমি বেড়াইতে যাইতেছিলাম, হঠাৎ পথের ধারের ঝোপ হইতে তিন জন লোক বাহির হইয়া আমায় আক্রমণ করে। তাহাদিগের হাতে তিন গাছি মোটা মোটা লাঠি ছিল, আমি একপ্রকার নিরস্ত্র, সম্বলের মধ্যে ভ্রমণের ছড়ি গাছটি মাত্র! আমি একটি ঘুসিতে একজনের গালেরপাটা উড়াইয়াছিলাম, চকিতের মধ্যে ফিরিয়া আর একজনকে ছুড়িয়া পর্ব্বতের উপর ফেলিয়া দিলাম। বেগতিক দেখিয়া তৃতীয় ব্যক্তি ছুটিতে লাগিল। দুর্ব্বৃত্তদের ভালরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত ভাবিয়া আমিও তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলাম। সুদীর্ঘ তিন মাইল পথ গিয়া সে ব্যক্তি একান্ত শ্রান্ত হইয়া আমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল। আমিও তাহাকে উত্তমরূপ প্রহার দিয়া ছাড়িয়া দিলাম। পরদিন শুনিলাম, প্রথম ব্যক্তি মৃত এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি খোঁড়া হইয়া পর্ব্বতের উপর পড়িয়া আছে। এ বিষয় লইয়া আর কর্ত্তৃপক্ষকে কিছু লিখিলাম না। তাহাদিগকে আমি চিনিয়া লইয়াছিলাম, ইচ্ছা করিলেই তাহাদিগের শ্রীঘরের পথ খোলসা করিয়া দিতে পারিতাম কিন্তু, আমার নিকট তাহারা যথেষ্ট শিক্ষা পাইয়াছিল সুতরাং সেরূপ কিছু আর করিলাম না। এই ব্যাপারে পাড়ার

লোকের আমার প্রতি কতটা শ্রদ্ধা আসিয়াছিল বুঝিতে পারিলাম। ইহাতে আরও একটা সুবিধা হইয়াছিল, সারাগ্রামময় আমার এই বীরত্বের কথা রাষ্ট্র হইলে পর লোকে কতকটা ভীত কতকটা ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ভবিষ্যতে আমার আর এরূপ বিপদে পড়িবার কোন আশঙ্কা ছিল না।

এখন রসেট-পরিবারের কথা বলি। কয়েকবার বৃদ্ধ রসেট্ আমায় মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলাম। কারণ আমি জানি রসেটের পুত্র কন্যাগণ কখনই আমায় সরল মনে অভ্যর্থনা করিবে না। যাহা হউক, একদিন বৈকালে পথে বৃদ্ধ রসেটের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি গাড়ী থামাইয়া বলিলেন,—"আজ আর তোমার কর্ত্তব্যের কোন অছিলা শুনিব না, আজ আতিথ্য গ্রহণ করিতেই হইবে।" তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমি এতদূর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, আমার জ্ঞান ফিরিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পার্শ্বে উঠিয়া বসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী চলিতে লাগিল। আমিও নিরবে তাঁহার সহিত যাইতে লাগিলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় রসেট সর্ব্বদা আমার সঙ্গ লাভ করিবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ইহাতে আমার কতকটা আশ্চর্য্য ও আনন্দ বোধ হইত। রসেট একজন ধনী লোক, চরিত্রও বেশ আদর্শ; তাঁহার মত লোকের সহিত সৌহৃদ্য করা একটা ভাগ্যের কথা।

ভোজন-টেবিলে স্কোয়্যার কন্যাগণ নীরবে বসিয়াছিল, আনন্দের বিষয় যুবক রসেট্ তখন বাটী ছিল না। কিছুক্ষণ পরে তাহারা এরূপ ব্যবহার করিতে লাগিল, যেন আমি সে স্থানে নাই। কেবল আমার আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি দেওয়া ব্যতীত তাহারা আমায় গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নাই।

আমার বোধ হয়, কন্যাগণের এরূপ ব্যবহার-বিষয় বৃদ্ধ রসেট পূর্ব্ব হইতেই সন্দেহ করিয়াছিলেন। আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই; পরে কন্যাগণের প্রতি তাঁহার কোপদৃষ্টি দেখিয়া সে কথা বুঝিতে পারিলাম। এই স্থানে আমি আর একটি কথা বলিয়া রাখি; বৃদ্ধ রসেট্ কখনও এরূপ গোপন ব্যবসার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি আমার নিকট যে ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তাহাতে বোধ হয় যেন তিনি আইনের পক্ষাবলম্বী। অন্ততঃ আমার এইরূপ ধারণা হইয়াছিল।

বহুক্ষণ ধরিয়া ভোজন-টেবিলের নিস্তব্ধতা ভঙ্গের জন্য তিনি অনেক পল্লী-কাহিনী আমার নিকট বিবৃত করিতে লাগিলেন। অবশেষে, হঠাৎ যেন

তাঁহার মনে পড়িল, এই ভাবে আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মিঃ ফসেট্‌, শুনিলাম নাকি তুমি সেদিন বিনা অস্ত্রে তিনজন লোককে পরাস্ত করিয়াছ ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তাঁহারা সেরূপ ভয়াবহ নহে ; তেমন পালয়ান হইলে কি পারা যাইত ?"

হঠাৎ মিস্ রাথ বলিয়া উঠিল,—"টম্ যদি একাও তোমায় আক্রমণ করিত, তাহা হইলে তুমিই পাহাড়ের উপর পড়িয়া প্রাণ হারাইতে। মনে করিও না যে এ পল্লীর সকলেই খোকা !"

বৃদ্ধ রসেট্‌ বলিলেন,—"চুপ কর রাথ !" তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তুমি কিছু মনে করিও না, উহারা স্বদেশ বড় ভালবাসে, স্বদেশের বিরুদ্ধে একটি কথাও উহাদের প্রাণে সহ্য হয় না। উহাদের ধারণা আমার পুত্র টম্‌রসেটের মত সুন্দর ও বলিষ্ঠ লোক বুঝি জগতে আর নাই !"

আমি রাথের দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—"গোপন ব্যবসায়ীরা আপন দলের মধ্যে এরূপ একজনও সাহসী লোক পাইয়াছে বলিয়া তাহাদের টমের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য। অবশ্য এরূপ একজন লোকও তাহাদের আবশ্যক বটে !"

আমি বুঝিয়াছিলাম, বৃদ্ধ স্কোয়্যার অকস্মাৎ ত্বরিতে বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে দেখিতেছেন। কিন্তু তবু আমি কুমারীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। বাস্তবিক আমার একটু দুষ্টামী করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল ; মিস্‌রাথের সেই অপমান সূচক বাক্য আমি সহ্য করিতে পারি নাই। কিন্তু রাগ হইলেও তাহার সেই সুন্দর লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি হইতে আমি চক্ষু ফিরাইতে পারি নাই। কি একটা আগ্রহ ক্রমাগত আমায় সেই দিকে টানিতেছিল। আমার কথা শুনিয়া মিস্ রাথ কোন উত্তর দিল না, নীরবে ডিসের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার অপরা ভগ্নীরাও ঠিক তাহারই মত নীরবে বসিয়াছিল ; সারা ঘরটায় তখন নিস্তব্ধতা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আর বৃদ্ধ রসেট্‌ ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার তখনকার অবস্থা দেখিলে মনে হয় যেন কন্যাদিগকে কিছু বলিবেন ইচ্ছা করিতেছিলেন, কিন্তু আমি সেখানে উপস্থিত থাকায় বলিতে পরিতেছিলেন না।

ভোজনের পর আমরা বৈঠকখানার গৃহে গিয়া বসিলাম। মিস্ রাথ একটি বীণা বাজাইয়া কয়েকটি বীরত্বপূর্ণ গাথা গাহিল। তাহার পর আবার যেই আর একটি গান গাহিতে যাইবে এরূপ সময় তাহার ভ্রাতা টম্ আসিয়া

সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সে জানিত না যে আমি সেই ঘরে বসিয়া আছি; সুতরাং নির্ভয়ে বলিয়া উঠিল,—"সেই চরব্যাটা আমাদের আর একজন দলের লোককে খুন করিয়াছে।"

মিস্ রাথ ভয়-বিবর্ণমুখে বলিয়া উঠিল,—"কি বলিলে?" সঙ্গে সঙ্গে অন্য রমণীরা ভীতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল।

টম্ অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বেই বৃদ্ধ স্কোয়্যার ডাকিলেন "টম্!"

ত্বরিতে টম্ পিছন ফিরিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে আমায় দেখিতে পাইল। টমের মুখ হইতে সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীতি-বিজড়িত শব্দ বাহির হইল; ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বৃদ্ধ রসেট্ আমাদিগের উভয়কে উভয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। টম্ আমার দিকে চাহিয়া টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিল, শিষ্টাচারের অনুরোধে আমিও তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিলাম। সে দিন আমি মার্টিন লোথার নামক এক ব্যক্তিকে আমার দলস্থ জেমস্ টনটন্ নামক এক কর্ম্মচারীকে গুলি করার অপরাধে ফাঁসি দিয়াছিলাম। টম্ যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়াছে তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। বাস্তবিক মার্টিনের জন্য আমার একটুকুও দয়ার উদ্রেক হয় নাই। না হইবার কারণও ছিল; জেমস কর্ত্তব্য পরায়ণ, সচ্চরিত্র, কর্ম্মঠ ও সুপঠিত যুবক এবং সর্ব্বোপরি নববিবাহিত, আর মার্টিন মানবাকারে পিশাচ, পাপের পূর্ণ সহচর; এমন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইলে কাহার মনে কষ্ট হয়? কিন্তু তবুও আমি স্থির করিলাম, যতক্ষণ রসেট-পরিবারের অতিথি থাকিব, ততক্ষণ যেন টমের কথা শুনিতে পাই নাই, এমনি ভাব প্রকাশ করিব; অন্যথা শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে।

যুবক রসেট্ যতক্ষণ সে ঘরে রহিল, ততক্ষণ অতি সহজভাবেই আমাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল;—যেন তাহার মনে আমার বিরুদ্ধে কোন ভাবই কখনও স্থান পায় নাই। আমি অতিথি, সে গৃহস্থ এমনি ভাবটা প্রকাশ করিতে লাগিল। গৃহের অন্য সকলেরও এই একইরূপ ভাব; সুতরাং টম্ গৃহ হইতে চলিয়া গেলে আমি উঠিয়া মিস্ রাথের নিকট গেলাম। সে তখন উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া বিস্তৃত আকাশ দেখিতেছিল। আমি তাহাকে একটি প্রাচীন প্রণয়-সঙ্গীত গাহিতে বলিলাম। জানিতাম না যে, আমি কি ভুল করিয়াছি। তাহার সেই লাবণ্যময়ী দেহে যে নম্রতা বা ভদ্রতার লেশমাত্রও ছিল না, আমি তাহা পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারি নাই। পলকে সে ভ্রম

আমার ভাঙ্গিয়া গেল, যুবতী বিনা বাক্যে আমার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া দেখিল ;—কি ঘৃণাপূর্ণ কি তীব্র সে চাহনী! তাহার পর সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া গাহিতে আরম্ভ করিল ; কিন্তু আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা নহে ;—সে এক মর্ম্ম বিদারক গাথা। সেই গাথা, গাহিবার গুণে আমার মনে হইতে লাগিল, যেন তাহা আমার অনুরোধের প্রতি তীব্র উপহাস করিতেছে। এরূপভাবে পূর্ব্বে আমি আর কখনও উপহাসাস্পদ হই নাই! এত অপমান আর জীবনে কখনও সহি নাই। সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে আমি স্কোয়্যারের নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বৃদ্ধ রসেটও কোন কথা কহিলেন না, ভাবে বোধ হইল যেন তিনি হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরে লোকমুখে শুনিলাম যে, বৃদ্ধ রসেট্ সকল কথা শুনিয়া পুত্র কণ্যাগণের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প'ড়িলেন এবং অকথ্যভাবে গালি দিতে লাগিলেন। যাহা হউক, আমি কখনও স্বপ্নেও যাহা ভাবি নাই পরে তাহাই সত্য হইল। তাহার পরদিন সন্ধ্যার সময় টম্ স্বয়ং আসিয়া আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং সেদিন সান্ধ্যভোজনে যোগদান করিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতে লাগিল ;—সে একরূপ 'নাছোড় বান্দা'! অগত্যা আমায় তাহার কথায় সম্মতি দিতে হইল। সে বলিল,—"সে দিন আমি যে আপনাকে গালি দিয়াছিলাম, সে জন্য মনে করিবেন না যে, আমরাও গোপন ব্যবসায়লিপ্ত ; আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির মধ্যে বড় একতা মহাশয়! একজন কেহ মরিলে বা মার খাইলে আমরা সকলেই তাহার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকি। সকলেই আমাদের ভাইয়ের মত!"

তাহার এই সকল চাতুরীপূর্ণ কথা শুনিয়া আমার মনের সকল সন্দেহ দূর হইল এবং তাহার অন্তর এত মহৎ ভাবিয়া মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিলাম। তাহার আগ্রহাতিশয্যেও বাস্তবিকই যে তাহাদিগের সকল দোষ আমি ক্ষমা করিলাম, ইহার প্রমাণ স্বরূপ আমি সে রাত্রে রসেট্-পরিবারের আতিথ্য স্বীকার করিলাম। আমি সেদিন টমের হঠকারিতায় সন্দিহান হইয়াছিলাম বলিয়া মনে যথেষ্ট অনুশোচনা হইতে লাগিল। আমি সম্মত হইলে টম্ সাতটার সময় আমার জন্য গাড়ী পাঠাইবে বলিয়া চলিয়া গেল।

সে রাত্রে রসেট্‌দের বাটী গিয়া বুঝিলাম, টমের ক্ষমা প্রার্থনার অভিনয় নিতান্ত মিথ্যা নহে। অবশ্য মিস্ রাথ সে দিনের ব্যবহারের পর যতটা

সম্ভব সরলভাবে আমার অভ্যর্থনা করিল। অন্যান্য কুমারীরাও সরলভাবে অভ্যর্থনা করিল। ভোজন-সময়ে বৃদ্ধ রসেট্ আমার সাচ্ছন্দে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং কুমীরাও অন্যান্যদিন অপেক্ষা বেশ সহজ সরলভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, কিন্তু মিস্ রাথের মুখ দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল কি যেন একটা অধীনতার ছবি তাহার মুখে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছিল; সে যেন আপনহারা। অন্যের ইচ্ছায় পরিচালিতা! মোটের উপর সে দিন আমাদের মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিল।

ভোজন-শেষে আমরা বৈঠকখানায় গিয়া বসিলাম। মিস্ রাথ বীণা বাজাইয়া আমার পূর্ব্বকথিত গীতটি গাহিল। তাহার পর আরও কয়েকটী প্রণয়-সঙ্গীত গাহিয়া নিম্নস্বরে আপন মনে গান গাহিতে লাগিল। তখন সমস্ত ঘরটি নীরব! কেবল মিস্ রাথের কোমল-কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুর স্বর বীণার করুণ রাগিণীর সহিত মিশিয়া সারা ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল! কি সুন্দর সে সুর! মোহমুগ্ধের মত আমি মিস্ রাথের অনিন্দ্য সৌন্দর্য্যে নিবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ চোখ তুলিয়া বৃদ্ধ রসেটের দিকে চাহিতে আমি আজকার এরূপ সখ্যতার কতকটা কারণ বুঝিতে পারিলাম,—দেখিলাম, বৃদ্ধ ক্রুদ্ধ নেত্রে উপর্য্যুপরি কণ্যাগণের দিকে চাহিতেছিলেন এবং নীরব ভাষায় শাসন করিতেছিলেন। কাজেই নিরুপায় কুমারীগণ আপনাদিগের স্বাধীনভাব গোপন রাখিয়া পিতার মতানুসারেই চলিতেছিল। তিনি যে ইচ্ছা করিলেই তাঁহার পুত্র কন্যাগণকে আপন মতে চালাইতে পারেন, ইহা তাঁহার কম গৌরবের বিষয় নহে; কিন্তু ইহা আমার আদৌ ভাল লাগিল না; এরূপ কৃত্রিম বন্ধুত্বে প্রয়োজন কি?

প্রথম চিন্তায় আমার মনে হইয়াছিল, এরূপ জোর করিয়া আতিথেয়তা প্রদর্শন আমি অনুমোদন করিব না, তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করিব; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলাম, তাহাতে আমার নিজেরই নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইবে এবং পরে হয়ত কখনও তাহাদের নিকট আসিবার সুযোগ পাইব না। আমার তখন সেখানে একটা টান পড়িয়া গিয়াছিল, সত্য কথা বলিতে কি, আমি মিস্ রাথকে প্রণয়ের চক্ষে দেখিতেছিলাম! আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, একদিন সকল কুমারীকেই দেখাইব যে, আমি তাহাদের বন্ধুত্বলাভের অযোগ্য নহি। প্রায় এক সপ্তাহের মধ্যে আমার মনে হইল যে, সে চেষ্টা একেবারে বিফল হয় নাই। কারণ আর কোন দিন বৃদ্ধ রসেটকে সেরূপ

চোখ রাঙাইয়া বন্ধুত্বের ভাণ করাইতে হয় নাই এবং তাহাদিগের হস্তে আমায় অর্পণ করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে স্থানান্তরে যাইতে পারিয়াছিলেন।

এখন আমি প্রত্যহই সে স্থানে গতায়াত করিতাম। আমি যে রসেট্-পরিবারের একজন বন্ধু তাহার নিদর্শন স্বরূপ ভোজন-টেবিলের একদিকে আমার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান খালি থাকিত। আমি ও মিস্ রাথ যে এক সঙ্গে থাকিতে ভালবাসি তাহা সে পরিবারের মধ্যে কাহারও অজানিত ছিল না। সেই জন্যই অনেক সময় অন্যে আমাদের দুই জনকে একত্র রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইত। মিস্ রাথ যখন আধ-লজ্জাপীড়িতা ভাবে আমার নিকট বসিয়া থাকিত, তখন তাহার সেই অনন্যসাধারণ রূপ আরও শতগুণে বাড়িয়া উঠিত। তাহার তখনকার অবস্থা দেখিলে, সে যে আর আমায় ঘৃণা করে, এরূপ মনে হইত না বরং অল্প অল্প ভালবাসিতেছে বলিয়াই বোধ হইত।

কখনও কখনও হয়ত যখন তাহারা ছয় ভগ্নীতে স্নান করিয়া আসিত, এরূপ সময় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আবার তাহাদিগকে জলে টানিয়া লইয়া যাইতাম এবং মিস্ রাথের গামছা জলে ভাসাইয়া দিয়া দুই জনে সেটাকে ধরিতে যাইতাম। এইরূপে প্রায় সর্ব্বদাই আমি তাহাদের সহিত মিশিতাম কিন্তু তখনও মিস্ রাথকে ঠিক চিনিতে পারি নাই।

একদিন মিস্ রাথ বলিল,—"রোজ রোজ আর জলে সাঁতার দেওয়া ভাল লাগে না, এবার মনে করিতেছি, সহরের সীমান্তের দিকে বেড়াইতে যাইব।"

আমি তাহার সহিত যাইতে চাহিলে সে সানন্দে তাহা অনুমোদন করিল। ইহা হইতে আমি বুঝিলাম যে, সে আমায় একটু ভালবাসিয়াছে; অল্প হইলেও মঙ্গলের বিষয়।

সেইদিন হইতে মিস্ রাথের ভগ্নীরা যখন প্রাতঃস্নানে যাইত, তখন আমি তাহাকে লইয়া সহরের প্রান্তভাগে বেড়াইতে যাইতাম। আমি প্রায় এক মাস এমনি ভাবে তাহার সহিত বেড়াইতে যাইতে লাগিলাম। কোন কোন দিন তাহারা স্নান করিয়া আসিতেছে, এরূপ সময়ে আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে আবার তাহাদের জলে টানিয়া লইয়া যাইতাম। এরূপ অবস্থায় মিস্ রাথ না থাকিলে আমায় বড় বিপদে পড়িতে হইত। আমি বেড়াইতে গিয়া কেবল তন্ময়ভাবে মিস্ রাথের রূপ দেখিতাম। আমার মনে হইত, আমি যে মিস্ রাথকে ভালবাসিতাম তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। আমার এরূপ

মনে করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল,—প্রায়ই আমি তাহার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করিতাম!

অবশেষে একদিন আমার এই বিয়োগান্ত নাটকের যবনিকা পড়িল। দেখিলাম, মিস্ রাথের ভগ্নীরা নিয়মিত ভাবে স্নান করিতে আসিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে মিস্ রাথ ছিল না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম; মিস্ রাথ রাস্তার মোড়ের কাছে বিশ্রাম করিতেছে, সেইখানে গেলেই আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে। আমি দ্রুতবেগে তাহার উদ্দেশে চলিতে লাগিলাম। মোড়ের নিকট গিয়া টমের ক্রুদ্ধস্বর শুনিতে পাইলাম। বোধ হইল সে যেন কি একটা প্রশ্ন করিতেছে, আর তাহার ভগ্নী তাহার উত্তর দিতে চেষ্টা করিতেছে। আমি ঘাসের উপর দিয়া আসিতেছিলাম, কাজেই তাহারা আমার আগমন বিষয় বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিল না। যখন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব কিনা ভাবিতেছিলাম, তখন হঠাৎ তাহাদের মুখে আমার নাম শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। আমার মন তখন মিস্ রাথের উত্তর শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। আমার হৃদয়ে বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণার সহিত মিস্-রাথের অবজ্ঞার হাসি শুনিতে লাগিলাম। তাহার পর সে বলিতে লাগিল,—"না টম্, তুমি যাহা বলিয়াছিলে আমি তাহার অতিরিক্ত একটুও করি নাই। তুমি বলিয়াছিলে যখন গোপন ব্যবসার মাল বোঝাই হইবে, তখন আমি তাহাকে সেখান হইতে দূরে রাখিব। সেই জন্যই আমি তাহাকে লইয়া বেড়াইতে যাই। তুমিও তাহাকে যেমন ভালবাস আমিও তেমনি জানিবে। যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহা হইলে আমার সহিত একদিন যাইয়া দেখিতে পার। তাহাতে পিতারও সন্তোষ সাধন করা হইবে। শুধু তাহাই নহে, গোপন ব্যবসায়ীরাও সেই সুযোগে অনেক কাজ করিয়া ফেলিতে পারিবে।" তাহার পর আবার সেই বিদ্রূপের হাসি! কি যন্ত্রণাদায়ক।

উত্তরে টম্ বলিল,—"আমি যদি একদিন যাই, তবে সে দিন আর ব্যাটাকে জীবন্ত রাখিব না; ঘাড় মুচড়াইয়া মাটির মধ্যে পুতিয়া আসিব। ব্যাটা পাজীর শিরোমণি।"

আমি মোড় পার হইয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমায় দেখিয়া মিস্ রাথ ভয়ে কি একটা অব্যক্ত চীৎকার করিয়া উঠিল। ভয়ে তাহার মুখখানি পাংশু বর্ণ ধারণ করিয়াছিল।

আমি মিস্ রাথের দিকে চাহিয়া বলিলাম,—"বেশ মিস্ রাথ, তোমার

বাহাদুরী আছে; মানুষের হৃদয় লইয়া খেলা করিতে তুমি বেশ পটু দেখিতেছি। মনে রাখা উচিত, মানবের হৃদয় বালিকার খেলার পুতুল নহে।"

মিস্ রাথ আমার কথার কোন উত্তর দিতে চেষ্টা করিল না. আমিও তাহার জন্য বিশেষ উৎসুক ছিলাম না। টমের দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—"মিঃ টম্ এতদিন তুমি যে ক্ষমতার গর্ব্ব করিয়া আসিয়াছ আজ বোধ হয় তাহার পরীক্ষা দিতে কুণ্ঠিত হইবে না?"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া একেবারে তাহার উপর গিয়া পড়িলাম; সে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। আমার বোধ হইল, মিস্ রাথ তখন কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে আমি বিচলিত হইলাম না; সে একবার আমায় ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু আমি তাহাকে সে সুবিধা দিই নাই; দূরে পড়িয়া গেল। আরও আট দশবার টম্ আমায় ধরিতে চেষ্টা করিল কিন্তু প্রতিবারেই মার খাইয়া দূরে হটিয়া গেল। আমি দেখিলাম, সে যেরূপ ভারি ও বলবান্ তাহাতে একটু সুবিধা পাইলেই আমায় চাপিয়া ধরিবে, সুতরাং ভদ্রতার সহিত কার্য্য করা সে ক্ষেত্রে এক প্রকার অসম্ভব। বিশেষতঃ তখন তাহাকে বেশ একটু ভাল রকম শিক্ষা দিবার ইচ্ছা আমার মনে একান্ত বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল; কাজেই প্রাণপণে তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে পরাস্ত হইল। ইলেক্‌ট্রিক ব্যাটারী দিলে মানুষ যেমন কাঁপিতে থাকে, তাহার সারা দেহটাও তেমনি কাঁপিতে ছিল; আমি এক ধাক্কায় তাহাকে ভূমিশায়ী করিলাম। নড়িবার পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাহার তখন ছিল না, কাজেই মড়ার মত স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল। অনতিদূরেই মিস্ রাথ দাঁড়াইয়াছিল; মৃতের ন্যায় তখন তাহার মুখখানি রক্তশূন্য; তাহারও সমস্ত দেহটী কাঁপিতেছিল।

আমি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—"মিস্ রাথ, টম্ গোঁয়ার হইলেও পুরুষ মানুষ; কিন্তু তুমি কি?"

তাহার পর আমি যে পথে আসিয়াছিলাম, সেই পথেই দ্রুতবেগে বাসায় ফিরিয়া গেলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্মৃতি।

যবে স্বপনের ঘোরে দেখে'ছি তোমার
সুষম সুন্দর ছবি।
হৃদয়-প্রস্তরে রেখে'ছি খুদিয়ে
জীবন-মঙ্গল রবি!
মনে পড়ে আজো বদন সুহাস
ললিত নয়ন-ঠার;
বীণার ঝঙ্কার সুরস বচন
বিমল আনন্দ-ধার।
কেন বা আসিলে কেন চলে গেলে
সুখের স্বপন ভেঙ্গে,
আকাশের গায় ক্ষিপ্ত গ্রহপ্রায়
চঞ্চল চরণ রঙ্গে।
ওগো সারা জীবনের কোহিনুর মণি
বিপদের ধ্রুবতারা,
পুড়িলাম তব বিরহ-অনলে
সারাটী রজনী ভরা।
তোমার মঙ্গল রাতুল চরণে
জীবন-বাসনা যত
দিয়েছি সঁপিয়ে প্রথম সাক্ষাতে
প্রিয় উপহার মত।
যাহা আছে মোর তাহাও তোমার
আমার কি আছে প্রভো?
হয়েছি এখন আপনাকে হারা
তোমারে হারায়ে বিভো!
ফিরে কবে আর ওহে দীনবন্ধো
দিবে মোরে দরশন,
মধুর নিশিথে আশার-সুসার
হবে মোর সম্পাদন।

শ্রীমতী যামিনীপ্রভা।

স্বামী ও স্ত্রী।

পিতামাতা আজকাল যেমন পুত্রদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন, কন্যাগণকেও সেইরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ শিক্ষা পুত্র-দিগের শিক্ষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ বিবাহিতা হইবার পর কন্যার জীবন ভিন্নপথে পরিচালিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে শিক্ষা দেওয়া হইত, সে শিক্ষা কেবল তাহার স্বামী ও স্বামি-গৃহসংক্রান্ত শিক্ষা। এ সম্বন্ধে ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার প্রমাণ। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধন-রত্ন-সমন্বিতা॥
অজ্ঞাত-পতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতি-সেবনাম্।
নোদ্বাহেৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥

ইহাতে কন্যার শিক্ষা কিরূপ তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এ শিক্ষার উপর আমাদের সমাজের উন্নতি প্রত্যক্ষভাবে অবস্থান করিতেছে। কারণ, সমাজের উন্নতি গৃহের উন্নতি-সাপেক্ষ। স্ত্রীলোকের প্রতি গৃহের সমস্ত ভার অর্পিত হয়। সেই সকল কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন গুরুতর কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের সমাজের ও দেশের দুর্ভাগ্য যে, পিতামাতা কন্যাকে শিক্ষাদানে সম্পূর্ণ উদাসীন। পিতা কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আপন কর্ত্তব্য বহির্ভূত বলিয়া মনে করেন। অধুনা কেবল কন্যার ভরণপোষণ যাহাতে সম্পন্ন হয়, সেই দিকে কেবলমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া, কন্যাকে যথাসম্ভব সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু পূর্ব্ব-কালে পিতা কন্যাকে ধর্ম্মশিক্ষা দান করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না, কন্যাকে রীতিমত ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষাবলে পূর্ব্বকালের স্ত্রীলোকগণ আজিও জগতে চিরস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন; তাহারা শিক্ষাগুণে স্বামিগৃহের প্রকৃত শোভা সংবর্দ্ধন করিতেন। স্বামীকে আপন জীবনের একমাত্র আরাধ্য দেবতা বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। এই শিক্ষাগুণে দ্রৌপদী পাণ্ডবকুলের ও সীতা রঘুবংশের গৃহলক্ষ্মী হইয়াছিলেন। বিবাহান্তে

স্বামি-গৃহ-প্রেরণকালেও মহর্ষি কণ্ব, কন্যা শকুন্তলাকে কি মধুর উপদেশ দিয়াছিলেন—

শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ॥
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী।
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামা কুলস্যাধয়ঃ॥

তুমি এস্থান হইতে পতিগৃহে গমন করিয়া শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনকে সেবা করিবে, সপত্নীজনের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করিবে। স্বামী অবমাননা করিলেও ক্রোধবশতঃ তাহার প্রতিকূলাচরণ করিও না, পরিজনের প্রতি অত্যন্ত অনুকূল হইবে। অভ্যুদয়ে অহঙ্কৃত হইও না। যুবতীগণ এইরূপে গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, প্রতিকূলচারিণীগণ গৃহের যন্ত্রণা স্বরূপ।

এরূপ উপদেশ যে কেবলমাত্র একবার দিলেই কন্যা পালন করিবে, তাহা আশা করা যায় না, কিন্তু পিতার নিকট শিক্ষিতা কন্যা এ উপদেশ কেন পালন করিবে না? দুঃখের বিষয়, আজকাল কণ্বের ন্যায় পিতা দুর্লভ। পিতা শিক্ষাবিষয়ে উদাসীন হইলেও স্বামী উদাসীন হইলে চলিবে না। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যথেষ্ট প্রভুতা আছে।

'পত্যুঃ দারেষু প্রভুতা সর্ব্বতোমুখী।'

ভৃত্যের প্রতি প্রভুর যে প্রভুতা, এ সে প্রভুতা নহে; এ প্রভুতায় স্বামী স্ত্রী উভয়েরই দায়িত্ব রহিয়াছে। 'ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে'। স্বামী স্ত্রীকে যৌবনে রক্ষা করিবেন। এ রক্ষা কেবল বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা ও ভরণ-পোষণে পর্য্যবসিত হয় না। স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ অতি পবিত্র। হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে একথা স্বীকার করিয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে বিলাসের ক্লেদ-কর্দ্দম মিশ্রিত নাই। এ সম্বন্ধ অতি পবিত্র ও স্বর্গসম উচ্চ। সেই নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ অবিবাহিত জীবনকে অসম্পূর্ণ বলিয়া থাকেন।

হিন্দুরমণীগণ পিতার নিকট হইতে শিক্ষা পান, আর নাই পান, কিন্তু স্বামী যে পরম দেবতা তাহা তাহারা আপন হইতে জানিতে পারেন। এই ধারণা স্বভাবতঃ তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, কিন্তু সংসারের কর্ম্মময় পথ বিঘ্ন-বহুল। এই বিঘ্নবহুল পথে নিষ্কণ্টকে ভ্রমণ করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। বাল্যকালে যে পিতামাতার স্নেহক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছে,

যে ভ্রাতা-ভগ্নীর সহিত একত্র বাস করিয়াছে, তাহাদিগকে অকাতরে পরিত্যাগ করতঃ একজন অপরিচিত যুবকের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকা স্ত্রীলোকের পক্ষে বহু ত্যাগ স্বীকার বলিতে হইবে। রমণী ভিন্ন আর কেহ এ ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে না। স্বামিগৃহে আসিলে তাহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য যাহাতে সে পিতামাতা প্রভৃতির বিচ্ছেদ অনুভব করিতে না পারে ; যাহাতে পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিলেও সে যেন শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে পিতামাতার স্থানীয় বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। শ্বশুর ও শ্বশ্রূ নববধূকে আপন কন্যার ন্যায় পালন করতঃ যেন তাহার পিতামাতার বিচ্ছেদজনিত শোকের লাঘব করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু যদি আদর যত্নের পরিবর্ত্তে যন্ত্রণার নির্ম্মম কশাঘাতে তাহার অস্থিপঞ্জর ভগ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার আক্ষেপের সীমা থাকে না, গৃহ অশান্তির আবাসভূমি হইয়া উঠে। একে ত বাল্যকালে তাহার ভাগ্যে শিক্ষালাভ ঘটে নাই, তাহার উপর স্বামী ও স্বামি-গৃহের অযথা উৎপীড়নে তাহার মনে কিরূপ কষ্ট হয় বল দেখি ?

হায়! হিন্দুর পবিত্র সংসারে এইরূপে চক্ষুজলে কত রমণী বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। রমণী যাহাকে সুধা মনে করিয়া পান করেন, তাহা যদি গরলে পরিণত হয়, যাহাকে সুরস বৃক্ষ বলিয়া আশ্রয় করেন, তাহা যদি বিষবৃক্ষে পর্য্যবসিত হয়, তাহা হইলে তাহার অন্তঃকরণে কিরূপ অননুভবনীয় মর্ম্মান্তিক ক্ষোভের উদ্রেক হয় ? যে সংসার রমণীর অশ্রুপ্রবাহে কলুষিত হয়, সে সংসারে কখনও উন্নতি হয় না।

সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা ভর্ত্রা ভার্য্যা তথৈব চ।
যস্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ ধ্রুবং ॥

যে কুলে স্বামী স্ত্রীতে ও স্ত্রী স্বামীতে অনুরক্ত থাকেন, সে কুলের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রমণী হীরক-সদৃশ। শিক্ষাদ্বারা রমণীকে বশীভূত করিয়া লইতে পারিলে, তাহা হইতে যেমন শান্তির পুণ্যস্রোত প্রবাহিত হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। বিধাতা রমণীকে অত্যন্ত কোমলতাময়ী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য কি ? মানবের রুক্ষস্বভাব ইহার সংস্পর্শে নম্রভাব ধারণ করিবে। অনেক সংসারে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির আবির্ভাবের একমাত্র কারণ এই যে, তত্রত্য রমণীগণ শিক্ষিতা নহেন, অথবা

তাহারা অধিকতর উৎপীড়িতা হন। স্বামী স্ত্রীকে পীড়ন করিতে থাকিবেন আর স্ত্রী স্বামীকে আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতে থাকিবে এরূপ আশা করা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু হিন্দুসমাজে এমন স্ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা স্বামীর উৎপীড়ন সত্ত্বেও তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু এরূপ স্ত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। অত্যন্ত পীড়িত হইলে মানবের মন সহজে বিচলিত হইতে পারে। নম্রস্বভাবা রমণীগণ যে বিচলিত হইবেন না এরূপ আশা করা যায় না। তাহারা স্বামীর পীড়নে সময়ে সময়ে পাপ-পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য হন, পবিত্র সম্বন্ধ ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যান। অতএব পত্নী যদি কুপথগামিনী হন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তজ্জন্য পত্নী অপেক্ষা স্বামী অধিকতর দোষী,—কারণ পত্নীর প্রতি স্বামীর ভালবাসার হ্রাস না হইলে পত্নী কখনও স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করে না।

ভালবাসা স্বর্গীয় পদার্থ। যে স্থানে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া একজন আর একজনকে ভালবাসে, সে স্থানে ভালবাসার নাম প্রকৃত ভালবাসা এবং এইরূপ ভালবাসাই সকলের অভিলাষণীয়। ইহা ব্যতীত অপর কোন কারণ বশতঃ ভালবাসা অপেক্ষা নীচ ভালবাসা আর নাই। স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধেও এইরূপ। স্ত্রী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া স্বামীকে ভালবাসিতে না পারিলে, তাহাদের ভালবাসা ভালবাসাই নয়। দুর্দান্ত স্বামীকে স্ত্রী যে ভালবাসে সে ভালবাসা স্ত্রীর আন্তরিক ভালবাসা বলিয়া বোধ হয় না। স্বামীর অযথা পীড়নের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত যে ভালবাসা, সে ভালবাসা মৌখিক ভালবাসা মাত্র। কিন্তু যেখানে স্বামী স্ত্রীকে আপন আত্মজ্ঞানে ভালবাসিয়া থাকেন, সেখানে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তিপূর্ণ ভালবাসা যথার্থ ভালবাসা। এরূপ ভালবাসা অনেকের ভাগ্যে ঘটে না। ভগবান্ মহাদেব পত্নীপ্রেমে আপন অর্দ্ধাঙ্গ স্ত্রী-দেহে পরিবর্ত্তিত করিয়াও আশার পরিতৃপ্তি করিতে পারেন নাই। স্ত্রীর প্রতি এরূপ গাঢ় অনুরাগ বশতঃ কেহ কেহ স্ত্রৈণ বলিয়া আখ্যাত হন। কিন্তু স্ত্রৈণ শব্দের অর্থ—বিভিন্ন। স্ত্রৈণ অর্থে স্ত্রীর বশীভূত। শাস্ত্র বলিয়াছেন, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যথেষ্ট প্রভুতা আছে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নীচ প্রভুতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্ত্রৈণ বলে। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে সদুপদেশ দান করিতে পারেন। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই প্রভুত্ব নীচ নহে, অতি উচ্চ। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীর বিপদে সম্পদে আপনাকে বিপদ্গ্রস্তা ও সৌভাগ্যবতী বলিয়া বিবেচনা করেন। স্ত্রী

সহধর্ম্মিণী, স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। বিপদে সান্ত্বনাদায়িনী, পীড়ায় শুশ্রূষা-কারিণী, দুঃখে আরামদায়িনী। ইহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ সমাজ-বিরুদ্ধ, সাধারণ বুদ্ধি-বিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

হিন্দু যুবকগণ! যদি সমাজের কল্যাণ কামনা করেন, যদি সংসার-মরুভূমে পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর স্বচ্ছ বারিরাশির ন্যায় শান্তি স্রোত প্রবাহিত করিতে চান, তাহা হইলে আপন আপন নিষ্ঠুর প্রকৃতি পরিত্যাগ করুন, সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্ম-শিক্ষা ও শ্বশুর-শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার শিক্ষা দিতে সচেষ্ট হউন।

শ্রীসূর্য্যকুমার মাইতি।

নিবেদন।

(১)

প্রভো! তোমারি কৃপায়, নরদেহ পেয়ে,
এ ভব-ভবনে এসেছি।
এমন মহান্, মানব জনম,
তব করুণায় পেয়েছি॥

(২)

তোমার দয়ায়, আসিয়া এ ভবে,
তোমারে ভুলিয়া র'য়েছি।
ভ্রমেও বারেক, ডাকি না তোমায়,
এমনি অজ্ঞান হয়েছি॥

(৩)

তুমি দয়াবান্, তাই এত দয়া,
এমন অপাত্রে ফেলেছ,
কৃতঘ্ন পামরে, তব স্নেহ-ছায়ে,
সদা সুশীতল রেখেছ॥

(৪)

তোমার আদেশ, অবহেলা করি,
ভাল প্রতিদান দিয়েছি,
যে পথে যাইতে, নিষেধ তোমার,
সে পথে সতত গিয়েছি॥

(৫)

এবে দণ্ড দাও, ওগো দণ্ডধর!
চাহি না তোমার করুণা।
দিবে কোন দণ্ড, দাও শীঘ্র করি,
অধিক বিলম্ব ক'র না॥

(৬)

আপন বলিতে, যা আছে আমার,
সকলি লওগো হরিয়া,
শ্রীপদ-কারায়, জনমের তরে,
রাখ হে আবদ্ধ করিয়া॥

(৭)

যদি বাঞ্ছা হয়, দাও দ্বীপান্তরে,
ভব-সিন্ধু পার করিয়া,
জন্ম-জন্মান্তরে, ভুবন-মাঝারে,
নাহি আসি পুনঃ ফিরিয়া॥

(৮)

অযাচিত দয়া, পেয়েছি তোমার,
এবে নিবেদন চরণে।
দণ্ড দাও প্রভু, লইব সাদরে
পালিব জীবনে মরণে॥

শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ।

পিশাচ-লীলা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নীরদবাবু ও বীরচাঁদ।

বীরচাঁদ মোহনলালের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাজপথে আসিয়া পড়িল। আজ বীরচাঁদের মনটা অতি প্রফুল্ল, আশাতিরিক্ত অর্থলাভ করিয়া সে বিশেষভাবে স্ফূর্ত্তি করিবার জন্য সন্নিকটবর্ত্তী একটা শৌণ্ডিকালয়ে প্রবেশ করিল। তখন দোকানে খরিদ্দারের যথেষ্ট ভিড় থাকিলেও বীরচাঁদের কোনরূপ অসুবিধা হইল না। দোকানদার নিজে বীরচাঁদকে খাতির করিয়া একটা পৃথক আসনে বসাইল। দোকানের ভৃত্য একটা মাটীর পূরিয়া ও এক বোতল মোউয়া মদ আনিয়া দিল। বীরচাঁদ অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টিতে ভৃত্যের পানে চাহিয়া তাহাকে চাটের জন্য দুই পয়সা কড়াইভাজা আনিতে হুকুম করিল। ঠিক এই সময়ে শতচ্ছিন্ন মলিনবাস পরিহিত একজন ভিক্ষুক বীর-চাঁদের সম্মুখে আসিয়া দীনবচনে বলিল,—"দয়া করে যদি দুই এক গেলাস দাও, তাহলে বড় উপকার হয়। দুদিন এক ফোঁটাও পেটে পড়েনি।"

বীরচাঁদ কোন জবাব না দিয়া ধীর ভাবে বোতল হইতে এক পূরিয়া মদ উদরস্থ করিল। পরে বিকৃত বদনে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল,—সত্যিই কিছু হয়নি ?"

আগন্তুক। না, এক ফোঁটাও না।

বীরচাঁদ। তবে বেশ স্ফূর্ত্তি করে দু-এক গেলাস টান—তারপর কথা-বার্ত্তা হবে।

আগন্তুক আর বিলম্ব না করিয়া বোতল হইতে দুই এক পূরিয়া উদরস্থ করিল। পূর্ব্বেই ভৃত্য বীরচাঁদের পার্শ্বে কড়াইভাজা রাখিয়া গিয়াছিল। বীরচাঁদ সেই কড়াইভাজা একমুঠা চিবাইতে চিবাইতে বলিল,—"এটাও চলুক না। যদি দরকার হয়, তা'হলে খরচে পেচ্‌পাও হবো না। টাকার জন্যে কুচ পরওয়া নেই।"

আগন্তুক তীব্রভাবে বীরচাঁদের পানে চাহিয়া বলিল,—"আপনি দেখচি ঘরয়োনা-ঘরের ছেলে। ঠিক লোকের কাছে ভগবান আশ্রয় দিয়াছেন।"

বীরচাঁদ। এখন বাজে কথা থাক্, তোমার ব্যাপারটা কি বল দেখি?

আগন্তুক। কপাল মন্দ—আজ হপ্তা খানেক হ'লো 'সরকারী হোটেল' থেকে বেরিয়েছি। বেরবার সময় কোন্ শালা অনামুখোর মুখ দেখে এসেছি, সেই দিন থেকে একটাও শীকার যুটে নি।

বীরচাঁদ। তবে ত তুমি ওস্তাদ লোক। কতদিন জেলে ছিলে?

আগন্তুক। তা তোমার মা-বাপের আশীর্ব্বাদে ছ'বছর।

বীরচাঁদ। কিসের জন্যে জেলে গিয়াছিলে?

আগন্তুক। তাও শুন্‌তে হবে? পথের উপর রাহাজানী করে ধরা পড়েছিলুম।

বীরচাঁদ। এত কথা হ'লো, কিন্তু আসল কথাটা ভুল হয়ে গিয়েছে। তোমার নামটাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এখন এস, আবার দুই এক পাত্র চালান যাক্, তারপর কথাবার্ত্তা হবে।

বীরচাঁদ আবার চালাইতে সুরু করিল। এবার কিন্তু আগন্তুক মদ্য-পান না করিয়া গোপনে কাপড়ে ঢালিয়া ফেলিতে লাগিল। বীরচাঁদ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল।

আগন্তুক গানের মাত্রায় একটা তাল দিয়া 'বাহবা' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পরে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আমার নাম মহাবীর পাঠক। আগ্রার মহাবীর পাঠকের নাম হয় ত তোমার অশ্রুত নহে?"

বীরচাঁদ। নামটা শুনেছিনু বটে, কিন্তু আলাপ হয় নি। তা বেশ আজই তোমাকে একটা কাজ দিতে পারি।

মহাবীর। পয়সার জন্যে পারি না এমন কাজই নেই। খুন বল, ঘরে আগুন দেওয়া বল, মাথা ফাটান বল, টাকা পেলে কিছুতেই ডরাই না।

বীরচাঁদ। এই রকম বাহাদুর লোকেরই আমার অভাব হয়েছিল; যখন এসেছ, ভালই হ'য়েছে। তবে চল, আমাদের পুরোণো আড্ডায় যাই,—সেইখানে কথাবার্ত্তা হবে।

মহাবীর। সে আড্ডাটা কোথায়?

বীরচাঁদ। কেন বাঙ্গালীটোলার কামিনী মাসীর আড্ডা। তুমি কি কখনও সেখানে যাও নি?

মহাবীর। বহুবার, তবে অনেক দিন যাইনি, সেইজন্যে ভুলে গেছি।

বীরচাঁদ। মাসীর বাটীতে যাবার সঙ্কেত কথাটা তা হলে তোমার জানা আছে।

মহাবীর হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তা আর থাক্‌বে না?"

বীরচাঁদ। তবে আর দেরী কেন? উঠা যাক, এই বলিয়া বীরচাঁদ দোকানদারকে তাহার প্রাপ্য গণ্ডা চুকাইয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাশীর বাঙ্গালী টোলার যে অঞ্চলে নিম্নশ্রেণীর বাস, সেই অংশের যে পথটা পূর্ব্বাভিমুখে দশাশ্বমেধের ঘাটের দিকে গিয়াছে—সেই পথের ঠিক মধ্যস্থলে উত্তরদিকে আর একটী খুব অপ্রশস্ত গলি-পথ আছে। এই পথের উপরিস্থ সকল বাটীগুলিই প্রাচীন—দেখিলে মনে হয় যেন দীর্ঘকায় রাক্ষস-দল ভীষণ বদন ব্যাদানে পথবাহীদিগকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে। এই বাটীগুলির ন্যায় বাটীর অধিবাসীদিগের অবস্থাও ভয়াবহ। প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকারে ফেরী করিয়া জীবিকার্জ্জন করিয়া থাকে। কেহ ছেঁড়া নেকড়ার, কেহ শিশি বোতলের, কেহ ভাঙ্গা কাঁচের, আর কেহ কেহ বা পুরণো কাগজের ফেরী করে। এই গলির সর্ব্ব শেষের বাটীখানা—'কামিনী মাসীর আড্ডা' বলিয়া পরিচিত। বাটীখানার অঙ্গবিশেষ কালের কঠোর তাড়নে খসিয়া গিয়াছে—কোন স্থানে চূণের সামান্য মাত্রও চিহ্ন নাই—কখনও জীর্ণ সংস্কার হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না—ঠিক যেন মা-মরা ছেলে। বাটীর সদর দ্বারটা পথ হইতে প্রায় দেড় হাত নীচু। গোল ফটক; বড় বড় পেরেকমারা দুইটা সুবৃহৎ কপাট সদাই ভিতরদিক হইতে বন্ধ। এই ভীষণ বাটীতে কাশীর যত খুনে গুণ্ডার আড্ডা। ছোট ছোট ছোকরা গাঁটকাটা হইতে বড় বড় ডাকাত পর্য্যন্ত সকলেই মাসীর আড্ডার নিত্য বাসেন্দা। কামিনী নাম্নী একটা প্রৌঢ়া রমণী এই আড্ডার আড্ডাধারী বলিয়া সকলে কামিনী মাসীর আড্ডা বলিয়া থাকে। কামিনী মাসী কালে যে সুন্দরী ছিল, এখনও তাহার দেহের লাবণ্য দেখিলে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু অনবরত নেশা ও রাত্রিজাগরণ ও অপরাপর অত্যাচার জন্য সেই লাবণ্য-জ্যোতিঃ হীন হইয়া গিয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, কামিনী ভদ্র কুলাঙ্গনা

ছিল। গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কাশীতে আসিয়া অসৎসঙ্গে কুপথগামিনী হইয়াছিল। কাশীর সমস্ত বদমাইসই কামিনীকে "মাসী" বলিয়া সম্ভ্রম করিত। মাসীও সকলকেই বিহিত সম্মান দানে ব্যবসায় বজায় রাখিত।

মাসীর বাটীটা ত্রিতল। প্রথম তলের সম্মুখেই প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ পার্শ্বে মহামায়ার মন্দির। প্রাঙ্গণে বসিয়াই নরমুণ্ড-মালিনী খর্পরধারিণী লোলজিহ্বা দিগ্‌বসনার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যে মায়ের করুণাধারায় জগতের সমগ্র পাপী তাপী তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছে—মাসীর বাটীতে সেই করুণাময়ীই—দস্যুদলের আরাধ্যা, তাহাদের দুষ্কৃতি সাধনের সহায়তাকারিণী বলিয়া পরিচিতা। চোর ডাকাইতেরা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মায়ের পূজা মানস করে—আবার আশা পূর্ণ হইলে মানসিক দিয়া থাকে। জানি না, মা আমার কি মায়ার প্রপঞ্চে জগতকে মুগ্ধ রাখিয়াছেন। মা, তোমার মহিমা তুমিই জান। আমরা অধম জীব, তোমার লীলা আমাদের অজ্ঞেয়! সাধারণ বুদ্ধিতে ত তোমার প্রকট লীলার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না। লোকে তোমাকে জগন্মাতা বলিয়া আরাধনা করে। মায়ের মত দয়া গুণ বিভূষিতা—সন্তানের দুঃখে সদাই মুহ্যমানা—তবুও মা তোমার সন্তোষের জন্য—তোমার করুণ দৃষ্টির জন্য—অসহায় ছাগ-রক্তে তোমার অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত পদতল রঞ্জিত করি। 'রক্তে মায়ের তৃপ্তি' ইহাই কি মা শাস্ত্রাদেশ? ছাগশিশুর অকলঙ্ক রক্ত না হলে কি মা তোমার পেট ভরে না? ব্রহ্মাণ্ডোদরী প্রকৃত পথ দেখিয়ে দে মা· সামান্য বুদ্ধিতে ত মনে হয় না যে, মায়ের প্রাণ এত নির্ম্মম হইতে পারে। শাস্ত্র জানি না—জানিতেও চাহি না—শুধু চাহি মা তোমার দয়া। বলে দে মা, তোর কি ভাবে আরাধনা করিব? হৃদয়সঞ্জাত ভক্তি-সিক্ত ফুল-চন্দনই কি তোমার সন্তোষের প্রকৃত পন্থা নয়?

মাসীর বাটীর প্রাঙ্গণে কখন সূর্য্য-কিরণ প্রবেশ করে নাই। প্রাঙ্গণ ত দূরের কথা—বাটীখানাকেই অসূর্য্যম্পশ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বে মাসীর মোউয়া মদের দোকান। মাসীর আশ্রিত একটা লোক বেচাকেনা করিয়া থাকে—তবে ধারে বেচিতে হইলে মাসীর মত লইতে হয়। মাসী ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিতে মজবুত। হতভাগ্য চোর ডাকাইতদিগের স্বোপার্জ্জিত অর্থে তাহাদের কোন কষ্টই দূর হয় না। কেন না তাহারা যাহা কিছু সঞ্চয় করে—প্রভাতের পূর্ব্বে তাহার প্রায় সমস্তাংশই মাসীর করগত হয়। শেষে মাসীই আবার বাঙ্গালার জমীদারদিগের ন্যায়

সওয়াই সুদে তাহাদের টাকা ধার দেয়। সুতরাং মাসী শাঁখের করাতের মত যাইতে আসিতে কাটিতে থাকে। প্রথমতঃ দুর্ব্বৃত্তেরা মাতাল হইলে মাসী মদের পরিবর্ত্তে জল বেচিয়া যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করে। দ্বিতীয়তঃ আবার উচ্চহার সুদে টাকা ধার দেয়। কিন্তু ইহার জন্য মাসীর খাতিরের কণামাত্র ক্ষতি হয় না। মাসী না হইলে তাহাদের এক দণ্ড চলে না। মাসীর বাটীর দ্বিতল ও ত্রিতল পূর্ব্বোক্ত খরিদদারগণেরই উপপত্নী ও তাহাদের গর্ভজাত পুত্র কন্যা দ্বারা পরিপূর্ণ। এক একটী ঘরে এক একটী পরিবার অবস্থান করে। হতভাগ্যেরা যুবতী কন্যা পুত্র ও স্ত্রী সহ একত্র শয্যায় শয়ন করিতে বাধ্য হয়। 'সতীধর্ম্ম' নামে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে—এ বাটীর সংশ্লিষ্ট স্ত্রীলোকদিগের নিকটে তাহা একেবারেই অবিদিত।

এহেন মাসীর আড্ডা আজ ভরপূর। নানা দলে স্ত্রী ও পুরুষে মদ্যুয়া পান করিতেছে। কোন যুবক তাহার যুবতীর কটিদেশ ধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে এলো মেলো বেতালা গান করিতেছে। কেহ বা গানের তাল ও সুর লইয়া কোন একজন সহকারী মদ্যপের সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেছে। কেহ বা মদের নেশায় বিভোর হইয়া সেই বিবাদের মীমাংসা করিতেছে। মোটের উপর আড্ডা ঘরে কোন শৃঙ্খলা নাই। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহাই করিতেছে। কেহ বা নিজ প্রণয়িনীকে অপরের সহিত বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া ঈর্ষায় কটু শপথ গ্রহণ করিয়া চিরদিনের জন্য তাহাকে ত্যাগ করিতেছে—আবার ক্ষণপরেই উভয়ে একত্র বসিয়া মদ্যপান করিতেছে। প্রাঙ্গণের চারিদিক মদের গন্ধে ও তামাকের ধূয়ার উৎকট গন্ধে পরিপূর্ণ। কেহ বা মদের নেশায় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে—পার্শ্বে পতিত ন্যক্কার একটা কুকুরে ভক্ষণ করিতেছে—কাহারও মুখ মাছি দ্বারা পরিপূর্ণ—পরিধৃত বস্ত্র কাহারও মদে সিক্ত। এই প্রাঙ্গণের একদিকে চারি পাঁচটী যুবক ও তিন চারিটী স্ত্রীলোক একত্র বসিয়া মদ্যপান ও গান বাজনা করিতেছিল। এই দলে রঙ্গিলা নাম্নী একটী যুবতী সুগায়িকা একজন উপপতির গলা জড়াইয়া গান করিতেছিল। গানের সহিত বাজনার তাল মানের সংস্রব না থাকিলেও—অনেকেই তাহাদের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া গান শুনিতেছিল। রঙ্গিলা গাহিতেছিল,—

কাঁদিতে জনম লো সই, তাই কাঁদি চিরদিন।
অভাগী কপালে বিধি, লেখে নি সুখ কেমন॥

পর-সাধে সাধ যার, সুখ কোথা ভালে তার,
প্রেমের মধুর ছবি—স্বপন সমান।
জীবন কাটিল বৃথা—না হলো মিলন।

গান থামিলে চারিদিক হইতে 'বাহবা' উঠিল। বিকট চীৎকারে আড্ডা প্রকম্পিত হইয়া পড়িল। প্রতিধ্বনি প্রাচীর গাত্রে সংঘাত হইবার পূর্ব্বেই একজন আড় কথায় বলিল, বিবির গলায় মিছরির টুকরো আছে—কেউ বলিল—না তা নয়, কোকিল আছে, না হলে অমন মিষ্টি সুর হতো না। একজন রসিক যুবক বলিল,—"ও কিছুই হলো না—বিবির পেটে ময়ূয়ার গাছ আছে—তা না হলে গান শুনলে অত নেশা হবে কেন।" আর একজন বলিল, বিবি সাহেব, মেহেরবাণী করে আর একটা গান হউক। রঙ্গিলা আড়নয়নে নিজের উপপতির পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে গাহিল—

সরমে মরম কথা, কহিতে পারি না।
নিজ মনে সুলোচনে বুঝে কেন দেখ না॥
আঁখির পলকে সখি, বারেক তাহারে দেখি,
জীবন দিইতে পদে—বাসনা।
ধর ধর উপহার—করো না ছলনা॥

আবার বাহবা উঠিল। এইভাবে আড্ডার মধ্যে আমোদ প্রমোদ চলিতেছে—পল্লীর মধ্যে কিন্তু অপরাপর বাটীর অধিবাসীবৃন্দের কোনরূপ অসুবিধা হইতেছে না। নিত্যই মাসীর আড্ডায় এইরূপ আমোদের গর্‌রা চলিত বলিয়া তাহাদের চমকিত হইবার কোন কারণই ছিল না। এই সময়ে বীরচাঁদ ও মহাবীর মাসীর আড্ডার গলিপথের পুরোভাগে উপস্থিত। বীরচাঁদ মহাবীরকে বলিল—"তুমি বোধ হয় জান, সঙ্কেত ব্যতীত কাহারও আড্ডায় প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং সঙ্কেত-কথা আড্ডা-সংশ্লিষ্ট সকলেই অবগত। এইবারে তোমাকে একক আড্ডামধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

প্রকৃতপক্ষে মহাবীর আড্ডার সঙ্কেত-কথা জানিত না। কিন্তু পাছে বীরচাঁদের মনে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে সাহসে বুক বাঁধিয়া আড্ডার দিকে অগ্রসর হইল। মহাবীর আড্ডার নিকটে যাইয়া ধীরে ধীরে বামপার্শ্বে তিনবার আঘাত করিবামাত্র, ভিতর হইতেও তিনবার শব্দ হইল। ইহাতে মহাবীরের মনে আশার সঞ্চার হইল। অমনি দ্বারের পার্শ্বে আবার দুইবার আঘাত করিল। আবার ভিতর হইতে দুইবার শব্দ

হইল। ইহার পর মহাবীর দ্বারের ঠিক মধ্যস্থলে একবার আঘাত করিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে একবার শব্দ হইল এবং দরজার মধ্যস্থল একটু ফাঁক হইল।

ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল—"কে তুমি ?"

মহাবীর। একজন বিপন্ন।

প্রশ্ন। একক না আর কেহ আছে ?

মহাবীর। এক জন সঙ্গী আছে।

প্র। সঙ্গী কোথায় ?

উ। দূরে দাঁড়াইয়া আছে।

প্র। সেও কি দলের লোক ?

উ। হাঁ, সেত এই কথাই বলে।

প্র। তাহা হইলে শেষ সঙ্কেত কথাটা কি জানিতে চাহি।

উ। "কামিনী মাসীর পাকাচুলের কদর" করিতে সকলেই বাধ্য।

"তবে প্রবেশ কর" সঙ্গে সঙ্গে দ্বার মুক্ত হইল।

মহাবীর একেবারে কামিনী মাসীর সম্মুখে। কামিনী তীব্র দৃষ্টিপাতে মহাবীরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। দৃষ্টির বেগ এত প্রখর যে, নীরদবাবুর মত সুবিজ্ঞ ডিটেক্‌টিভেরও হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মাসী দৃঢ়স্বরে বলিল—"কে তুমি, তোমাকে ত চিনি না ?"

মহাবীর। এইত মাসী, তোমাকে হারিয়ে পাচ্ছি, আমি যে আগ্রার সেই মহাবীর পাঠক! ছ'বছর আগে আমি যে তোমার খদ্দের ছিলাম!

প্রকৃতই মহাবীর নামক একজন বদমাইস আগ্রায় থাকিত। নীরদবাবুই তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। বিচারে মহাবীরের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইয়াছিল। এখনও ছয় বৎসর অতীত হয় নাই। সেইজন্যই নীরদবাবু নিজকে মহাবীর রূপে পরিচিত করিতে সাহসী হইয়াছিল।

মাসী বলিল,—"হাঁ নামটা শুনা আছে বটে, কিন্তু আমি ত তোমাকে চিনিতে পাচ্ছি না। তা যা' হো'ক তুমি নিজের কাজ নিজেই বুঝে নিও। ভাল কথা—তোমার সঙ্গে একজন সঙ্গী ছিল বল্‌ছিলে না ? সঙ্গীটা কে ?"

মহা। বীরচাঁদ।

মাসী। তা'হলে কথাই নেই। যাও বোতল গেলাস নিয়ে আমোদ করগে।

বলিতে বলিতে সদরদ্বারে সাঙ্কেতিক আঘাত হইল। দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র সশরীরে বীরচাঁদ উপস্থিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বিপদ।

বীরচাঁদের আড্ডাঘরে প্রবেশে তথায় যেন একটা সজীবতা উৎপন্ন হইল। যে যেখানে ছিল—সকলেই বীরচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভক্ত যেমন তাহার উপাস্য দেবতাকে ভক্তির চক্ষে দর্শন করে—কাশীর দস্যুদল বীরচাঁদকে সেইভাবে দর্শন করিয়া থাকে। ছোট বড় সকলেরই বীরচাঁদের ন্যায় নামজাদা দলপতি হইবার সাধ। মাসীর আড্ডায় বীরচাঁদের যে সম্মান—বোধ হয় কাশী-নরেশেরও সে সম্মান নাই। দলের প্রত্যেকেই ধীরে ধীরে বীরচাঁদকে অভিবাদন করিতে লাগিল—বীরচাঁদও মস্তক হেলাইয়া প্রত্যভিবাদন করিল। পরে মহাবীরের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"এস এখন কাজের কথা কই।"

মহাবীর সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল—"তুমি যখন মাসীর আড্ডায় ঢুকিলে তখন মাসী ফুসফুস ক'রে তোমাকে কি জিজ্ঞেসা করছিল?"

বীরচাঁদ এক গাল হাসিয়া বলিল,—"না, ও কিছু নয়। তোমাকে কোথা থেকে পেলুম এবং তুমি কে তাহার সন্ধান নিচ্ছিল।

মহাবীর। মাসীর আমার সকলের উপরই সন্দেহ।

বীরচাঁদ। ওটা মাসীর স্বভাব।

প্রকৃত কথা মহাবীরকে দেখিয়া মাসী সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই। অলক্ষ্য দৃষ্টিতে তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মাসী প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে বসিয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইলেও খরদৃষ্টিতে মাঝে মাঝে মহাবীরকে দেখিতেছিল। মহাবীরও সেটা লক্ষ্য করিয়াছিল।

মহাবীর। তা' আর আমার জানতে বাকি নেই। এখন তোমার কাজ কি বল?

বীরচাঁদ। তুমি গোয়েন্দা নীরদবাবুর কথা শুনেছ কি?

মহাবীর। তা আর শুনিনি। সেইত আমাকে জেলে পাঠিয়েছিল।

বীর। তাহ'লে ত দেখ্‌চি তার উপর তোমার রাগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে?

মহাবীর। হাঁ নিশ্চয়ই।

বীর। তবে তাকে সরাবার পক্ষে আমাকে সাহায্য ক'রতে পার?

মহাবীর। সেটা টাকার উপর নির্ভর করে।

বীর। টাকার কথা কেন?

মহা। গোয়েন্দা নীরদবাবুকে জাহান্নমে পাঠাবার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ তোমাকে যথেষ্ট টাকা কবলেচে, হয়ত টাকাটা হাতেও পেয়েছ। তুমি সেই কাজটা আমার সাহায্যে শেষ করতে চাও। আমি রাজী আছি। কিন্তু টাকার ভাগ চাই। টাকা না হ'লে এ কাজে আমি নেই। এখন বাজে কথা থাক, তুমি কত টাকা পেয়েছ—তাই বল।

অন্য কেহ বীরচাঁদকে একথা বলিতে সাহসী হইত না। কাশীর গুণ্ডার দলের সর্দ্দার—এমন কথা ইতঃপূর্ব্বে কাহারও নিকট শুনেও নাই। টাকার অংশ প্রার্থনা কেউ কখন করে নাই। বীরচাঁদ সামান্য টাকা দিয়াই কাজ হাসিল করিত। বীরচাঁদের সঙ্গে ডাকাইতি, খুন বা রাহাজানি করাটা ত অন্যান্য দস্যুরা সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয় মনে করিত।

বীরচাঁদ কিন্তু কোনপ্রকার ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়াই বলিল,—"খুব কম, পাঁচশত টাকা। এর মধ্যে আবার আব্দুলকে ভাগ দিতে হবে।"

মহা। ভাল তাই হ'ক্, তাহ'লে পাঁচশত টাকা তিন ভাগ করা হবে। তাতেই রাজী—তবে আমাকে তোমাদের সাহায্য ক'র্‌তে হবে।

বীর। নিশ্চয়ই সাহায্য করবো। তবে আব্দুলকে ডাকা যাক। এই বলিয়া একজন দৃঢ়কায় কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকৃতি ব্যক্তিকে আহ্বান করিল। লোকটা কাছে আসিলে—বীরচাঁদ বলিল,—"নীরদগোয়েন্দাকে খুন করবার জন্যে আমরা মহাবীরকে নিয়োগ করিলাম। তুমি আর আমি এই কাজে ওকে সাহায্য করবো। আর তার জন্যে পাঁচশত টাকার এক ভাগ দিব। কেমন হে আব্দুল! তুমি রাজী আছ?"

আব্দুল। আমার আর রাজী থাকাথাকি কি? ওস্তাদজী যা হুকুম করবে, তাই হবে।

মহা। আচ্ছা, এইবার খুন করবার মৎলবটা ঠাওরান যা'ক।

বীর। এটা খুবই সহজ। কেউ বিপন্ন হ'য়েছে ব'লে চিঠি নিয়ে একটা নির্জ্জন জায়গায় দেখা ক'রতে চাইলেই সে আসবে,—তার কাজই এই।

মহা। তাহ'লে কোন্ জায়গায় আস্তে লিখ্‌বো ?

বীর। শিকরোলের পথে পিয়ারা বাগানের ভিতর।

মহা। ভাল, আমি আজই তাকে চিঠি দেবো, যেন কাল রাত্রি ১১টার পর একলা পিয়ারা বাগানে এসে দেখা করে।

বীর। এই বেশ মতলব।

মহা। যদি একলা না পারি, তাহ'লে দুজনে সাহায্য করো।

বীর। তাতে আর সন্দেহ আছে ?

এই কথাবার্ত্তার পর নীরদবাবু বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, মিহিরলাল ও মতিবিবির সহিত বৃদ্ধ মহাজনের হত্যাকাণ্ডের কোন সংশ্রব নাই। মোহনলাল বাবু ও তাহার ভগিনী অথবা তৎসম্পর্কীয় অন্য কেহ এই হত্যার জন্য দায়ী।

এই সময়ে হঠাৎ নীরদবাবু দেখিলেন যে, কামিনী মাসী অলক্ষ্যে তাহাকে দেখাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিলেন যে, বিপদ ঘনীভূত হইয়া পড়িতেছে। তিনি সকলের অলক্ষ্যে একবার জীর্ণ গাত্রাবরণের মধ্যে পিস্তল দুইটা ঠিক করিয়া রাখিলেন। মনে করিলেন, বিপদ ঘটিলে পিস্তল সাহায্যে আত্মরক্ষা করা সহজ-সাধ্য না হইলেও শেষ পর্য্যন্ত একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন।

এই সময়ে যে লোকটা কামিনী মাসীর সহিত ফুসফুস করিতেছিল, সে ক্রুদ্ধভাবে মহাবীরের দিকে অগ্রসর হইয়া, পরুষ বচনে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ হে, তোমার নামটা কি ?

মহা। মহাবীর প্রসাদ।

আগ। কোথা থেকে আস্‌চ ?

মহাবীর প্রসাদ কোন প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া, ধীর গম্ভীর ভাবে বলিল,—"যেখান থেকে তুমি আসচ আর কোথা থেকে ?"

আগ। মিথ্যা কথা—আমি বিশ্বাস করি না।

"যে বলে, ঘুসিয়ে তার মুখ উঠিয়ে দিই" বলিয়া মহাবীর প্রসাদ সজোরে তাহার মুখমণ্ডলে এক ঘুসি মারিল। ঘুসির চোটে লোকটা একেবারে চৌচাপটে ভূতলশায়ী—নাক মুখ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ইত্যবসরে

মহাবীর দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু কামিনী তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ সদরদ্বারে চাবিবন্ধ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভূতল হইতে সেই লোকটা দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"ভাই সকল, তোমরা শুন, এই লোকটা মাসীর নিকটে নিজেকে আগ্রার মহাবীর প্রসাদ বলে পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি,—এর মিথ্যা কথা। মহাবীরের জেল এখনও শেষ হয়নি। আমি মহাবীরকে খুবই চিনি। ও নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী গুপ্তচর। তোমরা ইহার প্রকৃত পরিচয় জিজ্ঞাসা কর।"

এই কথা শুনিয়া বীরচাঁদ ও আব্দুল পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। দলের সকলেই ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় দলবদ্ধ হইয়া গর্জ্জন করিয়া মহাবীরের দিকে অগ্রসর হইল। একটা বৃহৎ লাঠী লইয়া কামিনী মাসী সদর দ্বারে পৃষ্ঠ দিয়া গমন-পথ প্রতিরোধ করিল। কাজেই মহাবীর প্রসাদ পকেট হইতে গুলিভরা পিস্তল বাহির করিয়া বলিল,—"খবরদার! যে যেখানে আছ, সে সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাক, এক পা অগ্রসর হইলেই, সে যেই হউক না— পিস্তলের গুলিতে মাথা উড়াইয়া দিব।"

দলের সকলে হঠাৎ পিস্তল দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ায়, কামিনী মাসী দৃঢ়স্বরে বলিল—"হতভাগারা! তোদের জীবনে ধিক্। আমি নিজেই এর ব্যবস্থা করচি। আর বীরচাঁদ ও আব্দুল, তোমরাও শুন—যদি এই লোকটা গুপ্তচর হয়, তাহলে তোমাদের দায়ী হইতে হইবে। হয় ইহাকে পিস্তল রাখিয়া শান্তভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে বল,—আর না হয় তোমরাও আমার দলে যোগ দাও, দেখচ না লোকটা ছদ্মবেশী গোয়েন্দা।"

মাসীর কথায় পশ্চাৎগামী দুর্ব্বৃত্তেরা আবার মহাবীর প্রসাদের চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল। মহাবীর প্রসাদও আর কালবিলম্ব না করিয়া কামিনী মাসীকে ঠেলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিল। মাসী লাঠী দ্বারা তাহাকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিলেও সফলকাম হইল না। মহাবীর তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া দ্বারের খিল খুলিয়া ফেলিল, কিন্তু চাবি বন্ধ থাকায় উন্মুক্ত হইল না। এইবার মহাবীরের জীবননাশ হইবার সম্ভাবনা ঘটিল,—একটা লোক তাড়াতাড়ি আসিয়া মহাবীরের পৃষ্ঠের উপর পতিত হইল। মহাবীর যেমন তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিল, তাড়াতাড়িতে তাহার কৃত্রিম দাড়ি খসিয়া পড়িল।

"দেখ হতভাগারা আমার কথা সত্যি কি না" বলিয়া কামিনী মাসী

হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বীরচাঁদ ও আব্দুল চীৎকার করিয়া বলিল,—"যে নীরদ গোয়েন্দার মাথা নিতে পারবে তাকে ৫০০ পাঁচ শত টাকা বকশিস দিব। "আমিও হাজার দিব" বলিয়া কামিনী ক্রুদ্ধ বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নীরদবাবু উপয়ান্তর নাই দেখিয়া দরজার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র জানালার উপর লাফাইয়া উঠিল। সেই সময়ে বীরচাঁদ ছুটিয়া নীরদবাবুর একটা পা ধরিয়া ফেলায়, তিনি নীচু হইয়া তাহার মুখে একটা ঘুসি মারিলেন। বীরচাঁদ প্রহারের ফলে ভূতলে গড়াইয়া পড়িল। এই সুযোগে নীরদবাবু মরিয়া হইয়া ডাকাতদের লক্ষ্য করিয়া দুই তিনবার পিস্তলের আওয়াজ করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"খবরদার, যে আস্‌বে—তাহার মরণ নিশ্চিত। জানত আমার লক্ষ্য কখন ভ্রষ্ট হয় না। দিয়ালের মাছি পর্য্যন্ত মারিতে পারি।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পৃষ্ঠ দ্বারা জীর্ণ জানালার কবাটে চাপ দিতে লাগিলেন। দুড়ুম্‌ করিয়া কবাট ভাঙ্গিয়া পড়িল,—তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে লাফাইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীত হইল। ঠিক জানালার নিম্নেই একটা বহু পুরাতন সুগভীর ইঁদারা ছিল। নীরদবাবু তাড়াতাড়িতে সেই ইঁদারার মধ্যে পড়িয়া গেলেন।

অপর দিকে মাসীও তাড়াতাড়ি সদরদ্বার উন্মুক্ত করিয়া সদলে বাহিরে গেল। তখন ইঁদারার চঞ্চল সলিল স্থির হইয়া গিয়াছিল,—ভিতরে কিছুই দেখা গেল না। "ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারিল" বলিয়া মাসী একটু হাসিয়া ফেলিল। মাসীর হাসি দেখিয়া সকলে আনন্দে চীৎকার করিতে লাগিল। মাসী বলিল, তোরা সে দিনের ছোঁড়া, তাই আহ্লাদ করচিস্‌—দাঁড়া এখন বিশ্বাস নেই। সকলে এক কাজ কর, এক টব সীসে গরম করিয়া ইঁদারার ভিতরে ঢালিয়া দে—কি জানি যদি ইঁদারার ভেতর বেঁচে থাকতেও ত পারে। মাসীর আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইল।

মাসীর এই সাহসিকতা দেখিয়া দলের সকলেই খুব তারিফ করিতে লাগিল। মাসী গৌরবে ফুলিয়া ফুলিয়া বলিল,—"তোরা কি জান্‌বি বল, যদি তোদের মেসো থাক্‌তো তাহলে আজ তোদের কাছে আমার বাহাদুরীর গল্প করতো। কি বলবো মিনসে যে নিজের দোষে ফাঁসি গেল। আমায় পায়ে ঠেলে সরি ছুঁড়ির সঙ্গে পিরীত করায় আমিত রেগে দুজনকে খুনের দায়ে ফেলে ধরিয়ে দিয়েছিলুম—নইলে তাকে ধরতে পারে কে? কাশীর পুলিশ তা'র চুলের টিকি কখন দেখতে পেত না।"

বীরচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিল,—"মাসী, আমার কতকটা জানা আছে। মেসো একলা পাঁচটা পুলিশকে ঘাল করেছে—স্বচক্ষে দেখেচি। মাসীও আমাদের কম জান না।"

মাসী। শুনবি একদিনের কথা। এলাহাবাদের এক-জন বড়লোক, তার বড় ভায়ের স্ত্রী ও তার একটা আট মাসের ছেলেকে খুন করবার জন্যে আমাদের ঠিক করে। তারা লোক জন নিয়ে তীর্থ করবার জন্যে কাশীতে এলে, আমাদের এই আড্ডায় ছুঁড়ীকে ও তার ছেলেকে দল থেকে ছিঁনিয়ে আনা হয়। মাটাকে নরবলি দিবার ব্যবস্থা করা হল, আর ছেলেটা পড়লো আমার ভাগে। ছেলেটাকে ফেলে তার জিভ্‌টা টেনে বুকের উপর পা দিয়ে ফট্‌ করে মেরে ফেলে দিলুম। বড় বড় চোক বার করে ছেলেটার সব ফুরোলো। আড্ডার ভিতর এই কাণ্ড বাহিরে কি রকমে খবর পেয়ে পুলিশ হাজির—দারোগা দরজা ভাঙতে ব্যস্ত।

মাসীর কথা শুনিয়া সকলেই অবাক। আব্দুল বলিল "তারপর মাসী কি হলো?"

মাসী। হবে আর কি? কোন উপায় নেই দেখে, ছুঁড়ীটার গলায় দড়ি বেঁধে টান্‌তে টান্‌তে পেছনের উঠোনে যে ইঁদারা আছে, সেইখানে টেনে নিয়ে গেলুম। টানের চোটেই অক্কা পেয়েছিল, শুধু একটু ধড়ফড় করছিল। সেটাকে তুলে ইঁদারার ভিতর ফেলে দিলুম। এদিকে পুলিশ বাটীর ভিতর ঢুকে পড়লো, কিন্তু বামাল না পেয়ে কিছুই করতে পারলে না।

আব্দুল। যদি ইঁদারা খুঁজতো?

মাসী। তা'হলেই বা কি হতো; গঙ্গার সঙ্গে সব ইঁদারার যোগ ছিল. লাস ভেসে গঙ্গায় গিয়ে পড়তো। অমন খুব কম করে তিনশত লাস ঐ ইঁদারার ভেতর আছে। যা সব আজ একটু বিশেষ করে আমোদ কর অনেক দিনের শত্রু নিপাত হয়েছে। আজ ময়ুয়ার বোতলের অর্দ্ধেক দাম বলা বাহুল্য আড্ডায় আমোদের হর্‌রা চলিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅর্জ্জুনচন্দ্র বসু

হেথা।

আমার চৌদিক পাহাড়ে ঘেরা ;
শৃঙ্গ লহরগুলি,
আকাশ পানে ঊর্দ্ধ শিরে
আছে আপনা ভুলি।
মেঘগুলি তার আশে পাশে,
রয়েছে লাগি গায়,
ধ্যানে মগন তাপস যেন
মোহন শ্যামকায়।
হোমের অনল জ্ব'লে বুঝি
উঠিছে ধোঁয়াগুলি,
আকাশ-সাথে মিশিয়ে যেন
করিছে কোলাকুলী।
বাতাস ব'লে গেল গো যেন
আমার গা পরশি,
"মহান্ ব্রতের শিক্ষা পেতে
হ'তে হবে উদাসী,
প্রেম-ভরা ওই উজান স্রোতে,
যাবি গো যদি ছু'টি,
আয় রে তবে আয় রে হেথা,
'মায়ার' বাঁধ টুটি।
ঢেউ বহিছে কত যে ভাবের
পাহাড় মাঝে এই,
ভাবের জিনিস পাইবে যদি
আছে গো হেথা সেই।"

শ্রীনলিনীকান্ত দাস।

বেহুলা-চরিত্র।

সাহিত্য-উদ্যানে অনেক কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়াছে, অনেক ঝরিয়া পড়িয়াছে, অনেক মুকুলিত হইতেছে। প্রস্ফুটিত কুসুম-নিচয়ের সৌরভে সংসার-কানন ভরিয়া গিয়াছে। প্রকৃতই সুগন্ধি কুসুমের সুবাসে হৃদয়-তন্ত্রী এক নূতন তানে বাজিয়া উঠে। তাই কবিগণ শান্তিপিপাসু প্রাণে সুগন্ধি কুসুমের কমনীয় মনোলোভা আলেখ্য আঁকিয়া গিয়াছেন। যে কুসুম সংসার-কানন হইতে অনেক দিন হয় ঝরিয়া পড়িয়াছে, তাহার সুবাস আজও দূর-দূরান্তরে ছড়াইয়া রহিয়াছে। প্রায় পঞ্চ শতাব্দী গত হইয়াছে, সংসার-কাননে একটি সুগন্ধি কুসুম বিকসিত হইয়াছিল; কালের কুটিল চক্রে সে কুসুমটি ঝরিয়া গিয়াছে, কিন্তু আজও তাহার সৌরভে সাহিত্য-জগত প্লাবিত।

পৌরাণিক কবিগণ কাব্যকুঞ্জে যে সকল আদর্শ চরিত্র রাখিয়া গিয়াছেন, রমণী-চরিত্রই তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। মনসা-মঙ্গল রচয়িতা কবিবর বিজয় গুপ্ত যে একখানি আদর্শ বিনোদ সতীত্ব-চিত্র আমাদের সম্মুখে রাখিয়া সংসার-যবনিকার অন্তরালে দাঁড়াইয়াছেন, সেই চিত্রখানি কাব্যকুঞ্জের একটি প্রধান অঙ্গ-সৌষ্ঠব। কি প্রাণময় সতীত্ব-প্রতিমার উজ্জ্বল আদর্শ তুলিয়াছেন। মনসামঙ্গল পুস্তকখানি পাঠ করিলে সত্যাসত্য সবিশেষ অবগত হইতে পারা যায়, সতীত্ব-ছবিখানি মানব-হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব বিমল কিরণজাল বিস্তার করিয়াছে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বোধ হয় যেন স্বর্গের দেবীই মানব-মূর্ত্তিতে ধরাধামে অবতীর্ণা। এই আদর্শ-চরিত্রখানিই বেহুলা-চরিত্র। বেহুলাকে দেবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার অমল চরিত্রে স্বর্গীয় গুণাবলি সন্নিবেশিত। একাধারে এতগুলি অলৌকিক গুণের এবং এত রূপের সমাবেশ আর দ্বিতীয়টি দেখা যায় না; তাই স্বনামধন্য পণ্ডিত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার প্রণীত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থের ১ম ভাগে ৯৭ পৃষ্ঠায় সমালোচনা করিয়াছেন। "বিলাতী এণ্ড্রমেকি, ডিডো, ডেস্ ডিমনা এবং জুলিয়েট প্রভৃতি দেখিয়াছি, তথাপি বেহুলার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই; বিলাতী উদ্যানে এমন সুগন্ধি কুসুম দেখি নাই। সতীত্বের এমন উজ্জ্বল পট, এমন চারু চিত্রলেখা বুঝি আর কোথায়ও নাই।" প্রেম, প্রীতি, দয়া, দাক্ষিণ্য, ভক্তি, বীরত্ব তাহার চরিত্রটি সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে। তাহার

আশৈশব চিত্তবৃত্তির অনন্যসাধারণ বিকাশ এবং চরিত্রের অনন্যসাধারণ গঠন লক্ষিত হইয়াছে। বেহুলা মানব-হৃদয়ে দেবভাব জাগাইয়া দিতেই সংসারে আসিয়াছিল। যে সংসারক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র একটি বারিকণার উত্থান ও প্রস্থান অনন্ত বিস্তারিত নিয়ম পরতন্ত্রায় পরিচালিত, অতিক্ষুদ্র একটি অঙ্গারও নিয়তির শাসন উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অঙ্গচালনা করিতে অসমর্থ, সেই সংসারে মানবের ন্যায় অনন্ত পিপাসু, অনন্তোন্মুখ উন্নতশীল জীব যে কোন রূপ প্রয়োজনের অনুসরণ বিনা, শুধু লীলা করিতে আসিবে, তাহা কখনই বিশ্বাসযোগ্য নহে, মর্ত্ত্যধামে অমর সতীত্ব-কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতেই বেহুলার আগমন।

বেহুলা রূপে গুণে অতুলনীয়া, তথাপি ভাগ্যচক্র অতিক্রম করিতে না পারিয়া বিবাহের রাত্রিতেই স্বামিহীনা হইল, বেহুলা কান্দিতে কান্দিতে বলিল,—

"কারে হেন বিধি করে, বিয়ার রাত্রে স্বামী মরে,
মধুকর উড়ে গেল, সুধা-কমল পড়ে রইল,
অঞ্চলে মাণিক্য ছিল, অকূলে খসিয়া পইল,
বিধির মনে ইহা ছিল, সুখের ঘরে আগুন দিল,
ছিলাম বড় আদরিণী হলেম পথের কাঙ্গালিনী।"

বেহুলার অসাধারণ স্বামি-ভক্তির উদাহরণ বড়ই প্রাণময়। স্বামী বিবাহ-বাসরে ক্ষুধায় অন্ন চাহিয়াছিলেন, সতী পতিব্রতা বেহুলা আপন নেতের আঁচল চিরিয়া অগ্নি জ্বালিয়া তিনটি নারিকেল দ্বারা উনন প্রস্তুত করিয়া ভাত রাঁধিয়াছিল।

"চাউল পাঁখালে বেহুলা ঘটের দিয়া পাণি।
নেতের আঁচল দিয়া জ্বালিল আগুনি ॥
তিনদিকে দিল বেহুলা তিন নারিকেল।
চাউল প্রমাণে বেহুলা হাঁড়ীতে দিল জল ॥"

আশৈশব বেহুলার তেজস্বিতার ক্রমবিকাশ দেখা যায়। লৌহ-বাসরে স্বামীর নিদারুণ অদৃষ্ট প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ করিলে, কৌশল-ক্রমে বেহুলা একে একে আটটি সর্পকে বন্দী করিল; কিন্তু বিধিলিপি নির্ম্মম, অখণ্ড; তাই বেহুলা ঈষৎ নিদ্রাবেশে অচেতন হইলে লৌহ-গৃহে এত লোকের মধ্যেও নিশাশেষে কালনাগিনী উদ্যতফণা হইয়া বাসরঘরে লক্ষ্মীন্দরকে কনিষ্ঠ

অঙ্গুলিতে দংশন করিল। দারুণ বিষের জ্বালায় লক্ষীন্দর নিদ্রোত্থিত হইয়া বিলাপ করিয়া বেহুলাকে ডাকিল,—

"আজি বিয়া হ'ল রাতি, না চিনিলা নিজপতি,
নাগিনী দংশিয়া যায় মোরে।
যদি জানিতাম সাঁচে, এমন নির্ব্বন্ধ আছে,
বিয়ার রাত্রে সাপে খাবে মোরে।
এক দিবসের লাগি, তোমার বধের ভাগী,
এই পাপে নরক বিভোগ।
না জানিলে হইল কি উঠ প্রিয়ে চন্দ্রমুখী,
বিয়ার রাত্রে সর্পাঘাত যোগ।"

অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত সর্পলেজ কাটিয়া রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন. বেহুলা নিদ্রাবেশে স্বপন দেখিল,—

"উঠ উঠ বেহুলাগো কত নিদ্রা যাও।
লক্ষীন্দর চলিয়াছে গা তুলিয়া চাও॥"

ভয়ানক স্বপন দেখিয়া বেহুলার কাল-নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চক্ষু মেলিয়া চাহিল। যাহা সে দেখিল, তাহাতে সে শিহরিয়া উঠিল। বেহুলা দেখিল, স্বামী চলিয়াছেন; নিকটে অষ্ট অঙ্গুলি পরিমিত সর্পলেজ দেখিতে পাইল। সর্পাঘাতে মৃত্যু নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া বেহুলা আকুল প্রাণে কান্দিয়া উঠিল; সেই ক্রন্দনে শাশুড়ী সোনেকা ছুটিয়া আসিয়া মৃত পুত্রকে বেহুলার সুকোমল ক্রোড়ে দেখিল। অমনি বেহুলাকে কান্দিয়া কান্দিয়া গালি দিতে লাগিল,—

"সোনা বলে বধূ তুমি পরম রূপসী।
আমার বাছা খাইতে আইলা কপট রাক্ষসী॥
স্বরূপে জানিলাম তুমি নিশাচর জাতি।
বিয়ার রাত্রে খাইলা স্বামী নহিল বাসি রাতি॥"

কিন্তু সতী পতিপ্রাণা বেহুলা তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া আপন অদৃষ্টের কথা ভাবিতে লাগিল। স্বামী রাত্রিতে তাহার নিকট আলিঙ্গন চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রমণীসুলভ লজ্জায় নব বধূ তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। সেই কথা মনে পড়িয়া বেহুলার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। এইরূপে বেহুলা নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার বিলাপে পাষাণ পর্য্যন্ত বিগলিত হইয়া গেল। ইহার পর এক ভয়ানক দৃশ্য! এই দৃশ্যে সতী

পতিব্রতা বেহুলা অনুপম সতীত্ব প্রভাবে এক অলৌকিক অক্ষয়কীর্ত্তি সংসারে স্থাপন করিয়া অপূর্ব্ব স্বামিভক্তি, রমণী হৃদয়ের অসীম তেজস্বিতা এবং দেবতার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তি এবং প্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বেহুলা মান্দাসে স্বামী জীয়াইবার আশায় তরঙ্গ-বিক্ষোভিত বারিধি-গর্ভে ভাসিল।

বেহুলা নিরুপমা সুন্দরী। তাহার রূপ দেখিয়া পূর্ণচন্দ্র মলিন হইয়া যাইত। নিতম্বলম্বিত কুন্তলরাজি দেখিয়া কাদম্বিনী আকাশের প্রান্তে লুকাইত।

শাশুড়ী যে এত গালি দিয়াছিল, তবুও যাইবার কালে অনেক বিনয় করিয়াছিলেন, "আমার সাবিত্রী ঘরে ফিরিয়া এস, আমি লখার শোক তোমাকে দেখিয়া ভুলিব।" স্বামীর মৃত দেহের পার্শ্বে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় সাধ্বী বেহুলা বসিয়া আছে আর শাশুড়ীকে বলিতেছিল,—

"বেহুলা বলে মাতা তুমি প্রভুর জননী।
না করিলাম তব সেবা মুই অভাগিনী॥
পতি বিনে মোর চিত্তে যদি থাকে আন।
অঘোর নরকে যাব নাহি পরিত্রাণ॥
মরা স্বামী ল'য়ে যাব দেবের সমাজ।
শিবপুরী লয়ে গেলে সিদ্ধ হবে কাজ॥
পৃথিবীতে আশা করি রাখিব ঘোষণা।
জীয়াইব নিজপতি ভাসুর ছয় জনা॥
সতী পতিব্রতা মাতা ধর্ম্মেতে আগুলি।
আশীর্ব্বাদ করি দেও চরণের ধূলি॥"

চারিদিক হইতে কত শত শোকাকুল নরনারী এই দৃশ্য দেখিতে আসিতেছে আর বেহুলাকে বলিতেছে, "মা তোমার মুখ দেখিয়া আমাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে, অভাগিনী মা ফিরিয়া এস।" দেখিতে দেখিতে বেহুলার মাজুষ তরঙ্গাঘাতে সুদূরে চলিয়া গেল।

পথিমধ্যে ভ্রাতা হরিসাধু এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া কান্দিতে কান্দিতে তাহাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছেন,—

"হরিসাধু বলে বেহুলা যাও কোন ঠাঁই।
আসিয়াছি অভাগিয়া তব জ্যেষ্ঠ ভাই॥

আসিনু তোমাকে নিতে মায়ের আজ্ঞা পাইয়া।
মান্দুষ চাপাও ঘাটে কথা কও রইয়া॥
বাপ ভাই ত্যজি বেহুলা কোন্ দেশে যাও।
বাপ মায়ের ঘরে বাস ঘৃত অন্ন খাও॥"

বেহুলা ভুরা তীরে না চাপাইয়া কেবল মাত্র বলিলেন,—

"বেহুলা বলে ভাই মোরে না বলিও আর।
বাপ-মায়ের চরণে মোর জানাইও নমস্কার॥
বেহুলা বলে ভাই মোরে না বল উচিত।
স্বামী না থাকিলে নারীর জীবন কুৎসিত॥"

অগত্যা হরিসাধু দেশে ফিরিয়া গেল। মান্দুষ ক্রমে ক্রমে ভাসিতে লাগিল, হঠাৎ গাঢ় কৃষ্ণ নীরদমালায় আকাশ সমাচ্ছন্ন হইল; ক্রমে বারিধি-গর্ভে ভয়ঙ্কর তরঙ্গ উপস্থিত হইল; এই জীবনসঙ্কট বিপদের সময় একমাত্র অসহায়া রমণী নিজ প্রাণের আশা ছাড়িয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল,—

"বিষম তরঙ্গে পড়ি চারিদিকে চাই।
এ সময়ে রক্ষা করে হেন বন্ধু নাই॥
গা তোল গা তোল প্রভু কত নিদ্রা যাও।
নদীর হিল্লোল বড় চক্ষু মেলি চাও॥"

বেহুলার এইরূপ কষ্টের কালে চতুর্দ্দিক হইতে নানারূপ জল-জন্তুগণ তাহাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল, তথাপি বেহুলা বিচলিতা বা ভীতা হইল না। তাহার ধীর, স্থির, অটল বিশ্বাস এবং পরমেশ্বরে অলৌকিক আনুরক্তি তাহাকে তাহার মানস-গগনের সুখ-তারা ক্রমে দেখাইতে ছিল এবং সেও সেই ভাবী সুখ-কল্পনায় নীরব ছিল। একমাত্র সতীত্ব প্রভাবে সে নানারূপ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিল। রমণীর প্রধান রত্ন, তাহাদের ইহকাল পরকালের একমাত্র সম্বল, সেই সতীত্ব-বলে সুদূর বৈকুণ্ঠধামে মহাদেবের পুরীতে উপস্থিত হইল। তথায় দেবসভায় তাহার সৌম্যমূর্ত্তি, সুখে দুঃখে সমভাব, মন-প্রাণহারী স্বভাব, দাঢ্যব্রত এবং অনুপম নৃত্য-গীতাদি দর্শন করিয়া দেবতারা তাহার উপর প্রসন্ন হইলেন, তাই সে পুনরায় তাহার অঞ্চলের নিধি, সাধনার ধন, জীবনের সর্ব্বস্ব সেই স্বামীকে ফিরিয়া পাইল। সে নিজ স্বামীর জীবন পাইয়াও সন্তুষ্টা হইল না, ক্রমে মৃত ছয় ভাসুরকেও রক্ষা করিল। এইরূপে সে আপনার সকল কামনা পূরাইয়া দেশে ফিরিল।

প্রকৃত পক্ষে বেহুলার ন্যায় পতিপরায়ণা নারী জগতে অতি দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গলিত পূতিগন্ধযুক্ত সেই মৃত পতিকে বক্ষে ধারণ করিয়া নানারূপ বিপদ সঙ্কুল বীচিমালা-শোভিত সমুদ্র-বক্ষে নির্ব্বিকার চিত্তে মান্দাসে ভ্রমণের কথা মনে করিলে, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি সতীদের স্থানও নিম্নে নির্দ্দেশ করিতে হয় এবং বেহুলাকে পতিব্রতার প্রধান মুকুট বলিতে ইচ্ছা হয়। বেহুলার চরিত্র পাঠ করিলেও পতিভক্তি ও দেবভক্তি আসে। বেহুলার সতীত্ব-কীর্ত্তি জগতে অবিনশ্বর। বেহুলা মানবী হইলেও স্বর্গের দেবীর প্রতিকৃতি তাহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে!

শ্রীরমণীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধনা।

বহুকাল একাসনে একস্থানে বসি
কঠোর তপস্যারত আছে যোগিবর;
একমনে একভাবে সারা দিবানিশি
মধুময় রামনাম জপে নিরন্তর।
কত জল, কত ঝড় প্রলয় হুঙ্কারে
মথিত করিয়া গেছে শীর্ণ দেহখানি,
তবু কভু কোন এক মুহূর্ত্তের তরে
কঠোর সাধনা ছাড়ি ওঠে নাই মুনি।
কত দীর্ঘ বর্ষ গেছে, তবু একাসনে
সমভাবে বসি যোগী জপিতেছে নাম;
বাহ্য জগতের শব্দ নাহি পশে কাণে,
নাহি মনে মু[illegible] ভিন্ন অন্য কোন কাম।
বল্মীক করেছে গ্রাস সারা অঙ্গখানি,
তবু মুখে উচ্চা[illegible] রাম রাম ধ্বনি।

শ্রীললিতকুমার সিংহ।

পিতৃযানে পবিত্র মিলন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অভিমন্যু। জ্যেষ্ঠতাত, কি আশ্চর্য্য, তব জ্ঞানরবি
স্নেহ-কুজ্ঝটিকাবেশে আজি কলঙ্কিত!
নবীন যুবক বলি অভিমন্যু বীরে
তুচ্ছ দেব! নহে তুচ্ছ এই বীরদেহ।
বজ্রসম অস্থি মোর, লৌহ তন্তু সম
মাংসপেশী। নহে মোর এ তরুণ দেহ
সুকোমল। হারি মানে সুকঠিন শিলা
মম অঙ্গ তুলনায়। পারি পদাঘাতে
কাঁপাতে পর্ব্বতশৃঙ্গ, বাহুর তাড়নে
উন্মূলিতে মহাবৃক্ষ। বজ্রমুষ্টি মোর
পাষাণ বিদীর্ণ করে; আপনারা যবে
ক্রূর দুর্য্যোধন হেতু পঞ্চভ্রাতা মিলি
বনবাসী, সে সময়ে হয়েছিনু আমি
পালিত মাতুল গৃহে দ্বারকা ভবনে।
বীর বলরাম সনে কিশোর বয়সে
মৃগয়ায় কত দিবা কত শত নিশি,
শত শত ক্রোশ ভ্রমি দুর্গম কান্তারে
অশ্বপৃষ্ঠে, সেবি বন্য মৃগমাংস সুখে
লভেছি এ ক্লান্তিহীন সবল সহিষ্ণু
বীরদেহ। আছে দেব ক্ষত্রকুল মাঝে
তামস বিলাসপ্রিয় দিবানিদ্রাসেবী
রাজপুত্র, ক্ষীর সর ঘৃত নবনীত
সেবে যেই অহর্নিশি না করি ব্যায়াম,
লভিতে মেষের ন্যায় কোমল শরীর।
দশমাস গর্ভবতী নারী পায় লাজ

দেখিয়া উদর যার ; শয়ন ভোজন
বিনা অন্য কাজে যার নাহিক পটুতা,
পুরুষ-কলঙ্ক হেন অভিমন্যু নয় !
মাতুলের চক্র আর ইন্দ্রের অশনি
দু'য়ে মাখা মোর অঙ্গ। ডরি কি রাজন,
এই ক্ষুদ্র ব্যূহভেদে ? এই ভুজবলে
শুণ্ডে ধরি বন্য হস্তী দিয়া পাকশাট
মারিয়া ফেলেছি কত। ভীষণ শার্দ্দূল
দুইপাটী দন্ত ধরি ফেলেছি চিরিয়া
কত শত। আমি কিহে ডরাই রাজন্
কৌরব রথাশ্বগজে ! শ্রীকৃষ্ণসমীপে
রণবিদ্যা বহুবিধ দেবতা-বাঞ্ছিত
যতনে শিখেছি কত। কয়জন রথী
ধারে সে বিদ্যার ধার ; আজ্ঞা কর প্রভো,
এখনি ভেদিব ব্যূহ, বধিব সবলে
কৌরবে। দেখিব আজি কোন রথী সহে
মম তেজ, ভাসাইব রণক্ষেত্র আজি
শত্রুরক্তে, দেখাইব দুষ্ট কৌরবেরে
অভিমন্যু বাহুযুগ কত বল ধরে।

যুধিষ্ঠির। বৎস, তোমার মাতা সুভদ্রা সিংহীর ন্যায় তেজস্বিনী। সেই বীরপত্নী সুশিক্ষিতা জননীর নিকট বীরধর্ম্ম শিক্ষা কোরে তুমি যে সিংহবিক্রম লাভ কোরেছ তাতে আমার সন্দেহ নাই, আর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিকট অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা কোরে তুমি অস্ত্র বিদ্যায় নিপুণ হোয়েছ তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তুমি চক্রব্যূহ প্রবেশের ও তথা হোতে নির্গমের কৌশল সম্যক অবগত আছ কিনা ?

অভিমন্যু। মহারাজ, আমি ব্যূহভেদের কৌশল বিশেষ জানি, কিন্তু নির্গমের কৌশল আদৌ জানি না। তাতে কোন ক্ষতি নাই কারণ আমার সঙ্গে পাণ্ডব বীরগণ সকলে ব্যূহ প্রবেশ কোর্‌বেন ; সুতরাং নির্গম কৌশল প্রয়োগের কোন আবশ্যকই হবে না। যাই হোক্ আর বৃথা চিন্তায় কাল-ক্ষেপ উচিত নয়। শীঘ্র আজ্ঞা করুন, এ দাস কর্ত্তব্যপালন করুক।

যুধিষ্ঠির। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) বৎস অভিমন্যু! তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হোলেম। ভীমসেন যেন সসৈন্যে তোমার সহিত ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করে। তুমি একাকী কদাচ ব্যূহপ্রবেশ কোর্‌বে না। আর একটা কথা— তুমি অর্জ্জুনের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের ভাগিনেয় সমরক্ষেত্রে এই কথা স্মরণ রেখো।

অভিমন্যু। আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য। (যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত)

যুধিষ্ঠির। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সুযশ জগতে চির-ঘোষিত হউক।

[অভিমন্যুর প্রস্থান।

[স্বগত] প্রিয়তম অভিমন্যুকে আজ অতি দুষ্কর কার্য্যে পাঠালেম। তাই অমঙ্গল আশঙ্কা কোরে মন অস্থির হোচ্ছে। ছি, ছি, হৃদয়, এত কাতর হোচ্ছ কেন? (ঈষৎ হাস্য করিয়া) মায়া! তুমি যুধিষ্ঠিরের হৃদয়েও আধিপত্য কোর্ত্তে চাও? তোমার এ আশা বৃথা। যে সমস্ত লোক এই নশ্বর জীবদেহকে একমাত্র সার বস্তু মনে করে, যারা চক্ষুর সমক্ষে বাল-বৃদ্ধ-যুবার মৃত্যু দেখেও নিজের মৃত্যুর বিষয় একবারও চিন্তা করে না, যারা মরীচিকাময় এই অনিত্য সংসারে অনিত্য দেহ ধারণ কোরে অনিত্য সুখের জন্য ধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ কোর্ত্তেও কুণ্ঠিত হয় না, যাও মায়া, তাদের কাছে যাও। তাদের অজ্ঞান-তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ই তোমার প্রকৃত বাসস্থান। অহো! ধন্য তোমার কুহক। তোমার কুহকে মুগ্ধ হয় না এরূপ জীব সংসারে অতি বিরল। যাই একবার শিবিরের বাহিরে যাই।

(গান।)

ছিছি ওরে মন, কেন অকারণ,
বিষাদে মগন, হইলি রে।
মোহের ছলনে, অনিত্য কারণে,
নিত্যানন্দে বুঝি, ভুলিলি রে।
এ সংসারে শুধু ধর্ম্মপথ সার।
সে পথে যে ফিরে ভাবনা কি তার।
তার ভাবনা যত, ভাবেন অবিরত,
ভাবনানাশিনী জননী রে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পাণ্ডব অন্তঃপুর।

(সুভদ্রা, দ্রৌপদী ও সুমতির প্রবেশ।)

সুমতি। সখি সুভদ্রে! আজ তোমায় এত বিষণ্ণ দেখ্‌ছি কেন? কতদিন হোতে সখিরূপে তোমার সেবা কোরে আস্‌ছি, কৈ কখনো ত তোমার চন্দ্রমুখ এমন মলিন দেখিনি! বল সখি, কেন আজ অকস্মাৎ এ ভাব হোলো?

সুভদ্রা। প্রিয়সখি! মহারাজ আজ আমার প্রাণের অভিমন্যুকে ব্যূহ-ভেদের জন্য প্রেরণ কোরেছেন। অভিমন্যুর ন্যায় অল্পবয়স্ক যুবকের পক্ষে সে কাজ বড়ই কঠিন বিবেচনা কোরে আজ আমার মন বড় অস্থির হোয়েছে। তাই বোধ করি তুমি আমার মুখের ভাবান্তর দেখ্‌ছ।

সুমতি। চিন্তা কি সখি, মহারাজ বিশেষ বিবেচনা না কোরে প্রিয়-পুত্রকে কখনই সে কাজে পাঠান্‌ নি।

সুভদ্রা। সুমতি, আমার অভিমন্যু ব্যূহভেদের কৌশল জানে বটে, কিন্তু নির্গম-কৌশল জানে না। যদি ব্যূহভেদের সময় অন্যান্য পাণ্ডব বীরগণ অভিমন্যুর সঙ্গে ব্যূহমধ্যে প্রবেশ কোর্ত্তে পারে, তা হোলে আর ভয় নাই; নচেৎ বিপদের আশঙ্কা আছে। তাই চিন্তায় মন আকুল হোচ্ছে।

সুমতি। পাণ্ডব বীরগণ ব্যূহভেদের সময় অবশ্যই অভিমন্যুর সঙ্গে ব্যূহপ্রবেশ কোরবেন। কখনই তাকে একা যেতে দিবেন না। তাই বলি তুমি আর বৃথা চিন্তায় মন অস্থির কোরো না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল।

দেবীগড়।

দশম পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত সংবাদ।

যে সৈন্যগণ ফিরিয়া রাজধানী যাইতেছিল, পথে তাহাদের সহিত কমলার সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের অবস্থা দেখিয়াই কমলার হৃদয় চমকিয়া উঠিল। তাহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কি সিংহের সহিত আসিয়াছিলে?"

একজন কাঁপিতে কাঁপিতে ভগ্ন অথচ অতি বিনীতভাবে বলিল—"আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।"

কমলা। সে কথা পরে শুনিব। সিংহ কোথায়?

সৈনিক। দেবি,—আপনি অন্তর্যামিনী, আমরা না বলিলেও সব জানিতেছেন। আপনার ভয়ে আমরা বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছি,—আমাদিগকে অভয় দিন।

কমলা। সিংহ কোথায় শীঘ্র বল?

সৈনিক। তিনি সেই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে বিদায় দিয়া জঙ্গলের মধ্যে কোথায় লুকাইয়াছেন।

কমলা। কোন্ কার্য্য?

সৈনিক। যে কার্য্যে মহারাজ আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেরূপ করে নাই—সিংহ অতিশয় দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ। আমরা তাহাকে ঠিক তাও বলিয়া দিয়াছি। আপনি অন্তর্যামিনী,—আমাদের সে কথাও নিশ্চয়ই আপনি শুনিতে পাইয়াছেন।

কমলা। তোমরা কি কথা বলিয়াছ,—শীঘ্র বল?

সৈনিক। কেন, আপনি কি শুনিতে পান নাই? আমরা বলিয়া দিয়াছি—যতক্ষণ দেবী এ সকল অবগত না হন, ততক্ষণ ঘাড়ের উপর মাথা

লইয়া বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াও। কিন্তু দেবী,—আমরা সম্পূর্ণ নিরপরাধ, আমাদিগকে অভয় দিন। আমরা চলিয়া যাই।

কমলা। শীঘ্র বল,—সিংহ কি করিয়াছে?

সৈনিক। সে দোষ তাঁহার—আমরা নির্দ্দোষ। ভয়ে কথা কহিতে পারিতেছি না।

কমলা। এত কথা কহিতে পারিতেছিস্, আর আসল কথা বলিতে পারিতেছিস্ না! শীঘ্র বল্—নতুবা তোদের নিস্তার নাই।

সৈনিক। নিশ্চয়ই আমাদের কোন ভয় নাই। আপনি মানুষ নহেন—দেবতা। মানুষে অবিচার করিয়া মানুষ মারে। দেবতায় বিচার করিয়া মারে,—তাই দেবতা আর মানুষে প্রভেদ।

কমলা। প্রথমতঃ এত বাজে কথা বলিয়া আসল কথা চাপা দেওয়া তোদের অপরাধ!

সৈনিক। সে কি আমাদের অপরাধ দেবী? ভয়ে যে, তাহা মুখে আসিতেছে না।

কমলা। কি হইয়াছে, শীঘ্র বল্—নতুবা এখনি বিদ্যুতে তোদিগকে মারিয়া ফেলিব।

সৈনিক। রক্ষা কর মা,—রক্ষা কর। এখনি বলিতেছি।

কমলা। বল্?

সৈনিক। সেই যাদুকরের স্ত্রী নাই।

কমলা চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"কে যাদুকর?"

সৈনিক। রাজার আদেশে আমাদিগকে লইয়া সিংহ যাহাকে ধরিতে গিয়াছিল।

কমলা। আশ্রমের—সেই ধর্ম্মপ্রচারকের স্ত্রী?

সৈনিক। হাঁ।

কমলা। নাই, কোথায় গেলেন?

সৈনিক। তিনি রোগে এত জীর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, যে, আমরা তাঁহাদের আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করিবার কিছুক্ষণ পরেই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া গেলেন।

"মা"—বলিয়া চীৎকার করিয়া কমলা অশ্বের উপরে পড়িয়া যাইতেছিল, পার্শ্বস্থ অশ্বোপরি হইতে গোলোকনাথ চাপিয়া ধরিল।

গোলোকনাথ দেখিল, কমলা মূর্চ্ছিত হইয়াছে। তখন কৌশলে কমলার দেহভার নিজ স্কন্ধোপরি রক্ষা করিয়া, দক্ষিণ হস্তে উত্তরীয়াগ্রভাগ দ্বারা তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে কমলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল,—তাহার জ্ঞান হইল।

মস্তক তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কমলা বলিল,—"গোলোকনাথ, আমার মা নাই। দুর্ব্বৃত্তের ভয়ে রোগাতুরা মা আমার মরিয়া গিয়াছেন। আর মাকে দেখিতে পাইব না।"

গোলোকনাথও অত্যন্ত ব্যথিত হইল। করুণ স্বরে বলিল,—"কমলা, আমরা এখন বড় বিপন্ন। আমাদের দেশের নৈতিক কবির উপদেশ স্মরণ করিয়া, এখন আমাদিগকে প্রতিপদে কার্য্য করিতে হইবে। বিপদে ধৈর্য্য-ধারণই এখন আমাদের মহামন্ত্র। স্মরণ করিয়া দেখ,—কিরূপ বিপদের বহ্নি-জালের মধ্যে আমরা আপতিত।"

কমলা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া করুণ নয়নে গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিল। শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে সে মুখ-ভাব দেখিয়া—সে করুণ-সৌন্দর্য্য দেখিয়া গোলোকনাথ আরও ব্যথিত-বিমুগ্ধ হইলেন। বলিলেন,—"রাজা শুদ্ধ এখন তোমার বিরুদ্ধে।"

অদূরে সেই সৈনিক দাঁড়াইয়া ছিল। সে বলিল,—"না না, যুবক; অমন মিথ্যা কথা বলিয়া রাজার বিরুদ্ধে দেবীর মন খারাপ করিয়া দিয়ো না। তুমি সে সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহ। রাজা কেবল তোমাকেই ধরিতে আদেশ করিয়াছেন,—তুমি যদি যাদুকরকে বন্দী করিবার বিরুদ্ধে কোন প্রকার সাহায্য কর—কেবল তোমাকে বাঁধিয়া রাজ-সমীপে লইবার হুকুম আসিয়াছে।"

গোলোকনাথ বিস্মিত নয়নের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কমলার বিষণ্ণ মুখের দিকে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া, সৈনিকের নিকটে আরও কিছু গুহ্য সংবাদ বাহির করিয়া লইবার প্রত্যাশায় বলিল,—"তোমার ভুল হইতেছে সৈনিক! যখন সিংহ সেই যাদুকরকে ধৃত করিবার জন্য রাজাদেশ পাইয়া রাজধানী হইতে যাত্রা করে, তখন আমি কোথায়—তাই আমাকে বন্দী করিতে আদেশ করিবেন?"

সৈনিক। তখন আদেশ করিবেন কেন? নদী স্ফীত হইয়াছে বলিয়া সিংহ সৈন্য লইয়া ওপারে অপেক্ষা করিতেছিল,—রাজা সেই সংবাদ পাইয়া

তোমাদের বাহির হইবার আদেশ দিয়াই শীঘ্রগামী অশ্বারোহী সৈনিক দ্বারা সিংহকে ঐ আদেশ পাঠান, এবং অতি ত্বরায় যাহাতে যাদুকর ধৃত হন, তাহা করিতে বলেন।

কমলা বুঝিল, রাজা তাহার উপরে সন্দেহ করিয়াছে, পূর্ব্বে যে প্রকার চক্ষুতে দেখিত, হয়ত এখন আর সেরূপ চক্ষুতে দেখে না।

সে গোলোকনাথের কানে কানে বলিল,—"আমাদের সঙ্গী সৈন্যগণ যে আমাদের সঙ্গে নদী পার হইয়া আসিল না,—'নদীপার হইতে গেলে স্রোতে ভাসিয়া যাইব,—ডুবিয়া মরিব' এই সকল মিথ্যা আপত্তি তুলিয়া স্থবিরের মত ওপারে রহিয়া গেল, তাহারও কারণ, বোধ হইতেছে রাজার চাতুরী ও গোপন আদেশ।"

গোলোক। নিশ্চয়ই। তাহারা পার হইয়া আমাদের সঙ্গে আসিলেও সিংহের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যার্থ কোন প্রকার সাহায্য করিত না।

কমলা। তোমার অনুমান মিথ্যা নহে,—আমাদের বিপদ ঘনীভূত।

গোলোক। তোমার পিতার সংবাদ জানা অগ্রে কর্ত্তব্য—তারপরে যে ব্যবস্থা হয়, করা যাইবে।

তখন কমলা সেই সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিল,—"যাঁহাকে তোমরা যাদুকর বলিতেছ, সেই পুণ্যাত্মা ধর্ম্মযাজক পত্নীবিয়োগে কি করিলেন?"

সৈনিক। আপনি কি জানেন না দেবী? আপনি তাঁহাকে পিতা বলিয়াছেন—বিদ্যুতে মানুষ মারিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। তিনি তাহাই করিলেন।

কমলা। তিনি কি সিংহকে হত্যা করিয়াছেন?

সৈনিক। না,—যে হতভাগ্য সৈনিক তাঁহার রুগ্না স্ত্রীকে কম্বলে জড়াইতে গিয়াছিল, বিদ্যুতে তাহারই ললাট ভেদ করিলেন।

কমলা। তারপর?

সৈনিক। সিংহ আদেশ করিল,—আপনি অন্তর্যামিনী আপনার সাক্ষাতে মিথ্যা কথা বলিব না দেবী।

কমলা। সিংহ কি আদেশ করিল?

সৈনিক। সিংহ আদেশ করিল - উহাকে ধর।

কমলা। তারপর?

সৈনিক। দুই জন লাফ দিয়া তাঁহাকে ধরিল—তিনি বিদ্যুতে

তাহাদিগকে মারিতে উদ্যত হইলে, আর একজন বর্ষাফলকে তাঁহাকে বিঁধিয়া ফেলিল—তিনি তৎক্ষণাৎ পড়িয়া গেলেন, এবং তাঁহারই মৃতা স্ত্রীর পার্শ্বে পড়িয়া মরিয়া গেলেন।

কমলা বালিকার ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সৎকার।

গোলোকনাথ এক লম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, কমলাকেও নামাইয়া লইল। তারপরে অদূরস্থিত এক বৃক্ষমূলে লইয়া গিয়া কমলার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দুইজন সহিস তাহাদিগের অশ্ব দুইটীকে তাহাদের নিকটে লইয়া গিয়া অশ্বদ্বয়ের আহারের ব্যবস্থা করিল।

কমলা সেই বৃক্ষতলে পড়িয়া পিতা মাতার এই নির্দ্দয় হত্যার জন্য ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই হত্যার মূল কারণ যে সে, তাহা বুঝিয়া সে আরও ব্যথিত—আরও আকুলিত হইতেছিল। গোলোকনাথ পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা ও প্রবোধ বাক্যে তাহাকে প্রবোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে কমলা একটু প্রকৃতিস্থ হইলে গোলোকনাথ বলিল,—"কমলা, ক্রমেই আমাদের বিপদের মেঘ ঘনাইয়া আসিতেছে। এখনই উপায় দেখিতে হইবে।"

কমলা তখনও কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"আর কিসের উপায় গোলোকনাথ? আমার সব গিয়াছে—জগতে আমার বলিতে আর আমার কেহ নাই—কিছু নাই—এখন আমি স্বচ্ছন্দে মরিতে পারিব। আমি মরিলে কাঁদিবার কেহ নাই।"

গোলোক। অমন কথা বলিয়ো না।

কমলা। কে আছে?

গোলোক। আমি।

কমলা। তুমি কাঁদিবে?

গোলোক। কাঁদিব না—তুমি মরিলে আমিও মরিব।

কমলা। যদি তেমন স্থির করিয়া থাক,—তবে বুঝি তোমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। এই বিদেশে অসভ্যগণের বর্শাফলকে বিদ্ধ হইয়া মরাই বুঝি আমাদের ললাট-লিপি।

গোলোক। হয় হোক্—সে জন্য ভীত নহি। যতক্ষণ পারা যায়, ততক্ষণ ইহ জগতে স্থূলদেহে একত্রে থাকি,—তারপরে সূক্ষ্ম জগতে একত্রে যাইব।

কমলা। বড় শোকে বড় সান্ত্বনা পাইলাম। এখন কি করিতে চাও?

গোলোক। অশ্বারোহণ কর—চল, তোমার পিতার আশ্রমাভিমুখে যাই।

কমলা। আর সেখানে কেন?

গোলোক। কেবল সৈনিকের কথায় বিশ্বাস করিয়া বিশিষ্ট অনুসন্ধান না করিয়া আমাদের অন্য পন্থা অবলম্বন করা উচিত নয়।

কমলা। আমার পা উঠিতেছে না,—আমার পিতামাতা পশুর নির্দ্দয় ব্যবহারে এক সঙ্গে—এক সময়ে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। কিসের আশায় আর আমি বাঁচিয়া থাকিব! একমাত্র তুমি—গোলোকনাথ, তুমি যদি এ সময় না আসিতে, আমি সুখে মরিয়া সকল জ্বালা যুড়াইতে পারিতাম।

গোলোক। মানব-জীবনে আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা সর্ব্বদাই জড়াইয়া আছে,—কখন কাহার বিয়োগ হইবে, তাহা কিছুই বলা যায় না। যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই ভাল। তারপর? তারপর তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া—আর স্নেহের জনের বিয়োগে তাহার স্মৃতি বুকে করিয়া নিজ কর্ত্তব্য-পথে গমন করাই উচিত। এই আমরা দুইজনে আছি,—হয়ত এখনই কোন দুর্দ্দৈব আসিয়া এক হইতে অপরের বিয়োগ সাধন করিয়া দিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কি মরিতে হইবে? না না,—আত্মহত্যায় মহাপাতক। আত্মহত্যা করিলে, সে মরণ বড় ভয়াবহ! যে জ্বালায় জ্বলিয়া মৃত্যু হয়, সে জ্বালা লিঙ্গদেহকে পরিত্যাগ করে না। তখন মনোময় কোষে—সর্ব্বাঙ্গে সে জ্বালা যুড়িয়া বসিয়া আগুন তুলিয়া দেয়। হাহাকার করিয়া এই পৃথিবীতেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে হয়।

কমলা। তবে কেন গোলোকনাথ, কেন, এত আত্মীয়তা?—এত অল্পক্ষণের জন্য কিসের আয়োজন?

গোলোক। না না, অল্পক্ষণ নয়! পরিণাম আছে,—ঊর্দ্ধলোকে মিলন

আছে। সে সব কথা যদি সময় পাই, দু'জনে আলোচনা করিব। এখন এখানে এরূপ নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আলোচনা করা উচিত নয়।

কমলা। কেন?

গোলোক। পাষণ্ড সিংহ আমাদের বিপক্ষে বিপুল আয়োজন করিয়া বসিয়া আছে। কোন প্রকারে যদি তাহার চক্র-জাল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, সে চেষ্টা আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

কমলা। তুমি বোধ হয়, বাবা যেখানে থাকিতেন—যেখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে স্থান কখনও দেখ নাই?

গোলোক। না,—আমি সেখানে কখনও যাই নাই। তাহার সন্ধানও কখনও পাই নাই।

কমলা। এখান হইতে অধিক দূর নহে। ঐ যে জঙ্গলটা দেখিতে পাইতেছ—উহার মধ্য দিয়া একটা ক্ষুদ্র গলিপথ আছে, সেই পথটা দিয়া সামান্য একটু গমন করিলেই সম্মুখে তাঁহার পুণ্য আশ্রম বুঝি এখন তাঁহাদের বিরহে হা হা করিতেছে, দেখিতে পাইবে। আমি কি করিয়া সেখানে যাইব,—আমার মা বাপ যে আর সেখানে নাই!

গোলোক। তথাপি যাইতে হইবে। একবার না দেখিয়া গেলে, মনে এমনও সন্দেহ কোন সময়ে উদিত হইতে পারে যে, হয়ত তাঁহারা ছিলেন—আমরা না দেখিয়াই ছাড়িয়া আসিয়াছি। হয়ত সিংহ ছলনা করিয়া সৈনিকের দ্বারা ঐরূপ মিথ্যা সংবাদ আমাদিগকে শুনাইয়া দিয়াছে।

কমলা। তোমার অনুমান সত্য হউক—কিন্তু সৈনিক যে মিথ্যা বলে নাই, ইহা নিশ্চিত।

তখন দু'জনে উঠিয়া সহিসদিগকে অশ্ব আনিতে আজ্ঞা করিল।

অশ্ব আনীত হইলে উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিল। দশ বার জন শরীররক্ষী সৈন্যমাত্র তাহাদের সহিত নদী পার হইয়া আসিয়াছিল, তাহারাও তাহাদের সঙ্গে গেল।

ঘন এবং অবিন্যস্ত জঙ্গলের মধ্য দিয়া সরু পথ,—সেদিনকার নির্ম্মলোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণও সেখানে পূর্ণরূপে আলোকদানে সমর্থ হয় নাই—কোথাও গাছের বনচ্ছায়ায় পূর্ণান্ধকার, কোথাও অন্ধকারের আবিলতা মাখা জ্যোৎস্নার ক্ষীণ বিকাশ, কোথাও বা পূর্ণালোক। সেই আলোকান্ধকারের পথ দিয়া

গোলোকনাথ ও কমলা অশ্বারোহণে সেই কয়জন শরীররক্ষী সৈনিককে সঙ্গে লইয়া গমন করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ঐরূপে গমন করিয়া ক্রমে তাহারা আশ্রম-সমীপে উপনীত হইল।

আশ্রমদ্বারে যেন কে দাঁড়াইয়া আছে,—অনতিদূরে থাকিয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সে মূর্ত্তি দেখিয়া পুলকপূর্ণিত স্বরে আবেগভরে কমলা বলিয়া উঠিল,—"গোলোকনাথ, তোমার অনুমানই সত্য। সৈনিক মিথ্যা বলিয়াছে—ঐ যে আমার বাবা পুরোদ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। জ্যোৎস্নালোকে এতদূর হইতেও আমি তাঁহাকে বেশ চিনিতে পারিতেছি।"

গোলোকনাথ বিস্মিত নয়নে সেদিকে চাহিল। কি সর্ব্বনাশ! এ কি ভীষণ দৃশ্য!

সহসা সেই মূর্ত্তির চারিদিকে যেন রক্তবৃষ্টি হইতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে শুভ্র আলোক-রেখা জ্বলিতে লাগিল।

কমলা ও গোলোকনাথ অশ্ব-বল্গা টানিয়া ধরিল,—আর একপদও অগ্রসর হইল না।

সে মূর্ত্তি যুগল বাহু আন্দোলন করিল। তারপরে একবার আকাশের দিকে চাহিল—ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল। তারপরে সব ফুরাইল—আর কিছু নাই।

গোলোকনাথ বিস্ময় কম্পিত স্বরে বলিল,—"না কমলা, তোমার পিতামাতা নাই। সত্যই তাঁহারা পশুর অধম সিংহের নির্দ্দয় হস্তে নিহত হইয়াছেন।"

কিঞ্চিৎ ভীতার্ত্ত হইয়া কমলা বলিল—"বাবাকে ওরূপ অবস্থায় কেন দেখিলাম?"

গোলোক। আমাদিগকে তাঁহার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখাইয়া তবে চলিয়া গেলেন। যদি পারি, আমরা প্রতিহিংসার প্রতিশোধ লইব। ঐ স্থানে বোধ হয়, তাঁহাদের মৃতদেহ আছে—অগ্রগামী হও। দেহ দুইটীর সৎকার করিতে হইবে। আমি শুনিয়াছি, বহু দিনের বসবাসের পরিত্যক্ত দেহ-সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া আত্মা শীঘ্র চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হন না,—সেই দেহে একটু মমতা থাকে,—কিন্তু বিক্রীত রুদ্ধদ্বার পুরাতন গৃহের পুরোদ্বারে উপস্থিত হইলে আশ্রয়হীন ব্যক্তির যেমন কষ্ট হয়, তখনকার নিরালম্ব জীবাত্মাও তেমনি বহুদিনের আবাসস্থান মৃতদেহের নিকটে দাঁড়াইয়া

থাকেন, কিন্তু প্রবেশাধিকার আর থাকে না। সেই দেহটীকে সেই জন্য সযত্নে শ্মশানানলে দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। যথাশাস্ত্র তাহার কার্য্য হইলে শীঘ্র ভোগদেহ গঠিত হয়। অতএব চল, আমরা তাহা সম্পাদন করিগে।

কমলা। সৈনিক বলিতেছিল,—গৃহমধ্যে তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে নিহত হইয়াছেন।

গোলোক। সিংহ বা তাহার সৈনিকগণ অথবা বনপশুগণ টানিয়া এখন বাহিরে আনিয়া ফেলিতে পারে।

তখন উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রমাভিমুখে গমন করিল।

বাস্তবিকই যেখানে তাহারা ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিল, তথায় কমলার পিতার মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি শবভুক্ শৃগাল কুক্কুর ঘুরিয়া বেড়াইলেও তাহা তখনও পূর্ণরূপে অক্ষত রহিয়াছে, দেখিতে পাইল।

বিস্মিত নয়নে গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া কমলা জিজ্ঞাসা করিল,—"এমন কেন হইল গোলোকনাথ ?"

গোলোক। কি হইল ?

কমলা। বাবা কখন ভ্রমেও পাপ করেন নাই,—অথচ তাঁহার দেহ শৃগাল-কুক্কুরেও ভক্ষণ করে নাই কেন? আমি শুনিয়াছি, পাপীর দেহই ঐরূপে পড়িয়া থাকে।

গোলোক। না না, তাহার কোন কারণ নাই। মানুষ পাপী বা পুণ্য-বান্ বলিয়া তাহার দেহ শৃগাল-কুক্কুরের অভক্ষ্য হয় না।

কমলা। তবে ?

গোলোক। দেহের উপরে যাহার অত্যন্ত আসক্তি—সে সূক্ষ্মদেহে দেহ-সন্নিধানে অবস্থান করিয়া পশু-গ্রাস হইতে নিজের পরিত্যক্ত দেহ রক্ষা করিতে থাকে।

কমলা। আমি শুনিয়াছি, অনেকস্থলে এরূপ দেহ অনেক দিন পচেও না, —তাহার কারণ কি ?

গোলোক। তুমি একথা শুনিয়াছ কি যে, মৃত্যুর পরেও শব-দেহে ধনঞ্জয় নামক বায়ু অবস্থান করে ? *

* মৎপ্রণীত 'জন্মান্তর-রহস্য' নামক পুস্তকে এ সকল কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কমলা। হাঁ, শুনিয়াছি।

গোলোক। ঐ মৃতদেহ পুড়িয়া গেলে তবে ঐ বায়ু বায়ুস্তরে মিশিয়া যায়। অপর সকল বায়ু প্রাণবায়ুর সহিত নাভিশ্বাস-কালে মিশিয়া যায় এবং জীবাত্মার সহিত মৃত্যুকালে দেহ হইতে বাহির হয়।

কমলা। সেই ধনঞ্জয় বায়ুই কি তবে মৃতদেহ রক্ষা করে ?

গোলোক। না। সেই বায়ুকে আশ্রয় করিয়া মুক্ত আত্মা বা সূক্ষ্মদেহী ঐ দেহকে বাহির হইতে রক্ষা করে বলিয়া অপেক্ষাকৃত অনেক দিন না পচিয়াই থাকে।

কমলা। যাহারা পুড়াইয়া দেয় ?

গোলোক। এইজন্যই দেহকে পুড়াইয়া দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর।

কমলা। তাহা হইলে বুঝি আসক্তি থাকিতেও দেহীকে তথা হইতে প্রস্থান করিতে হয়।

গোলোক। কাজেই। যাহার উপরে আসক্তি, তাহা যদি নষ্ট হইয়া গেল,—তবে আর কিসের জন্যে অবস্থান করিবে ?

কমলা। মাটীতে পুঁতিয়া ফেলিলে, সেখানেও কি দেহমুক্ত আত্মা গমন করিতে পারে ?

গোলোক। সূক্ষ্ম দেহীর অগন্তব্য স্থান নাই। দুইটী ক্ষুদ্র অণুকে খুব ঠাসিয়া পাশাপাশি বসাইলে সেখানেও একটু ফাঁক থাকে—সে ফাঁক দিয়াও মুক্ত আত্মা গমনাগমন করিতে পারে। †

কমলা। তবেত সমাধি-আদি প্রদান করিলে বহুদিনের বসবাসের দেহ পরিত্যাগ করিয়া জীবাত্মা অনেকদিন না গিয়াও আসক্তিবলে সেখানে অবস্থান করিতে পারেন ?

গোলোক। হাঁ, তা পারেন বৈ কি ;—আর যাঁহারা শবদেহ সমাধিস্থ করেন, তাঁহাদের সে বিশ্বাস আছে বলিয়াই সমাধিস্থানে মৃতকের আত্মার উদ্দেশ্যে ভক্তি শ্রদ্ধা ও দীপাদি দান করা হয়। তবে সকলেই থাকেন না,—যাঁহাদের দেহের উপর আসক্তি নাই, তাঁহারা মৃত্যু-অন্তেই চলিয়া যান।

† বর্ত্তমানে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, একখানি দৃঢ় ইষ্টকের মধ্য দিয়া ইথার বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। আবার ইথার আণবিক যোড়ের মধ্য দিয়াও মুক্ত আত্মা গমনাগমন করিতে পারে। বিলাতে ডাক্তার মিঃ হেয়ার ডেভিড সে প্রমাণও করিয়াছেন।

আবার আসক্তি লইয়া যাঁহারা অবস্থান করেন, তাঁহারাই যে, চিরকাল থাকেন, তাহাও নহে। কিছুদিন থাকিয়া যখন আসক্তি দূর হয়, তখন চলিয়া যান।

কমলা। আমার বাবা জীবদ্দশাতেই আসক্তিশূন্য ছিলেন,—মৃত্যুর পরে তবে কিজন্য দেহের নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন?

গোলোক। আমরা আসিতেছি, তিনি তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, আমাদের আগমন-কাল পর্য্যন্ত তাই দেহটিকে রক্ষা করিতেছিলেন। দেহটিকে কিয়ৎকাল রক্ষা করিলে যদি সৎকার হয়,—তাই দাঁড়াইয়াছিলেন।

কমলা। মৃতকের এ ক্ষমতা থাকে কি?

গোলোক। সকলের না থাকিলেও অনেকের থাকে।

কমলা। মায়ের দেহ খুঁজিয়া দেখিগে চল, এখনই আমরা দুইটী দেহের যথাসাধ্য সৎকার করিগে।

গোলোক। আপাততঃ তাহাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য।

তখন উভয়ে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া কমলার মাতার দেহের অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিল। তাহা শয্যাবৃত অবস্থায় ছিল।

তখন সেই শরীররক্ষী সঙ্গিগণের সাহায্যে শবদেহ দুইটীকে নদীতীরে বহিয়া লইয়া গিয়া কাষ্ঠাহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিল, তারপরে চিতাগ্নিতে ভস্ম করিয়া যথাবিধি সৎকার করিল। তারপরে স্নান করিল।

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন্ ভট্টাচার্য্য।

সমুদ্র।

কোথা যাও কল্লোলিয়া, ওহে অম্ভোনিধি,
অশনি-সম্পাত-নাদে ফির পুনরায় ;
শক্তিধর হ'য়ে কোন শক্তিধর-বিধি
মেনে চল,—নিশিদিন কে তোমা চালায় ?
কাহার আদেশ বহি স্ফীত বীচিমালা
সুসজ্জিত চমূ সম ধরিয়া উরসে
কর অভিযান, সিন্ধো, ভাসি' দাও বেলা
ওই তুঙ্গাটলতীর বিজয়-মানসে ॥
শারদ নীরদনাদে ঊর্ম্মিমালা ল'য়ে
ধেয়ে এস, কিন্তু হেরি অটলত্ব তার
ফিরে যাও ;—এস পুন বিজীগিষু হয়ে
দিবানিশি যাও—ফির হেন কতবার ॥
কত ঝঞ্ঝাবাত সহ মনোরথ তরে
তবুও জীগিষা ধ্রুব ;—শিখাও মানবে
হে অধ্যবসায়ি সিন্ধো, তারা যেন পারে
চেষ্টিতে এহেন শোকতাপ পূর্ণ ভবে !
মহাপ্রাণ তুমি, সিন্ধো, শক্তি অবতার,
হে অধ্যবসায়ি, তোমা নমি শতবার !!

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়।

রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র। *

রাঢ়ী ও বারেন্দ্র পদ্মার এপার ওপার সম্বন্ধ। অতি পূর্ব্বকালে যে এই দুইটী শাখা, একই কাণ্ড হইতে উঠিয়া, স্বগর্ব্বে পদ্মার এপার ওপার ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; তাহা অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের "সম্বন্ধ নির্ণয়" পুস্তক পাঠে জানা যায় যে, গৌড়েশ্বর আদিশূর, কান্যকুব্জ হইতে যজ্ঞসম্পাদনার্থ যে পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণ পঞ্চক এদেশে আনয়ন করেন, পরে তাঁহাদেরই বংশধরেরা রাঢ়ীয় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং পশ্চাৎ আগত তাঁহাদের ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের সন্তানসন্ততি বারেন্দ্র আখ্যা পাইয়াছিলেন। কেবলমাত্র এক ভট্টনারায়ণের বংশধরেরা কেহ রাঢ়ীয় এবং কেহ বারেন্দ্র শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর আদিশূর যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ এদেশে আনয়ন করেন, বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে কেন আনয়ন করেন, এ সম্বন্ধে অবশ্যই বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে ব্রাহ্মণের অধঃপতনেই যে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ এদেশে আনীত হইয়াছিল, তাহা একরূপ নিঃসন্দেহ।

কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চব্রাহ্মণ আনিত হইবার পূর্ব্বেও যে এদেশে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে সপ্তসতি বা চলিত কথায় সাতসতি ব্রাহ্মণ বলিত। তাঁহারা চণ্ডী পাঠ করিতেন। চণ্ডীতে সাতশত শ্লোক বর্ত্তমান। তাই বোধ হয় তাঁহাদের সপ্তসতি বলিত। ঘটকের চলিত কথায় এখনও শোনা যায়—

"পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই,
এ ছাড়া আর বামন নাই,
যদি থাকে দুই এক ঘর।
সাতসতি আর পরাশর।"

গাঁই শব্দ, গ্রামের অপভ্রংশ। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণকে রাজা এক একটি গ্রাম যৌতুকস্বরূপ দান করেন। সেই গ্রামের নাম হইতেই ভবিষ্যতে

---

* প্রবন্ধটিতে মতদ্বৈধ থাকিলেও ভাবিবার কথা আছে, অতএব পত্রস্থ করা হইল।

গাঁইএর সৃষ্টি। বিশ্বকোষ-প্রণেতা নগেনবাবু সেই গ্রামগুলির মধ্যে কতিপয় গ্রামের নূতন নাম ইত্যাদি পর্য্যন্তও আবিষ্কার করিয়াছেন।

রাঢ়ীয় সমাজের মুখোজ্জ্বলকারী কৃষ্ণনগরের রাজবংশ সপ্তসতি বংশ সম্ভূত। কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ এদেশে আনিত হইবার পূর্ব্বেও তাঁহাদের বংশ এদেশে বর্ত্তমান ছিল।

বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণের মধ্যে একটা শ্রেণী বিভাগ করিয়া যান। সেই সময় হইতে কি তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র পৃথক গণ্ডিতে আবদ্ধ হইলেন, একথা জানিবার উপায় নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলজ্ঞ (ঘটক) দিগের গ্রন্থে ঠিক এ সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ না থাকিলেও, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের একই বংশ হইতে যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই উভয় শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে,—একথা লিপিবদ্ধ আছে। কিম্বদন্তী আছে যে, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, বৌদ্ধরাজার দানগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, সমাজে পতিত হয়েন। এবং সপরিবারে ফিরিয়া আসিয়া এদেশে বাস করেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হইতেই এই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে। রাঢ়ীয় মতে শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ ও ছান্দড় এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ এদেশে আনিত হন, কিন্তু, বারেন্দ্র মতে ইহাদের নামের মধ্যে বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ইহাতে সহজেই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, উপরোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান-সন্ততি হইতেই এই রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগ।

গৌড়নগর যখন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজধানী ছিল, তখন কূটনীতি পরায়ণ বারেন্দ্রের বিশেষ আধিপত্য ছিল। তাঁহাদের অঙ্গুলিসঙ্কেতেই গৌড়ের রাজকার্য্য নির্দ্ধারিত হইত। এক্ষণে, বারেন্দ্রগণ রাজধানী হইতে কিঞ্চিৎদূরে অবস্থিত বলিয়া, কিংবা রাঢ়ীয় অপেক্ষা অধিকতর সঙ্গতি সম্পন্ন হেতু, রাজদ্বারে তাদৃশ সম্মানিত নহেন। এজন্য বলিতেছি, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র উভয়েই প্রতিভাবলে তুল্যকক্ষ। কেহই ধীশক্তি প্রভাবে হীন নহেন। ইহাদের পরস্পর বৈবাহিক মিলন হইলে মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইবে। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রাঢ়ীয় নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা বারেন্দ্র বরে সমর্পিত হইয়াছিল। বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহার প্রমাণ আছে। খড়দহের নিত্যানন্দবংশাবতংশ গোস্বামী প্রভুরা একথায় কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলেও সে আপত্তির মূলে কোনও ভিত্তি নাই।

বর্ত্তমানকালে এক রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যেও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা,—কুলীন বংশজ বা কাপে বিবাহ নিষিদ্ধ। গৌড়েশ্বর বল্লালসেন কুলীন কুমারীর পরিণয়ে যে কুলীন বরই বিধিবদ্ধ, এরূপ কোনও ব্যবস্থা অথবা শাসনের প্রচার করিয়াছিলেন না। বরং সে সময়ে শ্রোত্রীয় বরেও কুলীন কুমারী প্রদত্ত হইত। তাহাতে কন্যার পিতার বা ভ্রাতার কুল বিনষ্ট হইত না। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজা লক্ষ্মণসেনের সময়ে দেবীবর 'ঘটকের দ্বারা কুলীনের মেল বন্ধন হয়'। ধীরে ধীরে যখন কৌলীন্য প্রথায় দোষ প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন দেবীবর "মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা' মারিয়া কুলীনের মেল বন্ধন করিতে লাগিলেন। যথা,—ফুলে মেলের যবন দোষ। বল্লভীর পিণ্ডদান দোষ ইত্যাদি। বারেন্দ্রের মধ্যেও ঠিক্ এইরূপ হইয়াছিল; তখন রাঢ়ীয় ফুলে, খড়দহ, বল্লভী, ও সর্ব্বানন্দী প্রভৃতি মেল, ও বারেন্দ্রের বোহিলা, বেণী, নিরাবিলি আরও কতকি পটী সগর্ব্বে সমাজে বুক ফুলাইয়া উঠিল। ক্রমে ভাই ভাই সব ঠাঁই ঠাঁই হইয়া পড়িল।

এই ছিন্ন ভিন্ন সমাজে মেল, উপমেল, অনুমেল ও পটী, উপপটী অনুপটী প্রভৃতি কত কি এখন প্রবেশ করিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বাছিয়া পরিষ্কার করিতে গেলে, হয়তো ঠগ্ বাছিতে দেশ উৎসন্ন যাইবে। কিন্তু তবে এখন উপায় কি? উপায় এক একীকরণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

এই বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানালোকে আমরা কত সুদূর অতীতের পথ পরিষ্কার দেখিতেছি। সেনবংশ, পালবংশ গঙ্গাবংশ, মৌর্য্যবংশ প্রভৃতির তালিকা প্রস্তুত করিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে বংশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা জানিবার জন্য কাহারও আগ্রহ নাই। এবং একই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি। ইহা কি ক্ষোভের বিষয় নহে?

বিজ্ঞান বলেন, রক্তের যত নৈকট্য সম্বন্ধ হইবে বংশও তত দুর্ব্বল হইবে। মনুষ্যজগতে ও জীবজগতে ইহার প্রমাণ ভূরি ভূরি। এক চক্ষু উন্মীলন করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেই যথেষ্ট উন্মুক্ত দেখিবে। মানবধর্ম্ম শাস্ত্র-প্রণেতা মনুও ইহার সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া বিবাহে অষ্টম পুরুষ বর্জ্জনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

বারেন্দ্র সমাজে দুই একটী ভুক্তভোগী পটীর বন্ধন ছেদন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু রাঢ়ীয়গণ এখনও সম্পূর্ণ উদাসীন। বিধবার পুনঃ সংস্কার অপেক্ষা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহারা অধিকতর সফল মনোরথ হইতে পারিতেন। এ প্রবন্ধে আমার অধিক লিখিবার স্থানাভাব। বারান্তরে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। উপসংহারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মহাত্মাগণের নিকট আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা, তাঁহারা যেন স্ব স্ব পূর্ব্বতন মহাপুরুষদিগের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া, উভয় সম্প্রদায় মিলিবার জন্য যত্নবান হয়েন। এবং অবাদে উভয় উভয় শ্রেণীতে কন্যার আদান প্রদানে বঙ্গে এক বিশাল ব্রাহ্মণ-সমাজের সৃষ্টি করেন। ইংরেজের Lower Ganges Bridge অথবা পদ্মাসেতুর মিলনে, এ মিলন অধিকতর সময়োপযোগী হইবে।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রাধিকা ও ললিতা।

বসন্ত আসিল জানি কোকিল ডাকি'ছে ওই
মাতা'য়ে জগত কুহুস্বরে ;—
গাছে গাছে ফোটাফুল হাসিছে মধুর হাসি ;—
মলয় বহিছে ধীরে ধীরে।

বৃন্দাবনে বিনোদিনী কহি'ছে ললিতা প্রতি
"বসন্ত আসিল ফিরে সই !
নবীন পল্লব ফুলে, সাজিলপ্রকৃতি-রাণী
প্রাণ-কৃষ্ণ এলো মোর কই ?"

তখন ললিতা বলে, "বৃথা শোক ত্যজ ধনি !
স্থির হও, চেয়ে দেখ ফিরে,—
ললিতার কথা শুনি, ফিরিতেই বিনোদিনী
দেখে,—"শ্যাম লতাকুঞ্জ দ্বারে।"

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

জ্যোতিষী।

(দশকুমার-চরিত অবলম্বনে লিখিত গল্প)

এখনকার পাটনায় পূর্ব্বকালে মগধরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেখানকার রাজমন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের একটিমাত্র পুত্র সন্তান ছিল, তাহার নাম রত্নোদ্ভব। রত্নোদ্ভব বিদ্যাভ্যাসে বাল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া, যখন যৌবনে পদার্পণ করিল, তখন জগতের নানা দিগ্‌দেশস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি তাহার প্রাণে এক অদম্য ভ্রমণেচ্ছা জাগরূক করিয়া দিল। যেন সুদূর প্রদেশ হইতে সংসারের মলিনতা লিপ্ত গগনচুম্বী সমুদ্রের পরিসর, ঝরণার ধারা কল্লোলিত পর্ব্বতের অতি উচ্চ শিখর, আর বহুদূর বিস্তৃত নিবিড় অরণ্যের স্তব্ধ বিজনতা চতুর্দ্দিক হইতে সমভাবে তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন সে দেশভ্রমণ উপলক্ষে পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক অল্পসংখ্যক-মাত্র দাসদাসী লইয়া নৌকাযোগে বিদেশযাত্রা করিল। বহুকাল পুষ্ট ভ্রমণেচ্ছা আজ ফলোন্মুখী হইয়া তাহার হৃদয়ে এক ব্যাকুলতা জড়িত আনন্দ স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। সে যখন শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া বায়ুর উদ্দাম তরঙ্গভঙ্গী দেখিতেছিল, তখন বোধ হয় তাহার হৃদয়েও সেইরূপ আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছিল। এইরূপ বিচিত্র দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়া তাহার নৌকাখানি এক নগরপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া সমস্ত দাসদাসী সহ নৌকাখানি বিদায় করিয়া দিল; কারণ তাহাদিগকে ভ্রমণের অন্তরায় বলিয়া তাহার মনে হইল। তারপর রত্নোদ্ভব নগরে প্রবেশ করিয়া, একজন বণিকের আলয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মানুষের প্রবৃত্তি সাধারণতঃ সঙ্গানুবর্ত্তী। এই জন্যই অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ গ্রহণের নিমিত্ত নানাবিধ নৈতিক উপদেশ আছে। নিয়ত যাহার সহিত থাকা যায় প্রবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি তাহারই অনুগামী হইয়া পড়ে। রত্নোদ্ভব বণিকের আবাসে থাকিতে থাকিতে তাহার ভ্রমণের ইচ্ছা দূরীভূত হইয়া বাণিজ্যের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল। তখন সে বণিকের সহিত সমান অংশে অর্থদান করিয়া ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ

করিল। উভয়ে একত্র বাণিজ্য করায় তাহাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। ক্রমশঃ বণিকপরিবারে সে একজন আত্মীয় হইয়া উঠিল। বণিকের সুব্রতা নামে একটি কন্যা ছিল, সে খুব সুন্দরী। রত্নোদ্ভবের আগ্রহে এবং বণিকের একান্ত অনুরোধে তাহার সহিত রত্নোদ্ভবের বিবাহ হইয়া গেল। সুব্রতা পূর্ব্ব হইতেই রত্নোদ্ভবের অন্তরে স্থান-লাভ করিয়াছিল এবং সেও রত্নোদ্ভবকেই তাহার হৃদয়ের মধ্যে স্বামীরূপে দেখিতে পাইত, এই জন্য তাহাদের এই শুভ মিলন অত্যন্ত আনন্দজনক হইয়া উঠিল। এইরূপে দাম্পত্য প্রেমের পবিত্র মধুর আস্বাদে দম্পতিযুগল মুগ্ধ হইয়া রহিল।

সুখ দুঃখ বিজড়িত সংসার-তরঙ্গে অবিশ্রান্ত দুলিতে দুলিতে একবৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটী কুসুমের মত রত্নোদ্ভব ও সুব্রতা ভাসিয়া যাইতেছিল, এমন সময় অলক্ষ্যে ইহাদের ভাগ্যাকাশে কৃষ্ণমেঘের উদয় হইল। সুব্রতা এক দুই করিয়া দশম মাসের গর্ভবতী; সংসারের সার রত্ন পুত্রমুখ দর্শনের আশায় দম্পতির প্রাণ নূতন পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অপুত্রক বণিকও বৃদ্ধ বয়সে দৌহিত্র-মুখদর্শনে চরিতার্থ হইয়া, তাহাকেই স্বীয় বিষয় সম্পত্তির ভবিষ্যৎ স্বত্বাধিকারী করিবার কল্পনায় পুলকিত হইয়া উঠিল। এমন সময় স্বদেশ হইতে পিতৃমাতৃস্নেহ রত্নোদ্ভবকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সে বোধ হয় মনে করিতেছিল যে, আমার সন্তান হইবে, এই আশায় বৃদ্ধবণিক এতদূর আনন্দিত হইয়াছেন, আর আমার পিতামাতা একথা জানিতে পারিলে কতই আনন্দিত হইবেন। তখন সে সুব্রতাকে লইয়া দেশে যাইবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া পড়িল যে, বণিকের নিকট তাহা না জানাইয়া আর থাকিতে পারিল না। বৃদ্ধ বণিক অনেক বাদানুবাদের পর যখন বুঝিতে পারিল যে, সে কিছুতেই আর রত্নোদ্ভবকে রাখিতে পারিবে না, তখন চোখের জল মুছিয়া সজলনয়না সুব্রতার হাত দুইখানি ধরিয়া বলিল, "যাও মা! যখন তোমার সন্তান একটু বড় হইবে, তখন আবার তোমাকে লইয়া আসিব।" এইরূপে তাহাকে আশ্বস্তা করিয়া একজন ধাত্রীর সহিত কন্যা-জামাতাকে বিদায় দিয়া শোক-সন্তপ্তচিত্তে বিপত্নীক বণিক শূন্যগৃহে শয়ন করিয়া রহিল।

রত্নোদ্ভবের হৃদয় এখন আনন্দে উদ্বেলিত। আসন্নপ্রসবা প্রিয়তমা পত্নীকে লইয়া পুত্র-বিরহ-কাতর জনক জননীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ করিবার

অভিপ্রায়ে এখন তাহার হৃদয় উচ্ছ্বসিত। এখন তাহার সমস্ত অভাব পূর্ণ; এই পূর্ণতার মধ্যে স্বাধীনভাবে পত্নীকে লইয়া নৌকাযোগে স্বদেশে যাইতে যাইতে অদূরস্থ সমুদ্রকল্লোল তাহার কর্ণে প্রবেশ করায়, বহুদিনের একটী লুপ্ত অপূর্ণতা হঠাৎ তাহার মনে জাগরিত হইল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহা পূরণের ইচ্ছাও বলবতী হইয়া উঠিল। সুব্রতাও সমুদ্রের নাম শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল। ধাত্রী কিন্তু সমুদ্রের ভীতিপ্রদ গর্জ্জনেই হউক, আর ভাবী বিপদাশঙ্কা প্রৌঢ়ত্বের পরিচায়ক বলিয়াই হউক, পুনঃপুনঃ তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু আনন্দোচ্ছ্বসিত যুবক যুবতীর চিত্তে সে চেষ্টা স্থান পাইল না। তাহারা মাঝিকে আদেশ করিল, মাঝিও সমুদ্রের মধ্যে নৌকা লইয়া চালাইতে লাগিল। ক্রমেই আর একটুকু আর একটুকু করিতে করিতে নৌকাখানি আরও দূরে সরিয়া গেল। তখন সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব ছিল না। ক্রমশঃ সান্ধ্য সমীরণ প্রবল বায়ুতে পরিণত হইল। মাঝিরা অত্যন্ত আশঙ্কিত হইয়া প্রাণপণে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! উৎফুল্ল-হৃদয় যুবকযুবতী, ধাত্রী ও মাঝিদিগকে লইয়া নৌকাখানি সান্ধ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইল।

নৌকাখানি সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইবার পর সকলেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল, কিন্তু ধাত্রী বেশ সুদক্ষা ছিল, সে সুব্রতাকে কটিদেশে বাঁধিয়া লইয়া অন্ধকারে প্রাণপণে সন্তরণ দিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু একজন স্ত্রীলোক প্রাপ্তবয়স্কা আর একজন স্ত্রীলোককে লইয়া এইরূপ তরঙ্গিত সমুদ্রবক্ষে কতক্ষণ সন্তরণ দিতে সমর্থ হয়! প্রাণ যায়, আর রক্ষা হয় না; এমন সময় দৈবক্রমে সে একটী শুষ্ক অশ্বত্থ বৃক্ষ ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া তাহাতে আরোহণ করিল। তখন বায়ুর বেগ কিছু মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। উভয়ে অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া শুষ্ক বৃক্ষটিমাত্র অবলম্বনে সমুদ্রতরঙ্গে অনির্দ্দিষ্ট দেশে অন্ধকারে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ যখন রজনীর গাঢ় অন্ধকার ঊষার বিমল আলোকে ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে লাগিল, তখন ধাত্রী দেখিল, অদূরেই তটভূমি; অল্পমাত্র পরিশ্রম করিলেই উভয়ে সেখানে উপস্থিত হইতে পারিবে। তখন ঈশ্বর ভরসা করিয়া উভয়ে প্রাণপণ চেষ্টায় সন্তরণ দিতে লাগিল এবং অল্পায়াসেই

কৃতকার্য্য হইল। কিন্তু এইরূপ অরণ্যসঙ্কুল নির্জ্জন সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া আসন্নপ্রসবা সুব্রতাকে লইয়া ধাত্রী বিষম প্রমাদ গণিতে লাগিল।

ক্রমেই বেলা বাড়িতে লাগিল। সমস্ত রজনীর অনাহার অনিদ্রা আর ভীতি-বিজড়িত এই পরিশ্রমে উভয়েরই শরীর যেন এলাইয়া পড়িতেছিল। সুব্রতা এতক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় ধাত্রীর আদেশ পালন করিয়া আসিতেছিল, এখন সে নিজের বিপদ ভুলিয়া স্বামীর বিপদ চিন্তায় আকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধাত্রী অনেক চেষ্টায় তাহাকে কিছু আশ্বস্তা করিয়া, একটি বৃক্ষের ছায়ায় বসাইয়া, তাহাদের আহারের জন্য কিছু ফল অন্বেষণ করিতে করিতে একটু অন্তরালে গিয়া পড়িল এবং যত শীঘ্র সম্ভব কিছু ফল সংগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, আবার নূতন বিপদ উপস্থিত হইয়াছে; পূর্ণগর্ভা সুব্রতা বহুকালব্যাপী পরিশ্রমের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। ধাত্রী সেই নির্জ্জন সমুদ্রপ্রান্তে যতদূর সম্ভব সন্তানের সংস্কার সাধন করিয়া দেখিল যে, সুব্রতা প্রসব-যন্ত্রণায় অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, তখন ধাত্রী তাহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

সাধারণতঃ একটী প্রবাদ আছে যে, 'বিপদ কখন একাকী আসে না' কথাটী কেবল শুনিয়া সম্যক অনুধাবন করা যায় না, কিন্তু মানুষ যখন বিপদ-সমুদ্রে পতিত হইয়া চতুর্দ্দিকে উদ্বেলিত তরঙ্গ-ভঙ্গীর দিকে দৃষ্টিপাত করে, তখন কর্ত্তব্যবুদ্ধি দূরে যায়, ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, নিরাশায় হৃদয় আচ্ছন্ন করে। এই সময় মানুষের কর্ম্মশক্তি একমুখী হইয়া প্রধাবিত হয়, তাহার পরিণাম চিন্তা থাকে না, আর সেই একদিক ভিন্ন অন্যদিকে লক্ষ্যও থাকে না। মুহুর্মুহুঃ বিপজ্জাল-বিজড়িতা সুব্রতা যখন ধাত্রীর শুশ্রূষায় সংজ্ঞালাভ করিল, তখন দেখিল, একটী ভীষণ মত্তহস্তী ভীতিপ্রদ আস্ফালন করিতে করিতে তাহাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তখন ধাত্রী ও সুব্রতা প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সদ্যোজাত শিশুটী সেইখানে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া রহিল। অদূরস্থিত বন্য শৃগালগুলি বোধ হয়, শিশুটীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইয়া উচ্চরবে মধ্যাহ্ন গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

যেখানে এইরূপ দুর্ঘটনাশ্রেণী অবিশ্রান্ত ঘটিয়া যাইতেছিল, তাহার অনতিদূরে সমুদ্রের ধারে মগধরাজ-পুরোহিত কুশ সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিলেন।

তিনি দূর হইতে দেখিলেন, একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক ঊর্দ্ধশ্বাসে তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে; সে যখন নিকটস্থ হইল, তখন তাহাকে এইরূপ দ্রুত গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, "সে মগধরাজ-মন্ত্রি-পুত্র রত্নোদ্ভবের ও তাঁহার স্ত্রী সুবৃত্তার সহিত নৌকাযোগে আসিতেছিল; পথে এই সমুদ্রগর্ভে নৌকাখানি নিমজ্জিত হয়, সেও সুবৃত্তা কোনক্রমে তীরে উঠিতে সক্ষম হয় এবং সমুদ্রতীরে সুবৃত্তা একটি পুত্র সন্তান প্রসব করে, তারপর একটি মত্তহস্তীর আক্রমণে দুইজনে দুই দিকে পলায়ন করিয়াছে।" এই বলিয়া সে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল যে, সেই মত্তহস্তী তাহাদের দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে, তখন সে আবার বেগে পলায়ন করিল, ব্রাহ্মণ নিকটস্থ কতকগুলি বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইত হইলেন। হস্তী যখন সেই বৃক্ষগুলির নিকট দিয়া দূরে চলিয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ বাহির হইয়া আর স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে পাইলেন না; সে তখন অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটি শিশু সন্তান অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বৃক্ষতলে পতিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ উহা ধাত্রীর কথিত রত্নোদ্ভবের পুত্র মনে করিয়া, তাহাকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন। তখন রত্নোদ্ভবের পিতামাতা জীবিত ছিলেন না; সুতরাং মগধরাজ স্বয়ং শিশুটির লালনপালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

ক্রমান্বয়ে এক দুই করিয়া ষোড়শ বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। জগতে প্রতিপলকে কত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এই ষোড়শ বৎসরে যে কত পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়া গিয়াছে, কে তাহা নির্ণয় করিতে পারে? কত জীর্ণ অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, কত বালক যুবক ও যুবক প্রৌঢ় হইয়াছে। কত বৃদ্ধ কাল-কবলে পতিত হইয়াছে। তাহা হউক, অবিলঙ্ঘ্য কালচক্র যাহা ঘটাইবে তাহা ঘটিবেই।

অপরাহ্নে সূর্য্যের রক্তিম কিরণ-মণ্ডিত এক পর্ব্বতগহ্বরে ষোড়শ বর্ষীয় এক নবীন যুবাপুরুষ নীরবে বসিয়া আছে। তাহার সুন্দর মুখখানি চিন্তাকালিমাচ্ছন্ন, চক্ষু দুইটি অচঞ্চল, দৃষ্টি শূন্যে। বুঝি জীবনের কোন প্রধান কর্ত্তব্যপালনের চিন্তায় যুবকের হৃদয় আচ্ছন্ন। তাহার অদূরেই গিরি নির্ঝরিণী কলকল তানে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া বহিয়া যাইতেছে, আর অরণ্যস্থ বিবিধ বর্ণের বিহঙ্গগুলি সেই স্রোতে দেহ ভাসাইয়া কাকলীরবে পর্ব্বত কন্দর প্রতিধ্বনিত করিতেছে, কিন্তু যুবকের সে দিকে দৃষ্টি নাই, সে আপন মনে আপনার চিন্তায় নিমগ্ন। এমন সময় তাহার সম্মুখস্থ সূর্য্যকিরণে কিসের

যেন ছায়া পতিত হইল। অমনি ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিতে পাইল যে, একজন লোক পর্ব্বতশিখর হইতে পড়িয়া যাইতেছে। যুবক অত্যন্ত বলিষ্ঠ ছিল, সে অতি ত্রস্তে উঠিয়া শূন্যপথেই তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। যে ব্যক্তি পড়িয়া যাইতেছিল, সে যখন একটু আশ্বস্ত হইল, তখন যুবকটি তাহাকে ঐরূপ উচ্চস্থান হইতে পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল; তখন সেই ব্যক্তি বলিল "বাবা! আমাকে রক্ষা করিয়া তুমি ভাল কর নাই, আমার জীবন অতি দুঃখময়। আমি মগধরাজমন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের পুত্র, আমার নাম রত্নোদ্ভব। আমি বিদেশ ভ্রমণের ইচ্ছায় বাণিজ্য করিবার ছলনা করিয়া দেশত্যাগ করি, পরে বিদেশেই বিবাহ করি। তারপর আসন্নপ্রসবা পত্নীকে লইয়া দেশে আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে সমুদ্রগর্ভে নৌকাখানি নিমজ্জিত হয়, তাহাতে আমি কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছি, কিন্তু আমার পত্নীর যে কি হইল, তাহা আর জানিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেছিলাম, এমন সময় একজন জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, 'ষোড়শ বৎসর অন্তে তুমি পত্নী-পুত্রের সহিত মিলিত হইবে।' আজ সেই ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইল, কিন্তু তথাপি পত্নী-পুত্রের সাক্ষাৎ না পাইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতেছিলাম।" তখন হর্ষোৎ-ফুল্ললোচনে যুবক বলিল,—"বাবা! আমিই আপনার হতভাগ্য পুত্র। আমার মাতা অরণ্যের মধ্যে আমাকে প্রসব করিয়া নিরুদ্দিষ্টা হন। পরে আমি যখন জানিতে পারিলাম যে, আমার মাতাপিতা নিরুদ্দিষ্ট, তখন হইতে আপনাদের অন্বেষণে এইরূপ নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।" এমন সময় তাহারা পর্ব্বতশিখর হইতে স্ত্রীকণ্ঠে রোদনধ্বনি শুনিতে পাইয়া, সেইদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, একটী স্ত্রীলোক প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যতা; আর এক বৃদ্ধা তাহাকে বাধাপ্রদান করিতেছে। ইহাদিগকে দেখিয়া আর যেন তাহার প্রাণত্যাগের ইচ্ছা রহিল না। তখন রত্নোদ্ভব বৃদ্ধা ধাত্রীকে এবং স্বীয়পত্নী সুব্রতাকে চিনিতে পারিয়া, তাহার প্রাণত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, তাহাকেও একজন জ্যোতিষী গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, 'ষোড়শ বৎসরান্তে তুমি স্বামীপুত্রের সহিত মিলিত হইবে' কিন্তু অদ্য সেই ষোড়শ বৎসর পূর্ণ হইল, তথাপি সে পতিপুত্রের সাক্ষাৎ না পাইয়া জ্বলন্ত অনলে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছিল, কিন্তু ধাত্রী তাহাতে বাধাপ্রদান করিতেছে। তখন সকলে মিলিয়া সেই জ্যোতিষীর উদ্দেশে অজস্র ধন্যবাদ বর্ষণ করিল। রত্নোদ্ভব পত্নীকে পুত্রের সহিত

পরিচয় করিয়া দিল। সুবৃত্তা ছুটিয়া যাইয়া পুত্রের মুখচুম্বন করিল। সকলের আনন্দাশ্রুতে পর্ব্বতশিখর প্লাবিত হইতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হইয়াছিল, অদূরস্থিত ঝরণা-বারি মিলন-গীতি গাহিতেছিল, আর বন্য বিহঙ্গমগুলি মিলন সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে আপন আপন কুলায় ছুটিয়া চলিল।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

অনিত্যতা।

যায় দিন আসে রাত্তি, বিলোপি ভাস্করভাতি,
সুধাকর নভ-অঙ্কে হয় সুশোভন,
আবার নীহার নাশি, বিস্তারি কিরণরাশি,
পূর্ব্বদিকে হাসি দিনে উদেন তপন।
কভু হাসে কমলিনী, কভু কান্দে কুমুদিনী
পরস্পর হাসে কান্দে পাইয়া কিরণ;
বসন্তে প্রকৃতি সাজে, শিশিরে আপনি সাজে,
স্বভাব সুন্দরী— বেশ করে সম্বরণ;
বরষা আসিল ব'লে, কল্লোলিনী দলে বলে
উত্তুঙ্গবীচিকা শিরে করিয়ে ধারণ;
ভাঙ্গি তট নিজ নীরে, স্ববলে বর্দ্ধিত করে
ভয়ঙ্কর কলেবর ভীতি প্রদর্শন;
আবার শরদাগমে, কালের বক্রতা ক্রমে
তটিনীর ক্ষীণ তনু থাকে না সে ভাব;
যেমতি বারিদ পেলে, অনিল প্রবেশে বলে
থাকে না সে ভাব হয় তাহার অভাব।
সুখের "বালক কাল", নাহি থাকে চিরকাল,
না থাকে অধরে (তার) সুমধুর আধ ভাষ;
যৌবনে প্রবেশ করি, গম্ভীর "মুরতি" ধরি,—
বর্ষীয়স'—প্রতি করে ব্যঙ্গভাবে হাস;

না থাকে সে ভাব,—যায়, যৌবন বিলুপ্ত হয়,
বার্দ্ধক্য আসিয়া দেহে পশে সুনিশ্চয়,
সর্ব্বসংহারক আসি, লয়ে যায় তাও গ্রাসি
থাকে না নরের চিহ্ন ভূতে মিশে যায়॥
উষা-হর প্রভাতেরে, মধ্যাহ্ন হরণ করে
পরাহ্ন আসিয়া করে তার পরাজয়,
গোধূলি আসিয়া হাসি, পরাহ্নে সবলে গ্রাসি
ক্ষণিক শোভায় করে সুসজ্জিত কায়;
যামিনী আসিয়া রোষে, ধীরে ধীরে তাও গ্রাসে
থাকে না দিবার কিছু করয়ে হরণ;
সুকুমারী(র) বেশ দেখে, চেয়ে থাক তার দিকে
মায়ার কুহকে করে অসার ভাবন॥
কামিনী কাঞ্চন ধনে ভুলে থাক সর্ব্বক্ষণে
ভাব না যাকে,—শেষে কিছুই রবে না,
এ পঞ্চ ভৌতিক দেহ, ভোগি বহু মায়া-মোহ
তত্ত্বে তত্ত্ব লয় পাবে জীবন রবে না॥
অনিলে অনিল যাবে, জলে জল মিশে যাবে,
তেজে তেজ লয় পাবে ক্ষিতি ক্ষিতিসহ,
যাবে ব্যোম মহাকাশে কাল আসি তব কেশে
ধরিবে নিশ্চয় মন ত্যজ মায়া-মোহ,
দেখরে নয়ন মেলি, সম্মুখে রয়েছে ঢলি
অকালে স্নেহের ওই বালক নন্দন;
অনিত্য সংসার হায়. কিছুইতো স্থায়ী নয়
এইরূপে যাবে সবে ছাড়ি এ ভুবন॥
রে ভ্রান্ত! বচন ধর, নয়ন মুদ্রিত কর
থাকিতে সময় কর অর্চনা তাহার,
এ বিশ্ব রচনা যাঁর, যিনি ভব কর্ণধার
সময় থাকিতে তায় ভাব একবার॥

শ্রীহিমচন্দ্র সেন গুপ্ত

ভালবাসা ও তাহার দেবতা।

তুইপীঠ।

প্রেমের আনন্দ। কামের জ্বালা।

K. V. Seyne & Bros.

ভালবাসা ও তাহার দেবতা।

এখনো ত ভাঙ্গেনিক'
প্রাণ-জড়ান ভুল!
এখনো সেই কচি মুখে,
এখনো সেই ডাগর চোখে
ভেসে উঠে তেম্নিতর
স্বর্গ-ঝরা ফুল,
তবে কি ভাঙেনি আ'জও
জন্মযোড়া ভুল?

এখনো তার কথার মাঝে
কোকিল-মধুর আওয়াজ বাজে,
এখনো তার স্পর্শ বুঝি
স্বর্গ-সুখের তুল,
তবে কি ভাঙেনি আ'জও
তত কালের ভুল!

এখনো তার গলার মালা
তেম্নিতরই দোলে,
এখনো তার কবরী-ভার
তেম্নিতরই ঝোলে
এখনো তার রক্ত-রাগ
চরণ-তলে হাসে;
এখনো তায় ধর্‌তে গেলে
চাঁদের আলোয় মিশে।

ভেবেছিলাম এপারেতে
আমি আছি খাসা,
এত দিনে ভেঙে গেছে
ওপারের বাসা।

কোথায় এপার কোথায় ওপার
কোথায় গেল কূল.
কোথায় আদি কোথায় অন্ত
কোথায় ইহার মূল!

চিতায় চ'ড়ে পুড়্‌বো যে দিন
ফিরবো বায়ু-বলে,
সে দিনও কি এরি ঝোঁকে
ঝিমিয়ে যাব' চ'লে?
কার্য্য হ'লে কর্ত্তা আছে,
এর কি আছে মূল?
এরি নাম কি পী-রি-তি ?
এই কি মজায় কুল?

কবি বলে, খুব খবরদার
(ওটি) নষ্ট গুড়ের থাজা,
ওঁর নয়নে হয় নাস্তা-নাবুদ
স্পর্শে মরে তাজা!
কার্য্য সবাই শুন্‌লে উঁহার
অনঙ্গ ওঁর নাম;
কুসুম-শ্বাসে নিশোয়াস
কুসুম-সুন্দর-ঠাম।
ফুলের শয্যায় শয়ন নিতি
সবই উঁহার ফুল,
এক পীঠে ওঁর সুধার ধারা
আর এক পীঠে হুল।

১৫ই বৈশাখ ১৩২০। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

পল্লী কথা।

শিক্ষায় স্বাধীন না হইলে, মানুষ কর্ম্মে স্বাধীন হইতে পারে না। সকল বর্ণের, সকল লোকের পক্ষে আবার একরূপ শিক্ষাও হিতকর নহে। যে দেশে লোক আপনার আবশ্যক মত, আপনার স্বাধীন হৃদয়ের প্ররোচনায়, আপনার শিক্ষা বাছিয়া লইতে পারে, সে দেশ নিশ্চয়ই শান্তির লীলা-নিকেতন। যে দেশে তাহার উপায় নাই, সে দেশ সুজলা সুফলা হইলেও দৈহিক-প্রয়োজনে মরুভূমি। তাই ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ স্বাস্থ্যপূর্ণ ও সমৃদ্ধ। সার্ব্বর্ণিক 'লেখা পড়া' সত্বেও তাই আমাদের দেশ আ'জ অসুস্থ, নিরন্ন ও অশান্তির নির্ব্বিঘ্ন নিকেতন। রাজা সহস্র কারুণিক হইলেও, এদেশীয় লোকের পক্ষে যে শিক্ষা সর্ব্বাংশে হিতকর, তাহা স্থির করিয়া না উঠিতে পারেন। জাতীয় শিক্ষার ভার, জাতীয় হস্তেই থাকা উচিত। একথা আমরা বহুদিন হইতেই বলিয়া আসিতেছি। এত দিনের পরে বুঝি চৈতন্যের একটু উন্মেষণ দেখা দিয়াছে—শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যতত্ত্বের বিষয়ও আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কথাটা আরও একটু গোড়া হইতে আরম্ভ করা যাউক। আগে,—বড় অধিক দিনের কথা নহে; ত্রিশ চল্লিশ বৎসর আগে, আমাদের এই বঙ্গদেশে মানুষ যেন সা শান্তির মুক্ত স্বাধীন আনন্দ-ভবনে বাস করিত। ভয়, উদ্বেগ, অকাল-মৃত্যু, জরা—এ সকল কাহাকে বলে, তাহা যেন জানিত না। সিংহ-বল-দৃপ্ত মানব-মানবী যথেচ্ছ ভোজনে তৃপ্তি লাভ করিয়া দীর্ঘজীবন উপভোগ করিত। ভদ্রাভদ্র একত্র হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, ঢাল শড়কী লাঠি লইয়া ক্রীড়া করিত, দল বাঁধিয়া লাঠি দিয়া বন্য শূকর, বাঘরোল, শৃগাল প্রভৃতি শিকার করিত। সাধারণ গৃহস্থ ভদ্রলোকেরা হাঁটিয়া দশক্রোশ পথ গিয়া তবে স্নানাহার করিতেন। বড় লোকেরা অশ্বারোহণে গমন করিতেন। যাহার অশ্ব যত দুরন্ত—তিনি তত আনন্দ অনুভব করিতেন। স্থবির, পীড়িত, ও স্ত্রীলোকেরাই পাল্কীতে গমনাগমন করিতেন। আহারে—বিহারে—বসনে—ভূষণেও অনেক পার্থক্য ছিল। দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মানুষের জুতা পরিতে আছে, এমন ধারণাই কাহারও ছিল না। বড় শীত না লাগিলে জামা-আলোয়ান পরিতে হয়, তাহা কেহ জানিত না। নগ্ন পদে, অনাবৃত

দেহে, বিমুক্ত বাতাসে, বর্ষার ধারায়, গ্রীষ্মের খররৌদ্রে বালক-বালিকা স্বাধীনভাবে পল্লী ভবনের চিরসুসুস্থ মণ্ডপতলে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিয়াছে। যুবকগণ মোটা কাপড় পরিধান করিত—স্বাধীন ক্রীড়া, স্বচ্ছন্দবিহার আর বনজাত অনির্ব্বাচিত শাক-সব্জী মাছ-মাংস-দাইল-অন্ন এবং পায়স-পিষ্টক প্রভৃতি ভোজন করিয়া কখনও উদ্গার তুলিয়া মুখ ম্লান করিত না। মনে পড়ে, গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে দুই তিন মাইল পথ হাঁটিয়া গিয়া যুবকেরা ভূরি ভোজে মৎস্য মাংস কলাইয়ের দাইল বালৃতিভরা পায়স পিষ্টক খাইয়া তারপরে সন্দেশ-রসগোল্লায় আড়ি ধরিত! বৃদ্ধগণ পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দ গমনে যথেচ্ছ গিয়া 'রাক্ষুসে ভোজনে' দাতার দানশক্তির পরিচয় লইতেন। তখনকার আমোদ ছিল, বারোয়ারি কালী পূজায়। পূজায় মেষ-মহিষ-ছাগল বলিদান হইত। বলির পশু ধরিয়া, ঢাক-ঢোলের কঠোর বাদ্যের সহিত মাতৃনামের উচ্চ কোলাহলে গগন-গাত্র মুখরিত করিয়া আনন্দ অনুভব হইত। বলিদান-অন্তে পশুরক্তের ধারা মাখিয়া বাদ্যভাণ্ডের ভীষণ কোলাহলে তাণ্ডব নৃত্যে সকলে সুখানুভব করিতেন। গান ছিল, কবির লড়াই—তার বাদ্য ছিল, ঢোল কাঁসীর কর্কশ নিনাদ! আনন্দ-কর্দ্দমে মল্লযুদ্ধ হইত—ভদ্রাভদ্র সকলেই কাদার মধ্যে পড়িয়া নারিকেল ক্রোড়মধ্যে লুকাইয়া চাপিয়া রাখিতেন, প্রতিদ্বন্দ্বী বল প্রকাশে তাহা বাহির করিয়া লইবার চেষ্টা করিত। দর্শকগণ দেখিয়া উচ্চ হাস্য-কোলাহলে দিগন্ত মুখরিত করিয়া আনন্দ অনুভব করিত!

এখন সে সবই ঘোর অসভ্যতা! এখন সে সবই অশিক্ষিতের অনুচিত কার্য্য। বালক জন্মিলেই তাহার গায়ে জামা পরাইতে হইবে, আর সম্ভবতঃ বৃদ্ধ হইয়া মানুষ যখন চিতারোহণ করিবে, তখনই গাত্রচর্ম্মের সহিত, জামাও খুলিবে। 'জুতাত' জীবনের জপমালা। উঠিতে জুতা, বসিতে জুতা, খাইতে জুতা, শুইতে জুতা। জুতা না হইলে আর একদণ্ডও চলে না। পাছে পায়ে হিম লাগিয়া সর্দ্দি করে—এই আশঙ্কায় মেয়ের বাপও দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জুতার মধ্যে কন্যাপদ আবদ্ধ রাখিয়া দিতেছেন। আর দিনকতক পরে পায়ের 'হাজা ধরা' নিবারণ কল্লে যে, মা-লক্ষ্মীরা জুতা পায়ে দিয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃতা হইবেন, তাহা ধ্রুব নিশ্চয়।

পল্লীর ছেলে মেয়েরা আর এখন মুক্ত আকাশ-তলে মুক্ত বাতাসে মুক্ত গাত্রে ছুটাছুটি করে না। তাহারা এখন যেন প্যাক করা কাবুলী আঙ্গুর।

সর্ব্বাঙ্গে জামা-কাপড়ের আচ্ছাদন, পায়ে মোজা-জুতা, গলায় গলাবন্ধ, মাথায় টুপী—তথাপিও লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, নাক দিয়া জল ঝরিতেছে, চক্ষু-কোণে কজ্জল-রাগ-রঞ্জিত পিচুটীর ডেলা,—পেটে হাত দিয়া টিপিলে প্লীহা-যকৃতে ভরা। নাড়ী টিপিলে একটু তাত অনুভব হইবে।

যুবক-যুবতীর ম্লান মুখ। সে হাস্যোজ্জ্বল সম্পুষ্ট দেহ মানব-মানবী আর পল্লীমধ্যে দেখিতে পাইবে না। ম্লানমুখ জীর্ণ-শীর্ণ কঙ্কালসার দেহ—উদর অম্ল-ক্লেদ-প্লীহা-যকৃতের লীলা-নিকেতন। আহার—নিত্য পুরাতন চাউলের মুষ্টি পরিমিত অন্ন, ক্ষুদ্র মৎস্যের ঝোল, আর জলমিশ্রিত বল্কাদুগ্ধ। এক ক্রোশ পথ হাঁটিবার শক্তি আর যুবকগণের নাই,—'অশ্বারোহণ গোঁয়ারের কাজ'—গাড়ী পাল্কী তাও 'ঝেঁকনী' অসহ্য। চল্লিশ পার হইলেই স্থবির। বৃদ্ধ মোটে দেখাই যায় না,—বৃদ্ধত্ব লাভের অনেক পূর্ব্বেই অভিমানে ইন্দ্রিয়গণের সাফাই জবাব লইয়া মানব-মানবী যমালয়ের পথে চলিয়া যাইতেছে। ঢাকঢোল আর পল্লীতে বড় বাজে না—সে যে বড় কঠোর আওয়াজ! শাঁখে ফুঁ দিলে কর্ণ-পটহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বাজনার মধ্যে কোন কোন গৃহে হারমোনিয়মের একটু মিঠা আওয়াজ শোনা যায়। পূজা-অর্চ্চনা উঠিয়া গিয়াছে—সে সব করে কে? খাটে কে? সত্য কথা—আমাদের বাড়ীতে কখনও দুর্গোৎসব বন্ধ হইত না, হইবার কথাও ছিল না। দুর্গোৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবার জন্য পৈত্রিক সম্পত্তির ব্যবস্থা ছিল! কিন্তু শরদাগমে সারা বঙ্গপল্লী ব্যাপিয়া যখন শারদোৎসবের উচ্ছ্বাস উঠিত, সারা বঙ্গপল্লী যখন মাতৃ-শক্তির নবজীবন লইয়া মাতৃ-অর্চ্চনার জন্য কোমর বাঁধিত,—এখন ঠিক সেই সময় তাহারা পুত্র-কন্যা আর কুইনাইনের ফাইল সাগু-বেদানা ও রোগের হা হা রব লইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে! কেহ কাহারও দেখিবার থাকে না, কেহ কাহারও মুখ চাহিবার থাকে না, কেহ কাহারও পথ্য দিবার থাকে না। লোকাভাবে কাজেই পূজা বন্ধ করিতে হইয়াছে! কেবল আমাদের নহে—অনেক বাড়ীতে অনেক পল্লীতে পূজা বন্ধের কারণই এই।

আশ্বিন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাস পর্য্যন্ত বঙ্গপল্লীর দুর্দ্দশা, বঙ্গ-পল্লীর মরণ-কোলাহল, বঙ্গ-পল্লীর হতাশ-আক্ষেপ যাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন—বাহিরে দেশের উন্নতির যতই আয়োজন হউক, আর অধিক দিন নহে। কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালার মাটী

জনশূন্য হইয়া যাইবে। প্রত্যেক বৎসর কতলোক যে, অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, কত ভিটা যে নিষ্প্রদীপ হইয়া যাইতেছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য।

চৈত্রমাস গত হইলেই কি নিস্তার পাইতেছে? না। পূর্ণ শান্তি কোথায়? তবে ব্যাপকতা একটু বিদূরিত হয় মাত্র। তখন রুজার্ত্তের অবলম্বিত কন্থা একটু সরাইয়া দিয়া মানব-মানবী একটু উঠিয়া বসিয়া জগতের দিকে দীন-করুণ-নেত্রে চাহিয়া দেখিবার অবকাশ পাইতেছে মাত্র। কিন্তু এতদিন রোগ-ভোগে যাহাদের দৈহিক যন্ত্রগুলি অকর্ম্মণ্য ক্লিষ্ট ও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহারা কি শক্তিতে হঠাৎ তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবে! তাই দেখা যায়, তখনও অনেক লোক জীর্ণ শীর্ণ দেহে ফিরিতেছে। অনেকেই ক্ষয়কারী হাপ-কাস জ্বর যক্ষ্মা প্রভৃতি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাই দেখা যায়, তখনও প্রতি পল্লীতে আরোগ্যের আশায় কত লোক বঞ্চিত,—কত পীড়িত শিশু কোলে করিয়া কত ভীতার্ত্তা জননী নিরাশায় বৃথাশ্রমে রাত্রিজাগরণ করিতেছেন।

এত অল্পদিনে কোন্ দেবতার অভিসম্পাতে কোন্ কুগ্রহের অন্তর্দ্দৃষ্টিতে বঙ্গপল্লীর এমন দুরবস্থা ঘটিল, এবং তাহা নিরাকরণ করিবারই বা উপায় কি? আমাদের দয়ালু রাজা প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়াও বড় অধিক কিছু করিতে পারিতেছেন না। করিতে হইবে আমাদিগকে,—কারণ যাহা করিলে আমাদের প্রকৃতি অনুযায়ী স্বাস্থ্য ও সুখ ফিরিয়া আসিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি, রাজা তাহা বুঝিবেন না। কারণ, দেশ আমাদের, স্বাস্থ্য আমাদের। মাতা তাঁহার সন্তানের অবস্থা বুঝিয়া স্নানাহারের যেমন সুব্যবস্থা করিতে পারেন, ডাক্তার কবিরাজে তাহা পারে না। তাই আমরা আগেই বলিতেছিলাম,—শিক্ষার স্বাধীনতা চাই, এবং সে শিক্ষা জাতি ধর্ম্ম বর্ণ বিশেষে পৃথক্ হওয়া মন্দ নহে। কথাটা আরও বিশদ করার প্রয়োজন, কিন্তু প্রবন্ধ অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়ায়, এবার এই পর্য্যন্ত।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

সম্রাট্ অশোক ও বৌদ্ধধর্ম্ম। *

এই অবনীমণ্ডলে নানা প্রকারের ধর্ম্ম বহুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। বাহ্যতঃ এই সমস্ত ধর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ পালন-বিধি থাকিলেও, ইহাদের মূল উদ্দেশ্য ও পরিণতি যে এক, তৎপক্ষে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, —ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ কিন্তু এক গম্যস্থল॥

যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই জগদ্বক্ষে এক একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় ধর্ম্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতঃ ভূমণ্ডল শান্তি-পূর্ণ করেন। এই সমস্ত মহাপুরুষগণকে "অবতার" বলিয়া শাস্ত্রে অভি-হিত করা হইয়াছে। এই অবতারগণ সময়োপযোগী ধর্ম্ম প্রচার করতঃ অন্তর্হিত হন। তখন তত্তদ্দেশের রাজন্য বা অধিবাসিবৃন্দ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের সত্য দেশ বিদেশে প্রচার করেন। যে সমস্ত ধর্ম্ম এইরূপে রাজন্য ও দেশবাসিবর্গের আন্তরিক সহানুভূতি প্রাপ্ত হয়, সে সমস্ত ধর্ম্ম কিছুকাল স্থায়ী হয় এবং মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণের ন্যায় সে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হয়, আর যে ধর্ম্মের ভাগ্যে এই রাজকীয় সহানুভূতি না ঘটে, সে ধর্ম্ম জলবুদ্বুদের ন্যায় কালের কুক্ষিগত হয়।

এত বড় খ্রীষ্টধর্ম্ম—যাহা আজ ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় সমস্ত জগতের "গহন বিপিন কান্তারে" বিস্তৃত হইয়াছে, এই খ্রীষ্টধর্ম্মও রোম-সম্রাটের সাহায্য ব্যতীত ইউরোপ খণ্ডে প্রথমতঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই,— এ কথা কবির কল্পনা নয়, ইতিহাস সম্মত কথা। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া রোম-সম্রাট্ যেমন জগতে প্রসিদ্ধ, তেমনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা বলিয়া সম্রাট্ অশোক মহীমণ্ডলে পরিকীর্ত্তিত। বস্তুতঃ পক্ষে সম্রাট্ অশোকের সাহায্য না পাইলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রাচ্য-খণ্ডে "সূচ্যগ্র" স্থান ও পাইত না এবং চীন, জাপানে আজ ইহার ক্ষীণ রেখাটুকু দেখিয়া আমরা হৃদয়ে অপরিসীম শ্লাঘা বোধ করিতে পারিতাম না।

সম্রাট্ অশোক বাল্যাবস্থায় অতি নৃশংস, অত্যাচারী ছিলেন, ইতিহাস তাহার জাজ্বল্যমান সাক্ষী। কিন্তু সেই পাষাণের হৃদয়ে অবশেষে যে, এই ভাবে করুণার স্নিগ্ধ প্রস্রবণ প্রবাহিত হইবে, ইহা কে জানিত?

* এই প্রবন্ধটী প্রসিদ্ধ East and West পত্রিকায় প্রকাশিত Asok the great and Bnddhism নামক প্রবন্ধের অনুবাদ।

পর লোকগত মহাত্মা সোপেন বলিয়াছেন—

"If a man's fame can be measured by the number of hearts who revere his memory, by the number of lips who have mentioned and still mention him with honour. Asoka is more famous than Charlemagne or Ceasor" অর্থাৎ, যদি কোন লোকের যশঃ তাঁহার স্মৃতি উপাসক হৃদয়ের সংখ্যা দ্বারা পরিমিত হয়, তবে অশোক সার্লেমান অথবা সিজর অপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির সহায়ক কেবল অশোকই ছিলেন, একথা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। আর্য্যেরা শূদ্রদিগের উপর সে সময়ে অমানুষিক অত্যাচার করিতেন। আর্য্য-কুল-তিলক ব্রাহ্মণেরা শূদ্রদিগের উন্নতি আদৌ দেখিতে পাইতেন না। তাঁহারা শূদ্রদিগকে সর্ব্বপ্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছিলেন; কাজেই ব্রাহ্মণ-নিপীড়িত শূদ্রেরা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ"—এই সত্যের পরিপোষক-বৌদ্ধধর্ম্মকে দলে দলে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। বিশেষতঃ সম্রাট্ অশোকের ন্যায় একজন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ যখন ইহার পশ্চাতে তখন তাহাতে ভয় কি? সে সময়ে উত্তর ভারতে ও নিম্নবংশোদ্ভূত রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন, তাঁহারাও তথাকথিত ব্রাহ্মণগণের কবল হইতে নিস্তার পাইবার জন্য বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

হায়! যদি সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের অত্যাচারের মাত্রা কথঞ্চিৎ প্রশমন করিতেন—যদি তাঁহারা শূদ্রদিগের প্রতি একটু সহানুভূতি ও করুণা নেত্রে নিরীক্ষণ করিতেন, তাহা হইলে, শত শত—সহস্র সহস্র শূদ্র বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিত না। লোকের অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। আজ যাহাকে অম্বরচুম্বী প্রাসাদের মধ্যে দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যায় শয়ান দেখিতেছি, কাল হয়ত সে ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে পথে পথে মুষ্টি পরিমাণ তণ্ডুলের জন্য হৃদয়-বিদারী চীৎকার করিয়া বেড়াইবে। আ'জের ধনী কাল নির্ধনী হইতে পারে—আবার আ'জের ভিক্ষুক কাল রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে শূদ্রেরা আর সেই ছিন্নবস্ত্র পরিহিত, দরিদ্র, অন্নভিখারী শূদ্র ছিল না, তাহারা তখন অতুল অপরিমেয় ধনরত্নের অধিকারী। কাজেই তাহারা ব্রাহ্মণের অযথা অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবমাননা কেন সহ্য করিবে?

গৌতমের মৃত্যুর প্রায় দুইশত বৎসর পরে উত্তর ভারতে মৌর্য্যবংশ শক্তি-

শালী হইয়া উঠে। কিন্তু এই বংশ ক্ষত্রিয় না হওয়ায়, ইহারাও ব্রাহ্মণের ঘৃণার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিল না। তৎপর যখন এই মৌর্য্যবংশের তৃতীয় নরপতি অশোক সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তখন তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের অহিংসাবাদ দর্শনে তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন।

সম্রাট্ অশোক ২৭২ খ্রীঃ পূঃ অব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের তিন-চারি বৎসর পরে তাঁহার রাজ্যাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কোন্ সময়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিক-দিগের মধ্যে পরস্পরের মতভেদ আছে; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, তিনি সিংহাসনারোহণের নয় বৎসর পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

অশোকের শাসন অনেক পরিমাণে প্রজাতন্ত্র ছিল। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটী করিয়া পাঞ্চবার্ষিক সভার অধিবেশন হইত। সেই সভায় পিতা মাতার আজ্ঞা পালন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে ভিক্ষাদান, জীবিতপ্রাণী হত্যা না করা এবং অমিতব্যয়িতা বর্জ্জন প্রভৃতি নৈতিক উপদেশ প্রদান করা হইত। অশোকের ৩০,০০০ সহস্র অশ্বারোহী, ৬০,০০০ সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল। ইহা ভিন্ন গজ, রথ প্রভৃতি ত ছিলই। পূর্ত্তকার্য্যের জন্য অশোকের সময়ে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। তুষপ নামে একজন পারস্যদেশ-বাসী অশোকের রাজত্বকালে কাথিবাড়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, ইহা দ্বারা অশোকের উচ্চান্তঃকরণতা সূচিত হইতেছে। যাহা হউক,—অশোকের ব্যক্তিগত জীবনীর উল্লেখ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য কি কি করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাঁহার কি রকম সম্বন্ধ, তদ্বিচারই আলোচ্য প্রবন্ধের মূলীভূত উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারতা সাধন করিতে যাইয়া অশোক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বিদ্যার অনেক পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন। অশোকের পূর্ব্বে প্রস্তরাদির কোনই সদ্ব্যবহার হইত না। কিন্তু তিনি এই সমস্ত প্রস্তর দ্বারা মঠাদি নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করায়, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয়। অশোক ঘোষণা প্রচার করেন যে, কেহ আর প্রাণীবধ করিতে পারিবেন না। এমন কি একটি মোরগ বা একটি মৃগও বধ করিতে পারিবেন না। অশোকের এই আদেশ প্রথমবার বিফল হইয়াছিল; কারণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের তখন ভিত্তিই ছিল—প্রাণীবধ। যে ব্রাহ্মণ একশতটী অশ্ব নিধন করিতে পারিতেন, তাঁহাকে লোকে স্বয়ং জগদীশ্বরের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মনে করিত। কাজেই

ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ অশোকের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় বার অশোক কঠোর আইনের সাহায্যে এই ঘোষণা প্রচার করায়, ইহার বিরুদ্ধানুযায়ী কার্য্য করিতে আর কেহ সাহস পাইল না।

বুদ্ধদেব কোনও জীবিত প্রাণীকে যন্ত্রণা দিতে নিষেধ করিয়া ছিলেন, তিনি মাংস ভক্ষণ করিতে নিষেধ করেন নাই। কিন্তু সম্রাট্ অশোক একেবারে মাংস ভক্ষণই নিবারণ করিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত এই যে, শূকরের মাংস-ভক্ষণ-জনিত ব্যাধিতেই বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন।

অশোককে ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু সত্য কি তাহাই? ধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার শাসনের মেরুদণ্ড ছিল, এবং তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তাহ বলিয়া কেহ কি বলিতে পারেন যে, তিনি আওরেঙ্গজেবের ন্যায় কাহাকেও তদভিমত ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন? তিনি তাঁহার সপ্তম ঘোষণা বাণীতে স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ গ্রাহকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। বস্তুতঃ পক্ষে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধশ্রমণেরা অশোকের নিকট একই প্রকার সম্মান পাইতেন; এমন কি বনের অসভ্য জাতিরাও তাঁহার সহানুভূতির সীমার বাহিরে ছিল না।

তিনি মূক মানবের উপর যেমন অনুকম্পা প্রদর্শন করিতেন, তেমনি মূক পশুদিগের উপরও প্রদর্শন করিতেন। উভয়ের জন্য হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং উভয়কেই ঔষধ দান করিতেন। এদেশে সাধারণের উপকারার্থে অশোকই সর্ব্বপ্রথম কূপ-পুষ্করিণীর খনন, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করেন, তদবধি এই সমস্ত কার্য্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট মহাপুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। অশোক ঔদার-নীতিক এবং সুশাসক ছিলেন বলিয়া আজ তাঁহার নাম ভারতের—শুধু ভারতের কেন জগতের ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে। তিনি মানব-চরিত্রের উপর যে এক প্রবল পরিবর্ত্তনের বাত্যা প্রবাহিত করিয়াছেন, সেই জন্যই আজ জগত তাঁহার নাম কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ-স্বরে উচ্চারণ করে। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, অশোকের সহানুভূতি ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে ও অন্যান্য দেশে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিত না। যদিও আট দশ শতাব্দী পরে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়াছিল, তত্রাচ এই ধর্ম্ম যে হিন্দু ধর্ম্মের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছে, একথা ত অস্বীকার করিবার উপায়

নাই। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের ধর্ম্ম ঐহিকধর্ম্ম—সে ধর্ম্ম ইহলোকের সব লইয়াই ব্যস্ত—এককথায় পাশ্চাত্যবাসীদিগের দৃষ্টি ইহলোকের পরপারে যায় না। কিন্তু প্রাচ্যের ধর্ম্ম ইহলোকের ধর্ম্ম নহে, এধর্ম্ম পারত্রিক ধর্ম্ম। সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসারতা সাধন দ্বারা প্রাচ্যবাসীর চক্ষুতে "পরপারের" প্রতি দৃষ্টিশক্তি আরও একটু বাড়াইয়া তুলিয়াছেন।

প্রাচীন আর্য্যেরা শিকারী ও কৃষিজীবী ছিলেন। তাঁহাদের দৈনন্দিন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁহাদিগকে প্রকৃতি মাতার প্রতি অশ্রু-ভারাবনত নেত্রে তাকাইয়া থাকিতে হইত। কাজেই তাঁহারা অগ্নি, সূর্য্য এবং ইন্দ্র প্রভৃতির উপাসনা করিতেন, যাহাতে সূর্য্য সন্তুষ্ট হইয়া আতপ-দানে শস্যের পরিপুষ্টির সহায়তা করেন এবং ইন্দ্র বারি-দানে বপিত বীজ অঙ্কুরিত ও জমি সরস করেন। এই শ্রেণীয় পূজার কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য ছিল না।

বৈদিক যুগেও বলা বাহুল্য, পুরোহিত বলিয়া কোন স্বতন্ত্র শ্রেণী ছিল না। প্রত্যেক পরিবারের যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি পুরোহিতের কার্য্য কলাপ করিতেন। ক্রমে ক্রমে এক জাতীয় ব্যবসায়ী পুরোহিতের উৎপত্তি হইল। এই সমস্ত পুরোহিতেরা স্ব স্ব অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম করিবার নিমিত্ত কেবল ক্রিয়া কলাপের দিকে লোককে বেশী উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ফলে এই দাঁড়াইল যে, লোকেরা জ্ঞানকাণ্ড পরিত্যাগ করতঃ কর্ম্মকাণ্ডেই রত হইল এবং পশুবধ ও পূজা অর্চ্চনাই ধর্ম্মের নামান্তর রূপে পরিগণিত হইল।

কাজেই ঠিক্ এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের পশুবধ নিষেধ মূলক উপদেশ বড় কার্য্যকর হইল। ইতিহাস অধ্যয়ন-পরায়ণ ব্যক্তিগণ জানেন যে, সম্রাট্ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশ বিদেশে ভিক্ষু প্রেরণ করিতেন এবং মঠ স্থাপনা করিতেন। এখনও এই প্রথা যে একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা নহে, ব্রহ্মদেশে একটু একটু প্রচলিত আছে। অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভিক্ষু প্রচার করিতেন। এই সমস্ত ভিক্ষুদিগকে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া আধুনিক সন্ন্যাসিগণের ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। রাজকোষ হইতে ইহাদের যাবতীয় ব্যয় অশোক নির্ব্বাহ করিতেন। অশোক অবশ্য সদ্বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই এই প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু যেমন সবক্ষেত্রে ঘটিয়া থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল। যত মূর্খ লোক সুখে স্বচ্ছন্দে সম্মানের সহিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করণাভিলাষে পঙ্গপালের

ন্যায় দলে দলে আসিয়া সকলে ভিক্ষু হইল—কালে তাঁহাদের অর্ব্বাচীনতা দোষে সোণার বৌদ্ধধর্ম্মের পতন আরম্ভ হইল। তাই মহামতি দান্তের (Dante) কথায় অশোককে বলিতে ইচ্ছা হয়—"Ah, constantine, of how much ill was cause, not thy conversion, but those rich domains that the first wealthy Pope received of thee"

ভিক্ষাবৃত্তি বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষে অতি সম্মানজনক কার্য্য বলিয়া পরিগণিত। অনেকাংশে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সৌসাদৃশ্য আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বুদ্ধদেবের গুণধর শিষ্যবর্গের কৃপায় আজকাল বৌদ্ধধর্ম্ম অনেক পরিমাণে হিন্দুধর্ম্মেরই মত আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ স্বর্গীয় ডাক্তার ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর বলিয়াছিলেন যে, "জগন্নাথের রথযাত্রা বৌদ্ধদিগেরই উৎসব এবং জগন্নাথদেব বুদ্ধদেবেরই অস্থি সংযোগে নির্ম্মিত।"

অশোকের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সম্বন্ধ বিচার করিতে গেলে একখানি বৃহদাকার পুস্তক হইয়া পড়ে, সুতরাং এতাদৃশ ক্ষুদ্র কাগজে তাহা সম্ভব নহে। কাজেই এ সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা লিখিয়া আমি প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে সমস্ত কুসংস্কার ও অপবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, অশোককে তজ্জন্য দায়ী করা যাইতে পারে না। বরং তাঁহারই উদ্যোগ ও উদ্যমের ফলে পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধধর্ম্ম ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মে স্ত্রীলোকের স্থান অতি নিম্নে। রেভারেণ্ড মিঃ ইং জি. ইটেল বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"A Somewhat degrading position was assigned to women by Goutama, and no hope of salvation was held ont to them unless through being born as men

কিন্তু শত দোষে দোষী হইলেও মহাত্মা বুদ্ধদেব ও সম্রাট্ অশোক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া ভারতবাসীর—শুধু ভারতবাসীর কেন, সমগ্র জগৎ বাসীর অতি কৃতজ্ঞতা ভাজন। পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ শিক্ষকের প্রতি সম্মান এই যে সমস্ত মহামূল্য রত্ন অশোক ভারতবাসীর চিত্তে অঙ্কুরিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা "যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ো সরিতশ্চ মহীতলে" ভারত-বাসী কখনও ভুলিবে না। আজও ভারতবাসী অশোকের ঘোষণাবাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া থাকে—আজও জলাশয় খনন, রাস্তা নির্ম্মাণ, দুঃখীর

প্রতি দয়া, আর্ত্তের আর্ত্তনাদ মোচন এসব ভারতবাসীর নিত্যকর্ম্ম। আজও ভারতবাসী "সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ" একথা ভুলিয়া যায় নাই—এবং আজও সহস্র সহস্র মানব মৎস্য, মাংস স্পর্শ করে না।

বুদ্ধদেব অহিংসা পরমোধর্ম্ম-রূপ জ্ঞান-বর্ত্তিকা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, অশোক সেই জ্ঞান-বর্ত্তিকা হস্তে লইয়া ভারতের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া তাহাদের কুটীর প্রাঙ্গণ হইতে হিংসা-তমিস্রা বিদূরিত করিয়াছেন। অশোক বাল্যাবস্থায় যতই নৃশংস, অত্যাচারী হউন, পরবর্ত্তী জীবনের কার্য্য-কলাপ-পূত মন্দাকিনী-ধারা-স্পর্শে তাঁহার বাল্যের সে পাপ-কালিমা প্রক্ষালিত হইয়াছে।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

উপহার।

কি আছে আমার দিতে উপহার
তোমার চরণে হে জীবন-স্বামী।
যে ধন আমার তাওত তোমার
শুধু তাই নয়, তোমারই আমি।
তুমি মম প্রাণ, ভক্তি মুক্তি জ্ঞান,
হৃদয়ের প্রেম পবিত্রতা তুমি ;
জীবন সম্বল ধন জন বল
সকলই তোমার,—তুমিই আমি।
তুমি যে আমার প্রেম পারাবার
দিবগো তোমায় কিবা উপহার।
ধর উপহার শুষ্ক অশ্রুধার
জীবনের যাহা সম্বল আমার।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পিশাচ লীলা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নূতন দাসী।

নীরদ গোয়েন্দাকে হত্যা করিবার জন্য যেদিন বীরচাঁদ মোহনলাল বাবুর গদী হইতে টাকা লইয়া গিয়াছিল। সেই দিন বৈকালে একটী আধা বয়সী স্ত্রীলোক দাসীগিরি করিবার জন্য মোহনলাল বাবুর বাটীতে নিযুক্ত হইয়াছিল। মোহনলাল বাবুর বাটীতে আজকাল প্রায়ই নানা চরিত্রের লোক যাতায়াত করিতেছে—পাছে পুরাতন দাসদাসীরা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিয়া ফেলে এই আশঙ্কায় তিনি সকলকেই জবাব দিয়া নূতন দাসদাসী বহাল করিয়াছেন। কেবলমাত্র একটী দাসীর পদ অবশিষ্ট ছিল—সেটীও পূর্ণ হইয়াছে।

নীরদবাবু যেদিন মাসীর আড্ডায় কূপমধ্যে পতিত হন, তৎপরদিন প্রভাতে মোহনলালবাবু বাটীর একটী কক্ষে বসিয়া ভগিনী রমাবাইয়ের সহিত নিম্নলিখিত কথোপকথন করিতেছিলেন। এ দিকে নূতন দাসী গৃহকর্ম্ম অছিলায় অন্তরালে থাকিয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। নূতন দাসী "লছমনিয়া" বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল। সে নীরদবাবুর গুপ্তচর। সকল সংবাদ সংগ্রহ জন্য তিনি লছমনিয়াকে দাসীবৃত্তি করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন।

মোহন। আরত পারি না, দুশ্চিন্তায় নিদ্রা হয় না। কেবল ভাবনা, জানি না কবে যে এ ভাবনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব।

রমা। অত উতলা হলে চলবে না। মামার টাকার কথাটা একবার মনে করে দেখ। আমরা তার কে? কোন সম্পর্কে তিনি আমাদের মামা ছিলেন। আর কেউ না জানুক আমরাত জানি।

মোহন। চুপ কর বোন, দিয়ালগুলারও কাণ আছে। কেউ কোথা-থেকে শুনলে বিভ্রাট ঘটিবে।

রমা। তুমি পুরুষ মানুষ, এত ভয় কিসের? বিষয় সম্পত্তি করিতে

হইলে,—দশ জনের একজন হইতে হইলে—সমাজে মাত্র সম্ভ্রম অর্জ্জন করিতে হইলে বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এই পাপের অর্জ্জিত-ধনগৌরবে তোমার পুত্র পৌত্রের মুখ উজ্জ্বলই হইবে—বিমলিন হইবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। ভবিষ্যতে বংশধরগণের দান ধ্যানে পুণ্যকার্য্যে তোমার পাপের কতক প্রায়শ্চিত্ত হইবে। দেশের অধিকাংশ ধনীরই এই অবস্থা। প্রথম হইতে খুঁজিলে অনেক গলদ পাওয়া যায়।

"সবই জানি ভগিনী" বলিয়া মোহনলাল বাবু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। কিন্তু অর্থে মনের অশান্তি যে বিদূরিত হয় না—এইখানেই বড় গোল। ভবিষ্যৎ দূরে থাক—বর্ত্তমানেই বিভ্রাট। যা'ক আর ভাবিব না। যখন অগ্রসর হইয়াছি—তখন আর ভাবিলে কি হইবে। অদৃষ্টই আমাকে এ পথে চালিত করিয়াছে—নিশ্চয়ই আশা সফল হইবে।

রমা। এই পুরুষের উক্তি। সাহসে বুক বাঁধ। ভগবান আমাদের আশা পূর্ণ করবেন।

মোহন। না না ও কথাটা বলো না। একে পাপ, তার উপরে ভগবানের পুণ্যময় নামের সংযোগ—আবার দুটো কেন? একটার উপর দিয়েই যাক্ না।

রমাবাই হাসিয়া বলিল,—"আচ্ছা তাই হবে।"

মোহন। আজ আমার মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়াছে। যতক্ষণ না বীরচাঁদ নীরদ গোয়েন্দার সম্বন্ধে কোন খবর লইয়া না আসিতেছে, ততক্ষণ আমি কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না।

রমা। এইখানেই তুমি একটা মস্ত ভুল করিয়াছ। যখন জানিতে যে অর্থের দ্বারা নীরদবাবুকে ক্রয় করা যাইবে না, তখন তাহাকে ইহার সংবাদ না দিলেই হইত।

মোহন। অতিবুদ্ধির জন্যই এই কার্য্য ঘটিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম—সরকারী গোয়েন্দা হিসাবে নীরদবাবুর উপর এই হত্যাকাণ্ডের ভার অর্পিত হইতে পারে—সেইজন্য আমি নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণার্থ পূর্ব্বেই তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তখন জানিতাম—সে আমাদের পক্ষ হইতে এই ব্যাপারের তদন্ত করিবে, কিন্তু এখন হিতে বিপরীত হইয়াছে।

রমা। যদি শুদ্ধ পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হইত, তাহা হইলে নীরদবাবু এ সংবাদই পাইতেন না; বিনা গোলযোগে কাজ মিটিয়া যাইত।

যতদিন না এ কণ্টক দূর হইবে, ততদিন আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।

মোহন। তবে বীরচাঁদকে আমি খুব জানি। সে আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবে। ঐ শোন—সদর দরজায় শব্দ হইতেছে, দেখিয়া আসি কে ডাকে।

এই বলিয়া মোহনলাল বাবু কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নূতন দাসী লছমনিয়াও সাবধানে অন্তরাল হইতে সরিয়া যাইয়া একেবারে সদর দ্বারে হাজির। দাসী ভিতর হইতে জিজ্ঞাসা করিল —"কে তুমি ?"

আগ। দরজা খুলেই দে না।

লছ। নাম না জান্‌লে খুলবো না।

আগ। আমার নাম বীরচাঁদ। মোহনলাল বাবুকে বল্লেই তিনি বুঝ্‌তে পারবেন।

লছ। বাবু এখনও ঘুমুচ্ছেন, তুমি এখন যাও, দুপুর বেলা দেখা হবে।

আগ। আ! মর মাগী! আমার হুকুম খোল বল্‌চি।

লছ। তবে একবার দরজাকে হুকুম দাও—আপনাপনি খুলে যা'ক্।

পশ্চাৎ হইতে মোহনলালবাবু বলিলেন—"ঝি, কে আমাকে ডাক্‌চে ?"

লছ। বীরচাঁদ না কালাচাঁদ কে একজন সকাল না হ'তে হ'তেই হাঁকাহাকি পাড়্‌চে।

মোহন। আচ্ছা তুমি যাও; আর এক কাজ ক'রো। এবার থেকে যে যখনই হউক না কেন—আমাকে ডাক্‌লে—আমায় খবর না দিয়ে তাড়িয়ে দিও না। বুঝলে ? যাও এখন অন্য কাজ করগে।

লছমনিয়া প্রস্থান করিলে মোহনলালবাবু দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। বীর-চাঁদ সহাস্যবদনে মোহনলালবাবুকে অভিবাদন করিয়া বলিল,—"বাবু! আজ জবর খবর এনেছি। এখন বখ্‌শিস কি দেবেন বলুন!

মোহন। খবরটা কি ?

বীর। খবরটা আপনিই আন্দাজ করুন না কেন।

মোহন। ঠিক কি ক'রে বলি বল ? তবে অনুমানে মনে হয়, নীরদ গোয়েন্দার খবর। তাই নাকি হে ?

বীর। এখন ভিতরে চলুন—সব খবরই শুনবেন।

তখন বীরচাঁদ ও মোহনলালবাবু, রমাবাই যে কক্ষে বসিয়াছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বীরচাঁদ একখানি টুলের উপর বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—"বাবু, আপনার অনুমানই ঠিক। নীরদ গোয়েন্দা সাবাড়!"

মোহনলালবাবু ও রমাবাই যুগপৎ আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"বল কি? যদি খবর সত্য হয়—তাহ'লে আজ আমাদের সকল বিপদের অবসান হ'লো।

বীর। সত্যি না ত কি মিথ্যে;

মোহন। কি ক'রে মারা গেল?

বীর। আপনার কাছে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে একটু আমোদ করবার জন্যে 'মামার দোকানে' যেই ঢুকেছি—অমনি একটা লোক এসে আমার কাছে মদ খেতে চাইলে—তারপর একটু মদও খেলে। দু' চার কথায় আমি তা'কে নীরদ গোয়েন্দা ব'লে চিনে নিলুম। ছদ্মবেশে কি আর আমাদের সঙ্গে চালাকি চলে? কিন্তু কোন কিছু ভাঙলুম না—সেখান থেকে তাকে নিয়ে একেবারে কামিনী মাসীর আড্ডায়—মাসী গো মাসী—বোধ হয় তুমি তাকে জান।

মোহন। হাঁ খুব জানি। তারপর?

বীর। মাসীর আড্ডায় উঠে—মাসীকে চোক টিপে দিলুম। মাসী আমাদের বাঘের মাসী। একেবারে লাফিয়ে প'ড়ে—তার নাকটা নখে ক'রে ছিঁড়ে দিতে গেল। তাই না দেখে গোয়েন্দার পো তাড়াতাড়ি যেমন পালাতে যাবে—অমনি পা পিছলে ইঁদারার ভিতর—ব্যস্, সব ফরসা।

মোহন। তুমি নিজের চোখে ইঁদারায় পড়তে দেখেছ?

বীর। আপনাকে কি মিছে কথা বলছি? আমি যেমন বেঁচে আছি সত্যি—যেমন দিনের আলো সত্যি—তেমনি সে ইঁদারায় প'ড়েছে সত্যি।

মোহন। তোমরা একজনকে ইঁদারায় নামিয়ে দিয়ে সে সত্যি মরেছে কিনা দেখলে না?

বীর। মাসীকে আর এ সব শেখাতে হবে না। বাছাধন ইঁদারায় পড়বামাত্র মাসী এক টব সীসে গরম ক'রে তার ভেতরে ঢেলে দিয়েছে।

রমা। দেখলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি কত? মেয়েমানুষ যা করবো মনে করে—তা যে কোন রকমেই হউক করবেই করবে।

বীর। যখন আপনারা সন্তুষ্ট হয়েছেন, তখন বাকি টাকাটা হুকুম ক'রে দিন?

মোহন। নিশ্চয়ই। এই লও তোমার টাকা। এই বলিয়া তিনি বাক্স হইতে বীরচাঁদকে হাজার টাকা গণিয়া দিলেন।

"বাবু, পায়ে রাখবেন, আপনার কাজে যেমন নগদ দেনা-পাওনা, কাশীর বড় বড় ঘরেও এমন পাই না। কাজের আগে বাবুরা মুক্তহস্ত—মুখে রাঙা করে দেন—কিন্তু কাজ হাসিল হবার পর, প্রায়ই কথা রক্ষা হয় না। তবে আমরাও প্রথমে অর্দ্ধেক না পেলে কাজে হাত দিই না। আর এমন চড়া দর দিই যে অর্দ্ধেকেই পূরার কাছাকাছি এসে পড়ে, তবে আসি বাবু" বলিয়া বীরচাঁদ টাকাগুলি কোঁমড়ে বাঁধিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

বীরচাঁদ প্রস্থান করিলে মোহনলালবাবু ভগিনী রমাবাইকে বলিলেন—"আজ থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম"।

রমা। তা তো হ'লো। কিন্তু আজ থেকে আমার পরামর্শ না নিয়ে তুমি কোন কাজ ক'রো না। তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি তেমন পাকা নয়। আর মামার সম্পত্তিতে যখন আমারও অর্দ্ধেক ভাগ—তখন দেখাও উচিত।

মোহন। তোমার যদি সেই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাই হইবে। এখন আমাকে একবার বাহিরে যাইতে হইবে।

এই বলিয়া মোহনলালবাবু কক্ষ ত্যাগ করিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅর্জ্জুনচন্দ্র বসু।

নিবেদন।

'ভালবাসা' আমার নাম,
(আমি) সর্ব্ব সুলক্ষণ।
হিয়াটি মোর 'সুধা-ভরা'
বিশ্ব বিমোহন।
পার যদি গো আঁখি-জলে
ভাসা'তে বুক অবহেলে
এসো কাছে; পাবে তখন
আমার দরশন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দে।

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

অহল্যা হরণ।

ইতিহাস মতে গৌতম-পত্নী অহল্যাদেবীকে দেবরাজ ইন্দ্র হরণ করেন। গৌতমের শাপে অহল্যা পাষাণী এবং ইন্দ্র সহস্রাক্ষ হইলেন। অনন্তর শ্রীরামের পাদস্পর্শে অহল্যা সজীব হইলেন। সহস্রাক্ষ সহস্র চক্ষু রহিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণে (৩।৩।৪।৮) ইন্দ্র-অহল্যার যে উপাখ্যান দৃষ্ট হয় তাহাই এই ইতিহের আদি উল্লেখ বলিয়া অনুমান হইতে পারে না। বেদে অবশ্যই এই উপাখ্যানের আদি উল্লেখ আছে।

জ্যোতিষিক তত্ত্ব ও ইতিহ।

বেদমতে (ঋ ৪।১।১৬ ইত্যাদি) সূর্য্য গো নাম ধারণ করেন। এবং গৌতম-পত্নী সিনিবালীর (অমাচন্দ্র) পাষাণবৎ কৃষ্ণবর্ণ হয়। সিনিবালীর প্রিয় সমাগমের দর্শতিথিতে হলচালন নিষিদ্ধ বলিয়া সিনিবালী অহল্যা নাম ধারণ করেন।

সূর্য্যের পাদ (কিরণ) স্পর্শে সিনিবালী ক্রমে কলায় কলায় দীপ্তিময় হয়।

শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে অহল্যার এক কলা দীপ্তিময় হয় কিন্তু অহল্যা অদৃশ্য থাকে। যথা।—

পুষ্করতীর্থ যাত্রায়াম্ সূর্য্যাপর্বণি নারদ।
তত্র আগতাম্ অহল্যাম্ চ দদর্শ পাকশাসনঃ॥
তদা পরদিনে তাম্ চ দৃষ্ট্বা মন্দাকিনী তটে
ইতি উক্ত্বা কামুকঃ শক্রঃ পপাত চরণে মুদা।

(ব্রঃ বৈঃ পুঃ ৪।৬১)

দ্বিতীয়া তিথিতে সূর্য্যের পাদ (কিরণ) স্পর্শে অহল্যা সুদৃশ্য হয়।

সূর্য্যের দৃশ্য পৃষ্ঠ রাম নাম ধারণ করে।
অধঃ রামঃ সাবিত্রঃ (নিরুক্ত)।

উপপত্তি।

শুক্ল প্রতিপদ তিথিতে অহল্যার অদর্শনের ব্যাখ্যায় রহস্তকারি অর্থাৎ ঐতিহাসিক বলেন যে, ইন্দ্র অহল্যাকে হরণ করিয়াছিলেন এবং শুক্ল দ্বিতীয়া

তিথিতে অহল্যার পাষাণমূর্ত্তি অন্তর্হিত এবং অহল্যা সজীব ও সুদৃশ্য হইল। ইহার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, শ্রীরামের পাদস্পর্শে পাষাণীভূতা অহল্যা সজীব ও সুদৃশ্য হইল।

গর্ভাধান ও সুপ্রসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (ঋঃ বেঃ ২।৩২ ৬) পতিব্রতা অহল্যা সিনিবালীর সুবিমল সতীত্ব রহস্যকারের রহস্যে মলিন হয় নাই। অদ্যাপি অহল্যা হিন্দুসমাজে আদর্শসতী বলিয়া পরিগৃহীত ও পূজিত হইতেছেন। প্রত্যূষে সুব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নানান্তে নিত্য গাইতেছেন "অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা। পঞ্চকন্যাঃ স্মরেৎ নিত্যম্ মহাপাতক নাশনম্॥"

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

দুনিয়া।

১

হাস যদি—তোমার সঙ্গে দুনিয়া উঠ্‌বে হেসে।
কাঁদ যদি—কাঁদ্‌বে না কেউ তোমার কাছে এসে॥
তোমার হর্ষ-অংশ নিতে, চায় এ ধরা ব্যগ্রচিতে,
তাহার কারণ সদাই ধরা দুঃখে আছে ভেসে॥

২

গাইবে তুমি—গাইবে ধরা আনন্দ উল্লাসে।
ফেল্‌বে তুমি দীর্ঘশ্বাস মিশ্‌বে তা বাতাসে॥
নিয়ে শুধু হর্ষ-রোল, প্রতিধ্বনি তুল্‌বে গোল,
ত্রাস পেয়ে সে লুকোয় কোথায় শুন্‌লে হা হুতাশে॥

৩

মজায় থাক—হাসি মুখে খুঁজবে তোমায় লোকে।
শোকের সময় দেখেও তোমায় দেখ্‌বে না কেউ চোখে॥
দেখ্‌বে তুমি কর্‌ছো ফূর্ত্তি, আস্‌বে ছুটে অনেক মূর্ত্তি,
মুর্দ্দো ম'লে হায় বাড়ীতে কেউ না সেধে ঢোকে॥

৪

আমোদ কর—কত সুহৃৎ আস্‌বে দলে দলে।
বদন ভারি দেখ্‌বে যখন সর্‌বে সবাই ছলে॥
সুধার আসব কর্‌তে পান, দেখ্‌বে ব্যাকুল সবার প্রাণ,
একলা তোমায় খেতে হবে জীবন-হলাহলে॥

৫

দেও হে খানা—বন্ধুপূর্ণ দেখ্‌বে বৈঠকখানা।
শুকিয়ে মরো—সুধায় না কেউ কার না আছে জানা?
ধন কড়ি যা উপার্জ্জন, জানবে সুখী করতে জীবন,
মরণটাকে কর্‌তে সুখী সব তা কড়ি কাণা॥

৬

দেশ জুড়ে নাম জাহির হবে—কর দান খয়রাত।
আশে পাশে সাম্‌নে তোমার সবাই পাত্‌বে হাত॥
দুনিয়াটা যে কি বিচিত্র, শত্রু তখন হবে মিত্র,
সদর অন্দর ভর্‌বে তোমার জয়-গানে দিনরাত॥

৭

কর্জ্জ যদি কর্‌তে যাবে প্রাণের সখার কাছে।
বল্‌বে সে জন "হায় রে কপাল আমার কি আর আছে!"
দুনিয়ার হায় এম্‌নি ধাঁচ, সবাই কাচে কাঙ্‌লা-কাচ,
এক পয়সায় মরে রে ভাই—এক পয়সায় বাঁচে।

৮

সুখের সময় সবাই আছে—দুখের সময় ফাঁকা।
সুখের সময় কপালগুণে সরল হয় যে বাঁকা॥
দুখ্‌কে সুখ যে কর্‌তে পারে, দুখ আসে না তার-ই ধারে,
থাকে যেন এই কথাটি হৃদয় মাঝে আঁকা॥

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

বন্দী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিছুক্ষণ পরে হৃদয়ের জ্বালাটা একটু কমিলে আমি ষ্টেসনের পথ ধরিলাম। আমি মিস্‌রাথকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, দিনের বেলাতেই গোপন ব্যবসার মালপত্র চালান হয়। আমার কিন্তু তাহা বিশ্বাস হয় নাই, সেই জন্যই একবার ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার সন্দেহ হইল, হয়ত আমার লোকেরা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেছে। তাই এই দিনের বেলাও গোপন ব্যবসার মালপত্র নিরাপদে পার হইয়া যাইতেছে। মিস্‌রাথের এ বিষয়ে মিথ্যা বলিবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি যে এতদিন এবিষয় বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারি নাই তাহা আশ্চর্য্য বটে! মিস্‌রাথের কথা যে ধ্রুব সত্য তাহার প্রমাণ দুই এক দিনের মধ্যেই পাইলাম। আমার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর পত্রে জানিলাম, তখনও যথেষ্ট পরিমাণ মাল চালান হইতেছে। পরবর্ত্তী মাসের প্রথম হইতেই আমি, দিবারাত্র আমার নিযুক্ত লোকেরা কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেছে কি না দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। তাহাতে আমার নিজেরও অনেক উপকার হইল; ঘুরিয়া বেড়ানতে আমি প্রাণের জ্বালা অনেকটা অনুভব করিতে লাগিলাম না। তবু সে মাসটা কি কষ্টেই যে আমার কাটিল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসম্ভব! আমি যে শুধু আমার প্রণয়িনীকেই হারাইয়াছিলাম তাহা নহে; পরন্তু সকল কোমল বৃত্তিই আমার হৃদয় হইতে একপ্রকার বিদায় লইয়াছিল। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আমি তপ্ত হৃদয় শান্ত করিবার মত কিছুই দেখিতে পাইলাম না; সকলই যেন মরুভূমি!

কিছুদিন পরে আমি বুঝিতে পারিলাম যে, আমার কর্ত্তব্য সম্পূর্ণভাবে সম্পাদন করা হইতেছে না, কারণ তখনও অভিযোগ আসিতেছিল, বিনাশুল্কের ব্যবসা এখনও বন্ধ হয় নাই। কিরূপে যে তখনও গোপন ব্যবসা চলিতেছিল, তাহা আমার ধারণাতেও আসিল না। আমি সংকল্প করিলাম, কর্ত্তৃপক্ষকে আরও জনকয়েক লোক পাঠাইতে লিখিব। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা আর করিতে হইল না; একটী সূত্র আমায় ন্যায় পথে চালাইয়া দিল।

একদিন রাত্রে আমার দ্বারের নিকট এক টুকরা কাগজ দেখিতে পাইলাম। তাহাতে লিখিত ছিল,—

"গর্ব্বিত যুবক, রসেটের কন্যাগণের স্নানের সময় নজর রাখিও।"

ইহা নিশ্চয়ই রসেটকন্যাগণের কোন শত্রুর লিখিত ; লেখাটা স্ত্রীলোকের বলিয়া বোধ হইল। আমার পক্ষে ইহা কাজে লাগিয়াছিল,—যে বিষয় আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, সেই গোপন ব্যবসার আদিস্থান জানিতে পারিলাম। রসেটকন্যাগণের স্নানের স্থান আমার বাসার নিকটেই ; কাজেই সেখানে আর অন্য কোন লোক না রাখিয়া, আমি নিজেই নজর রাখিব স্থির করিলাম। পূর্ব্বে আমি অনেকবার তাহাদিগের সহিত সেখানে স্নান করিতে গিয়াছি ; কাজেই একাজটা আমার বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হইল না। যেদিন মিস্‌রাথের হৃদয়-হীনতার পরিচয় পাইলাম, সেই দিন হইতে আপনাকে সেদিক হইতে যথাসাধ্য দূরে রাখিয়াছিলাম ; বিশেষতঃ যখন কুমারীরা স্নান করিতে আসিত তখন সেদিকে মোটেই যাইতাম না। এই জন্যই বোধ হয় সেই সময় তাহারা নিরাপদে অভিলষিত কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারিত।

পরদিন সকাল হইতে আমি রসেটকন্যাগণের আগমন পথ চাহিয়া রহিলাম। যখন তাহারা আমার সম্মুখ দিয়া গিয়া ঘাটে নামিল, তখন ছয়জন অনুচর সঙ্গে লইয়া আমি সেই ঘাটপথে যাত্রা করিলাম। তাহা-দিগকে নিকটে লুকাইয়া রাখিয়া বলিয়াদিলাম, আমি দুইবার বংশীধ্বনি করিলেই তাহারা যেন আমার নিকট গিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল বিষয় ঠিক করিয়া নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমি ঘাটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে এরূপ একটী স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলাম যে সেখান হইতে নিম্নের সকল কার্য্যকলাপই বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কুমারীগণের পরিচারিকা আমার নিকট ছুটিয়া আসিয়া বলিল,—"আপনার এখন ওদিকে যাওয়া হইবে না ; বিবসনা কুমারীগণ স্নান করিতেছেন। সরিয়া যান আপনি।"

সাধারণ অবস্থার যে কোন লোক এই কথা শুনিলেই তখনি সে স্থান হইতে চলিয়া যাইত ; কিন্তু আমি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ; সেখানে যদি সহস্র স্ত্রীলোকও উলঙ্গ অবস্থায় থাকিত তাহা হইলেও আমি পশ্চাৎপদ হইতাম না। পরিচারিকা যখন দেখিল যে, আমি তাহার সাবধান-বাক্য

গ্রাহ্যই করিলাম না. তখন সে অগত্যা ছুটিয়া গিয়া কুমারীদিগকে সাবধান করিয়া দিবে মনে করিল, কিন্তু আমি তাহা ঘটিতে দিলাম না। তাহার হাত ধরিয়া নিকটস্থ একজন অনুচরের নিকট আটক রাখিলাম, এবং যাহাতে সে চীৎকার করিতেও না পারে তাহারও উপায় করিয়া দিলাম।

তখনই আবার আমি পূর্ব্বকথিত স্থানে ফিরিয়া আসিলাম এবং কুমারীরা কি করে তাহা দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাহারা সম্পূর্ণ নির্ভয়ে জলকেলী করিতেছে; স্বপ্নেও ভাবে নাই যে. কেহ এসময় তাহাদিগকে বাধা দিবে। একমনে আমি তাহাদিগের কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। শীঘ্রই গতরাত্রে প্রাপ্ত পত্রের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। এখনই গুপ্ত ব্যবসা যে কিরূপে চলিতেছিল তাহার একটী সুন্দর চিত্রপট আমার চক্ষের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল। দেখিলাম রসেটকন্যাগণ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপা জলের উপর দিয়া ভাসাইয়া একটী পর্ব্বত-গহ্বরে স্তূপীকৃত করিতেছে। সেই গহ্বরটী একেবারে নদীর উপর ঝুকিয়া পড়িয়াছিল। এতক্ষণে সকল বিষয় আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া গেল। বুঝিলাম এইরূপে রসেটকন্যাগণ স্নানের সময় টমের আনিত মালগুলি নদীর অর্দ্ধপথ অবধি রাখিয়া আইসে। তাহার পর রাত্রে টম সেগুলি সেখান হইতে নৌকায় তুলিয়া লইয়া দেশান্তরে চালান দেয়। এইরূপে দিবালোকেই তাহারা গোপন ব্যবসা চালাইতেছিল। তাহাদের ন্যায় সম্ভ্রান্তবংশীয় কুমারীগণ যে এরূপ কার্য্য করিতে পারে, তাহা মানবের কল্পনারও অতীত। আরও যে সময় তাহারা এই কর্ম্মে নিযুক্ত হয় তখন আমার অনুচরেরা সুখে নিদ্রা গিয়া থাকে এবং আমি মিস্‌-রাথের ক্রীড়া পুত্তলী হইয়া নগরের সীমান্তে বসিয়া থাকি!

ক্রমে অগ্রসর হইতে হইতে নদীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কুমারী-গণের হাস্যধ্বনি জলের ছল্ ছল্ শব্দের সহিত মিলিয়া বেশ শ্রুতিমধুর হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা এ পর্য্যন্ত আমায় দেখিতে পায় নাই; কিন্তু আমি আর নীরবে থাকা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া বলিলাম,—"কুমারীগণ! উঠিয়া আইস। দেশের আইনের হস্তে আত্মসমর্পণ কর।" ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কুমারীগণের মুখ হইতে একটা করুণ আর্ত্তনাদ উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে কুমারীগণ গলা অবধি জলে ডুবাইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন কাহারও মুখ লজ্জায় আরক্ত, কাহারও বা ভয় ও লজ্জা কর্ত্তৃক একত্রে আক্রান্ত হইয়া মুখখানি একবার লাল এবং পরমুহূর্ত্তেই পাংশুবর্ণ

ধারণ করিয়া ছ এবং নৈরাশ্যের ছবি সে মুখে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে ; দৃষ্টি জলের উপর।

তাহাদিগকে জল হইতে উঠিয়া আসিয়া পোষাক পরিতে বলিলাম ; তাহারা প্রথমে সে কথা কাণেই তুলিল না, নীরবে জলমধ্যে বসিয়া রহিল, কিন্তু আমিও সহজে ছাড়িবার পাত্র নহি। তখনই পকেট হইতে বাঁশী বাহির করিয়া বলিলাম, যদি তাহারা স্বেচ্ছায় উঠিয়া না আসে তবে এখনই আমি বাঁশী বাজাইয়া আমার লোকদিগকে ডাকিব। তাহারা তখন বাধ্য হইয়া আমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিল। আমার মনে তখন কোমলতার লেশমাত্র ছিল না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম মানবহৃদয় যে খেলার সামগ্রী নহে, আশারসেটকন্যাগণকে বুঝাইবার জন্য তাহাদের প্রদর্শিত হৃদয়হীনতাই অবলম্বন করিব। শঠের সহিত শঠতা করাই কর্ত্তব্য।

যখন রসেটকন্যাগণ বুঝিল যে, তাহাদিগের প্রতি আমি বিন্দুমাত্রও দয়া প্রদর্শন করিব না, পরন্তু ঠিক আইন অনুসারেই কার্য্য করিব। তখন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমায় বিদ্রূপ করিতে ছাড়িল না, কিন্তু অনেকেই কাঁদিয়া ফেলিল মিস্‌রাথের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে তেমনি নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সে একবার মাত্র আমার দিকে চাহিল, তাহার পর ভগ্নীগণকে স্থির হইতে বলিয়া আমায় নিম্নস্বরে বলিল,—"তুমি একবার সরিয়া যাও, আমরা তীরে উঠিয়া পোষাক পরি। আমি তোমায় কথা দিতেছি কেহ এখান হইতে পালাইবে না।" আমি তাহাতে অমত করিয়া বলিলাম,—"রাথ! তোমার কথার কোন মূল্য আছে বলিয়া আমার মনে হয় না, তোমাকে আর বিশ্বাস করিতে পারি না।" কুমারীর মুখে নৈরাশ্য ফুটিয়া উঠিল। অবশেষে আমি বলিলাম, "কুমারীগণ! তোমাদের জন্য আমি এই পর্য্যন্ত করিতে পারি যে, আমি নিকটেই কোন একটা ঝোপের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিব, আর তোমরা এক এক করিয়া পোষাক পরিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইবে। কিন্তু আমি ইঙ্গিত না করিলে দ্বিতীয় কেহ যাইবে না ; এই প্রস্তাবে সম্মত থাকত বল।" ইহাতেই তাহারা সম্মত হইল ; কারণ আমি এরূপ রূঢ় ব্যবহার করিতেছিলাম যে, তাহাদের মনে বিশ্বাস হইয়াছিল, আমি সত্য সত্যই আমার লোক ডাকিয়া তাহাদিগকে তীরে আনিব।

অতঃপর আমি একটু আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইলে সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা পোষাক পরিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইল ; কিন্তু তাহার আকার ইঙ্গিতে বুঝিলাম

যে. সে অত্যন্ত ভীতা হইয়া পড়িয়াছে। আমি তাহাকে হস্ত প্রসারণ করিতে বলিলাম, কিন্তু সে প্রথমে তাহা করিতে স্বীকৃতা হইল না। তখন আমি পকেট হইতে বাঁশী বাহির করিলাম ; আমার তখন প্রায় ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। অগত্যা সে ঘৃণা ও ভীতিসহকারে হাত বাড়াইয়াদিল. সঙ্গে সঙ্গে আমিও লৌহ-বলয় পরাইয়া দিলাম। সেই জন্য আমি সেগুলি পূর্ব্ব হইতে সঙ্গে আনিয়াছিলাম। আমার রকম দেখিয়া কুমারী ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল ; আমি তাহা গ্রাহ্য না করিয়া দ্বিতীয় কুমারীকে আসিতে ইঙ্গিত করিলাম। এইরূপে প্রত্যেকেরই হস্তে লৌহ-বলয় পরাইয়া দিলাম ; সে সময় কেহ বা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল, কেহ বা ভয়ে সাদা হইয়া গেল, কিন্তু অবশেষে সকলকেই কাঁদিতে হইয়াছিল। কারণ অবশেষে সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, আইনানুসারে তাহারা বাস্তবিকই দোষী ; একমাত্র আমার দয়া ভিন্ন তাহাদিগের আর মুক্তির পথ ছিল না।

সর্ব্বশেষে আসিল মিস রাথ। দূর হইতে ভগ্নীদিগের অবস্থা দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। তাহার পর আমার নিকট আসিয়া আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই সে ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিয়া দিল. আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে আমার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইলাম। তাহাদিগকে একত্রে বাঁধিলাম এবং শৃঙ্খলগুলি আমি ধরিয়া রহিলাম।

এইবার আমি তাহাদিগকে লইয়া বাটীর দিকে চলিতে লাগিলাম। যে পথ দিয়া যাইতেছিলাম সেটী একটী সরু পথ, কাজেই অন্য কোন লোক তাহাদিগকে সে অবস্থায় দেখিতে পাইল না। তাহারা নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে লাগিল. কারণ যদি তাহারা যাইতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই অনুচরগণকে ডাকিব এইটাই তখন তাহাদের ভয়ের প্রধান বিষয় হইয়াছিল। আমি তাহাদিগকে লইয়া কয়েকটী গলি পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এইস্থানে তাহারা সকলে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর মিস রাথকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, আমার বোধ হয় তাহারা তখন মিস রাথকে আমার সহিত পুনঃসন্ধি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিল ; কেননা তাহার পরই মিস রাথ তাহাদিগের মধ্য হইতে বাহির হইয়া বরাবর আমার নিকট আসিল। আমি তখন একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম ; আমি কোন কথা না বলিয়া তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলাম। সে আসিয়া আমায় তাহাকে এবং তাহার ভগ্নীগণকে

ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিল। সে আরও বলিল যে, সেদিন যে শিক্ষা তাহারা পাইয়াছে, তাহাতে যতকাল জীবিত থাকিবে কখনও আর আইনের অমান্য করিতে সাহস করিবে না। আর যদি কাহাকেও একান্তই শাস্তি গ্রহণ করিতে হয়, তবে সেই তাহা করিবে। যদি তাহার ভগ্নীগণকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে সে আমি যেখানেই তাহাকে লইয়া যাই না কেন বিনা প্রতিবাদে সেইখানেই যাইবে। আমি মিস্ রাথকে তখনও তেমনি ভালবাসিতাম। সে যেরূপ করুণভাবে তাহার ভগ্নীগণের মুক্তি ভিক্ষা করিতেছিল তাহা দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিল।

কয়েক মিনিট আমি কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাহার পর কুমারীদিগের দিকে চাহিয়া বলিলাম,—"বোধ হয় তোমরা আজ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিলে; আশা করি, ইহাতেই তোমরা ভবিষ্যতে আর আইনের মর্য্যাদা হানি করিতে প্রয়াস পাইবে না; চিরদিন এই কথা তোমাদের মনে গাঁথা থাকিবে এবং সর্ব্বদা আইন বাঁচাইয়া কার্য্য করিবে।" অনন্তর আমি চাবি দিয়া একে একে সকল কুমারীকেই মুক্তি দিলাম; অবশেষে মিস্ রাথের বলয় খুলিয়া দিতে আসিলে সে তাহা খুলিতে দিল না। ভগ্নীদিগকে বলিল,—"তোমরা বাড়ী যাও আমার কিছু বক্তব্য আছে তাহা শেষ করিয়া আমি যাইতেছি।"

তাহার ভগ্নীরা একটু দূরে চলিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে হাত হইতে লৌহ-বলয় খুলিয়া ফেলিল। সেটা তাহার পক্ষে তত কঠিন নহে কেননা সে সকলের চেয়ে বয়সে ছোট এবং দেহের গঠনও অপেক্ষাকৃত কৃশ।

আমার মনের অবস্থা তখন ভিন্ন প্রকার। নীরবে তাহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিলাম। কেন যে সে তখনও অবধি সেই লৌহ-বলয় দুইটী পরিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই; নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। আমি বরাবরই তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই ভূমিসংলগ্ন ছিল; এইবার তাহার হাত দুটী ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম,—"মিস্ রাথ্, এখন তুমি মুক্তি পাইয়াছ, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার কিন্তু তুমি কেন লৌহ-বলয় পরিয়াছিলে জান?"

নিম্নস্বরে রাথ্ বলিল,—"জানি; আমি তোমার নিকট বন্দী তাই এই লৌহ-বলয় পরিয়াছিলাম।"

"শুধুই কি এই জন্য ?"

"হাঁ।"

"বেশ এখনত স্বাধীনতা পাইয়াছ, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।"

কিন্তু সে চলিয়া যাইবার জন্য কোন উদ্যমই করিল না পরন্তু তেমনি নিরুদ্বেগে বলিল,—"না ; এখনও আমি তোমার বন্দী !"

আমি দ্রুতপদে তাহার নিকটে আসিয়া কর্কশকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ কথার মানে কি ? আবার কি হৃদয় লইয়া খেলা করিবার সাধ হইয়াছে ?"

সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"হায় ! আর যে আমি জীবনে তোমার নিকট হইতে মুক্তি পাইব না। এ জনমে আর সে আশা কই ?" আমি তাহাকে বাহুবেষ্টনে চাপিয়া ধরিলাম।

সে বলিতে লাগিল,—"আমি নিজের অজ্ঞাতে তোমায় ভালবাসিয়াছি ; টমকে যখন বলিয়াছিলাম, আমি তোমায় ভালবাসি না, তখন নিজেই বুঝিতে পারি নাই ; কিন্তু তাহার পর হইতেই বেশ বুঝিতেছিলাম।"

আমি কোন কথা বলিলাম না ; তখনও সে তেমনি ভাবে আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছিল !

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পঞ্জিকা সংস্কার।

হিন্দুধর্ম্মের সকল কর্ম্মই প্রকৃত কাল-সাপেক্ষ। কোনও নির্দ্দিষ্টকালে বিশেষ কোনও কর্ম্ম করিলে নির্দ্দিষ্ট ফল পাওয়া যায় ; ইহাই হিন্দুর স্থির ধারণা ; সুতরাং সেই কালনির্দ্দেশক গ্রহাদি-সংস্থান জানা হিন্দুর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক এবং সেই জন্যই পঞ্জিকা নির্ম্মাণ করিয়া আমরা সর্ব্বদা সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকি ; কিন্তু পঞ্জিকার প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই কতকগুলি বিষয় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় ; অর্থাৎ সূর্য্যোদয় বা অন্যান্য গ্রহোদয়কাল, গ্রহযুতিকাল, গ্রহণকাল ইত্যাদির সময় ও পঞ্জিকায় উল্লিখিত উক্ত কালাদির বিশেষ পার্থক্য দেখা যায়। ১৮০৬ শকের চৈত্র পূর্ণিমায় যে চন্দ্রগ্রহণ হয়, ইহাই এই পার্থক্যের একটী প্রসিদ্ধ ।। কিন্তু এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ? কেহ কেহ বলেন যে, সংস্কার কখনও

হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, জ্যোতিঃশাস্ত্র বেদাঙ্গীভূত, তাহার পরিবর্ত্তন করা মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে। কেহ কেহ বলেন যে, দৃষ্টকার্য্যে গণিতাগত কালের কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু যে ধর্ম্মকার্য্যোপযোগী কালাদিসাধনে পঞ্জিকায় ভুল আছে, তাহা কদাচ নহে। এই দুইটী প্রশ্নের শাস্ত্রীয় মীমাংসা কি? প্রথমতঃ দেখা যায় যে, জ্যোতিঃশাস্ত্রে সংস্কারের ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়;—যথা;—

> যে বৃদ্ধা লঘবোঽপি যেঽত্র গণকা বদ্ধাঞ্জলি র্বচ্মি তান্
> ক্ষন্তব্যং মম চৈর্য্যমা যদধুনা পূর্ব্বোক্তয়ো দূষিতাঃ।
> কর্ত্তব্যে স্ফুটবাসনাপ্রকথনে পূর্ব্বোক্তিবিশ্বাসিনাং
> তত্তদ্দূষণমন্তরেণ নিতরাং নাস্তি প্রতীতি র্যতঃ॥

পুনশ্চঃ—

> শাস্ত্রমাদ্যং তদেবেদং যৎপূর্ব্বং প্রাহ ভাস্করঃ।
> যুগানাং পরিবর্ত্তেন কালভেদোঽত্র কেবলম্॥ সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

ইদং ময়া তুভ্যং বক্ষ্যমাণং জ্যোতিঃশাস্ত্রং তৎ সূর্য্যোক্তম্। এবকারাৎ সূর্য্যোক্তাভিন্নত্বেন ত্বাং প্রত্যনুবাদো ন কচিৎ স্বকল্পনান্তরেণেত্যর্থঃ। আদ্যং প্রাক্‌কালে সূর্য্যেণোক্তং। নম্বাসন্নযুগীয়সূর্য্যোক্তস্যাপি পূর্ব্বকালোক্তাদ্যত্ব-সম্ভব ইত্যতস্তৎপদাপেক্ষিতমাদ্যপদবিবরণরূপমাহ যদিতি। শাস্ত্রং সূর্য্যঃ প্রথমং যস্মাৎ পূর্ব্বমনুক্তমিত্যর্থঃ প্রাহ প্রকর্ষেণ বিস্তরেণ মুনীন্ প্রত্যুক্তবান্। তথাচ প্রথমাতিরেকে কারণাভাবাৎ প্রথমস্য বিস্তৃতত্বাচ্চানন্তরোক্তং পূর্ব্বোক্তে গতার্থতয়া সংক্ষিপ্তমুপেক্ষ্য প্রথমযুগীয়শাস্ত্রমুপদিশ্যত ইতি ভাবঃ।

নন্বেবং তর্হ্যনন্তরযুগীয়শাস্ত্রাণাং সূর্য্যোক্তানাং বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গইত্যত আহ যুগানামিতি। মহাযুগানাং পরিবর্ত্তেন পুনঃপুনরাবৃত্ত্যাত্র সূর্য্যোক্তশাস্ত্রেষু কেবলং স্বভিন্নাভাববত্তন্মাত্রমিত্যর্থঃ। কালভেদঃ কালকৃতমন্তরং। পূর্ব্বশাস্ত্র-কালাদনন্তরশাস্ত্রকালো ভিন্ন ইত্যেষু শাস্ত্রেষু ভেদো ন শাস্ত্রোক্তরীতিভেদ ইত্যর্থঃ। তথাচ কালবশেন গ্রহচারে কিঞ্চিদ্বৈলক্ষণ্যং ভবতীতি যুগান্তরে তত্তদন্তরং গ্রহচারেষু প্রসাধ্য তৎকালস্থিত-লোকব্যবহারার্থং শাস্ত্রান্তরমিব কৃপালুরুক্তবানিতিনানন্তরশাস্ত্রাণাং বৈয়র্থ্যম্। এবঞ্চ ময়া বর্ত্তমানযুগীয়-সূর্য্যোক্তশাস্ত্রসিদ্ধ-গ্রহচারমঙ্গীকৃত্যাদ্যসূর্য্যোক্তশাস্ত্রসিদ্ধং গ্রহচারং চ প্রয়োজনাভাবাদুপেক্ষ্য তদুক্তমেব ত্বাং প্রত্যুপদিশ্যত ইতিভাবঃ। এবঞ্চ যুগমধ্যেঽপ্যবান্তরকালে গ্রহচারেষ্বন্তরদর্শনে তত্তৎকালে তদন্তরং প্রসাধ্য

গ্রন্থাংস্তৎকালবর্ত্তমানান্তদ্যুক্তাঃ কুর্ব্বন্তি। তদিদমন্তরং পূর্ব্বগ্রন্থে বীজমিত্যা-মনন্তি। পূর্ব্বগ্রন্থানাং লুপ্তত্বাৎ স্বর্য্যর্ষিসন্দেহেঽপীদানীং ন দৃশ্যত ইতি তদ-প্রসিদ্ধিরাগমপ্রামাণ্যাচ্চ নাশঙ্ক্যা॥ রঙ্গনাথ।

ইদং তদেবাদ্যং শাস্ত্রং যৎ যুগানাং পরিবর্ত্তেন ভাস্করঃ পূর্ব্বং প্রাহ। নমু ভাস্করেণাপি যুগে যুগে মুনিভ্যো ভিন্নং ভিন্নং কিমর্থমুপদিষ্টমত আহ কাল-ভেদোঽত্র কেবল ইতি। অয়মভিপ্রায়ঃ।—যস্মিন্ যুগে পূর্ব্বোপদিষ্টশাস্ত্রা-দন্তরং দৃষ্ট্বা অন্যং নিরন্তরং মুনিভ্যঃ প্রোক্তবান্। তেন মুনিভিরপি স্বকৃত-গ্রন্থেষু গ্রহাণাং কালবশেনান্তরং দৃষ্ট্বা তত্তদ্ গৃহেষু দেয়মিত্যুপাদিষ্টং ভবতি। তথাচোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদিযন্ত্রেভ্যঃ (।) তৎসংস্কৃতগ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ—ইতি। বশিষ্ঠসিদ্ধান্তেঽপি ;—

ইত্থং মাণ্ডব্য সংক্ষেপাদুক্তং শাস্ত্রং ময়োত্তমম্।
বিস্রস্তাঁরবিচন্দ্রাদ্ধ (দ্যৈ) র্ভবিষ্যতি যুগে যুগে ইতি॥

বিস্রংসনং বিস্রস্তঃ শিথিলত্বমিতি যাবৎ। অতএবার্য্যভট্টব্রহ্মগুপ্তা-দিভিঃ স্বসত্বাকালে অন্তরাণ্যুপলভ্য মুনিকৃতগ্রন্থেষু নিক্ষিপ্য গ্রন্থা রচিতাঃ।

নমু কালবশেন যদন্তরং পততি তৎকথমতীন্দ্রিয়জ্ঞানবদ্ভি মুনিভির্নোপ-লক্ষিতং কথং চর্ম্মচক্ষুর্ম্মাত্র ব্রহ্মগুপ্তাদ্যৈশ্চোপলক্ষিতমিতি (।) উচ্যতে, মুনিভি-রুক্তং তত্তু তাদৃগেব, কিন্তু কালবশেন যদন্তরং পততি পুনস্তস্যাপ্যভাবঃ কিয়তা কালেন ভবতি পুনরপি কিয়তা কালেন কিয়দন্তরং পততি তৎপূর্ব্বা-পেক্ষয়া বিলক্ষণমেব ভবতি কদাচিদন্তরাভাব এবেত্যেবং চাঞ্চল্যাৎ গ্রন্থবাহুল্য-ভয়াৎ (তৎ) কদাচিদভাবাচ্চ নোক্তবন্তোঽপীদমুচুঃ যদান্তরং তদোপলভ্য দেয়মিতি অতএবৈঃ স্বসত্বাকালে লক্ষয়িত্বা দীয়ত ইতি। গণিতস্কন্ধে উপপত্তিমানে বাগমপ্রমাণমিতি।

শৃঙ্গোন্নতি (শৃঙ্গোন্নতি) গ্রহযুতিগ্রহণোদয়াস্তচ্ছায়াদিষু দৃগ্‌গণিতৈক্যা-ন্যথানুপপত্ত্যা মুনিকৃতগ্রন্থজনিত-গ্রহেষু তদন্তরং দেয়মেব। অতো যুগে যুগে শাস্ত্রপ্রণয়নং শ্রীসূর্য্যস্য মুনীনাঞ্চ যুক্তমেব। পৌর্ব্বাপর্য্যেণ শাস্ত্রপ্রণয়নে ন কশ্চিদ্দোষ ইতি ভাবঃ। পৌর্ব্বাপর্য্যং প্রসিদ্ধমেব সৌরঃ প্রথমঃ প্রশ্নঃ দ্বিতীয়ো ব্রাহ্ম্যস্তৃতীয়ঃ পৌলিশঃ চতুর্থঃ সোমসিদ্ধান্ত ইতি। শাস্ত্রান্তর-প্রণয়নকারণং তূক্তমেব॥ নৃসিংহ গণক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ।

দেবীগড়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

কমলা ও গোলোকনাথ একটা বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিল। কমলার আদেশমতে শরীররক্ষী সৈন্যগণ ও অশ্বরক্ষকদ্বয় অশ্ব লইয়া একটু দূরে সরিয়া গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল।

তখন রাত্রি তৃতীয় প্রহরে পদার্পণ করিয়াছিল। শুক্লা দ্বাদশীর চন্দ্র অস্ত যাইবার উপক্রম করিতেছিল। নিশাচর পক্ষিগণ চারিদিকে উড়িয়া ফিরিতেছিল। তাহাদিগের পক্ষবিধুনন ও কণ্ঠস্বরে বনভূমির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে নিশাচর হিংস্র জন্তুগণের কণ্ঠস্বর উঠিয়া দিগন্ত কাঁপাইয়া দিতেছিল। যামঘোষেরা সময় মতে ডাকিয়া ডাকিয়া প্রকৃতির দুয়ারে যাম ঘোষণা করিতেছিল।

একটু বিশ্রামান্তে কমলা কাতরকণ্ঠে কহিল,—"গোলোকনাথ, যদিও আমি আশৈশব বনে বনে সহস্র বিপদের মধ্যে ফিরিয়া-ঘুরিয়া মনকে একরূপ অদ্ভুতভাবে পরিবর্দ্ধন করিয়া লইয়াছি, তথাপিও আমি মানুষ;—মানব-জন্মের সার দেবতা—সার অবলম্বন—সার স্নেহাধার পিতামাতাকে হারাইয়া যে, কি অবস্থায় অবস্থান করিতেছি, আমার মনের অবস্থা যে এখন কি হইতেছে,—তাহা বোধ হয়, তুমি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ। আমার যে একটু সামান্য বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল, তাহা একরূপ লোপ হইয়া গিয়াছে,—এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য ? বর্ত্তমান অবস্থাও তুমি সমস্ত অবগত হইয়াছ,—যাহা সৎ হয়—তাহা ঠিক করিয়া দেখ।"

গোলোকনাথ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"অবস্থা আমাদের এখন বড় সঙ্কটাপন্ন। সমস্ত দিকেই অন্ধকার।"

কমলা। তবে এক কাজ করা যাক্।

গোলোক। কি বল ?

কমলা। মরা যাক্ না কেন ? দু'জনে পাশাপাশি হইয়া চল ঐ জলে

নামিগে—দেখ, চন্দ্রকিরণে অগাধ বারিরাশি কেমন সুন্দর থৈ থৈ করিতেছে। উহার মধ্যে একত্রে ডুবিয়া মরিলে, শান্তি পাইব। শান্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই। এই বিপদে—এই শোকের সময় যদি তোমার সহিত ছাড়াছাড়ি হই—তবে আরও কষ্ট হইবে। আর কষ্ট সহ্য করিতে পারিতেছি না।

নির্ম্মল জ্যোৎস্নালোক কমলার নির্ম্মল মুখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। গোলোকনাথ চাহিয়া দেখিলেন, কথা কহিতে কহিতে কমলার কৃষ্ণতার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা ধারাকারে আসিয়া ফুল্লরক্ত-কুসুমকান্তি গণ্ডযুগল বিপ্লাবিত করিল। গোলোকনাথ সে অশ্রুতে সারা বিশ্বের করুণরস একত্রে সঞ্চিত দেখিলেন। সে মুখের ম্লান সৌন্দর্য্যে সারা বিশ্বের সার সৌন্দর্য্য অবলোকন করিলেন। সারা বিশ্বের সার প্রেম একত্রে ঘনীভূত হইয়া কমলার সেই কথায় তাহার হৃদয় পরিপ্লুত করিল। গলা ঝাড়িয়া মৃদু শ্বাসের সহিত বলিলেন,—“এমন মৃত্যু বুঝি দেবতারও বাঞ্ছনীয়,—কিন্তু কমলা, আত্মহত্যা সর্ব্বত্রই পাপ। যাহা পাপ, তাহা কোন অবস্থাতেই করণীয় নহে। পাপে তোমাকে পরলোকে পাইব না। পাপীর জন্য প্রেম নহে—প্রেম সংযমীর। কমল—প্রাণের কমল; আমি আমার জন্যে ভাবি না, নরকের জন্যে ভাবি না, কিন্তু তোমার প্রেমে যাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহাই করিতে বড় ভয় পাই।”

কমলা। তবে এখন কি করিবে? কোন্ পথে যাইবে?

গোলোক। বাস্তবিক সকল পথ রুদ্ধ। মুসলমান সৈন্যগণের সঙ্গে মিশিয়া পড়াই কর্ত্তব্য ছিল,—কিন্তু তাহাতেও সাহস নাই।

কমলা। কেন?

গোলোক। তাহারা যে কাজে পাঠাইয়াছিল, তাহা সমাধা না করিয়াই ফিরিতেছি, ইহাতে আমার উপরে চটিয়া যাইবে। আমাকে যে সম্মান করিত, তাহা আর করিবে না। আরও এক কারণ আছে।

কমলা। কি?

গোলোক। তোমাকে লইয়া তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারিব না। তাহারা সকলেই স্বাধীন—হয়ত তোমাকে লইয়া বিষম বিভ্রাট বাধাইবে।

কমলা। নুনি পার হইয়া যদি রাজার ওখানে ফিরিয়া যাই, আমার বোধ হয়, সেখানেও সুবিধা হইবে না।

গোলোক। কেন?

কমলা। রাজাকে বোধ হয় সিংহ আমার প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দিবে।

গোলোক। জানাইতে জানাইতে আমরা কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিব।

কমলা। কি করিবে?

গোলোক। মুসলমান সৈন্যের সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে নগরে আনাইতে পারিব।

কমলা। তাহার পরিণাম?

গোলোক। মুসলমানগণ জয় লাভ করিলে, আমাকে সম্মানের চক্ষে দেখিবে—তখন তাহাদের সাহায্যে তোমাকে লইয়া বঙ্গদেশে চলিয়া যাইতে পারিব।

কমলা। যদি রাজা আমার প্রতি অত্যাচারী, ইহার প্রমাণ পাই, তাহা হইলে সেরূপ করিতে পারা যাইবে।

গোলোক। নতুবা?

কমলা। নতুবা হইবে না।

গোলোক। কেন?

কমলা। রাজা যদি পূর্ব্ববৎ আমাকে সম্মান করে, পূজা করে,—বিশ্বাস করে, তাহা হইলে কি প্রকারে তাহার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রের আয়োজন হইবে, তাহা জানিয়াও তাহাকে সাবধান না করিয়া থাকিতে পারিব?

গোলোক। রাজার আজ্ঞায় তোমার পিতামাতা অতি নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়াছেন। রাজা শঠতা করিয়া সৈন্যগণকে আমাদিগের সহিত আসিতে দেয় নাই। রাজাই সিংহকে এই নির্দ্দয় ও বর্ব্বরোচিত কার্য্যে উত্তেজিত করিয়া শীঘ্র কার্য্য সমাধা করিতে আদেশ করিয়াছে।

কমলা। আপাততঃ তাহাই জ্ঞান হইতেছে গোলোকনাথ। কিন্তু তুমি সমস্ত অবস্থা পরিজ্ঞাত নহ,—এ দেশের যে রাজা, সে নিতান্ত অসভ্য—নিতান্ত সরল—নিতান্ত অবিশ্বাসী। সিংহ অত্যন্ত শঠ—অত্যন্ত ধূর্ত্ত—অত্যন্ত লোভী। গোড়ায় সে যেরূপ বুঝাইয়া—যেরূপভাবে উত্তেজনা করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে,—রাজা সেইরূপ ভাবেই হয়ত কার্য্য করিয়াছে। যাক্, কখন কি ঘটিবে, এখন তাহা লইয়া আলোচনা করিয়া কি করা হইবে না হইবে, তৎসম্বন্ধে ভাবিয়া কি হইবে। এখন বর্ত্তমান স্থির কর।

গোলোকনাথ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"চল। তোমাদের আশ্রমে যাই,—রাত্রি প্রভাত হইলে, যেরূপ ঘটে, তাহাই করা যাইবে।

এখন ভাবিতব্যতা যে দিকে লইয়া যাইবে, সেই দিকে যাওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর দেখা যাইতেছে না।”

তখন তাহারা দুইজনে উঠিয়া আশ্রমাভিমুখে চলিয়া গেল। তাহাদের শরীররক্ষিগণও সে সঙ্গে গেল। অশ্বরক্ষকদ্বয়ও অশ্ব লইয়া সঙ্গে সঙ্গে গেল।

যখন তাহারা আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় প্রায় এক শত বর্ষাধারী সৈন্য অতর্কিত ভাবে ঝটিতি আসিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে গোলোকনাথকে ধৃত করিয়া বন্দী করিয়া ফেলিল, এবং সিংহ নিজে অতিশয় বলপূর্ব্বক কমলাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার চক্ষুতে কাপড় জড়াইয়া দিল, এবং বলিল,—“চক্ষুতেই তোমার বাহাদুরী ; আপাততঃ তাহা বন্ধ রহিল।” তারপরে সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—“পাপাত্মা মুসলমানের গুপ্তচরের বস্ত্রমধ্যে বিদ্যুতের যন্ত্র লুকান আছে, তাহা কাড়িয়া লও। কোমর তরবারি খুলিয়া লইয়া নিরস্ত্র কর—তারপরে রীতিমত বন্ধন করিয়া আশ্রমের পার্শ্বের ঐ দিকে যে ঘরখানা আছে, তথায় বন্দী করিয়া রাখিয়া দাও।”

কমলা সে সকল কথা শুনিতে পাইল। বুঝিতে পারিল, সিংহ তাহাদের সম্পূর্ণ অনিষ্ট না করিয়া ছাড়িবে না। গোলোকনাথের জন্য সে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। তথাপি তখনকার মত সাহসে নির্ভর করিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—“সৈন্যগণ! আমি তোমাদের দেবী ;—এক পাষণ্ডের করে আমার এত দুর্দ্দশা—এত অপমান, তোমরা কি করিয়া দর্শন করিতেছ?”

সিংহ হা হা করিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিল। একজন সৈন্য বলিল,—“মা, আমাদের কোন অপরাধ নাই। রাজার আদেশে আমরা ইঁহার কথা শুনিয়া কাজ করিতেছি। আপনি অন্তর্যামিনী সব জানিতেছেন।”

সিংহ হাসিয়া বলিল,—“তুমিত দেবী, তবে কেন বিদ্যুৎ ডাকিয়া আমাদিগকে নিধন কর না। দেখি, দেখি,—বিদ্যুতের থ’লেটা কাড়িয়া লই।”

এই বলিয়া সিংহ কমলার বস্ত্রমধ্যে হাত চালাইয়া দিয়া লুক্কায়িত পিস্তলটি বাহির করিয়া নিজের নিকট রাখিয়া দিল। তারপরে মৃদুস্বরে বলিল,—“কমলা, এখন বুঝিতেছ, কিরূপে তোমাকে হস্তগত করিলাম। তুমি সম্মানের কেউ নহ। ভাবিয়াছিলাম, এদেশের দেবী বলিয়াই তোমাকে পরিচিত করিয়া দিব, এবং তোমাকে বিবাহ করিয়া আমিও পূজ্য হইব। তারপরে কৌশলে আমরাই এ দেশের রাজা হইব,—কিন্তু তুমি তেমন মানুষ নও। একটা মুসলমানের দাসানুদাসকে ভালবাসিতে উদ্যত হইয়াছ—কিন্তু

সিংহ জীবিত থাকিতে সে কার্য্য কখনই হইবে না। কা'ল সকালেই তাহার মুণ্ড বর্শায় বিঁধাইয়া আনিয়া তোমার পায়ের তলায় উপহার দিব। তুমি আমাকে মোহিনীবিদ্যায় মুগ্ধ করিবে? তোমার বিদ্যা বুঝিয়া লইয়াছি,——তোমার দিকে না চাহিলে বা তোমার হাত চালাইতে না দিলে আর কি ছাই করিবে?"

কমলা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল,—কোন উত্তর করিল না।

মৌনে সম্মতিলক্ষণ বিবেচনা করিয়া, সিংহ বড় পুলকিত হইল। বলিল,—"আর এখনও তোমার মান-সম্ভ্রম সব বজায় আছে—এখনও তোমার বুজরুকি ভাঙ্গিয়া যায় নাই,—এখনও যদি আমাকে বিবাহ কর, সব থাকিবে,—আর যদি আমার স্ত্রী তখন অনুরোধ করে, তবে ঐ হতভাগ্য কুকুরকে জীবিত অবস্থায় এখান হইতে তাড়াইয়া দিতে পারিব। কি বল কমলা, একটা উত্তর দাও।"

কমলা অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে উত্তেজিত স্বরে বলিল,—"হয় সিংহ নয় কমলা, একজন অচিরেই মরিবে। পিতৃ-মাতৃ-হন্তা—পশু! আমার সম্মুখে! হা, ভগবান্!

সিংহ তখন কমলাকে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া আশ্রমমধ্যস্থ একটা গৃহে বন্দী করিল। সৈন্যগণ অনেকক্ষণ পূর্ব্বেই গোলোকনাথকে লইয়া গিয়া সিংহের আদেশ পালন করিয়াছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সারারাত্রির মধ্যে কমলার একবারও নিদ্রাকর্ষণ হয় নাই। একে পিতামাতার নিষ্ঠুর হত্যাজনিত প্রবল শোক, তদুপরি সিংহকর্ত্তৃক এতাদৃশ অপমান এবং গোলোকনাথের জীবন বিনাশের আশঙ্কা,—যুগপৎ এতগুলি কষ্টের বিষয় একত্রে যোট পাকাইয়া তাহাকে একেবারে বিপুল বেদনার মধ্যে পতিত করিয়াছিল, ভাবিতে ভাবিতে সে একেবারে কাঠ হইয়া উঠিতেছিল।

যখন প্রভাতের আলোক তাহার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন সে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। রজনীর অন্ধকারে সে এতক্ষণ কোন্ ঘরে আবদ্ধ

আছে, তাহা দেখিতে পায় নাই। এখন দেখিল, যে গৃহে তাহার পিতা ও মাতা থাকিতেন,- যে গৃহে তাহার পিতামাতা নিষ্ঠুররূপে নিহত হইয়াছেন—সেই গৃহেই সে বন্দিনী অবস্থায় অবস্থান করিতেছে।

গৃহমধ্যে তখনও তাহাদের পরিত্যক্ত দ্রব্য-সম্ভার যেন অধিস্বামিগণের অভাবে বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া হা হা করিতেছে! তখনও তাহাদের শয্যাগুলি পড়িয়াছিল। তাহার মাতার শেষ শয্যা তখন শূন্য পড়িয়া শোকের মর্ম্মোচ্ছ্বাস লইয়া পড়িয়াছিল,—আর তাহারই অদূরে একখানা শাণিত বর্ষা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল।

কমলা সে সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকক্ষণ মাটিতে পড়িয়া পিতামাতার জন্য লুঠিয়া লুঠিয়া কাঁদিল। তারপরে আপনিই উঠিয়া বসিল। অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া কি চিন্তা করিল। অবশেষে উঠিয়া গিয়া সেই বর্ষাখানা কুড়াইয়া আনিল।

উঃ! তীক্ষ্ণধার বর্ষাগ্রে তখনও রক্তের দাগ লাগিয়াছিল। বর্ষাখানা যেরূপভাবে পড়িয়াছিল, এবং প্রথমে সৈনিকের নিকটে যেরূপভাবে যাহা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহাতে সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, এই বর্ষাতেই তাহার পিতৃদেবের প্রাণবায়ু দেহ হইতে উড়িয়া গিয়াছে। বর্ষাগ্রে এখনও তাহার পিতৃ-রক্ত লাগিয়া রহিয়াছে। বর্ষা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার খানিক কাঁদিল।

তারপরে বর্ষাখানা পার্শ্বে রাখিয়া মেঝেয় বসিয়া পড়িল। বসিয়া বসিয়া ভাবিল,—"আর কেন, কমলার সব ফুরাইয়াছে, এখন মরি না কেন? আর একটু পরেই গোলোকনাথের বর্ষাবিদ্ধ ছিন্নমুণ্ড সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন তাহা দেখিয়া মরার চেয়ে, আগে মরাই কি ভাল নয়?"

অনেকক্ষণ তাহা ভাবিল। ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিল, আত্মহত্যায় মহাপাপ,—যতক্ষণ আমার সতীত্বের উপরে অত্যাচার না হইতেছে, ততক্ষণ মরিলে আত্মহত্যাজনিত মহাপাতক হইবে। আর জন্মে কত পাতক করিয়াছিলাম, তাহারই ফলে এবার যন্ত্রণা পাইতেছি,—আবার কেন? শুনিয়াছি, আত্মহত্যার চেয়ে আর পাপ নাই!

ঠিক এই সময় পার্শ্বের দরজা উন্মুক্ত হইল। কমলা চমকিয়া সেইদিকে চাহিল,—দেখিল, সিংহ উত্তম বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, নৈশ ফুল্ল বনকুসুমের মালা গাঁথিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে গৃহ-প্রবেশ করিল। কিন্তু

তাহার চক্ষু খোলা নাই—চক্ষু চশমা লাগান। তাহাকে দেখিয়া কমলার হৃদয় দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল,—সে ভূপতিত বর্শাখানা টানিয়া হাতে করিল।

ধীরে ধীরে—মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে গৃহমধ্যে আগমন করিয়া কমলার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া সিংহ বলিল,—"কমলা, আমি আসিয়াছি। আমাকে আপনজন ভাব—আমাকে ভালবাস,—উভয়ে সুখে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব।"

অতিশয় উত্তেজিত অথচ গম্ভীরস্বরে কমলা বলিল,—"পিতৃ-মাতৃ-হন্তা নরাধম :—আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

সিংহ। তা' পারিব না। তোমাকে বড় ভালবাসিয়াছি,—তোমাকে না পাইলে কিছুতেই প্রাণে বাঁচিব না।

কমলা অনেকক্ষণ কথা কহিল না। বর্শাগ্রভাগে নয়নদ্বয় স্থাপন করিয়া রহিল। তারপরে বর্শাখানা কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, —"এই বর্শায় কাহার রক্ত ?"

সিংহ বর্শারদিকে একটু চাহিয়া দেখিয়াই বলিল,—"আমার রক্ত কমলা।"

কমলা। তোমার ! তোমার রক্ত ইহাতে কি করিয়া লাগিল ?

সিংহ। যখন তোমার পিতা সেই বর্শাধারী সৈনিকের ললাটে গুলি করিয়াছিলেন, সেই সময় সেই হতভাগ্য আমাকে লক্ষ্য করিয়া এই বর্শা ছুড়িয়াছিল,—বর্শা আসিয়া আমার বাহুতে বিদ্ধ হয়, এই দেখ, চাহিয়া দেখ, —আমার বাহুতে সে ক্ষত এখনও বিদ্যমান।

কমলা সে দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। কোনও কথাও কহিল না। সে একমনে বর্শাফলকখানা মেঝের উপরে ঘর্ষণ করিতে লাগিল।

তখন প্রভাতের নবোদিত সূর্য্য-কর উন্মুক্ত জানেলা-পথে আসিয়া কমলার মুখের উপরে পড়িয়াছিল। তাহার মস্তকের চুলগুলি থোপা থোপা হইয়া কতক ঝুলিয়া আসিয়া মুখের উপরে পড়িয়াছিল—কতক দুই বাহুর উপর দিয়া বহিয়া মেঝেয় পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছিল—কতক নিতম্বে পড়িয়া দুলিতেছিল। ধীর বায়ু সে আষাঢ়ের নবকাদম্বিনী সদৃশ চুলগুচ্ছ দুলাইয়া দিয়া সমস্ত গৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছিল, সিংহ সে বিষন্ন-শ্রী রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব ছিল। তারপরে সিংহ বলিল,— "কমলা, আমাকে দোষী করিও না। রাজার আদেশে—রাজার সৈন্যগণই তোমার পিতাকে হত্যা করিয়াছে।"

কমলা তথাপি নিরুত্তর। সে যাহা করিতেছিল, তাহাই করিতে লাগিল।

সিংহ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ও কি করিতেছ কমলা? বর্ষার ফলক ঘসিয়া কি লাভ হইবে? উহাতে যথেষ্ট ধার আছে।"

কমলা ঘর্ষণে নিরস্ত হইল। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"তোমার রক্ত আমার রক্তকে দূষিত করে, এমন ইচ্ছা করি না।"

সিংহ সে কথার মর্ম্ম বুঝিল না। সে কিয়ৎক্ষণ কমলার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"কমলা, তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বল।"

কমলা ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে বলিল,—"তুমি পার না বটে, কিন্তু একজন এদেশের অসভ্য সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিয়ো, তাহারা বুঝাইয়া দিবে। আর তাহাতে যদি লজ্জা বোধ কর, - আমার পিতামাতার আত্মাকে জিজ্ঞাসা কর।"

হঠাৎ সিংহের মনে ভয়ের উদ্রেক হইল—মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু তখনই সামলাইয়া লইয়া বলিল,—"কমলা, তোমার পিতামাতার মৃত্যুর সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই। ও বিষয়ে আমার উপরে অন্যায় সন্দেহ করিতেছ।"

কমলা। তবে তাঁহাদিগের প্রেতমূর্ত্তি তোমার পশ্চাতে দেখিতেছি কেন?

সিংহ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই বলিল, "কমলা, তুমি কি আমাকে এদেশের অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি মনে করিতেছ,—আর সেইপ্রকার বৃথা ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার চেষ্টা করিতেছ? শোন কমলা, বৃথা সময় নষ্ট করিয়ো না। আমি যে তোমাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসি তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। এখন আমাকে বিবাহ করিবে কি না তাই বল।

কমলা। তোমার অপর যাহা কর্ত্তব্য থাকে, করিতে পার। বিবাহের কথা আর কখনও তুলিয়ো না।

সিংহ। তবে তাই হউক,—বলপ্রকাশে—

কমলা বর্ষা হাতে করিয়া ধা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সিংহীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল—"সাবধান কুকুর,—আমি অসহায়া নহি। সতীনাথ সতীর সঙ্গে থাকেন।"

যেরূপভাবে কমলা কথা কহিল, তাহাতে সিংহ বুঝিল,—কমলাকে পাইবার আশা তাহার কোনপ্রকারেই নাই। কিন্তু তথাপি রমণীর রূপে সে মুগ্ধ হইয়াছে—ভুলিতে বা পশ্চাৎপদ হইতে পারিল না। তাহার মনে হইল,

এতদূর যখন অগ্রসর হইয়াছি, তখন আশা ত্যাগ করিব কেন? ঐ হতভাগ্য যুবকই এ পথের কণ্টক,—তাহাকে নিহত করিয়া আনিয়া তাহার ছিন্নমুণ্ড না দেখাইলে কমলা কিছুতেই বশ হইবে না। প্রণয়ী জীবিত থাকিতে কেই বা অপরে প্রাণ দেয়। তখন সে কর্কশ-গম্ভীরস্বরে বলিল—"কমলা, তোমার জন্যে অনেক করিয়াছি, আবার একটি স্বদেশবাসী যুবকের প্রাণবধ করিতে হইল।"

সিংহ ভাবিয়াছিল, কমলা ভীত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না।

সেই সময় একটা চিল বাহিরের আকাশ-পথে উড়িয়া গেল। জানেলা দিয়া তাহা দেখিয়া—সেই পাখীটিকে দেখাইয়া কমলা বলিল,—"ঐ পাখীটিকে তুমি যেমন হস্তগত মনে কর, আমাকে তদপেক্ষা আরও অল্প ভাবিয়ো। আমার গাত্র-স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে আমি সহস্ররূপে আত্মহত্যা করিতে পারিব।"

কিছুক্ষণ সিংহ কোন কথা কহিল না। তৎপরে বলিল,—"শোন কমলা,—তুমি আমায় ভালবাস না, তা' জানি। তবুও আমার শেষ কথা এই যে, হয় আমাকে বিবাহ কর, আর না হয়, গোলোকনাথের রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড দেখিবার জন্য প্রস্তুত হও।"

কমলা কোন কথা কহিল না।

সিংহ পুনরপি বলিল,—"এই মুহূর্ত্তে শেষ উত্তর চাই।"

কমলা গম্ভীর স্বরে বলিল,—"ভগবানের দিকে চাহিয়া যাহা ইচ্ছা কর। আমি বঙ্গ রমণী, সতীত্ব আমার সর্ব্বস্ব।"

"বটে! এত!" এই কথা বলিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে সিংহ চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

রুষীয় ললনা প্রাস্কোভিয়ার অসাধারণ পিতৃ-মাতৃ ভক্তি।

এই অসীম, অনন্ত সুখদুঃখপরিপূর্ণ সংসার-নাট্যে কত লোক আসে, কত লোক যায়, তাহাদের সংবাদ রাখে কে? কত লোক নানা রকমে স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন-পুরঃসর অনন্তে বিলীন হইয়া যায়—তাহাদের সংবাদ রাখে কে? ইহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বনামধন্য, প্রথিতনামা; যাঁহারা দেশের জন্য বা দশের জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন; যাঁহারা স্বীয় জীবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া অগ্নিময় গৃহে প্রবেশ করিয়া, অপোগণ্ড শিশুগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন; তাঁহারাই দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় ও মানব-হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন। কত যুগ যুগান্তর চলিয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের নাম এখনও মানবের হৃদয়ে অনপনেয় হইয়া রহিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নাম, রামায়ণকার চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। "অন্যে পরে কা কথা" অশিক্ষিত কৃষকবৃন্দ পর্য্যন্ত রামলীলা গাহিয়া থাকে। তাই ইংরেজ কবি এই সকল মহাত্মাকে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

Ten thousands years may come and go,
Not to move them from their place.

কিন্তু ইংরেজ-কবি আবার গাহিয়াছেন:—

Full many a gem of purest ray serene,
The darkest unfathomed caves of ocean bears;
Full many a flower is born to blush unseen,
And waste its sweetness in the desirt air.

কথাটা ঠিক। দিগন্তপ্রসারিত মরুভূমির মাঝে মাঝে যে সকল উর্ব্বরা স্থান আছে, তাহাতে কত সুন্দর-দর্শন মনোহর কুসুমরাজি প্রস্ফুটিত হয়। তাহার আদর করে কে? অনন্ত অপার সমুদ্রগর্ভে অসংখ্য রত্নরাজি রহিয়াছে। মানবের মধ্যে কেহ কেহ তদ্রূপ লোকালয় হইতে দূরে দূরে

থাকিতে চান। তাঁহারা নাম চান না, যশঃ চান না ; তাঁহারা কেবল চান, "অন্তিমে যেন তোমার চরণ পাই।" দুর্ভিক্ষের সময় অশিক্ষিত কৃষক গৃহাগত অতিথিকে সম্মুখস্থ খাদ্য দ্রব্য বিলাইয়া দেয়। কোনও প্রতিবাসীর গৃহে দৈবাৎ অগ্নি লাগিলে, কত অশিক্ষিত কৃষক স্ব স্ব জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া গৃহমধ্য হইতে গৃহস্বামীর দ্রব্যাদি বা সন্তানগণকে উদ্ধার করে। সিংহ-শার্দ্দূল-জন্তু-উপদ্রুত বনরাজিতে কত সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী ইন্দ্রিয়-নিগ্রহপূর্ব্বক নিরাহারে ভগবচ্চিন্তনে নিমগ্ন আছেন। তাঁহারা কি যশঃপ্রার্থী? কখনও নয়। সেই কৃষককে জিজ্ঞাসা কর—কেন প্রাণ দিতে ব'সেছ? সে অমনিই উত্তর করিবে—কেন? এ যে আমার কাজ। ধন্য—ইহারাই জগতে ধন্য। হায়! কত লোক নামের জন্য কত করিয়াছেন।

আমাদের প্রাস্কোভিয়াও মরুভূমির মধ্যস্থিত একটি কুসুম। সামান্য বালিকার কি প্রবলা ইচ্ছাশক্তি তাহা আমরা ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিব।

প্রাস্কোভিয়া, লুপোল্ফ্ নামক জনৈক রুষীয় সৈনিকের একমাত্র কন্যা। লুপোল্ফ্ রাজসরকারে কাজ করিতেন। তখন Part I রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি অত্যন্ত অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী, উদ্ধতস্বভাব নরপতি ছিলেন। তাঁহার কোপদৃষ্টিতে যে পড়িয়াছে, সে সুদূর বরফাবৃত, সিংহ-শার্দ্দূলাদি-সঙ্কুল সাইবেরিয়া প্রদেশে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসিত হইয়াছে। লুপোল্ফ্ও দুর্ভাগ্যবশতঃ সপত্নীক নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। হায়! তাঁহাদের এই অপরিচিত স্থানে তাঁহাদের কষ্টের একশেষ হইত। হায়! যাহারা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াছেন ; চর্ব্ব চুষ্য-লেহ্য-পেয় ব্যতীত যাহাদের রসনা পরিতৃপ্ত হইত না ; যাহারা কোনপ্রকার কষ্ট হইলে অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতেন, যাহাদের ভয়ে ভৃত্যগণ সশঙ্ক থাকিত, হায়! তাঁহাদের কি দশা এখন। মৃত্তিকোপরি ভূমিশয্যা, পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, ভৃত্যহীন বন্ধুহীন জীবন। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবাদির স্নেহপাশ হইতে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন। এত গেল তাঁহাদের উৎকট পরিবর্ত্তন। এতদ্ব্যতীত দেশের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। চিরকাল উৎকট হিম—সূর্য্যরশ্মিও মন্দীভূত। সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি। কত মানুষ, কত ছাগ, কত বৎসতরী তাহাদের উদরসাৎ হইয়াছে।

যখন লুপোল্ফ্ এতৎপ্রদেশে নির্ব্বাসিত হন, তখন প্রাস্কোভিয়া তিন

বৎসর বয়স্কা বালিকা। বালিকা দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় বাড়িতে লাগিল। বালিকা যাহাতে সুখে থাকিতে পারে, তাহাতে তাঁহারা সচেষ্ট ছিলেন। দেখিতে দেখিতে বালিকা যৌবনে পদার্পণ করিল। তখন বুদ্ধিশক্তির উন্মেষও হইয়াছে। মাতৃসকাশে যাবতীয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে বড়ই আঘাত পাইল। তদবধি পিতৃমুক্তি-উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অনেক চিন্তার পর বালিকা দেখিল—রাজ-দরবারে আবেদন করিলে পিতৃমুক্তি নিশ্চয়। এই মনোগত ভাব পিতৃমাতৃসকাশে নিবেদন করিলে, তাঁহারা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। 'বামন হ'য়ে চাঁদে হাত ?' কিন্তু যে হৃদয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রবলা, তথায় বাধা-বিঘ্ন নিষ্ফল হয়। বেগবতী নদীতে বাঁধ দিলে নদী যেরূপ দ্বিগুণবেগে চলিয়া বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলে, তদ্রূপ প্রবলা ইচ্ছাশক্তি পথে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। বালিকাও স্বীয় সঙ্কল্পে দৃঢ়মনা। একদিকে জীবন, অন্যদিকে পিতৃমুক্তি। "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।" ইহা স্থির করিয়া বালিকা রাজধানীতে যাইবে স্থির করিয়া পিতামাতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। পিতামাতা অনন্যোপায় হইয়া তদ্গমনে অনুমতি দিলেন। পরদিবস প্রাতে সাদরে লালিতা, সাংসারিক কষ্ট-অনভিজ্ঞা প্রাস্কোভিয়া—পিতামাতার স্নেহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, ভগবৎ কৃপা সম্বল করিয়া বিপৎসাগরে ঝাঁপ দিল। পথে অকথ্য কষ্টে পড়িয়াছে। কোন সময়ে হয়ত দস্যুহস্তে পড়িয়া নিগ্রহ পাইয়াছে। কত স্থানে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া বিফলমনা হইয়াছে। কখন হয়ত ঝড়বৃষ্টিতে অসহ্য কষ্ট সহিয়াছে। কিন্তু নির্ভীক বালিকা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে নাই বা তৎসঙ্কল্পিত কার্য্য হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ইচ্ছাশক্তির কি দুর্দ্দমনীয় প্রাধান্য! প্রাস্কোভিয়া যে সকল বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, সে সকল বর্ণনা করিলে প্রবন্ধের কলেবর বর্দ্ধিত হইবে; তজ্জন্য উল্লেখযোগ্য একটীমাত্র ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সে নানাদেশ অতিক্রম করিয়া রুষদেশে আসিয়াছে। সন্ধ্যা আগত-প্রায়, সূর্য্যদেব অস্তমিত, ভয়ঙ্কর অন্ধকার বনরাজিতে জমাট বাঁধিয়াছে, দেখিতে দেখিতে কৃষ্ণমেঘরাশি আকাশে জমিতে লাগিল। পবন-দেবও একটু বেগে বহিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল। বৃষ্টি মুষলধারে আরম্ভ হইল। বালিকা এখন কোথায় যায়। অদূরে কোন গৃহাদিও পরিলক্ষিত হইতেছে না। তখন বালিকা কোন বৃক্ষতলে আশ্রয়

লইল। তাহার সকল শরীর বৃষ্টিজলে সিক্ত হইয়াছে। দারুণ শীতে কাঁপিতে লাগিল। এইভাবে রাত্রি ভোর হইল। ঝড়বৃষ্টি কমিয়া গেল। সূর্য্য উঠিল। সে অতি কষ্টে আশ্রয় স্থান হইতে নির্গত হইয়া রাস্তায় আসিল। কিন্তু হায়! সে কুসুমকোমল দেহ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল, একটী সুন্দরকক্ষে সুকোমল শয্যায় শায়িতা। প্রাচীরগাত্র নানাবিধ সুন্দর সুন্দর চিত্রে শোভিত। কক্ষে তিনটী বাতায়ন। একটী বাতায়ন-পথে সূর্য্যদেব কক্ষ মধ্যে উঁকি মারিতেছেন, কক্ষটী অতি সুন্দর দেখাইতেছে। কক্ষমধ্যে একটী টেবিল ও তিনখানি চেয়ার, টেবিলটির উপর নানাবিধ পুস্তক, মসীপাত্র ও কলমদান। একখানা চেয়ারে একজন সুন্দর-দর্শন যুবক বসিয়া পুস্তক পড়িতেছেন। মাঝে মাঝে পুস্তক হইতে চক্ষু তুলিয়া স্নেহ-দৃষ্টিতে প্রাস্কোভিয়াকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। তিনি প্রাস্কোভিয়াকে সজ্ঞান দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে তৎসমীপবর্ত্তী হইলেন এবং ভিষকৃদত্ত সুস্বাদু ঔষধ পান করাইলেন। প্রাস্কোভিয়া ক্ষীণস্বরে কহিল—"আমি কোথায়?"

যুবক মধুরস্বরে বলিলেন—কথা কহিবেন না। আপনি সেণ্টপিটারবার্গ হইতে ১০০ শত ক্রোশ দক্ষিণে আছেন।

প্রাস্কোভিয়া কুতূহলে আবার জিজ্ঞাসিল—"আমি এখানে কিরূপে আসিলাম?"

যুবক। সে অনেক কথা। আপনি যখন পথিমধ্যে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, তখন আমি অনতিদূরেই ছিলাম। আমি ঘোড়ায় আসিতেছিলাম, আপনাকে ঘোড়ার উপর উঠাইয়া আজ ৪ দিন হইল এখানে আনিয়াছি। আপনাকে জ্ঞান করাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছি, যাহা হউক, আপনার যে জ্ঞান হইয়াছে, তজ্জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেই।

প্রাস্কোভিয়া। আপনি কে?

যুবক। আমি রাজকর্ম্মচারী।

সহসা প্রাস্কোভিয়ার অনিন্দ্যবদন আরও সুন্দর হইয়া উঠিল। এইরূপে কয়েকদিন পরে প্রাস্কোভিয়া নীরোগ হইয়া উঠিল।

যুবকের সাহায্যে বালিকা প্রাস্কোভিয়া রাজমাতার নিকটে আনীতা হইল। যুবককে রাজমাতা অত্যন্ত স্নেহ করেন। রাজমাতা বালিকার মুখে

তাহার পিতৃমাতৃ-অবস্থা ও তাহাদের মুক্তির জন্য তাঁহার জীবনপণ শ্রবণে বিস্ময়রসে আপ্লুত হইলেন। তিনি সস্নেহে বালিকাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন,—"তোমার পিতার মুক্তির জন্য আমি সমধিক চেষ্টা করিব। তুমি আগামী কল্য সন্ধ্যাবেলা আমার নিকট আসিও।"

বালিকা প্রস্থান করিলে পর রাজমাতা তৎপুত্রকে ডাকিয়া যাবতীয় বৃত্তান্ত কহিলেন ও লুপোল্ফ্‌কে মুক্তি দিতে বলিলেন। Paul মাতার আজ্ঞানুসারে তাঁহাদের মুক্তি ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজধানীতে আনিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। এক পক্ষ পরে তাঁহারা রাজধানীর অদূরে কোন ধর্ম্মমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বালিকা যুবক সমভিব্যাহারে প্রাগুক্ত ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশকালে অদূরে পিতামাতাকে দেখিয়া নিশ্চল নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যুবক বালিকাকে ধরিলেন—বালিকা লুপ্তজ্ঞান হইতেছিল। পিতামাতা তাঁহাদের একমাত্র আদরের কন্যাকে বহুদিন পরে দেখিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া বালিকাকে বুকে রাখিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলে, বালিকা পিতৃমাতৃসকাশে যাবতীয় বৃত্তান্ত নিবেদিল। পরিশেষে তাঁহারা সকলে রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন। রাজা বালিকার কথা সমস্তই শুনিয়াছিলেন। বালিকাকে দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—"লুপোল্ফ্‌, জগতে তুমিই ধন্য—তুমি এক রত্ন পাইয়াছ। প্রাস্কোভিয়ার মত কন্যা যাহাদের আছে, তাহারাই জগতে সুখী ও ধন্য।" এই বলিয়া তিনি লুপোল্ফ্‌কে পূর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

এখন দেখ, ইচ্ছাশক্তির কি দুর্দ্দমনীয় প্রাধান্য। সামান্য বালিকার কি হৃদয়ের বল! কোথায় সাইবেরিয়া—আর কোথায় রুষ-রাজধানী। এই সুদূর-পথ সামান্য বালিকা পদব্রজেই গমন করিয়াছিল। ধন্য বালিকা! তাই বিজ্ঞগণ বলিয়াছেন—

God help those who help themselves.

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'গীতিকোচ্ছ্বাস' নামক একখানি সুন্দর গানের বই সমালোচনার্থ উপহার পাইয়া এবং গানগুলি পাঠান্তে বড়ই সুখী হইয়াছি ভাবশূন্য কেবল শব্দ ঝঙ্কার কবিতা ও গান শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালা-পালা হইয়া যাইতেছে। এ সময় এমন সরস রস-রচনা বড়ই দুর্লভ। নিম্নে দুইটি গান উদ্ধৃত করিলাম।

প্রসাদী সুর।

মন, তোমার যে ভ্রম গেল না।
তুমি পরের কাছে যশের তরে নিজেরে কর ছলনা॥
তুমি লোক-সমাজে ব্রহ্মচারী অন্তরেতে কসাইখানা।
সাধুর সাজে দেখায়ে চমক, লুকিয়ে যাও চোরের থানা॥
(তোমার) শাস্ত্র-ব্যাখ্যা বচন প্রমাণ লোক ভুলানি আছে জানা।
নিজের বেলায় স্বেচ্ছাচারী শাস্ত্র ছেড়ে আঁধলা কানা॥
মোহমদে মাতাল হলে, থাকে না তার ঠিক ঠিকানা।
তুমি শান্তিরক্ষা ক'রতে যেয়ে হত্যা কর আত্মজনা॥
প্রসাদ-সেবকে বলে এখনো তোমার হুস হলো'না।
(তোমার) বহিঃস্বভাব বাহিরে থুয়ে ভিতরটা ধুয়ে ফেল না॥

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

পুঁজি হারা হলেম তারা কি করি উপায় গো।
(আমার) ঘর দোর সব ভেঙ্গে গেছে নাই স্বজন সহায় গো॥
পাশা ঘর বাড়ী ছিল দ্বারে দ্বারী, রত্ন ধন কত হায় গো।
যৌবনের ঝড়ে বাড়ী গেছে প'ড়ে (এখন) চোরে সব কেড়ে লয় গো॥
বিবেকাদি যত ছিল অনুগত, অর্থাভাবে ছেড়ে' যায় গো।
(এবে) কামাদি ছয় অরি ষড়যন্ত্র করি, নাশে বুঝি আমায় গো॥
দরিদ্র সম্বল তুমি মা কেবল, তব কৃপা যদি হয় গো।
তবে ক্ষেপার পুরে আশা, বেঁধে ভাঙ্গা বাসা, রতন ভূষা ফিরে পায় গো॥

সূর্য্যাস্ত।

দিবসের কর্ম্ম ক্লান্ত রবি ঐ ডুবি যায়।
সমাপ্তি ললাট-লিপি, ঐ শ্বেত মেঘ-গায়।
বিহগেরা ছুটিয়াছে ধীরে নীড়ে আপনার।
চুপি চুপি সংসারেতে ব্যাপিতেছে অন্ধকার॥
লোক-ভরে ঢলি ঢল বহিয়া যেতেছে নদী।
অনন্ত সাগর-মাঝে ধীরে ধীরে ধীরগতি।
গোধূলির তারা এক চাপিয়া মধুর হাসি।
পড়িয়া নদীর জলে চলিয়াছে ভাসি ভাসি॥
কেতকী কুসুম-বালা ফুটেছে তরুর শিরে।
ফেলিয়া করুণ শ্বাস সমীর চলেছে ধীরে॥
বিহগ গাহিছে হোথা গাছে বসি শোকগান।
হইতেছে ধরণীর এক দিবা অবসান॥
এই সন্ধ্যা মত বুঝি মানব-জীবন হায়।
এক দিন মিলাইবে অনন্ত কালের গায়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দাস।

কলি-গীতা।

(১)

কলি কহিলেন, হে দুতশ্রেষ্ঠ! বৎসর বৎসর যেমন সংবাদ-পত্র-কুরুক্ষেত্রে পঞ্জিকার লড়াই বাধিয়া থাকে, এবারেও তাহা বাধিয়াছে ত?

দূত বলিলেন,—মহারাজ! তজ্জন্য চিন্তা করিবেন না। সে লড়াই বাধিয়াছে।

কলি বলিলেন,—কে জিতিবে?

দূত। এখনও তাহা স্থির হয় নাই।

কলি। আমি জ্ঞান-নেত্রে দেখিতে পাইতেছি শ্রীযুক্ত বাগ্‌চি মহাশয়েরা নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কাশী, পূর্ব্বস্থলী, বিক্রমপুর প্রভৃতির নিরীহ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতগণের প্রতিমূর্ত্তি আঁকাইয়া তাঁহাদের অঙ্গবিশেষে লৌহশলাকাঙ্কিত করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন, তখন অপর পক্ষের জয়াশা আর নাই।

দূত। মহারাজ! অপর পক্ষ আমাকে একদিন লুকাইয়া একখানি পঞ্জিকা প্রেজেণ্ট করিয়া জয়ের উপায় কি, জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছিল।

কলি। সুন্দর উপায় আছে।

দূত। বলিয়া দিলে দাস উপকৃত হয়।

কলি। এ পক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দাগিয়া বাহির করিয়াছেন,—অপর পক্ষীয়েরা এইবার বৎসতরী সহিত প্লাকার্ডে তুলুন।

(২)

কলি কহিলেন,—হে দূতশ্রেষ্ঠ! বঙ্গের সাহা-বৈশ্য মহাশয়েরা যে সামাজিক উন্নতিসাধন ও উপবীত গ্রহণের উদ্যোগ করিতেছিলেন, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন?

দূত। শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছেন। যদিও আমি অন্য সংবাদ বিশেষরূপে রাখিতে পারি নাই, তথাপি কিছু কিছু জানি, এবং যাহা জানিতে পারিয়াছি, তদ্দ্বারাই হৃদয়কে আশান্বিত করিতে পারিয়াছি। চোরবাগানের শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সাহা-বৈশ্য বাপাজি যোগানন্দ-সুধা আবিষ্কার করিয়া খুব সুলভ মূল্যে প্রদান করিতেছেন। কয়েক বোতল একত্রে লইলে কমিশন এবং ট্রামভাড়াও দিতেছেন।

কলি। পদার্থটা কি?

দূত। প্লাকার্ডে তাহা খুলিয়া বলিয়া দিয়াছেন—খাঁটি দেশী মদ।

কলি। জয়োঽস্তু। মদের নাম যাহারা যোগানন্দ-সুধা রাখিতে পারে, আমার রাজত্বে তাহাদের উন্নতি করামলকবৎ।

(৩)

কলি। নববর্ষে বঙ্গ সাহিত্যে কোন নূতন মাসিক পত্রের প্রচার-আয়োজন সংবাদ পাইয়াছ কি?

দূত। হাঁ মহারাজ! অতি সমারোহে এবারে 'ভারতবর্ষ' বাহির হইবে। এবং বিশ্বস্তসূত্রে ইহাও অবগত হইতে পারিয়াছি যে, আগামী বর্ষে 'করাচিস্থান' এবং তার ফিরেবার 'মূলাযোড়' বাহির হইবে।

কলি। বর্ত্তমানে কোন্ কোন্ কবিরাজের পসার বেশী?

দূত। যিনি যত আপন প্রশংসাপত্র ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন ছড়াইতে পারেন।

কলি। তন্মধ্যে বিশেষ করিয়া বল?

দূত। যাহাদের ক্যাটালগে নাম আছে, মানুষ নাই।

কলি। বুঝিতে পারিলাম না।

দূত। এমন অনেক কবিরাজী কারখানা আছে, যাহাতে অনেক খ্যাতনামা কবিভূষণ, কবিরত্ন প্রভৃতি উপাধিধারী কবিরাজের নাম ও বড় বড় লোকে তাঁহার দ্বারা চিকিৎসিত হইয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাও ছাপান আছে,—কিন্তু সেই নামধেয় কবিরাজ কখন জন্মান নাই। বর্ত্তমানে নাই, এবং ভবিষ্যতে জন্মিবেন কি না, তাহাতেও সন্দেহ আছে। তাঁহাদেরই পসার বেশী।

কলি। তোমার কথায় বড় সন্তুষ্ট হইলাম—আমার সেই সকল প্রজার জয় হউক। এ আনন্দ সংবাদ তুমি কি করিয়া অবগত হইতে পারিলে?

দূত। কোন সংবাদ পত্রে ঐ প্রকার ঔষধালয়ের সত্ত্বাধিকারীর নাম ঔষধালয়ের ঠিকানা এবং সেই নামহীন নামের তালিকা বাহির করিবার উদ্যোগ হইতেছে, এবং যাহাতে এই সকল প্রতারণার প্রতিকার হয়, তজ্জন্য পুলিশের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা হইবে।

কলি। দুঃসংবাদ! দুঃসংবাদ! আর শুনিতে চাই না। আমার নামে কলঙ্ক হইবে।

যাও দূত! ধরি বায়ু-বেশ,
কহ সেই মদ্ভক্তগণ-কানে কানে,—
মাতি করি কাল-ব্যাজ ল'য়ে কিছু টাকা
বিজ্ঞাপন দিয়া যেন আসে সেই খবর-কাগজে,
হ'য়ে যাবে মুখ বন্ধ, কথা না কহিবে আর
সম্পাদক। সাধ্য কি যে দাস হ'য়ে
চটাইবে, রুদ্ধ করি আয়-পথ
স্বদেশের হিতকামী আপন প্রভুরে।

——

অবসর

'এ কি সেই।

Printed by K. V. Seyne & Bros.
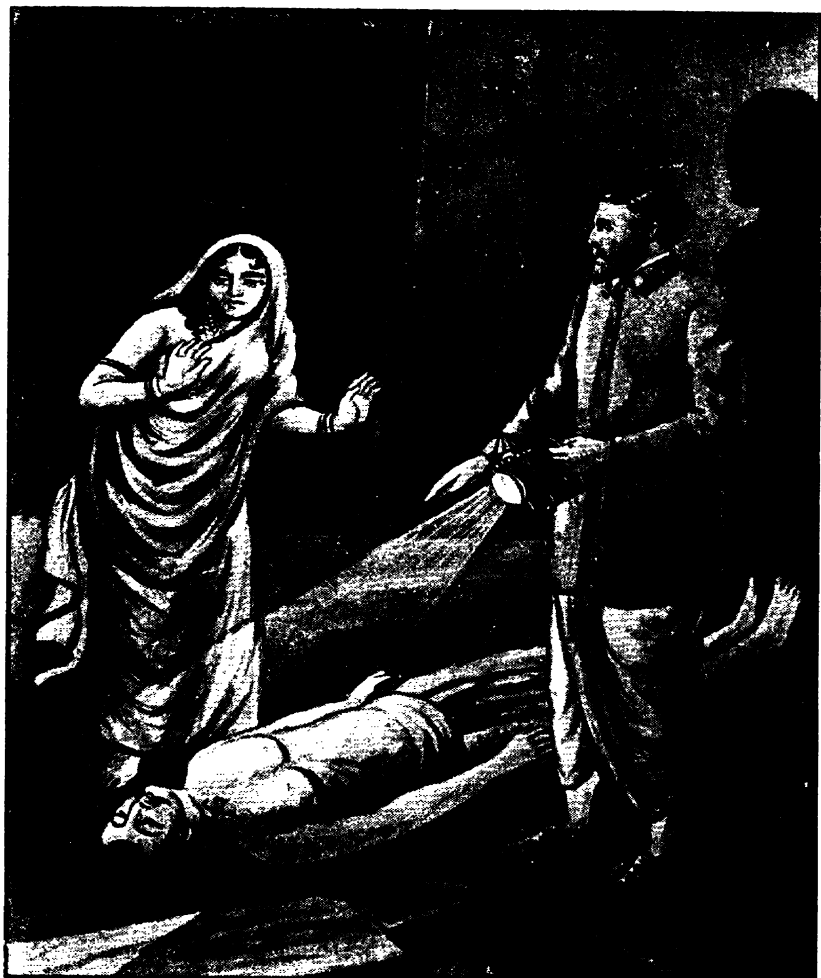
দোষ কাহার।

মানুষের স্বভাব আত্মদোষ দেখিতে পায় না। পরছিদ্রান্বেষী, পরকুৎসাকারী স্বার্থপর আমি এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইব কেমন করিয়া? তাই প্রতিপন্ন করাইতে চাহি, আমার দোষে এই দৈব-দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয় নাই। দেখাইতে চাহি, আমি এসংসারে প্রবঞ্চিত, বিড়ম্বিত।

বহুভাগ্যবলে তোমাকে পাইয়াছিলাম। তুমি পুষ্পের রেণু, সৌন্দর্য্যের সুষমা, লালিত্যের অমৃতধারা, কমনীয়তার সারাৎসার,—তোমাকে পাইবার জন্য যে বুক পাতিয়া দিব, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? রমণীকুলের শিরোরত্ন, লোকললামভূতা নিসর্গ সুন্দরীকে লাভাশায় হৃদয়াসন শূন্য রাখা অসম্ভব ব্যাপার নহে। আমি তাহাই করিয়াছিলাম; তাহারই ফলে, তুমি স্মিতাননে, আমাকে বোধ হয় ভালবাসিবে বলিয়াছিলে!

মূঢ় আমি তখন বুঝিতে পারি নাই, ফণিশিরস্থ মণি-লাভ সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে। বুঝিতে পারি নাই যে মোহিনীমূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া পরমযোগী পিনাকী পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন, সেই অপরূপ রূপলাবণ্যবতী আমার প্রতি বিমুখ হইবে, প্রেমের প্রতিদানে কার্পণ্য প্রকাশ করিবে। তাই বুক ভরা আশা লইয়া, প্রাণভরা আনন্দ লইয়া তাহার দ্বারে প্রেম ভিক্ষা করিতে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সে যদি আমাকে তখন প্রত্যাখ্যান করিত, তাহা হইলে সকল জ্বালাই মিটিয়া যাইত। কিন্তু সে তাহা করে নাই, প্রসন্ন মনে ভিক্ষা দিতে অগ্রসর হইয়াছিল।

কে জানে, অমৃতে গরল, কুসুমে কীট, জলে বাড়বাগ্নি থাকে। রমণীর সার বলিয়া যাহাকে ভাবিয়াছিলাম, সে যে কাপট্য প্রকাশ করিবে, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। মনে করিয়াছিলাম, সে সরলতার আধার, সত্যের প্রতিমূর্ত্তি। তাই তাহার কথায় প্রত্যয় করিয়াছিলাম।

জানি এ সংসার প্রবঞ্চনাপূর্ণ কুটিলতার লীলা-নিকেতন, কাঠিন্যের কেন্দ্র স্থান। জানি এখানে মানুষ শার্দ্দূল অপেক্ষাও ভীষণ, সর্প অপেক্ষাও ক্রূর। এখানে ভ্রাতায় ভ্রাতার সর্ব্বনাশ করে, পুত্র পিতার কণ্ঠচ্ছেদ করে, মিত্র সুহৃদের হৃদয়ে শেলাঘাত করে। জানি এখানে স্বার্থপরতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। মানুষ ভাবে, সে চিরজীবী, সুতরাং অহোরাত্র 'আমার, আমার'

বলিয়া যাবতীয় দ্রব্য আয়ত্ত করিতে তৎপর। সে কে, কোথা হইতে কত দিনের জন্য আসিয়াছে, পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরেই বা কি হইবে, ঐশ্বর্য্যাদি তাহার সহিত যাইবে কি না, পুত্র কলত্রের সহিত ক'দিনের সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় আদৌ ভাবে না। এই অহম্মূঢ় মায়াবদ্ধ জীবের সংখ্যাই যে সংসারে সমধিক, তাহা জানি। তথাপি জানিয়া শুনিয়া, তাহাকে তিলেকের তরে অবিশ্বাস করিতে পারি নাই। ভাবিয়াছিলাম, সে স্বর্গের দেবী, প্রতারণার ধার ধারে না, অবিতথ তাহার শিরায় শিরায় প্রবহমান। সে দেবীমূর্ত্তিতে যে অসরলতা থাকা সম্ভব, তাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। তাই হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাহাকে বরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাই আমার কাল হইল। আমি রজ্জু ভ্রমে সর্প ধারণ করিয়াছিলাম, তাই তাহার তীব্র দংশনে দুর্ব্বিষহ বিষের জ্বালায় এক্ষণ ছটফট করিতেছি।

আমি ভাল বাসিয়াছিলাম কেন, তোমরা তাহা জান কি? আমি রূপের ভিখারী নহি, জ্ঞানের প্রার্থী নহি। আমি ভালবাসার সুধাবিন্দু পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিবার আশায় ভালবাসিয়াছিলাম। যে প্রেমে স্বর্গলাভ হয়, সেই অক্ষয় ভাণ্ডার প্রেমকণা পাইয়া জীবন সার্থক করিব ভাবিয়াছিলাম। অমর হইয়া স্বর্গবাসের আকাঙ্ক্ষা কাহার থাকে না বল?

বলিতে পার, আমি স্বীয় মূর্খতার ফলভোগ করিতেছি, তাহা হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে দেখিলে সকলকেই জ্ঞানহারা হইতে হইত! সেই ইন্দীবরাক্ষী যখন মৃদুহাস্যে মুকুতাপাতিসদৃশ দশনকান্তি প্রকাশ করিয়া বলিত, "আমাকে ভালবাসা দিবে ত" তখন তুমি কোন ছাড়, ইন্দ্রেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া সম্ভব হইত। আমি তাহার হৃদয়ের প্রার্থনা বুঝিয়াছিলাম, সে আমাকে প্রাণ দিয়াছে, তাই প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ চাহিতেছে। সেই প্রার্থনায় আপন হারাইয়া প্রাণ দান করিলাম, বিনা মূল্যে আপনাকে বিকাইলাম; তাহারই কি এই পরিণাম?

হে দেবি! তুমি স্বর্গ মর্ত্ত পাতালের যে স্থানেই যে দেহেই অবস্থান কর, একবার বল আমার এই সমস্ত প্রাণের সম্পূর্ণ ভালবাসা যদি চাহিয়াছিলেই, তবে লইলে না কেন? আমি ত হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম, তবে কিসের জন্য, কোন্ অপরাধে তুমি ইহা পরিত্যাগ করিলে? হইতে পারে, আমি কুৎসিত, হইতে পারে, তুমি স্বর্গের দেবী, আমার হৃদয় নরকের ছবি, কিন্তু তাই বলিয়া ত তোমার ইহা এমনই করিয়া পদতলে বিমর্দ্দন

করিয়া পরিবর্জ্জন করা উচিত হয় নাই। অন্যের নিকট আমার হৃদয়ের মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু তোমার সমীপে যখন হৃদয় পাতিয়াছিলাম, তখন ইহাতে কলঙ্ককালিমার চিহ্ন ত ছিল না, সরলতার কিঞ্চিন্মাত্র অভাবও ত পরিলক্ষিত হইত না। তখন স্বচ্ছ-স্ফটিকসম প্রাণটী তোমার নয়নপথে পাতিয়া দিয়াছিলাম। এখন প্রাণে তুমি দাগা দিলে কেন?

তুমি বলিতে তুমি আমাকে ভালবাসিতে। কিন্তু হে প্রিয়ে, তুমি ত আমাকে ভালবাসিতে দিলে না। আমার ভালবাসা অপূর্ণ রহিয়া গেল। সমস্ত জগৎটা আঁকাড়িয়া ধরিয়া প্রেম ঢালিলাম, তবু তৃপ্তি হইল না। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নিঙ্‌ড়াইয়া প্রেমবর্ষণ করিলাম, তবু হৃদয় শান্ত হইল না। তোমাকে যে ভালবাসা দিয়াছি, তাহা অনন্ত! সুতরাং তৃপ্ত হইব কিরূপে? এ প্রেমের ব্যাখ্যা করা মনুষ্য-সাধ্যাতীত। তাই কবি, প্রেমের উপমা অন্বেষণ করিতে গিয়া, সমস্ত সৃষ্টি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া হতাশ প্রাণে বলিয়াছিলেন ;—

“স্বভাবে অভাব আছে পুরাব কেমন করে,
প্রাণে যত ভালবাসা, তত ভালবাসি তোরে।”

আমারও তাহাই হইয়াছে। তজ্জন্যই অনুযোগ করিতেছি, তোমাকে পূর্ণভাবে ভালবাসিতে দিলে না কেন?

অথবা নিষ্ঠুরে, মমতাবিহীনা বালিকে! তোমার ইহাতে আদৌ দুঃখ উপস্থিত হয় নাই। তুমি খেলিবার জন্য ঘর বাঁধিয়াছিলে, তাই ভাঙ্গিতে মমতা হইল না। কিন্তু আমার ত তাহা নহে। মনে আছে কি, আমার কত যত্নের, কত সাধের ঘর? দরিদ্রের একমাত্র সম্বল, আশ্রয়হীনের একমাত্র আশ্রয়, অন্ধের একমাত্র অবলম্বন, আর্ত্তের একমাত্র সান্ত্বনা, দুঃখীর একমাত্র ভরসাস্থল, তুমি ভাঙ্গিয়াছ। দেখ, দেখ, বজ্রাহত তরুর ন্যায়, আমার হৃদয় ছারখার হইয়া গিয়াছে। আমি যে বড় আশায়, অনেক দুঃখে প্রাণ দিয়া কুটি কুড়াইয়া ঘর বাঁধিয়াছিলাম, তাহা কি এইরূপে উন্মূলিত করিতে হয়? আমার সাধের বাঁধা ঘর, সুতরাং আমার মমতার আধার, প্রীতির নিকেতন, প্রফুল্লতার কুসুমকানন। ছিঃ! ছিঃ! তাহা কি এমন করিয়া শ্মশানে পরিণত করিতে হয়?

কিন্তু ইহাতে বস্তুতঃ সে কি দোষী? প্রকৃতই কি সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার এই বাঁধা ঘর ভাঙ্গিয়াছে, সুখের আশায় ছাই দিয়াছে, সোনার

সংসার ধ্বংস করিয়াছে, সাজান বাগান শুকাইয়া দিয়াছে—যে হৃদয় উদাম-উৎসাহে পূর্ণ ছিল—দয়াদাক্ষিণ্যে মণ্ডিত ছিল—সেই হৃদয় শতধা বিদীর্ণ করিয়াছে! না সে করে নাই, আমি বুদ্ধিহীন, তাই তাহাকে দোষী করিতেছি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সে আদৌ দোষী নহে। মানুষ গড়ে, ভগবান ভাঙ্গে। বিধাতার ইচ্ছা না হইলে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। সে আমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত,—সে আমা ব্যতীত জানিত না, সংসার পাতিবার জন্য যে কিছু উপকরণের প্রয়োজন, সেও আমার সহিত বড় সাধে সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু বিধাতা তাহাতে বাধ সাধিলেন,—অকালে নয়নাভিরাম মনোহর সুগন্ধী পুষ্পকে বৃন্তচ্যুত করিলেন। দোষ কি তাহার?

আমরা ভ্রান্ত জীব, তন্নিবন্ধনই অহর্নিশ "আমার আমার" করিয়া মত্ত। এই 'আমিত্ব' ক্ষণকালের জন্য বিলুপ্তকর, পঞ্চেন্দ্রিয়-রুদ্ধকর, নিত্যবস্তুর দিকে মনকে স্বাধীন ভাবে প্রধাবিত হইতে দাও। দেখিবে এই সংসার অনিত্য। 'আমার' 'তোমার' বলিয়া কিছুই নাই। সৃষ্টি স্থিতি বিলয়—প্রহেলিকা মাত্র। তবে ভাই বল দেখি, তাহাকে দোষী করিয়া আমি স্বয়ংই অপরাধী হইতেছি কি না। সে বিশ্বনিয়ন্তার নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। তাহার এদিক ওদিক করিবার কি উপায় ছিল? তাই বলিতেছিলাম, দোষ কাহারও নহে। এই নিমিত্তই রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

"আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ভুল না মূল। *

কেন গো ভাঙিতে সাধ
জন্ম-যোড়া ভুল ?
নাহি চাই প্রতিদান,
শুধু প্রাণ বলিদান, —
যাচিয়া বিকা'তে পদে
আছি গো ব্যাকুল,
তবু কেন চাও সখা
ভেঙে দিতে ভুল ?

ভালবেসে সুখ পাই.
আমি ভালবাসি তাই,
যশ-মান নাহি চাই
নাহি চাই কুল ;
বাঁচিব কেমনে ওগো
ভেঙে দিলে ভুল !

ভুল যদি ভেঙে দেবে
আধা তবে কোথা পাবে.
ভুলে ভুলে মনে রাখা
ভুল এর মূল !
(এত) প্রেম নয় প্রীতি নয়
গোলোকের ফুল।

ভুল নিয়ে বেঁচে আছি
গেছে যে দুকুল !
ভুলের মাঝারে থাকি,
ভুল বুকে পুষে রাখি,
ভুলিয়া কভু কি মোরে
হবে অনুকূল ?
নির্ভুল করিবে মোর
আজন্মের ভুল !

কিংবা বল শেষ দিনে,
জ্বলন্ত চিতার সনে
পাব' কি তোমার সখা,
পরশ-মৃদুল ?
মুছে যাবে 'তুমি-আমি'
আমি গিয়ে হব তুমি
ঘুচিয়া যাইবে সেই
পিতামহ-ভুল !
দূরে যাবে যাওয়া আসা
ভেঙে যাবে আশা-বাসা
চ'লে যাব বায়ু-বলে
উড়ায়ে দুকূল !!

শ্রীমতী নগনলিনী দেবী।

---

* গত সংখ্যায় প্রকাশিত "ভালবাসা ও তাহার দেবতা" নামক কবিতায় উত্তর।

নারিকেল।

নারিকেল ফল ভারতবাসীর নিকটে চির-সমাদৃত এবং মাঙ্গলিক বলিয়া পরিচিত। দেবপূজা, যাগ-যজ্ঞ, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি হিন্দুর সমস্ত কার্য্যেই নারিকেল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন নারিকেলের দ্বারা যত প্রকার রসনা-তৃপ্তিকর খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে, এমন আর কোন দ্রব্য দ্বারাই হয় না। সন্দেশ, রসকরা, চন্দ্রপুলী, নারিকেলী লাড়ু, নারিকেল-মুড়কী প্রভৃতি কত প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্ন যে নারিকেল দ্বারা প্রস্তুত হয়, তাহা বলা যায় না। যে তরকারীতে নারিকেল দেওয়া যায়, তাহাই অতিশয় সুস্বাদু হইয়া থাকে। মোচার ঘণ্ট, কচুশাকের ঘণ্ট, নারিকেল ভাজা, কেবল নারিকেলের ডাল্‌না এ সকলও উৎকৃষ্ট তরকারী। নারিকেলের চিড়া পূর্ব্বদেশীয় ভদ্রসমাজের একটি গৃহ-শিল্প ও পরম সুখাদ্য দ্রব্য। দরিদ্র ও মধ্যবিৎ গৃহস্থগণের নারিকেল-গুড় অথবা মুড়ী-নারিকেল নিত্য জলখাবারে ব্যবহার্য্য। অপক্ক নারিকেল ফলের জল (ডাবের জল) স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত অনুকূল। ইহা পিপাসা-নিবারক, অম্ল-নিবারক, পাচক বলকর ও স্নিগ্ধ-কারক। পক্ক নারিকেলের জল পান করিলে শূলরোগ নিবারণ হয়। আয়ুর্ব্বেদ-মতে নারিকেল খণ্ড (নারিকেল দ্বারা প্রস্তুত ঔষধ বিশেষ) শূল, অম্লপিত্ত ও অম্লরোগের মহৌষধ।

আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, বঙ্গের পল্লী-গৃহের আশে-পাশে, আনাচে কানাচে নারিকেল বৃক্ষ বিরাজ করিত। তাহাতে গৃহস্থের বাড়ীরই বা কত শোভা দেখাইত। দীর্ঘাকৃতি বৃক্ষদণ্ড গগন ভেদ করিতে যেন ঊর্দ্ধে সমুত্থিত। বৃক্ষমস্তকে শ্যামল দীর্ঘ-পত্র-সমন্বিত দীর্ঘ দীর্ঘ কাণ্ডসকল বিস্তারিত। সেই ঘন-সজ্জিত কাণ্ডমূল হইতে কাঁদি কাঁদি সবুজ রঙের নারিকেল ঝুলিয়া যেন রস-ভারে ফাটিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কোন্ শক্তিবলে মধ্য হইতে কাষ্ঠ জন্মিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিতেছে। ঝুনা নারিকেলের কাঁদি পিঙ্গলবর্ণে রঞ্জিত, সেই সকলের মধ্যে বসিয়া পাপিয়া গলা ছাড়িয়া গান গাহিয়া পল্লী-ভবন মুখরিত করিত, অথবা সাহিত্যে অকুলীন অজ্ঞাত-কুলশীল কোন্ এক পাখী তাহার মধুরকণ্ঠে গৃহস্থের 'খোকা হউক' বলিয়া নিত্য আশীর্ব্বাদ করিত।

এখন আর সেরূপ দেখা যায় না। বাপ-ঠাকুরদাদার রোপিত বৃক্ষ প্রায় ফলদান করিয়া করিয়া মরণের পথে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের স্থানে আর নূতন বৃক্ষ রোপিত হয় নাই, কাজেই এই নিত্য ব্যবহার্য্য পরমোপকারী ফলের বৃক্ষ পল্লীগ্রামে প্রায় দৃষ্ট হয় না।

অনেকে ভাবিতে পারেন, আগের চেয়ে এখন বঙ্গের মানুষ সব জ্ঞানী হইয়াছে, এখন আরও এ সকল প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি অধিক রোপিত হইবে!

হা অদৃষ্ট! জ্ঞান হইয়াছে—বাল্যকালে পুস্তকে পড়িতেছে,—একটা বিড়ালের কয়টা গোঁফ, একটা গরুর কয়টা লেজ, অশ্বত্থ বৃক্ষের পাতার রঙ কেমন? তারপর Bengal Readr এর কয়েকখানা পাতা উল্টাইয়া কোন সহরে গিয়া পনর টাকা বেতনের জন্যে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। তারপরে অনেক কষ্টে মাসিক দশ বার টাকার চাকুরী যুটাইয়া লইয়া আজীবন পরের দাসত্ব করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে।

যখন দেখিতেছে, মরণের আর অধিক দিন নাই। জরা আসিয়া সর্ব্বদেহ আচ্ছন্ন-প্রচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে—তখন কোন একটা প্রভিডেণ্ট-ফণ্ডরূপ বাঙ্গালী-প্রতারকের ফাঁদে নিঃসম্বল শিশু সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বলের জন্য নিজ উদরের উপরে বাণিজ্য করিয়া মাসিক এক টাকা বা আট আনা করিয়া চাঁদা দিয়া যাইতেছে। তারপরে মরিলে সব গোল মিটিয়া যাইতেছে। কোম্পানী তাহা বিনা আপত্তিতে হজম করিয়া বসিয়া থাকিতেছে। অথবা নগদ পনর যোল টাকা সেই নিঃসম্বল পরিবারকে প্রদান করিয়া আইন বাঁচাইয়া যাইতেছে; কিন্তু যদি হতভাগাগণ সেই চাঁদার টাকা দিয়া নিজ পল্লী ভবন-তলে নারিকেল বৃক্ষ রোপণ করিয়া যাইত, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে নিজে প্রচুর অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিত, এবং মৃত্যুর পরে নিরাশ্রয় সন্তানগণের যথেষ্ট সাহায্য হইতে পারিত। এস্থলে একটা হিসাব দেখান যাইতে পারে।

পল্লীগ্রামে একবিঘা নিষ্কর জমি ক্রয় করিতে সাধারণতঃ একশত টাকা। সে সুবিধা না হইলে পাকা জমা করিয়া লইতে পনর টাকা নজর, আর বার্ষিক খাজনা ৫৲ পাঁচ টাকা; ইহাই হইল বড় অধিক হিসাব, অনেকস্থলে ইহা হইতে খুব কমেই মিলিয়া থাকে।

যদি একেবারে একত্রে টাকা সংগ্রহ না হয়, তবে মাসে মাসে যে এক-টাকা করিয়া প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে চাঁদা দেওয়া হইত, ঐ বার টাকার মধ্যে পাঁচ টাকার চারা খরিদ—দশটা করিয়া টাকায় চারা হইলেও পঞ্চাশটা

চারা হয়। আর দুই টাকা চারার ব্যয় ও পাঁচটাকা খাজনা। পর বৎসর ঐরূপ পর বৎসর উহার মধ্যে যে কয়টা চারা মরিয়া যায়, তৎস্থলে নূতন চারা রোপণ, যে কয়টি ঘের ভাঙ্গিয়া যায়, সেই কয়টি নূতন করিয়া দেওয়া আর গাছের গোড়া খোঁড়া, সার দেওয়া ও খাজনা ইত্যাদিতে ঐ বার টাকা ব্যয়। এমনি চারি পাঁচ বৎসর—তারপরে দুই তিন বৎসর আর কোন ব্যয় নাই ; কেবল বৎসর বৎসর বর্ষার শেষে শরদাগমে গাছগুলির শুষ্ক ডাল কাটিয়া শুষ্ক বল্কল ফেলিয়া একটু পরিষ্কার করিয়া দেওয়া। সাত আট বৎসরেই সর্ব্বত্র নারিকেল ফলে। প্রথম প্রথম গড়ে প্রতি গাছে চারিটা করিয়া নারিকেল ফলিলেও একশত গাছে চারিশত নারিকেল হয়। চারিশত নারিকেলের মূল্য গড়ে প্রতিশত তিন টাকা হইলেও বার টাকা। তারপরে দুই তিন বৎসর পরে গড়ে পঞ্চাশটা করিয়া প্রতিবৃক্ষে ধরিলে পাঁচ হাজার নারিকেল হয়। ইহার মূল্য অন্যূন একশত পঞ্চাশ টাকা। তোমার জীবনে যদি এইরূপ তিনটি বাগান করিয়া রাখিয়া যাইতে পার, অন্নের জন্য তোমার পল্লীবাসী সন্তানগণকে আর হাহাকার করিয়া ফিরিতে হইবে না। তুমিও বার্দ্ধক্যে উদরের জ্বালায় ধুঁকিতে ধুঁকিতে আফিঙের কিল-চড় খাইয়া চক্ষুর জলে বুক ভাসাইবে না। আর কলিকাতার অলি-গলির ফন্দীবাজ ফণ্ড-কারীদের উদরপূর্ণ করিয়া সন্তান-সন্ততিগণকে পথে বসাইবে না।

এখন অনেকে বলিতে পারেন, সকলেই যদি নারিকেল বাগান করিয়া বসিবে, তবে কিনিবে কে ? ক্রেতা হইবে না, কাজেই নারিকেল অবিক্রীত হইয়া উঠিবে ? নারিকেলের মত এমন শত সহস্র আয়কর পদার্থ বিদ্যমান আছে,—নির্ব্বাচন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য রোপণ করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু নারিকেল অবিক্রয়ের জিনিষ নহে। দশজনে গাছ লাগাও, একজনে তাহা ক্রয় করিয়া শিল্প-বাণিজ্য আরম্ভ কর। ইহা লইয়া অতি উৎকৃষ্ট লাভ-জনক ব্যবসা চলিতে পারে।

প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকার নারিকেল-তৈল ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। সামান্য মূলধনেই ইহার ব্যবসায় করা যাইতে পারে। ব্যবসায়ে লাভও প্রচুর। কোচিনে এই ব্যবসায় করিয়া অনেক লোক ধন-কুবের হইয়া গিয়াছে। এ দেশে নারিকেল ক্রয় করিয়া কেহ কেহ নারিকেল তৈলের ব্যবসায় করিলেও ধনবান্ হইতে পারেন। পন্থা অতি সহজ। কোচিনে যে প্রকারে ও যে প্রণালীতে নারিকেল হইতে তৈল বাহির করা হয়, তাহা এই—

এতদ্দেশের বাজারে যত প্রকার নারিকেল তৈল বিক্রীত হয়, তন্মধ্যে কোচিনের তৈলই প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট। সুতরাং সে দেশের প্রস্তুত প্রণালীতে এদেশে কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ।

কোচিন, মালাবার উপকূলবর্ত্তী ভারতের একটি করদ রাজ্য। এখানে নারিকেল গাছের বহুল আবাদ আছে। নারিকেলের বর্ণ যখন সবুজ হইতে পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিতে আরম্ভ করে, অর্থাৎ যখন দোমালা ছাড়াইয়া কেবল ঝুনার দিকে যায়, তখনই উহা তৈল হইবার উপযোগী হয়। একেবারে ঝুনা হইয়া গেলে তৈল কম হইয়া যায়।

বৃক্ষ হইতে নারিকেল পাড়িয়া খোসা ছাড়াইয়া দুই টুকুরা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দাও। ততক্ষণ শুকাইতে হয়, যতক্ষণে মালা হইতে শাঁস-গুলি আলগা না হয়। একটু শুকাইলেই শাঁসগুলি মালা হইতে আলগা হইয়া পড়ে। তখন সরু কাটির সাহায্যে ঐ শাঁসগুলি মালা হইতে বাহির করিয়া লও। তারপরে রৌদ্রোত্তাপে শাঁসগুলি উত্তমরূপে শুষ্ক করিতে থাক। কাঁচা থাকিলে সবুজ রং ধরিয়া ক্রমে পচিয়া উঠে। ভাল করিয়া শুকাইয়া বস্তা বা অন্য কোন আধারে রক্ষা কর এবং প্রয়োজনমতে তাহা হইতে তৈল বাহির করিতে থাক। সম্যক্ প্রকারে শুষ্ক নারিকেলকে কোচিনে 'কপ্রা' বলে। কপ্রা পিষিলে তাহা হইতে প্রচুর তৈল বাহির হয়। সাধারণ ঘানিতে দিলেই তৈল বাহির হইয়া থাকে, কিন্তু কলেই ভাল পেষা হয়, কাজেই সমস্ত তৈল নিঃশেষিতরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারবার যত বৃহৎ হয়, কল ও তাহার এঞ্জিন যত বড় হয়, লাভ তত অধিক হইয়া থাকে।

বোম্বাই সহরে আবদাস সহর হাজিমূটা, শঙ্করদাস কেটনী ও সাদাভাই কাদির প্রভৃতি কোম্পানী ও আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোম্পানী এই ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া প্রচুর লাভ করিতেছেন। বঙ্গদেশে আজিও কেহই এ ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যদি কোন উৎসাহী যুবক সামান্য চাকুরীর মায়া কাটাইয়া যশোহর জেলা হইতে নারিকেল কিনিয়া কপ্রা প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতায় আনিয়া হালসির বাগানের তৈলের কল হইতে তৈল বাহির করিয়া লইয়া আপাততঃ এই ব্যবসায় করেন, তাহা হইলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন।

নারিকেল ক্রয় করিয়া শাঁসগুলিতে কপ্রা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। মালাগুলি জ্বালানের জন্য বিক্রয় হয়, আর ছোবড়াগুলি জলে ভিজাইয়া তন্তু বাহির করিয়া দড়ীর জন্য বিক্রয় হয়।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষা পদ্ধতি। *

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফিলিপাইন স্বাধীন ভাবে আত্মচরণোপরি দণ্ডায়মান হইবার চেষ্টা করে। বহুদিন নানাবিধ অত্যাচার, উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া অবশেষে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্য্যাতিত, নিপীড়িত ফিলিপাইন, আপন প্রভুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়—উভয়ে মহা-কোলাহল চলিতে থাকে; কিন্তু ইত্যবসরে শ্যেন-দৃষ্টি আমেরিকা আসিয়া স্পেনের স্কন্ধে উপবেশন করে। একখানি আমেরিকা-জাহাজ ভুলক্রমে স্পেনবাসীরা নষ্ট করে, তাহার ফলে আমেরিকা স্পেনের প্রতি খড়্গহস্ত হয়। ফলে প্যারিসের সন্ধিসূত্র ছিন্ন হয়।

আমেরিকাকে ফিলিপাইনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখিয়া ফিলিপাইনবাসী সত্য সত্যই হৃদয়ে বড় আঘাত পায়। কোথায় ফিলিপাইন বাসীদিগের স্বাধীন পতাকা—আর কোথায় আমেরিকার অধীনতা-শৃঙ্খল!!

ফিলিপাইন তদবধি আমেরিকার অধীন হইয়াছে।

সাড়ে তিন শতাব্দীকাল স্পেন ফিলিপাইনের অধিকার-সুখ ভোগ করিয়াছে। এই সাড়ে তিন শতাব্দীকাল তাহারা ফিলিপাইনবাসীদিগকে সভ্য করিতে ও তাহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শিক্ষার কিছু বিস্তৃতি আরম্ভ হয়। কারণ তাহার পূর্ব্বে ফিলিপাইনে শিক্ষা-ও সভ্যতা বিস্তারের ভার রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়-ভুক্ত পুরোহিতবর্গের হস্তে ন্যস্ত ছিল; কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন-সম্রাট্ গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঘোষণা করেন; অবশ্য ঘোষণানুযায়ী কার্য্য অতি অল্পই হইয়াছিল। সুতরাং স্পেন-শাসনাধীনে থাকিয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে শিক্ষার বিস্তৃতি অতি অল্প ঘটিয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

আমেরিকার শাসনাধীনে আসিবার পর হইতেই ফিলিপাইনের শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। গত একশতাব্দীব্যাপী চেষ্টার ফলে ইউরোপীয় জাতি ফিলিপাইনে শিক্ষার বিস্তৃতিকল্পে যাহা করিতে না

* প্রসিদ্ধ Modern review পত্রিকায় প্রকাশিত Education in Philipines নামক প্রবন্ধের অনুবাদ।

পারিয়াছেন, আমেরিকা মাত্র দশ বৎসরের চেষ্টায় তাহা করিয়াছে। আমরা এস্থলে মণিলা (Manila university) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা, গণিত, চিকিৎসা-শাস্ত্র, কৃষিবিদ্যা, আইন, শিল্প প্রভৃতি সম্বন্ধীয় উচ্চশিক্ষার কথা আলোচনা না করিয়া শুদ্ধ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের শিক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করিতেছি।

আমেরিকা নিম্নলিখিত তিনটী উদ্দেশ্য লইয়া ফিলিপাইনের শিক্ষা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে ;—

(১) সমগ্র লোকের মধ্যে সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তার।

(২) ফিলিপাইনবাসীদিগের মধ্যে শিল্প-বিদ্যার প্রচলন।

(৩) যাহাতে শিক্ষকবর্গ গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়, তজ্জন্য শিক্ষকদিগকে শিক্ষাদান।

উল্লিখিত তিনটী উদ্দেশ্যের মধ্যে দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটীর প্রতিই আমেরিকার অত্যধিক দৃষ্টি।

ফিলিপাইনবাসী বালকেরা চাকুরী-মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য বিদ্যা শিক্ষা করে না ; পরন্তু কিসে শিল্প-কারুকার্য্যাদির বিকাশ সাধন দ্বারা তাহারা দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে তাহারা অতুল পরিশ্রম সহকারে Technical ও Industrial education লাভ করে।

কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক ফিলিপাইনবাসী শিক্ষার্থীকে একাদশ বৎসর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে হয়। তন্মধ্যে চারিবৎসর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, তিনবৎসর মধ্য-বিদ্যালয়ে এবং বাকী চারিবৎসর কলেজের অধস্তন বিদ্যালয়ে Secondary পড়িতে হয়।

সমগ্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জটী শিক্ষার জন্য আটত্রিশ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে এক একজন বিভাগীয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আছেন। প্রত্যেক বিভাগে সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত এক একটি করিয়া উচ্চ বিদ্যালয় আছে। এই বিভাগগুলি আবার মিউনিসিপালিটীতে বিভক্ত। প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীতে এক একটি করিয়া মধ্য বিদ্যালয় (Intermediate School) আছে। আবার ইহা ছাড়া প্রতি মিউনিসিপালিটীতে কয়েকটি করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ও আছে। মিউনিসিপালিটীর অধীনে আমাদের বঙ্গদেশীয় পল্লীগ্রামস্থ প্রাথমিক স্কুল সমূহের ন্যায় গ্রাম্য বিদ্যালয় (Hamlet

School) আছে। এই সমস্ত গ্রাম্য বিদ্যালয় থাকাতে দেশের অতি দূর-তর স্থানবাসীরা কিছু না কিছু শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণিত, ভূগোল, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ব্যতীত কিছু কিছু শিল্প-শিক্ষাও দেওয়া হয়। অবশ্য স্থান-কাল-পাত্রানুসারে এই শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে শিক্ষার্থীকে প্রত্যহই প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিতে হয়। তৃতীয় বৎসরে ৪০ ও চতুর্থ বৎসরে প্রত্যহ ১০০ শত মিনিট শিল্প কার্য্য করিতে হয়।

প্রথম বৎসরে শিক্ষার্থীকে মাঁদুর বোনা, ব্যাগ তৈয়ারী, পাখা নির্ম্মাণ প্রভৃতি শিখিতে হয়।

দ্বিতীয় বৎসরে শিক্ষার্থীকে বাগানের কার্য্য ও বয়ন-কৌশল শিক্ষা ছাড়া নারিকেলের আবরণ প্রস্তুত করণ, বেত্রের ফ্রেম নির্ম্মাণ, মৃণ্ময় পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতে হয়।

তৃতীয় বৎসরে শিক্ষার্থী বাগানের কার্য্য, বয়ন বিদ্যা, জানালা, দরজা মেরামত প্রভৃতি শিক্ষা করে এবং তাহাদিগকে টুপি, জুতা প্রভৃতি এমন সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিতে হয়; যাহাতে তাহাদের নির্ম্মিত পদার্থ সাধারণে আগ্রহের সহিত ক্রয় করে।

চতুর্থ বৎসরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়। এই চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এইরূপ ভাবে এ শ্রেণীতে বাগানের কার্য্য, তন্তুবয়ন, সূচিকার্য্য প্রভৃতি শিক্ষা করে, যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া শিক্ষার্থী মধ্য স্কুলে (Intermediate School) ভর্ত্তি হইতে পারে, অথবা ফিলিপাইন স্কুলে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা করিতে পারে; বস্তুতঃ এ সমস্ত শিক্ষার্থীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

এই মধ্য বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ, কম্পোজিসন্, পঠন, লিখন, গণিত ও চিত্রবিদ্যা ছাড়া নানা প্রকারের শিক্ষা দেওয়া হয়। যাহারা সাধারণ বিভাগীয় ছাত্র, তাহারা ভূগোল, ইতিহাস, সঙ্গীত প্রভৃতি শিক্ষা করে। যাহারা কৃষিবিভাগে অধ্যয়ন করে, তাহারা কৃষি সম্বন্ধীয়—যেমন বৃক্ষ রোপণ, জমির চাষ ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করে। যাহারা ব্যবসা বিভাগে অধ্যয়ন করে, তাহারা দোকান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করে। যাহারা গৃহ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান

বিভাগে (Domestic science) অধ্যয়ন করে, তাহারা রন্ধন, সূচের কার্য্য, বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি শিক্ষা করে, আর যাহারা চাকুরী বিভাগে অধ্যয়ন করে, তাহারা টাইপ রাইটিং (Type writing) বুক কিপির, ভূগোল, ইতিহাস এবং গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধীয় মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয় অধ্যয়ন করে।

উপরে শিক্ষা সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞাতব্য কথা বলা হইল। এখন এই শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা ফিলিপাইনবাসীদিগের কি উপকার সাধিত হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা যাউক।

এই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের লোকসংখ্যা সাত লক্ষ। এই ৭ লক্ষ লোকের এক ষষ্ঠাংশ লোক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। অবশ্য এই গণনা যে সম্পূর্ণ ঠিক্, এমন কথা বলা চলে না।

১৯১০—১৯১১ সাল পর্য্যন্ত এই দ্বীপে ৪১২১টী প্রাথমিক, ২৪৫টী মধ্য বিদ্যালয় এবং ৩৮টী কলেজের অধস্তন (Secondary) বিদ্যালয় ছিল।

ফিলিপাইন গবর্ণমেণ্ট ১৯১০—১৯১১ সাল পর্য্যন্ত প্রায় ১০, ৩৫০, ০০০ টাকা শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যয় করিয়াছেন।

আমেরিকা, ফিলিপাইন অধিকার করিয়াই অন্যূন ৭৫০ জন আমেরিকা-বাসীকে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনা করাইবার জন্য ফিলিপাইন দ্বীপ পুঞ্জে প্রেরণ করেন। এই সমস্ত শিক্ষকেরা ডিরেক্টর বাহাদুরের আদেশ মত প্রতি অবকাশের সময় একত্র সম্মিলিত হয়। ইহার ফলে আমেরিকা ও ফিলি-পাইনবাসী শিক্ষকদিগের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিতেছে। আমেরিকা হইতে বড় বড় অধ্যাপকেরা এই সমস্ত সম্মিলনীতে যোগদান ও বহু সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

১৯১১ সালে সিকাগো (Chicago) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জন পাল গুড্ এবং ডাক্তার ফ্রানিসস্, ডব্লিউ সেকার্ডসন্, বাণিজ্য, ভূগোল ও অর্থনীতি এবং আমেরিকার ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৯০৭ সালে শিক্ষকদিগকে শিক্ষা প্রণালী শিখাইবার নিমিত্ত ফিলিপাইনে নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যে সমস্ত শিক্ষক স্ব স্ব বিদ্যালয় পরি-ত্যাগ করিয়া এই নর্ম্মাল স্কুলে উপস্থিত হইতে না পারে, তাহাদিগকে পত্র দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয়াদি জানান হয়।

এই দ্বীপ হইতে ১৯০৭ সালে তিনলক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া ১৮৩ জন ছাত্রকে আমেরিকায় রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

ফিলিপাইন গবর্ণমেণ্ট এই উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক তত্রত্য শিক্ষা বিষয়ের উন্নতি সাধনে চেষ্টিত হইতেছেন। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এখন সর্ব্বসমেত ৮৪০৩ জন ফিলিপাইনবাসী শিক্ষক এবং ৬৮৩ জন আমেরিকাবাসী শিক্ষক।

উপরে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের শিক্ষাপদ্ধতির মোটামুটি আলোচনা করা গেল। পাঠক বুঝিতে পারিলেন ফিলিপাইনবাসীদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য আমেরিকার কত চেষ্টা—কত যত্ন।

আমরা কি আশা করিতে পারি না যে মাননীয় মিঃ গোখেলের প্রাথমিক শিক্ষাবিধি গবর্ণমেণ্ট এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অনুমোদন করিবেন? আমেরিকার নিকট হইতে ফিলিপাইন যে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেছে, আমরা কি আমাদের সুসভ্য প্রজাহিতৈষী ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট সে সহানুভূতি বা অনুগ্রহ পাইতে পারি না?

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

অসুদ।

অসুদ শিখেছি ভাল, কে নিবি গো আয়।
'নয়' পয়সা মূল্য ইহার, ফ্রি-মাশুলে যায়।
প্রেমের ব্যথা, প্রেমের দাগা, মুখখানি বিরস—
চোখভরা জল, কাজ-কর্ম্মে সদত অলস,
বুকের ভিতর বিড়াল পোষা ধড়ফড়ানি সদা,
নীরবেতে কাল কাটান, কথায় কথায় কাঁদা।
রোগের লক্ষণ দেখ্‌লে এরূপ ক'রো আবেদন,
ফেরৎ ডাকে পাঠিয়ে দিব করিয়া যতন।
অনুপানের রেখো যোগাড়, নামটী ব'লে রাখি;
দেশ ভেদে অনেক আছে,—আসল শতমুখী।

শ্রীনদেরচাঁদ ধর।

সতীঘাটা।

(১)

এইমাত্র এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে,—একখণ্ড লঘু মেঘ কোথা হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া তাহার সঞ্চিত সমস্ত জলটুকু দর্শনার প্রান্তরে ঢালিয়া দিয়া মুহূর্ত্তে বিদায় লইল। পশ্চিম আকাশ পরিষ্কার ছিল, তাই বৃষ্টির সময়ও অস্তগমনোন্মুখ লোহিত সূর্য্য-কর জলবিন্দুরাশির সহিত ক্রীড়া করিতেছিল, সে জলে-রৌদ্রে খেলা, মানিনীর নয়নে জল অধরে হাসির সহিত উপমেয়। তারপর বর্ষণার্দ্র ধরণীর উপরে হরিদ্রাভ তেজোহীন রৌদ্র পড়িয়া মাঠের তৃণরাশিকে শোভান্বিত করিতে লাগিল।

জল হইতে দেহ রক্ষাকল্পে দুইজন পথিক এক বটবৃক্ষ-কোটরে আশ্রয় লইয়াছিল,—এতক্ষণে তাহারা বাহির হইল।

একজন যুবক আর একজন প্রৌঢ়। যুবকটি ভদ্র বংশোদ্ভব, প্রৌঢ় ব্যক্তির মাথায় একটা মস্ত পুঁটুলী।

যুবক বাহির হইয়াই একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। তারপর বলিলেন—"উমেশ, আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, আর ভয় নাই।"

উমেশ মাথার মোটটা দুই হাত দিয়া মাথার উপরেই একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল,—"বাবু, মেঘে আর কি কর্‌তি পারে? ভিজ্‌লে মানুষ গলে না। তবে এ মাঠটা বড় ভাল নয়—সন্ধ্যার মধ্যে এ মাঠ ছাড়াতে না পারলে মঙ্গল নেই।"

যুবক একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"বেলা বড় অধিক নাই, বড় জোর দুই দণ্ড—সূর্য্য রাঙা হইয়া পাটে বসিবার উপক্রম করিতেছেন। এর মধ্যে কি এ মাঠ ছাড়ান যায়! মাঠটা নেহাত কম, সাত মাইল হইবে।"

উমেশ কিঞ্চিৎ বিরক্তিস্বরে বলিল,—"তাতেই তখন বোলেছিলাম, কা'ল সকালে বেরনো যাবে।"

যুবক সে কথার আর কোন উত্তর করিলেন না। কেবল 'চলত'—এই কথা বলিয়া হাটিতে আরম্ভ করিলেন। উমেশ হস্তধৃত উর্দ্ধোত্তোলিত মাথার বোঝা মাথায় নামাইয়া লইয়া যুবকের পশ্চাদনুসরণ করিল।

(২)

অনেক দিনের আগেকার কথা। তখন ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম রবি-রশ্মি বঙ্গভূমিতে কেবল পতিত হইতেছিল, কিন্তু তখনও দেশ সুশাসিত হয় নাই। তখনও গ্রামে গ্রামে চোর—মাঠে মাঠে ডাকাতের থানা। দেশের অধিকাংশ ভদ্রনামধারী কায়স্থ ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব নরাধমেরা চোর-ডাকাতের সহায়তা করিত; তাহাদের অপহৃত দ্রব্য নিজেদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া বিক্রীত মূল্যের অংশ গ্রহণ করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কোথাও বা তাহারা নিজেই দলবাঁধিয়া দস্যুবৃত্তি করিত।

আরও কিয়দ্দূর গমন করিয়া চলিতে চলিতে যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল, উমেশ; তুমি বলিতেছিলে, এ মাঠটা বড় ভাল নয়,—কেন? এ মাঠে কি দস্যুভয় আছে নাকি?"

উমেশ কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—"দাদা ঠাকুর, বাংলার কোন মাঠেই বা ডাকাতের ভয় নেই! তবে ফিরিঙ্গির পুলিসের ভয়ে এখন একটু লুকিয়ে কাজ হাসিল কর্ত্তে হয়। আমরা যোয়ান বয়সে যখন ওকাজ কোরেছি, তখন কি লুকোচুরি ছিল!"

যুবক। তুমিও কি ডাকাতি করিতে উমেশ?

উমেশ। কে না করিত? চাষার ছেলে, গায়ে জোর ছিল এক লাঠীতে চারি পাঁচজনের মাথা নিতে পাত্তাম—আমি আর ডাকাতি করি নি!

যুবক। আহা, যখন লাঠি মারিতে তখন তাহারা কি যন্ত্রণাতেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইত? তোমার দয়া হইত না?

উমেশ। তোমরা পাঁটার গলায় কোপ মার কেমন করিয়া? দয়া হয় না?

যুবক সে কথার উত্তর করিলেন না, নীরবে কি চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। তারপরে বলিলেন,—"হাঁ, এ মাঠে কি বড় ভয়?"

উমেশ। এ কোটালী-দর্শনার মাঠ। এর আশে পাশে অনেক পাঠানের বাস—অনেক কৈবর্ত্ত-গোয়ালার বাস—আর এখানে ভয় নাই? শোননি দাদাঠাকুর—

"কোটালী-দর্শনার মাঠে,
দুই ভাই দুই কোঁৎকা হাতে,
খাজনা না দিয়ে দাখিলা চায়,
দাখিলা না দিলে প্রাণ যায়।"

এক ব্রাহ্মণের এ দেশে কিছু জমি ছিল। সে খাজনার জন্যি এসেছিল, কিন্তু গ্রামে না যেতেই তাকে পাকড়াও কোরে দাখ্‌লে চায়। ব্রাহ্মণ নিরুপায় হ'য়ে ঐরূপ লিখে দিয়ে যায়। তারপরে ইংরেজের লোককে খবর দিয়ে ধরিয়ে দেয়। ঐ লেখাতেই ধরা পড়ে। ধোনা ও মোনা দুই ভাইয়ের ঐ জন্যে সাতবৎসর জেল হ'য়ে গেছে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই বহু বিস্তৃত প্রান্তর একেবারে ডুবিয়া পড়িল।

(৩)

সমস্ত প্রান্তরব্যাপী অন্ধকার—আকাশ নির্মেঘ, নিশ্চন্দ্র। একটা উজ্জ্বল সন্ধ্যার তারা কিয়ৎক্ষণ তাহার ক্ষীণ আলোক দিয়া ডুবিয়া গেল।

ততক্ষণে যুবক ও তাহার সঙ্গী অনেকদূর গিয়া পড়িয়াছিল,—কিন্তু নির্দ্দিষ্ট গ্রামে যাইতে অনেক বিলম্ব, এখনও সে চারি ক্রোশের কম নহে।

যুবক শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিলেন। বেলগাছি হইতে আহারাদি সমাধা করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। যখন বাহির হন, তখনই অনেকে নিষেধ করিয়াছিল। কেন না, সে সময় বাহির হইলে, হাসিলপুর পঁহুছিতে রাত্রি এগারটা ; কিন্তু পথে দস্যুভয়।

যুবকের শরীরে রক্তের তেজ। বিশেষতঃ বিদেশবাসী—মুর্শিদাবাদে একটা রেশমের কুঠীতে চাকুরী করিতেন। কতদিন পরে বাড়ী আসিয়াছেন, —কিন্তু সে সময় তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনী সুনীতি বাপের বাড়ী ছিল। কতকাল যে তাহাকে দেখেন নাই! তাই প্রিয়ামুখদর্শনেচ্ছু যুবক সময়-অসময় না বুঝিয়া ছুটিয়াছিলেন,—কিন্তু এতক্ষণে তাঁহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল।

যখন অন্ধকারে পথপার্শ্বের ক্ষুদ্র বৃক্ষগুলা বায়ুভরে দুলিয়া উঠিতেছিল, তখন যুবক চমকিয়া উঠিতেছিলেন যখন সাঁ করিয়া কোন নিশাচর পাখী মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, তখন যুবক চমকিয়া উঠিতেছিলেন। যখন পাশ কাটাইয়া শৃগাল বা খরগোস চলিয়া যাইতেছিল, তখন যুবক চমকিয়া উঠিতেছিলেন। উমেশ যুবকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হুচোট খাইতে খাইতে চলিয়াছিল—তাহার বয়স হইয়াছে, রাত্রে ভাল পথ দেখিতে পাইতেছিল না।

সহসা সাঁ করিয়া পার্শ্বের রাস্তা দিয়া দুইজন মানুষ আসিয়া তাহাদের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। একজন বলিল,—"তোমরা কোথায় যাবে?"

যুবক হঠাৎ মানুষের গলার স্বর শুনিয়া চমকিয়া দাঁড়াইতেছিলেন, উমেশ গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"চল বাবু, ওরা ভাল মানুষ; দেখিতে হইবে না। বোধ হয় হাটুরে হবে।"

তারপরে অবিচলিত কণ্ঠে বলিল,—"আমরা কোম্পানীর লোক। বাবু হাসিলপুর যাবেন, কাছে পিস্তল আছে, কাজেই ভয় নাই। তোমরা কোথায় যাবে ভাই?"

একটু গা টিপাটিপি করিয়া একজন বলিল,—"তুমি যথার্থ অনুমান করিয়াছ, আমরা হাটুরে। পদ্মবিলার হাটে গুড় বেচিতে গিয়াছিলাম। তা' আপনারা কোথায় যাবেন?"

উমেশ গম্ভীর স্বরে বলিল,—"কালা নাকি গো! এইত ব'ল্লাম হাসিলপুর।"

"সে যে অনেকদূর—পথে ভয়-টয়ও আছে" অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে এই কথা বলিয়া পশ্চাদাগত ব্যক্তি নিস্তব্ধ হইল।

উমেশ বলিল,—"আমরা ভয় করি না। কোম্পানীর লোক যদি ভয় করিবে, তবে নির্ভয়ে পথ বহিবে কারা? পিস্তলের এক এক গুলিতে দশ দশ শালার মাথা উড়ে যাবে!"

হাটুরে দুইজন পরস্পরের গা টিপিল। অন্ধকারে তাহারা তাহা দেখিল না। যুবক বলিলেন,—"না, সে ভয় আমাদের আদৌ নাই। তবে অন্ধকারে আমার লোকটি ভাল চলিতে পারিতেছে না—এই যা।"

সোৎসাহে একজন বলিল,—"তবে এক কাজ করুন না কেন! আপনি কি ব্রাহ্মণ?"

যুবক। হাঁ, আমি ব্রাহ্মণ,—কি কাজ?

হাটুরে। আর আধক্রোশ খানেক গিয়ে ডানদিকে আধপোয়া রাস্তা ভাঙ্গলেই হরিতডাঙ্গা—সেখানে চাড়ুযো মশায়েরা আছেন, তাঁরা খুব ভদ্রলোক—অতিথি গেলে ফেরে না। সেইখানে আ'জ থেকে, কা'ল সকালে উঠে হাসিলপুর যাবেন। ভদ্রলোক—অন্ধকার রাত্রি, নানা রকম কষ্ট হবে।

যুবক কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার ভাবেন, এই ঘোরান্ধকার-বিজড়িত রাত্রে আশ্রয় লওয়া মন্দ নয়! আবার তাঁহার পত্নীর সহাস্য সুন্দর মুখখানি মনে পড়ে—ভাবেন, পথের এই কষ্টটুকু সহিতে পারিলে কিন্তু আ'জ রাত্রেই তাহা দেখিতে পাইতাম! যুবক বিদেশে থাকেন, শ্বশুরবাড়ী দুই একবার গিয়াছেন মাত্র।

তারপর ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন,—"উমেশ কি বল?"

উমেশ বলিল,—"তাই ভাব্ছি। বামুন-কায়েতের বাড়ীও যে মাঠের চেয়ে ভয়শূন্য, তাও না।"

হাটুরে উত্তেজিতস্বরে বলিল,—"কি বল? তাঁরা দেবতার মত মানুষ। আমাদের মনিব—আমরা আর জানি না। টাকার কুমুর—ছোট-খাট জমিদার।"

উমেশ। ঐ খানেই ত ভয়ের গোড়া, তা' চল যাই—পথ যখন দেখতে পাচ্ছি না, তখন একটা যায়গায় আশ্রয় নিতে হবে, হুঁচোটে হুঁচোটে আঙ্-লের মাথাগুলো সব ছিঁড়ে রক্তময় হ'য়ে গেছে।

হাটুরে। নাগো, তোমরা চল,—কোন ভয়-টয় নেই, তাঁরা বড় ভাল-লোক।

(৪)

রাত্রি তখন প্রায় নয় ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন সুপ্তপল্লী মধ্যে তাহারা চারিজনে প্রবেশ করিল এবং অবিন্যস্ত বাঁশ আম কাঁটাল ভাইস আইসসেওড়ার বনরাজির মধ্য দিয়া আঁকা বাঁকা পথ বহিয়া একটা বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়া হাটুরে দ্বয় বলিল,—"ঐ আমাদের মণিব চাড়ুয্যে মশায়দের বাড়ী—আপনারা যান, খুব আদর ক'রে আশ্রয় দেবেন।"

বাহিরের ঘরে একটা কেরোসিনের ডিবায় একটা ক্ষীণ মৃদু আলোক জ্বলিয়া জ্বলিয়া কাঁপিতেছিল,—সেখানে মানুষ মাত্র ছিল না। একটা ঘাসের বোঝা সেই গৃহের বারেণ্ডায় পড়িয়াছিল এবং দুইটী নিরীহ ছাগ তাহা ভক্ষণ করিতে করিতে পার্শ্বে শুইয়া পড়িয়াছিল।

যুবক সেখানে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন,—"কে আছেন মশায়,"—

তাঁহাদের সাড়া পাইয়া ছাগ দুইটী চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপরে কোন অত্যাচারের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ আবার শুইয়া পড়িয়া রোমন্থন আরম্ভ করিল।

তারপরে একজন লোক বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথা থেকে আস্ছেন?"

যুবক। পথিক আমরা—হাটুরেদের মুখে শুনিলাম, এখানে আশ্রয় পাওয়া যায়।

যে আসিয়াছিল, সে তাঁহাদিগকে বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই এক ভৃত্য আসিয়া বলিল,—"আসুন।"

যুবক। কোথায়?

ভৃত্য। এ খানা রাখাল কৃষাণের ঘর—ভিতরের মহলায় আমার মণিবদের বসিবার ঘর—সেইখানে চলুন।

যুবক উঠিলেন,—উমেশও পুটুলীটা লইয়া তৎক্ষণাৎ তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। ভৃত্য আলো লইয়া পথ দেখাইয়া গেল।

আঁকিয়া বাঁকিয়া পথ গিয়াছে—সেই ঘরের পার্শ্বে কলাবাগান—ঝোপে ঝোপে কলাগাছ—কলা বাগানের মধ্য দিয়া পথ। কচারবেড়া—দুয়ার নাই, ডিঙ্গাইয়া যাইতে হয়। তারপরে একখানা খড়ের ঘর, সেই ঘরে বসিবার যায়গা—দুইখানা তক্তাপোষপাতা। সেখানেও একটা ক্ষীণ আলো জ্বলিতেছিল। গৃহখানা সম্পূর্ণ জনশূন্য। ভৃত্য যুবক ও উমেশকে বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

উমেশ যুবকের খুব গা ঘেঁসিয়া গিয়া বসিল। বলিল—"দাদাঠাকুর, ব্যাপার বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। এটা নিশ্চয়ই ডাকাতের বাড়ী।"

যুবক চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তা' বুঝলে কি করিয়া?"

উমেশ। ওগো, সাপে চেনে বেদের হাঁই। কোন ভদ্রলোকের বাহিরের ঘর থেকে ভিতরবাড়ী আসতে এমন পথহীন জঙ্গলে কলাবাগান থাকে?

যুবক। যদি তাই হয়,—তবে উপায়?

উপায়। উপায় যমের বাড়ী যাওয়া।

ঠিক এই সময় দুইজন দুর্দ্দান্ত লোক আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া যুবক ও উমেশের গলা চাপিয়া ধরিল। তাহাদের হাতে দা ছিল,—তদ্দ্বারা কণ্ঠে কোপ মারিল, এক দুই—তিন কোপে যুবক ও উমেশের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

আরও দুইজন লোক আসিল। উমেশের শবদেহ বহিয়া লইয়া গিয়া সেই বাড়ীর পশ্চিমপার্শ্ব-প্রবাহিত প্রকাণ্ড বিলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহাদের জ্ঞান হইল, যেন একটা মানুষ সেই অন্ধকারে সাঁ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। তাহারা অনেক সন্ধান

লইল. কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না, তথাপি নিঃসন্দেহ হইতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিল এবং সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

যেখানে যুবক ও উমেশ নিহত হইয়াছে, তাহারই একটু দূরে, চাড়ুয্যে মহাশয়দের বাস-ভবন। চাড়ুয্যে মহাশয় তখন আহার করিয়া বাহিরে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন।

লোক দুইটী গিয়া বলিল,—দুটো কাৎলা প'ড়েছে। একটাকে যখন জলসই ক'রে আর একটা নিতে আস্ছি, তখন যেন একটা লোক সাঁ ক'রে পাশ দিয়ে চ'লে গেল, কিন্তু সন্ধান করে কিছুই দেখ্তে পেলাম না। এখন বাকি কাৎলাটার কি করি?

চাড়ুয্যে। কোম্পানীর গোয়েন্দা বড় লেগেছে। খুব শীঘ্র এটা বাগানের গর্ত্তে ফেলগে—দাগটাগ যাতে ভাল যায়—সঙ্গের মাল যাতে গোলায় ওঠে—খুব শীঘ্র তার বন্দোবস্ত করগে। লোক দুটো কোথা হ'তে আস্ছিলো?

"আমরা যখন তাদের দেখা পাই, তখন জিজ্ঞাসা কোরেছিলাম,—বলেছিলো বেলগাছি তাদের বাড়ী। সঙ্গে পিস্তল আছে—তাই মাঠের মধ্যে কাজ সারতে পারিনি। একটু অন্যমনস্ক না হলে পারা যাবে না—কাজেই এখানে আন্তে হ'য়েছিল"—এই কথা বলিয়া তাহারা অতি দ্রুত কার্য্য করিতে চলিয়া গেল।

গৃহমধ্য হইতে এক সুন্দরী যুবতী চাড়ুয্যে মহাশয়ের পদতলে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।—"মেসোমশায়,—বুঝি আমার সর্ব্বনাশ করেছো—বেলগাছি আমার শ্বশুরবাড়ী—বুঝি আমার স্বামীকে হত্যা করেছ। তাঁর যে, আ'জ আমাদের বাড়ী যাবার কথা ছিল।"

বাস্তবিক তাই। মেসোর ছেলের অন্নপ্রাশনে সুনীতি আ'জ সাতদিন এ বাড়ীতে আসিয়াছিল। আগামী কল্য প্রভাতে সে বাপের বাড়ী যাইবে।

চাড়ুয্যে মহাশয়—"এঁ্যা এঁ্যা" করিয়া লাফ দিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিকক্ষণ সে ভাব পোষণ করিতে হইল না। একপাল চৌকিদার কনষ্টবল লইয়া একজন পুলিশ কর্ম্মচারী বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনিই মাঠের মধ্যে লোকজন লইয়া লুকাইয়াছিলেন—মাঠটা বাস্তবিকই দস্যুর দৌরাত্ম্যে পূর্ণ ছিল। তাঁহারই গোয়েন্দা অন্ধকারে দেখিতে পাইয়াছিল, দুইটা লোক বিলের মধ্যে কি ফেলিয়া দিয়া চাড়ুয্যেবাড়ী অভিমুখে

চলিয়া গেল। তারপরে চাড়ুয্যে বাড়ীর মধ্যে আসিয়া তিনি সদল-বলে প্রবেশ করিলেন।

সুনীতির কথা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। প্রথমে তাহার জ্ঞান সঞ্চার করিয়া লওয়া তিনি কর্ত্তব্য মনে করিয়া তাহাই করিলেন।

সুনীতির জ্ঞান হইল বটে, কিন্তু হাহারবে দিগন্ত মুখরিত করিতে লাগিল। দারোগা বলিলেন,—"আগে দেখ, যে হত হইয়াছে সে তোমার স্বামী কি না, কাঁদিবার ঢের সময় আছে।"

শ্মশানে লজ্জা থাকে না। সুনীতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—"ওগো, তাঁর যে আমাদের বাড়ী যাবার কথা ছিল।"

এই সময় আর একজন নিম্ন কর্ম্মচারী আসিয়া বলিল,—"আসুন, লাস পাওয়া গিয়েছে। একটা গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিয়া তক্তা চাপা দিতেছিল। আমরা উপরে তুলাইয়াছি।"

দারোগা সুনীতিকে সঙ্গে লইয়া শবদেহ-সমীপে গমন করিলেন। তাঁহার হস্তের তীব্র আলোকে শবদেহ দেখাইলেন। বলিলেন,—"দেখ দেখি,—এই কি সেই?"

সুনীতি চমকিয়া উঠিল। তারপরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল! * *

(৬)

পর দিবস প্রাতঃকালে সুনীতি সেই কুমুদ-কহ্লার শোভিত বিলের ধারে স্বামীর শবদেহ বুকে করিয়া সহমরণে দেহত্যাগ করিয়াছিল, তাহার মেসোর ও অপর চারিজন দস্যুর ফাঁসি হইয়াছিল।

সেই বংশকে লোকে এখনও "দাকোপা চাড়ুয্যে" বলিয়া অভিহিত করে। আর সেই ঘাটটি এখনও "সতীঘাটা" নামে অভিহিত হইয়া অতীতের একটি শোকাবহ ঘটনার ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া তুলে।

"ঐতিহাসিক ভ্রম।"

বাল্যকালে কণ্ঠস্থ বিদ্যার অনুগ্রহে এবং টেক্সটবুক কমিটীর নির্ব্বাচিত পুস্তকের অপার কৃপায়, জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যজাতি এ দেশের "খাটী" অধিবাসী নহেন। এ দেশ তাঁহাদের জন্মভূমি নয়; কর্ম্ম ভূমি বটে; অর্থাৎ মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়া তাঁহারা এ দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছেন মাত্র। তাহারও যুক্তিযুক্ত কারণ আবিষ্কৃত হইয়াছে; সুতরাং অবিশ্বাসের আর কোনও কারণ নাই।

কোন্ শাস্ত্রবলে, বা কোন্ ঐতিহাসিক নজীরের জোরে, "আর্য্যজাতি যে এ দেশের আদিম অধিবাসী ছিলেন না" বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। হায়! দেশের কি দুর্দ্দিন। নিজের গৃহ-সংবাদ পর্য্যন্তও অবগত নহি, আর কতকাল এইরূপ নিজের অপদার্থতা শুনিয়া কৃতার্থতা লাভ করিব? এমন কি আমরা কোন্ দেশের আদিম অধিবাসী; কোন্ দেশের আদিম জাতি, তাহা পর্য্যন্তও জানি না। আমাদের আদিম বাসস্থানটা ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা শীতল মস্তিষ্কের জোরে কল্পনা করিয়া না দিলে, আমাদের ততটা বিশ্বাস হয় না।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনুমান করেন "শূদ্রগণই এ দেশের আদিম অধিবাসী, কালক্রমে আর্য্যজাতি মধ্য এসিয়া হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তার করে। এই উপলক্ষে আর্য্য ও অনার্য্য-শোণিতে আর্য্যাবর্ত্ত প্লাবিত হয়, আরও আর্য্যজাতি সর্ব্বদা আহবে লিপ্ত থাকিত বলিয়া তাহাদের মধ্যে একদল বলশালী লোক যোদ্ধা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তি হইল। এইরূপে আর্য্যজাতি ক্রমশঃ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িল।"

এইরূপ কল্পনার বিমানে আরোহণ করিলে যে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়, তাহা ধ্রুব সত্য। এই কল্পনা যে ভ্রমাত্মক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ-বিরুদ্ধ, তাহা আর্য্যজাতির প্রত্যেক বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, জ্বলদক্ষরে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, অপিচ ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের এই কল্পনা-প্রসূত অনুমানের মূলে, কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ আর্য্যজাতিই যে বহুকাল হইতে এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, যথা অথর্ব্ববেদের চতুখণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্য ও শূদ্র সম্বন্ধে এইরূপ

লিখিত আছে যে,—"তয়াহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্যাঃ"। যদি বাস্তবিক আর্য্যজাতি স্থানান্তর হইতে আসিয়া এ দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেন, তবে প্রাচীনবেদ, বেদাঙ্গাদির কোন না কোন শাখায়, তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হইত। (১)

ইউরোপীয় মনস্বিগণ অনুমান করেন, ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী শূদ্র। এই কল্পনামূলে কিছু ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না, দেখা যাউক। "ভূরিতি বৈ প্রজাপতি ব্র্হ্ম অজনয়ৎ, ভুব ইতি ক্ষত্রিয়ং স্বরিতি বিশম্" (সামবেদ)। সুতরাং সামবেদের এই শ্লোকেও দেখা যায় যে, এখানেও শূদ্রের কোন উল্লেখ নাই। "ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যকঃ কৃতঃ, ঊরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়ত"। শূদ্রের সম্বন্ধে এইস্থানেও অজায়ত বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু ও বৈশ্য ঊরু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই প্রাচীন সামবেদেও শূদ্রের কোনও উল্লেখ নাই। যদি আর্য্যজাতির পূর্ব্বে শূদ্র থাকিত, তবে এখানে নিশ্চয়ই তাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হইত। এইরূপ প্রমাণ করা যায় যে, শূদ্র ভারতের আদিম অধিবাসী নহে। আর্য্যদিগের সহিত যাহারা সমরে পরাজিত হইয়া আচার-ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহারাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইত।

জগতে বিজিত জাতি যে বিজেতা জাতির নিকট সর্ব্বদা ঘৃণার পাত্র ও নিকৃষ্ট, তাহা রাজনীতির কুটীল নীতিই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। নতুবা জগদ্বিজয়ী মহাবীর নেপোলিয়ান কেন সেণ্টহেলনায় সামান্য কয়েদীর মত বন্দিদশায় কষ্ট ভোগ করিবেন? ফলতঃ আর্য্যজাতির সমরে যাহারা পরাজিত ও বেদবিধির নিয়ম-বহির্ভূত হইয়াছিল, (আসুর স্বভাব) তাহারাই অনার্য্য বা অসুর বলিয়া অভিহিত হইত। পুরাকালে যে, দেবাসুর-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও বোধ হয় এই আর্য্য ও অনার্য্যের শোণিত বিনিময়ের ফল।

ফলতঃ পুরাকালে অর্থাৎ বৈদিক যুগের সমীপবর্ত্তী কালে সকলেই "একবর্ণ" ছিলেন। পরে কার্য্যানুরোধে কর্ম্মবিভাগ হইয়া পড়ে, সুতরাং বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়া যায়। "একবর্ণাঃ পুরা সর্ব্বে" পুরাকালে অর্থাৎ বৈদিকযুগে সকলেই "একবর্ণ" ছিলেন। পরে গুণ ও কর্ম্ম-বিভাগ হেতু চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীভগবান গীতায়ও বলিয়াছেন, "কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতঃ" অর্থাৎ

(১) এই বিষয় মৎকৃত প্রাচীন আর্য্য সভ্যতায় সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি।

মানবের উৎপত্তিকালে বর্ণ, বর্ণভেদ (জাতিভেদ) ছিল না। কর্ম্ম দ্বারাই বর্ণ-বিভাগ হইয়াছে, এবং এই কর্ম্ম-বিভাগ হেতু সত্ত্ব, রজঃ তমঃ গুণানুসারে তাহাদের প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ" (গীতা) এখানেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, গুণকর্ম্মানুসারেই আমি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। যাঁহারা সত্ত্ব-প্রধান, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ; যাঁহারা রজোগুণ-প্রধান, তাঁহারাই ক্ষত্রিয় ইত্যাদি। এইরূপেই গুণাধিক্য বশতঃ জাতির উৎকর্ষাপকর্ষ নিরূপিত হইয়াছিল।

"ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

(গৌতমসংহিতা।)

এই শ্লোক দ্বারাও জানা যায় যে, "জাতি পূজ্য নহে। গুণই কল্যাণ কারক অর্থাৎ পূজ্য, চণ্ডালও যদি বৃত্তস্থ হয়, তবে তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিও।"

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও বলিয়া গিয়াছেন "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ"। বাস্তবিক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে এমন নহে। স্বীয় স্বীয় প্রকৃতির গুণানুসারেই (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) বর্ণতা প্রাপ্ত হইত।

অতি পূর্ব্বকালে যখন জাতি-বিভাগ ছিল না, তখন প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তাই সন্তানগণের প্রকৃতির গুণানুসারেই স্বীয় স্বীয় স্বাভাবিক কর্ম্মে নিয়োগ করিতেন। যাঁহারা সত্ত্ব-গুণ-প্রধান, তাঁহারা উপাসনা, যজন, যাজন ইত্যাদি কর্ম্মেই নিযুক্ত হইতেন। যাঁহারা রাজসিক, সুতরাং বাহুবলশালী—তাঁহারাই দেশরক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইতেন, এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, একই পরিবারের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইত, বোধ হয়, এই আখ্যায়িকাই কালক্রমে বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু সন্তানগণ প্রায়ই মাতা পিতারই গুণ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যাঁহারা পরিবারের মধ্যে সত্ত্ব-প্রধান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের সন্তান সন্ততিও সত্ত্ব-প্রধান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হইবে। এইরূপে গুণাধিক্যেই বোধ হয় সমাজের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়।

নতুবা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও কেন (সত্ত্বগুণাধিক্যে) ব্রাহ্মণ হইলেন, শুকদেব নারদের মত ভক্তও কেন রাজর্ষি জনকের উপদেশামৃত পান করিবার জন্য মত্ত থাকিতেন? এইরূপ আর কত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব, যাহা

আমরা না জানি, প্রাচীন ভারতের এমন কত মহামূল্য দ্রব্য হয়ত আজিও ইতিহাসের স্থূল যবনিকায় আবৃত রহিয়াছে। যাহা হউক অন্ততঃপক্ষে এই সকল ঘটনা বোধ হয় সকলেই জানেন। এই সকল ঘটনার দ্বারা ইহাই কি প্রতীতি হয় না যে, জাতি কখনও পূজ্য নহে; গুণই পূজ্য। সুতরাং দেখা যায় যে, পুরাকালে অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থায় এদেশে বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না।

কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কোন্ নজীরের বলে বলিয়া থাকেন যে, আর্য্যগণ এ দেশের অধিবাসী নহেন। শূদ্রগণই এ দেশের আদিম অধিবাসী। আমরা এতদূর পর্য্যন্তও যাহা প্রমাণ দিলাম, তাহাতে দেখা যায় যে, শূদ্রগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহে। আর্য্যদিগের মধ্যহইতে প্রকৃতিজ গুণানুসারেই অনার্য্য বা শূদ্রজাতির উদ্ভব হইয়াছে। (প্রকৃতপক্ষে আর্য্য-জাতিই ভারতের প্রাচীন অধিবাসী) শূদ্রগণ যে, এ দেশের প্রাচীন অধিবাসী নহে, তাহার আরও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এতৎ সম্বন্ধে মহাভারতেও দেখিতে পাওয়া যায়।—

"ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্ম্যমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
সর্ব্বভক্ষরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ সর্ব্বঃ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বে বর্ণভেদ ছিল না, প্রজাপতি হইতে সৃষ্ট এই জগৎ প্রথমে ব্রাহ্মণময় ছিল। পরে কর্ম্মানুসারেই বর্ণ বিভাগ হইয়াছে। (কিরূপে হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে একপ্রকার আলোচনা করিয়াছি)। "কাম-ভোগ-প্রিয় তীক্ষ্ণ, ক্রোধী, সাহসী দ্বিজগণই ক্ষত্রিয়—গোপালকও কৃষিজীবী পীতবর্ণ দ্বিজগণই বৈশ্য এবং মিথ্যাবাদী লোভী আচার-ভ্রষ্ট দ্বিজগণই শূদ্র, আরও

যাহারা অশুচি, আচার পরিভ্রষ্ট, ধর্ম্মত্যক্ত, বেদ-বিধিতে অনাসক্ত, তাহারাই শূদ্র বলিয়া অভিহিত।

আরও দেখিতে পাওয়া যায়,

"ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"

গৌতমসংহিতা।

পুনশ্চ—

"অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাং স্তান্ দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

গৌতমসংহিতা।

গুণ কর্ম্মানুসারেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ইত্যাদি চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বৈদিকযুগে সকলেই একবর্ণ ছিলেন। সুতরাং সেই সময় শূদ্রগণ কিরূপে এই ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী ছিল? তবে যে শূদ্র ভারতের আদিম অধিবাসী, ইহা জোর করিয়া কিরূপে বলিব?

আরও দৃষ্ট হয়,—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদভ্যাসাদ্ ভবেদ্ বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রাহ্মণঃ॥

স্কন্দ-পুরাণ।

ইহাতেও দেখা যায় যে, "জন্মদ্বারাই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। সংস্কার ক্রমতঃ বেদভ্যাস ও ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। এইরূপে যাহারা আচারভ্রষ্ট, নীচভাবাপন্ন, বেদ-ধর্ম্মবিবর্জ্জিত ও দ্বিজোচিত সৎকার-বিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাই আর্য্য শ্রেণী হইতে চ্যুত হইয়া, অনার্য্য বা শূদ্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইল; এইরূপ হওয়াও সম্ভব। যেহেতু সমাজের সকল লোকের প্রকৃতিজ গুণ সমান নহে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

"কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ"। এইরূপে ভারতে আর্য্য সমরে পরাজিত হইয়া ও আচারভ্রষ্ট এবং দেবদ্বিজের হিংসুক হইয়া, অনার্য্য বা শূদ্রজাতি গঠিত হইতে লাগিল। শূদ্র আর্য্যদিগের পূর্ব্বের লোক নহে। আর্য্য হইতে অনার্য্য বা শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব অনার্য্য জাতি যে

ভারতের আদিম অধিবাসী ছিল, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কোন্ প্রমাণের জোরে বলিতে চাহেন, বুঝিতে পারি না। কেবল "অনুমানেন বোদ্ধব্যং" বোধ হয় এই নীতির "দূরবীণ"—লইয়া দেখিয়াছেন।

অতএব আমরা যতদূর পর্য্যন্ত প্রমাণ দিলাম, তাহাতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইল যে, অনার্য্য জাতি এ দেশের প্রাচীন অধিবাসী নহে।

(২)

তবে অতি প্রাচীনকালে বৈদিক ঋষিগণ পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশে বাস করিতেন। তখন ইহার নাম "সপ্তসিন্ধু" বলিয়া তাঁহারা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। পরে সিকগণ এই সপ্ত সিন্ধুকে "হপ্তহিন্দু" নামে উচ্চারণ করিতেন। যেহেতু ইহাদের তদানীন্তন "জেন্দ" ভাষার উচ্চারণে সংস্কৃত দন্ত্য সকার হকাররূপে উচ্চারিত হইত। সেই অনুসারে পশ্চিম সীমান্ত-বাসিগণ আর্য্যজাতিকে "হিন্দু" বলিয়া অভিহিত করিত। এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম "হিন্দুধর্ম্ম" বলিয়া আজ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছে। এইজন্য পাশ্চাত্যগণ ভারতবর্ষকে আজিও "হিন্দুস্থান" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। এইরূপে আমরা জাতীয় ইতিহাসের বক্ষে একটা বিজাতীয় নাম পোষণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, আ'জ কা'লও অনেক ভারতবাসী আর্য্যধর্ম্মের পরিবর্ত্তে হিন্দুধর্ম্ম, ভারতবর্ষের পরিবর্ত্তে হিন্দুস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

ইতিহাস সমাজের এইরূপ গলদ আর কতকাল বহন করিবে জানি না। ফলতঃ আর্য্যধর্ম্মের পরিবর্ত্তে "হিন্দুধর্ম্ম" এই কথাটা আমাদের এত মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে যে, আমারা ভুলেও একবার হিন্দুধর্ম্ম উচ্চারণ না করিতে ভুলি না।

যাহা হউক এই পর্য্যন্ত যতদূর জানা গেল, তাহাতে প্রতীত হইল যে, বৈদিকযুগে আর্য্যজাতি সপ্তসিন্ধু প্রদেশে বাস করিতেন। তৎপর আর্য্যগণ ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে বসতি বিস্তার করিয়া—"ব্রহ্মর্ষি" প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন। তদনন্তর ক্রমে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও পরিশেষে আর্য্যাবর্ত্ত বা সমস্ত উত্তর ভারতে তাহাদের অধিকার বিস্তার হইয়া পড়ে। আর্য্যদিগের বাসস্থান সম্বন্ধে অমরসিংহ লিখিয়াছেন,—"আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্য-হিমাগয়োঃ" (অমর কোষ)। মহাত্মা মনু লিখিয়াছেন—"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বা-

দাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ। তয়োরেবান্তরং গির্য্যো রার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ”। “উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, পূর্ব্বে পূর্ব্ব-সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম-সমুদ্র” এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী স্থানে প্রথমতঃ আর্য্যগণ বাস করিতেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যে ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান মধ্যএসিয়ায় নিরূপণ করেন, তাহার বিশেষ কোনও কারণ না থাকিলেও যেই ভট্ট ম্যাক্সমূলার সাহেব অনুমান করিলেন, অমনি সকলেই সেই সুরেই তান ধরিলেন। কিন্তু অনুমানের স্থূল যবনিকার অন্তরালে অনেক সময় যে ঐতিহাসিক সত্য প্রচ্ছন্ন থাকে, ইহা কি কেহ দেখিয়াছেন? যাহা হউক ঘটনাটী এই। বশিষ্ঠ ঋষির অভিসম্পাতে নিমির অকাল মৃত্যু হয়। তাঁহার দেহ মন্থন করিয়া, মিথি নামক এক পুত্র উৎপাদন করা হয়। মন্থন করাতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার নাম মিথি, জন্মদাতার অবর্ত্তমানে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার নাম জনক এবং পিতার মুক্ত দেহ হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাঁহারই অপর নাম “বৈদেহ” ছিল। ঋক্‌বেদে ইনি বিদেহ মাধব বলিয়া পরিচিত। ঋক্‌বেদে এই বিদেহ মাধবের একটী উপাখ্যান আছে, সেই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ভট্ট ম্যাক্সমূলার সাহেব ও তাহার শিষ্য নব্যদল অনুমান করেন, “আর্য্যগণ মধ্যএসিয়া হইতে ভারতে আসিয়াছেন, আমরা সেই গল্পটী আগা গোড়া উঠাইয়া দিতেছি।

“বিদেহমাধব মুখে অগ্নিধারণ করিতেন, পুরোহিত সেই অগ্নি বহিষ্কৃত করিবার জন্য “সর্পি” এই শব্দ উচ্চারণ করেন। তাহাতেই সেই অগ্নি বিদেহ-মাধবের মুখ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া পূর্ব্বদিকে গমন করেন (১) পুরোহিতও সেই বিদেহমাধবের মুখনিঃসৃত অগ্নির পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া, “সদানীরা” নদীতীর পর্য্যন্ত আইসেন। পাঠক! দেখিবেন এই ঘটনাটী অয়োধ্যা হইতে পূর্ব্ব দিকের কথাই বলা হইয়াছে। ইহাতে যে আর্য্যগণ ইরাণ হইতে পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, এইরূপ বোধগম্য হয় না।

আবার কোন কোন ঐতিহাসিক-অনুমানের “মেকৃনিফাইং গ্লাস” লইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইরাণ হইতে এরিয়াণ; এরিয়াণ হইতে আর্য্য শব্দের উৎপত্তি, সুতরাং আর্য্যজাতি মধ্যএসিয়া হইতেই বহির্গত হইয়াছে। ম্যাক্স-মূলারের ভক্তগণই এইরূপ অনুমানের যথেষ্ট পোষকতা করিয়াছেন।

---

(১) ভৌগোলিক প্রমাণানুসারেও মধ্যএসিয়ার পূর্ব্বদিকে কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দ্বীপ। পরন্তু ভারতবর্ষ মধ্যএসিয়ার দক্ষিণভাগে। পাঠক! ইহা বিবেচনা করিবেন।

এইরূপ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার একটী দেশীয় রহস্যের কথা স্মরণ হইল, আশাকরি পাঠকগণ, আমার এই অন্যায় আবদার ক্ষমা করিবেন। "ঢেকি ও কাণমলা" এই উভয়েই "ক" কারের প্রয়োজন। সুতরাং "ঢেকি ও কাণমলা" উভয়ই সমান। ইরাণ হইতে আর্য্যশব্দের উৎপত্তি ও ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির বসতি বিস্তারের অনুমানও এইরূপ বলিয়া বোধ হয়। নতুবা আমাদের দুরদৃষ্ট, এমন সকল ইরাণ দেশীয় "লম্বা চোকা-চাপকানধারী" কাজি সাহেবের দল কেন আমাদের জ্ঞাতি হইতে চাহিবেন। অনেক পণ্ডিত আবার ভাষা সমীকরণ দ্বারা আর্য্যজাতির বাসস্থান একই স্থানে বলিয়া স্থিরীকৃত করিতে চাহেন। আমরাও তাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু আর্য্যজাতি যে পূর্ব্বকালে ভারত হইতে চতুর্দ্দিকে বহির্গত হইয়া যান নাই, এমন প্রমাণ কি কেহ দিতে পারেন?

ফলতঃ জগতের "সূতিকাগারই" এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ।

গ্রীক, লাটিন, এঙ্গোলা সেক্সান, ইংরেজী, রুষ, আইরিস, কর্ণিশ, ওয়েলস, লিথুয়েনিক প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় ভাষায় হল ও কৃষি বাচক কতকগুলি শব্দ আছে। তাহা "অর" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহাতে বোধ হয় আর্য্যেরা একত্র হইয়া কৃষিকার্য্য করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় অবিকল "অর" ধাতুর উল্লেখ নাই। "ঋ" ধাতু আছে বটে, তাহা হইতেই আর্য্যশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত অতি প্রাচীন ভাষা এবং ইহা স্বভাব-প্রদত্ত। এই কথা ভট্ট ম্যাক্সমূলার সাহেবও বলিয়া গিয়াছেন! সুতরাং আর্য্যগণ বোধ হয় পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষেই একত্র হইয়া বাস করিতেন। নতুবা যে সময় ভারত সভ্যতার উচ্চসীমায় পদার্পণ করিয়াছিল, যে সময় পৃথিবীর অন্যান্য জাতি আঁধার হইতে আলোতে আসিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় মধ্যএসিয়ার অধিবাসী কেন উলঙ্গ অবস্থায় আম-মাংসদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন? ফলতঃ যাহা হইতে জগতের সভ্য জাতির উৎপত্তি ও প্রতিভা বৃদ্ধি হইল, সেই দেশ কেন নিতান্ত আঁধারে পড়িয়া থাকিবে? ইহা কখনও কি সম্ভব? কিন্তু আমার বোধ হয় প্রাচীন আর্য্য জাতি মধ্যএসিয়া হইতে বাহির হয় নাই। ইহা বোধ হয় ঐতিহাসিকদিগের স্বকপোল-কল্পিত। বিশেষতঃ ভারতীয় আর্য্য জাতি যে আদিমকাল হইতে ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, ঐতিহাসিক সত্যের অনুরোধে বলিতে গেলে, ইহা নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি।

যাহাহউক অনন্ত বিস্তৃত নীল আকাশ-চন্দ্রাতপ তলে এসিয়া ভূভাগের শ্রেষ্ঠ হিমগিরির অভ্রংলিহ শিখরগুলিই জগতের আদিস্থল। এবং তাহাই আর্য্যজাতির প্রসূতি-গৃহ। হিমালয়ের এই সমস্ত শীতপ্রধান শিখরই জগতের প্রাচীনতম প্রসূতি-নিকেতন। ঋক্‌বেদেই তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সুতরাং এই ভারতবর্ষই আর্য্যদিগের আদি বাসগৃহ। এই পর্য্যন্ত আমরা যতদূর আলোচনা করিলাম, তাহাতে প্রতীত হইল যে (১) শূদ্র ভারতের আদিম অধিবাসী নহে (২) আর্য্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। (৩) আর্য্যগণই এদেশের আদিম অধিবাসী এবং তাঁহাদের ধর্ম্ম (হিন্দুধর্ম্ম নয়) আর্য্যধর্ম্ম। (৪) আর্য্যগণ ইরাণ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই।

আমরা শাস্ত্র না দেখিয়া এবং বিদেশীয় পণ্ডিতদিগের অনুমানের বাক্য-চ্ছটায় মুগ্ধ হইয়া স্বদেশপ্রিয়তা ও মনুষ্যত্ব হারাইয়াছি। কারণ আমাদের মাতৃভূমি কোথায়, তাহাও বিদেশে কল্পনা করি। সুতরাং এই দুর্ব্বল জাতির স্বদেশ-প্রিয়তা কিরূপে হইবে? আমাদের সকলই বিদেশীয়দিগের ক্রীড়া পুত্তলী। সুতরাং আমাদের এইরূপ দুরবস্থা হইবে না ত তবে আর কাহার হইবে? (১) যাহাহউক প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আলোচনা করা, আর অন্ধকারে "ঢিল" নিক্ষেপ করা উভয়ই সমান। তবে আলোচনার দ্বারা যে সত্যের পথ পরিস্কার হয়, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রীবিপিনবিহারী সরকার।

---

(১) এই প্রবন্ধটী মৎকৃত "প্রাচীন আর্য্য সভ্যতা" নামক পুস্তক বিশেষের কোন অংশের ছায়াবলম্বনে লিখিত।

ত্রিধারা।

মান।

রাধা' 'রাধা' বলি', মোহন মুরলী,
বাজিল কুঞ্জের পাশে ;
পূরব অচলে, উষা কুতুহলে,
হাসিল কনক বাসে।
সে বাঁশরী স্বরে অনুরাগ ভরে,
কাঁপিল যমুনা-জল,
উষার উদয়ে, উঠিল হৃদয়ে,
সুমধুর কল কল।
ময়ূর ময়ূরী, ভ্রমরা ভ্রমরী,
জেগে হ'ল দিশাহারা ;
যারে পথে পায়, ধ'রে চুমো খায়,
নাচে গো পাগলপারা।
প্রেমে শুক শারী মাতোয়ারা ভারি,
গায় 'রাধা-শ্যাম' নাম ;
আবেগে আকুল, ফুটে যায় ফুল,
উরসে বসিল কাম।
নীলিম আকাশে, চমকি' উল্লাসে,
হাসিল তারকাচয় ;
চাঁদ পানে চেয়ে, চাঁদে চুমো খেয়ে,
মিশিল আকাশময়।
"কোথা প্রাণ হরি ?" বলি সহচরী,
চমকিল গো সকল ;
ঝরিল গোপনে, কিশোরী নয়নে,
দুই ফোঁটা অশ্রুজল !

থেকে থেকে থেকে,'রাধানাম' ডেকে,
বাঁকা করি' বাঁশী ধরি' ;
সে কুঞ্জ কুটিরে, পশি ধীরে ধীরে,
দাঁড়াইল বাঁকা হরি।
রসের মূরতি, সেই বৃন্দাদূতী,
হেরি' সে সুন্দর ঠামে ;
হাসি হাসি বলে,—'যাও শ্যাম ! চলে,
কি কাজ রাধার নামে ?
"ওহে চিত চোরা ! গোপনারী মোরা,
নাহি জানি কলা-ছল ;
"পদে প্রাণ মন, সঁপিনু যেমন,
ফলেছে তাহার ফল।
"তোমার পিরীতে, তোমার চরিতে,
মজিয়ে ঢালিয়ে প্রাণ,
"করে ঢলাঢলি, দিনু জলাঞ্জলি,
কুল-শীল-লাজ-মান !
"বাঁশীস্বর তুলি', শুধু 'রাধা' বুলি,
মুখে কত ভাল বাসা,
"যথা প্রিয়জন, করহে গমন,
ছি ছি—মিছে হেথা আসা !
"ঘাটে মাঠে বাটে, প্রেম নাটে ঠাটে,
কর কত রঙ্গ ভঙ্গ ;
"দেখে ব্রজ-বালা, ওহে শঠ কালা !
ধর তার তুমি সঙ্গ।

কুলবালাকুল, সদাই আকুল,
কুল রাখিবার তরে;
"হরিয়ে দুকূল, মজা'লে গোকুল,
মরি সরমের ডরে।
"হে চিকণ কালা' কলঙ্কের মালা,
পরাইয়ে দিলে গলে;
"ব্রজকুল-কালি, কভু বনমালি,
যা'বে না যমুনা-জলে?
"হেথা কিবা কাজ, যাও নটরাজ,
প্রাণের প্রেয়সী পাশে;
"করিবে যতন, দিবে প্রাণ মন,
যে তোমারে ভালবাসে।
"খুলে নে বিশাখা, ওই শীখি-পাখা,
নে লো কুলনাশী বাঁশী,
"নে লো পীতধড়া, কেড়ে নে লো চূড়া,
বনমালা প্রেম-ফাঁসি।
"কেড়ে নে নূপুর, মজাতে চতুর,
মুছে দে লো রসকলি;
"মেখে চূনকালি, যাও বনমালি,
ভাবিতেছে চন্দ্রাবলী।
"বঙ্কিম হইয়ে, মধুর হাসিয়ে,
দিও না হে আর ধাঁধা;
"চাহে না তোমায়, ওহে শ্যাম রায়,
শ্যাম-তেয়াগিনী রাধা"

মুচকিয়ে হাসি, সে রাধা-বিলাসী,
শুনিল চতুরা বাণী;
দূতী-গঞ্জনায়, সরমের দায়,
অপরাধ নিল মানি।
নয়নে রাধার, বহে শত ধার,
মুখ-শশী বিমলিন;
শ্রীরাধার পায়, ধরি ক্ষমা চায়,
সেই রাধা-প্রেমাধীন।
চতুরা সে দূতী, করিতে দুর্গতি,
বলিল গরব করি,'—
"বৃথায় শ্রীহরি, পায়ে ধরাধরি,
যাও কুঞ্জ পরিহরি।
"কাঁদায়ে রাধায়, পড়িবারে পায়,
বড়ই নিপুণ বট;
"চিনেছে তোমায়, ব্রজ সমুদায়,
নিপট কঠিন নট!
"ভেঙ্গেছে পরাণ, টুটিবে না মান,
বৃথা এত সাধাসাধি;
"ছিঁড়েছে বাঁধন, হে কালবরণ,
ওহে ঘোর অপরাধি!
"তথাপি কানাই! কুলবালা রাই,
তোমা পানে ফিরে চায়।
"যদি রীতিমত, দিয়ে 'দাসখত',
বাঁধা থাক রাধা-পায়।"

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।

উজ্জ্বলে মধুরে।

বয়সের দোষেই হউক, আর যে কারণেই হউক, থিয়েটার দেখাটা মোটেই ভাল লাগে না। বিশেষতঃ রাত্রি-জাগরণের যন্ত্রণা একেবারেই অসহ্য বলিয়া জ্ঞান করি। কিন্তু উজ্জ্বলে মধুরের লেখক সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি মহাশয় কৃপা করিয়া তাঁহার বইয়ের অভিনয়টা দেখিবার জন্য বলিতেন। ঐ রাত্রি-জাগরণের ভয়ে কয়েক দিন পাশ কাটাইলাম। কিন্তু এক দিন ঠিক সন্ধ্যার সময় কৃপা করিয়া বাগ্‌চি মহাশয় আমার বাসায় আগমন পূর্ব্বক বলিলেন,--"আ'জ যাইতেই হইবে, আ'জ আগে উজ্জ্বলে মধুরে অভিনয় হইয়া দশটায় শেষ হইবে।" তাঁহার কথা শেষ না হইতেই দেখি, শিশু পুত্র দুইটি জামা-কাপড় পরিয়া পার্শ্বে আসিয়া হাজির—অজুহাত থিয়েটার দেখিতে যাওয়া। তখন তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে গমন করিলাম।

আমাদিগকে রঙ্গমঞ্চের প্রবেশদ্বারে দাঁড় করাইয়া শ্রীযুক্ত বাগ্‌চি মহাশয় কোথায় গমন করিলেন,—কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই অভিনয় আরম্ভ হইল। গার্ড মহাশয়েরা আসিয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া বলিলেন—কৈ আপনাদের টীকেট? টীকেট নাই। তখন কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল স্বরে তাঁহারা আদেশ করিলেন—"হয় ঢুকুন, নয় অনুগ্রহ করিয়া বাহিরে যান,—আমরা প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ করিব।" দশ বৎসরের বড় পুত্রটি বিরক্ত হইয়া বলিল—"টীকেট আনান না কেন?" আমি বাগ্‌চি মহাশয়ের আশায় সেস্থানের টীকেটের মত টাকা সঙ্গে আনি নাই—কাজেই ত্রিশঙ্কুর স্বর্গারোহণের মত 'ন যযৌ ন তস্থৌ' হইয়া পড়িলাম। ঠিক সেই সময়ে ঐ থিয়েটারের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী বাবু অবিনাশ-চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় তথায় কি কাজে আগমন করিলেন। তাঁহাকে ঐ কথা বলিতেই তিনি ভারি ব্যস্ত হইয়া একবার ষ্টেজের মধ্যে, একবার টীকেট ঘরে বাগ্‌চি মহাশয়কে খুঁজিয়া আসিলেন, কিন্তু সন্ধান পাইলেন না। তারপরে ব্যবস্থা করিয়া আমাদিগকে বসাইয়া দিলেন। তাঁহার সহিত যে তেমন অধিক আলাপ ছিল, তাও না। তবে এত মধুর ব্যবহার করিলেন কেন?—মিনার্ভার সকলেরই বুঝি এইরূপ উজ্জ্বলে মধুরে স্বভাব! সেই সময় বাগ্‌চি মহাশয়ও আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—তিনি খোকাদের জন্যে কি আনিবার বন্দোবস্ত করিতে গিয়াছিলেন।

তারপরে অভিনয়ের কথা। সে কথা, ছাপান কেন? আমরা মনে করি, থিয়েটারের অভিনয় ও অভিনীত পুস্তকগুলির সমীচীন সমালোচনা মাসিক কাগজ মাত্রেই হওয়া কর্ত্তব্য—উহা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের সমুন্নত ক্ষেত্র।

যাঁহারা নৈতিক জীবনের ভগ্ন পতাকা-তলে দাঁড়াইয়া বলিয়া থাকেন,—'থিয়েটারে যে লোকশিক্ষা হয়, তাহা অপকর্ষ-শিক্ষা—কামের সন্ধুক্ষণ মাত্র', তাঁহাদের মতের সহিত আমাদের মতের বড় অধিক মিল নাই। কীর্ত্তনওয়ালীরা চিরকাল কীর্ত্তন গাহিয়া হরিনাম প্রচার করিয়াছে বৈষ্ণবীরা এখনও দ্বারে দ্বারে, এমন কি গৃহস্থদের বাড়ীতে বাড়ীতে নাম গাহিয়া ফিরে—তাহাতে কোথাও কামের আগুন ছড়ায় না। তবে ইহাতে যে একেবারেই ভয় নাই, তা নয়। সব কাজেরই দুঃপীঠ আছে। কিন্তু একথা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, সাহিত্যকে সম্পুষ্ট করিতে রঙ্গভূমি যেমন সমর্থ, এমন আর কিছু নহে। গিরিশ ঘোষের 'চৈতন্যলীলা'—বেশ্যার মুখের হরিনামে একদিন বঙ্গ-ভূমি টলিয়াছিল—বুঝি ভগবানের আসনও না কাঁপিয়া থাকে নাই।

যাউক, বাজে কথায় আর কাজ নাই। উজ্জ্বলে মধুরের অভিনয় আরম্ভ হইল। আগাগোড়া দেখিয়া শুনিয়া সে দিন মনে হইয়াছিল,—"কি দেখিনু আহা আহা, আর কি দেখিব তাহা"—কারণ, ধারণা ও কল্পনার অতীত, অপূর্ব্ব দৃশ্যপটসকল, সুমনোহর বহুমূল্য ও সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক সাজ-সজ্জা, অভিনেতা-অভিনেত্রীগণের কৃতিত্ব, আর গ্রন্থকারের স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যমাখা কবিত্ব শক্তির প্রকাশে রঙ্গভূমিকে যেন এক অপূর্ব্ব ভাব-গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমার বোধ হয়, আমারই মত প্রত্যেক দর্শককেই থিয়েটার দেখিয়া স্বপ্ন-মদিরা-মত্ততা প্রাণে লইয়া ফিরিতে হইয়াছিল।

গ্রন্থকারের কৃতিত্ব অসীম। রূপকে রসের রূপ বানাইয়া বড় বাহাদুরী লইয়াছেন। ব্যাপারটা কি শুনুন—

আমাদের মত ত আর দেবতাদের আট টাকা মণের চাউলের ভাবনা ভাবিতে হয় না—লোকের নৈবেদ্য খাইয়াই দিন যায়। তাই হঠাৎ একদিন চন্দ্রলোকে বসিয়া চন্দ্রের সখ হইল, কর্ম্মভূমি মর্ত্ত্যভূমিতে মানব-মানবী কেমন ভাবে প্রেম করে—কেমন করিয়া মজে, মরে, ধড় ফড় করে—দেখিতে হইবে। যাঁহাতক ইচ্ছা, অমনি প্রিয়তমা রোহিণী দেবীকে বলা। তিনি একে চান, আরে পান। তখন চন্দ্র ও রোহিণী যাহারা সহজে নরনারীর মনে প্রেম জাগাইয়া থাকে, তাহাদিগকে ডাকাইলেন।

এই স্থানে গ্রন্থকারের বেশ একটু কল্পনার কৌশল বুঝিতে পারা যায়। আবহমান কাল হইতে প্রেম উৎপাদন, বর্দ্ধন ও প্রেমে কাতর করা মদন ও রতিরই কার্য্য ছিল। কিন্তু চন্দ্র ও রোহিণী সে ব্যবস্থা করিলেন না। তাঁহারা ডাকিলেন সখ ও শোভাকে। চন্দ্র ও রোহিণী ত আর কেষ্ঠ-বিষ্ণু নন— স্বর্গের রাজাও নন, সাধারণ দেবতা। মদন ও রতি তাঁহাদের 'কথা শুনিয়া কাজ করিতে ছুটিবেন কেন?

সখ ও শোভা সে কাজে নিতান্ত অপারগও নয়। লোকে সখ করিয়াই প্রেম করে—শোভা দেখিয়াই মজিয়া যায়। তবে দার্শনিক বলিতে পারেন— জন্মান্তরবাদী বা পৌরাণিক বলিতে পারেন—প্রেম কি সখ করিয়া হয়? উহা জন্ম-জন্মান্তরের যুগ্ম-আত্মার আকর্ষণ। পিতামহ ব্রহ্মা আত্মাকে প্রথমে নর ও নারীরূপে দুই খণ্ডে বিভক্ত করেন,—সেই টানই প্রেমের আকর্ষণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আত্মার দ্বিভাগ (Dichatomy) মত পোষণ করেন। তা করুন,—মদন ও রতি যখন সেই ঘটনা ঘটাইয়া থাকেন, তখন সখ ও শোভা তা'তে চন্দ্রের বলে নিতান্ত অপারগ হইবেন কেন, এবং সখ করিয়া যে হঠাৎ প্রেম হয়, তাহা সর্ব্বত্রই যে কলুষিত কামনা-প্রসূত এমন বলা যায় না। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আদি রূপক কাব্য এই শ্রেণীয়।

তখন সখ, শোভা ও জ্যোৎস্নাবালাগণ মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিলেন,—সখ ও শোভাতে মিলিয়া একটা প্রেমের কানন প্রস্তুত করিলেন। কাননের অপূর্ব্ব শোভা—সখ ও শোভা যত পারুন না পারুন, মিনার্ভার পাণ্ডেঠাকুর অজস্র রজত-খণ্ডের বিনিময়ে কৃত্রিম বনভূমি যেন সৌন্দর্য্যের হীরকচূর্ণে সজ্জিত করিয়াছেন।

এখন, একদেশে মদন ও মোহন নামে দুই বন্ধু ছিল, উভয়েই কিশোর বয়স্ক। মদন রাজপুত্র, মোহন তাহার সখা। রাজার বয়স্য যেমন চিরকাল একটু চাপা—একটু কুটিল, অথচ স্পষ্টবাদী; মোহনও তাই। মদন দেশে কাহার প্রেমে পড়িয়া হতাশ-প্রেমের ব্যর্থ বেদনা পাইতেছিলেন, তাই সেই ব্যাধি নিরাকরণের জন্য দুই বন্ধুতে বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সখ ও শোভার প্রেম-কাননে আসিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। মোহনও যে প্রেমের আগুণ বুকে পোষে নাই, তা' নয়। তবে রাজার ছেলের প্রেমে যেমন হাহাকার আছে, মূর্চ্ছা আছে, কোমল কিশলয়ের ব্যজনী আছে, শীতল চন্দনের প্রলেপ আছে—সহচরের সে সকল কোথায়? সে সরল বৃক্ষের কোটরগত আগুণ, ভিতর হইতে দগ্ধ করিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রন্থখানি রূপক-রসে মজকুল। সুতরাং সর্ব্বত্র তর্কের কাটারি চালাইতে পারা যাইবে না। খুব লিকলিকে, খুব ধারাল ল্যানসেট চাই। বুঝিতে হইবে—কোন দেশান্তর নয়—কোন ধাঁধাঁ নয়, কোন মায়া নয়—প্রেমেরই স্বপ্ন-কল্পিত আলোক-তলে কিশোর-কিশোরীর দুই প্রকার অঙ্কিত চিত্র—প্রেমিক-প্রেমিকার দুই প্রকার ভাবের চিত্র।

যাউক, সেই কানন-মধ্যে প্রবেশ করিয়া মদন যখন কাননের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহার শোভা বর্ণনা করিল, তখন মোহন খোলা প্রাণে বলিয়া ফেলিল—

"সখা, আমিত তখনই তোমাকে ব'লেছিলুম—জ্বর তাড়াবার যেমন অব্যর্থ ঔষধ কুইনাইন, পিরীত তাড়াবার তেমনি অমোঘ ঔষধ দেশভ্রমণ। আমাদের হাবাতের দেশে কি এমন সুন্দর কানন পাওয়া যায়? আহা! এখানে এসে প্রাণটা যেন জুড়ুলো। এই গাছতলায় একটু বসি। (উপবেশন করিয়া) এখানকার সবই বেশ মিঠে মিঠে রকম দেখ্‌ছি, এখন মেয়েমানুষের হ্যাঙ্গামা-ফ্যাসাদ না থাকলেই বাঁচি। তা এ বনে কোন্ অবলা সরলা কুল-বালার চরা করতে সখ হবে?"

প্রেমের মায়া-কাননে প্রবেশ করা জীবের সহজ। জ্ঞানতঃ হউক, অজ্ঞানতঃ হউক, অল্প হউক অধিক হউক, এ আকর্ষণ জীবমাত্রেরই আছে। কারণ, যোড়া যোড়া হইয়া জীব বাহিরে আসিয়াছে, মিলিয়া ফিরিয়া যাইবে। যতদিন সে পূর্ণ মিলন না হইতেছে, ততদিন সে আকর্ষণের হাত হইতে নিস্তার নাই। ভারতের ঋষি হইতে কবিগণ পর্য্যন্ত এ মহা তত্ত্ব অবগত আছেন। বৈদিক-গাথায় কবি গাথায় এ তত্ত্ব সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছে। উজ্জ্বলে মধুরের কবিও তাই এ মায়া-কানন সাজাইয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এর আকর্ষণে জীবমাত্রকেই ছুটিয়া আসিতে হইবে, আর আসিলে যোঁড়া না বাঁধিয়া যাইবার উপায় নাই। 'অন্ন-চিন্তা চমৎকার' বাঙ্গালী আমরা —আমাদের উপর সখ ও শোভার পূর্ণ অধিকার না থাকিলেও কিছু যে নাই, তা' বলা যায় না। ফুল্ল-জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী, কুসুমগন্ধামোদিত ধীর সমীর, বিহগ-কূজন-মুখরিত কুঞ্জকানন—এ শোভার মধ্যে একটা আব্‌ছাওয়া ভাব প্রাণের মাঝে জাগে বৈ কি! আর জাগে—সেই প্রাণের অতি গোপন-পুরে লুক্কায়িত সহজ-ধ্যানের মুখখানি। মদন-মোহনের তাই জাগিয়াছিল, —তাই পাছে কোন রমণীর হাঙ্গামে পড়ে, সে ভাবনা একটু একটু হইতে-ছিল। ঝড় উঠিবার আগে প্রকৃতি বড় নিস্তব্ধ হয়,—বুঝি সম্পদ বা বিপদের

একটা আগমন বার্ত্তা প্রাণে আগেই আসে। দূর হইতে তাই তাহারা আব্‌ছাওয়া-আব্‌ছাওয়া রমণী দেখিল,—দূর হইতে প্রাণের কানে প্রেমের স্নিগ্ধ স্বপ্ন-বার্ত্তা পঁহুছিল। ষ্টেজ যুড়িয়া একপাল জ্যোৎস্না-বালার আবির্ভাব হইল। তাহারা বসনে ভূষণে হাবে ভাবে উজ্জ্বল করিয়া—সে স্বপ্ন-গাথা শুনাইয়া কোরাসে কের্দ্দানী করিয়া গেল

"আয় লো আজ মনের সুখে খেলি লো ধরায়।
মধুর হেসে যাই লো ভেসে মলয়া হাওয়ায়॥
কুসুম-কলি মগ্ন মনে, ঘুমায় হেথা প্রেম-স্বপনে
চম্‌কে উঠে যাবে ফুটে, আয় লো পড়ি গায়—
ডাকি চল্ পাখীর তানে, কইগে তার কানে কানে,
কেঁদে মরে সে যার তরে, লুকিয়ে সে কোথায়॥"

মদন রাজপুত্র, সখ ও শোভার অনুশীলনে হৃদয়-বৃত্তির বহর খুবই বাড়াইয়াছিলেন,—তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া উঠিলেন। সখা মোহনও নেহাৎ কম নন,—তবে তিনি ঘা'ল খাইয়া সাবধানের দিকে যাইতেছিলেন। বৃত্তি-টার নিরোধ করিবার জন্যে অভ্যাসযোগে মন দিয়াছিলেন। কাজেই রাজপুত্র মুখ ফুটিয়া প্রেমের বর্ণনা ও প্রেমের হা-হুতাশ আরম্ভ করিলেন। মোহন চমকিয়া পেত্নী তাড়াইবার ঔষধ আবিষ্কারে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সাফ বলিলেন,—"দেখ্‌লে না যখন গান হচ্ছিল, তখন আব্‌ছা আব্‌ছা কতকগুলো ধব্‌ধবে চেহারা আমাদের ধরি ধরি কচ্ছিল। বিন্ধ্যেশ্বরী—আমরি! শেষটা পেত্নীর পাল্লায় প'ড়ে মারা যাব! চল, পালাই চল।"

মদন। হোক্ পেত্নী। তোমার সখ থাকে, তুমি এই রাত্তিরে বাইরে গিয়ে বাঘ ভাল্লুকের পেটে যাও—ইত্যাদি। এমন মনোহর পেত্নীতে পায়, সে বহুত আচ্ছা।

মোহন সখার জন্যে বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িল। নিজের জন্যে কিছু চিন্তা যে তার হয় নাই, তাও না। কারণ, তাহার প্রাণভরা কষ্টের কথা সে তাহার বন্ধুর নিকটে বলিয়া ফেলিল। বলিল, পিরীত-জিনিষটা বড়ই দুর্দ্দান্ত—আমি ভাই, ওতে একান্তই নারাজ।

"কোন্ শালা আর হবে পিরীত খোর।
এক টানে কাৎ চৌঘুড়ীমাৎ, এমনি চিজের জোর॥
সে মনের ঘরে আপনি সিঁদ দিয়ে,
মন-প্রাণ আমার সব নিয়ে—

উড়ে এসে যুড়ে ব'সে, আমায় বানায় চোর।
কোন্ শালা আর যৌতাতে তাতে,
বিশ হাত মেপে থাকবো তফাতে,
এম্নি মজা, মিলি নেশায় সদাই নেশায় ভোর॥
পিরীত প্রথম কুতূহলে,
পরে, নাকের জলে চোখের জলে—
শেষে কোন্ ফিকিরে ফকির ক'রে, পরায় কপ্নী-ডোর॥"

সত্যের খাতিরে এই স্থানে বলিতে হয়, যিনি মোহনের ভূমিকা লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি এতক্ষণ যেমন স্বাভাবিক ও সুন্দর ভাবে অভিনয় করিয়া আসর জম্কাইয়া তুলিয়াছিলেন, গানের বেলায় তেমন পারেন নাই। অতিরিক্ত পরিহাস-রসের অবতারণা করিবার অভিপ্রায়ে অতিরিক্ত মাত্রায় হাত-পা নাড়িয়া, অতিরিক্ত মুখভঙ্গী করিয়া—স্বাভাবিকতা বিনষ্ট করিয়াছিলেন,—বুঝি তাঁর গলার স্বরটাও তেমন মিঠা নয়, তাই গানের কথাগুলা যেন ফুরাইলেই তিনি বাঁচেন—এমনই তাড়াতাড়ি করিয়া গাহিয়াছিলেন।

তারপরে যাতে তাঁর বন্ধুকে পেত্নীতে না পায়, আর তাঁর উপরেও কোন পেত্নীর কু-নজর না পড়ে, এমন একটা অসুদের সন্ধানে মোহন চলিয়া গেলেন। অসুদ তাঁর জানাই ছিল, শুধু খুঁজিয়া তুলিয়া আনা। মদন সেই স্থানেই রহিয়া গেলেন।

বারান্তরে প্রকাশ্য।

দেবীগড়।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পরাভূত।

বিষণ্ণ বদনে, আকুল প্রাণে কমলা সেই মেঝ্যের উপরে বসিয়া পড়িল। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই গোলোকনাথের ছিন্ন মুণ্ড আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইবে। হায়! তখন সে কি করিবে? সে দৃশ্য দেখিয়া কি করিয়া সে প্রাণ ধারণ করিবে?

সহসা বাহিরে ভীষণ কোলাহল উত্থিত হইল,—বোধহয় সহস্র সহস্র লোকের চীৎকারে সে বন-ভূমি নিনাদিত হইতে লাগিল। কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্রচিত্তে কমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জানেলার নিকটে গেল। কিন্তু কোথাও কিছু দেখিতে পাইল না। অল্পক্ষণ পরেই কাঁপিতে কাঁপিতে সিংহ কমলার গৃহে প্রবেশ করিল।

কমলা তাহার মুখের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইল। ত্রাস-কম্পিত ম্লান মুখে সিংহ বলিল.—"আমায় রক্ষা কর। সত্যই কি কমলা, তোমাতে কোন অলৌকিক শক্তি আছে? কমলা,—কমলা,—রক্ষা কর, রক্ষা কর,—ঐ দেখ, ঐ দেখ,—কি ভীষণ বজ্রাগ্নি আমাকে দহন করিতে উদ্যত হইতেছে।"

কমলা কিছুই দেখিতে পাইল না, বুঝিতে পারিল না। এই সময় হাসিতে হাসিতে মিনিয়া আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। মিনিয়াকে দেখিয়া কমলা এত বিপদের মধ্যেও বড় হর্ষোৎফুল্ল হইল। এবং মনে মনে বুঝিতে পারিল,—"মিনিয়া দ্বারা কৃত কোন অজ্ঞাত কৌশলে সিংহ ভীত হইয়াছে।"

মিনিয়া কমলার পাদস্পর্শ করতঃ পদরজ গ্রহণ করিয়া মস্তকে দিল। তারপরে বলিল,—"বড় ভাল সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম,—আর একটু না আসিতে পারিলে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া যাইত। বিদেশী যুবককে নিহত করিতে আর মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইত না। দেবী, আপনি যদি আদেশ করেন—এখনই আমি এই কুকুরকে নিহত করিতে পারি।"

কমলা। সখি, তোমার কথায় আশ্বস্ত হইলাম। যুবক এখন কি করিতেছেন?

মিনিয়া। তিনি সুস্থ-দেহেই আছেন।

কমলা। এ বিপদের সময়ে তুমি কোথা হইতে আসিলে মিনিয়া?

মিনিয়া। আমি কা'ল ফিরিয়া আসিয়াছি।—আসিয়া রাজার নিকটে আপনার বিশেষ সংবাদ কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। মনে দারুণ সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইল। ব্যাকুল অন্তরে গোপন-সন্ধান আরম্ভ করিলাম। সেই সন্ধানের ফলে অবগত হইতে পারিলাম, আপনি এক বিদেশী যুবকের সহিত নদী পার হইয়া আপনার পিতামাতার আশ্রমের দিকে আসিয়াছেন—আর রাজার আদেশে বর্ব্বর ও নিষ্ঠুর সিংহ আপনাদিগকে ধৃত করিতে আপনাদের অনুসরণ করিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া বড়ই বিচলিত হইলাম। আর কাল বিলম্ব না করিয়া এখানে ছুটিলাম। আপনার পিতা বা মাতাকে দেখিতেছি না কেন,—দেবী?

কমলা বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে কহিল—"তাঁহারা নাই।"

বিস্মিত হইয়া মিনিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"নাই কি দেবী?"

তখন সকল ঘটনা বিবৃত করিয়া কমলা অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে সিংহকে দেখাইয়া দিয়া বলিল,—"ঐ পাষণ্ড—ঐ দুর্ব্বৃত্ত, আমার পূজনীয়—স্নেহ-মায়াময় পিতা ও মাতাকে অতি নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত করিয়াছে।"

মিনিয়া একবার বক্র-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপরে বলিল,—"এখনও আপনি উহার প্রতি করুণা করিতেছেন! অনুমতি করুন,—আমি এখনই উহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলি।"

কমলা। মিনিয়া—মিনিয়া,—আমি বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারকের মেয়ে,—আমায় হিংস্রকের প্রতিও প্রতিহিংসা লইতে নাই। কিন্তু একটু আগে এত লোকের কোলাহল শুনিতে পাইয়াছিলাম,—সে সকল লোক কোথা হইতে আসিল। সে সকল কি তোমার সঙ্গী?

মিনিয়া। না দেবী,—তাহারা মানুষ নয়। আমি যে দেশে গিয়াছিলাম, সে দেশের যিনি প্রধান পুরোহিত,—তিনি আপনাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া যাইতে অনুমতি করিয়াছেন এবং ঐ আত্মাগুলিকে সঙ্গে দিয়াছেন। পথে উহারা আমাদিগকে রক্ষা করিবে—অর্থাৎ সৈন্যের কাজ করিবে।

কমলা। আমি তোমার কথার একবর্ণও বুঝিতে পারিলাম না।

মিনিয়া। উহারা স্থূল-দেহী নহে।

কমলা। তবে?

মিনিয়া। সূক্ষ্ম-দেহী।

কমলা। তথাপি প্রহেলিকা।

মিনিয়া। হাঁ, আমাদের দেশের যিনি প্রধান পুরোহিত হইবেন, তাঁহাকে এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইতে হয়।

কমলা। কোন্ বিদ্যায়?

মিনিয়া। ভৌতিক বিদ্যায়।

কমলা। সে কথা পরে শুনিব মিনিয়া,—এখন উহা বুঝিতে পারিব না। নানা কারণে আমার মন বড় চঞ্চল হইয়াছে,—মাথা আদৌ ঠিক নাই। তুমি কি বলিতে পার, গোলোকনাথ কেমন আছে?

মিনিয়া। কে গোলোকনাথ দেবী?

কমলা। এই নিষ্ঠুর যাহাকে হত্যা করিতে গিয়াছিল?

মিনিয়া। না, তাহাকে হত্যা করিতে পারে নাই—আমি সেই মুহূর্ত্তে আসিয়া পঁহুছিতে না পারিলে তাঁহার প্রাণ থাকিত না। এক্ষণে তিনি সুস্থ শরীরেই আছেন,—তিনি কে দেবী? আপনার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ কি?

নতবদনে নম্রস্বরে কমলা বলিল,—"আমি তাঁহাকে ভালবাসি।"

মিনিয়া উৎফুল্ল-আননে বলিল,—"আমি তাঁহাকে এখনই এখানে আনিতেছি।"

তারপরে সে চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই গোলোকনাথকে সঙ্গে লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

সিংহ ততক্ষণ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহাদের কথোপকথন শুনিতেছিল। আর ভাবিতেছিল,—এ সকল কি কথা শুনিতে পাই! বাস্তবিক কি মিনিয়ার সহিত মুক্তাত্মা বা সূক্ষ্মদেহী ভূতযোনি সকল অবস্থান করিতেছে! এ সকল এদেশীয় অসভ্য মানবে বিশ্বাস করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত বাঙ্গালার মানুষ আমরা—আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে যাইব কেন? তন্মুহূর্ত্তেই মনে হইল, বিশ্বাস করিব না—কিন্তু প্রত্যক্ষ করিলাম যে! আমি যখন গোলোকনাথকে হত্যা করিবার জন্য হুকুম দিলাম—সৈন্যটা যখন বর্ষা উত্তোলন করিল, তখন মিনিয়া ছুটিয়া আসিয়া নিষেধ করিল। আমি হাসিয়া উঠিলাম—অবজ্ঞা করিলাম,—সৈন্যটাকে আরও ঝটিতি কার্য্য-সমাধা করিতে অনুমতি করিলাম। তখন আমারই সম্মুখে

মিনিয়া করযোড় করিয়া ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া আপন মনে কি বলিল,—আর সহস্র মানবের মিলিত স্বর-কোলাহলে সমস্ত বন-ভূমি আলোড়িত হইয়া উঠিল। দশ খানা ভীষণ মুখ আমার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। কতকগুলি মৃত মানবের দীর্ঘ বাহু আমাকে জড়াইয়া ধরিতে আসিল,—আমি ভয়ে পলাইয়া এখানে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইলাম! না আসিলে মরিতে হইত! এ সকল কি? এ বিশ্বের রহস্য কি কিছুই বুঝিয়া উঠা যায় না?

যাক্, গোলোকনাথ এখন এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহাকে ধ্বংস করিতে পারিলাম না। পরন্তু উভয়ে এখন প্রেমালাপে সময় অতিবাহিত করিবে—আর আমি হতভাগ্য এখানে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিব! না,—তাহা কখনই হইবে না। মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। কিন্তু উহাদের কিছুই করিতে পারিব না,—মিনিয়ার একটু অঙ্গুলীচালনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে;—এমন করিয়া না মরিয়া জীবিত থাকিলে সময়ে—অপর কৌশলে ঐ হতভাগ্য কুকুরকে নিহত করিতে পারা যাইবে।

তখন সে শুষ্ক-মুখে নম্রস্বরে অথচ দাম্ভিকতার স্পষ্ট-উত্তেজিত ভাবে বলিল,—"এখন আমি কি করিব কমলা?"

কমলা মিনিয়ার মুখের দিকে চাহিল। মিনিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"দেবীর অসীম দয়া, তাই তোমার মত পশুকে বারে বারে ক্ষমা করিতেছেন। কিন্তু তুমি সে দয়া বুঝিতে না পারিয়া পুনঃ পুনঃ উঁহার অনিষ্ট করিতেছ—এবারও তোমাকে দেবী ক্ষমা করিলেন। যাও হতভাগ্য,—আর কখনও দেবী বা দেবীর লোকজনের উপরে হিংসা করিও না। এবার অপরাধী হইলে, আর ক্ষমা পাইবে না। ক্ষমারও সীমা আছে।"

অপ্রসন্ন মুখে একবার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া সিংহ সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

সেই দিন মধ্যাহ্ন-ভোজনাদি সমাপ্তির পরে গোলোকনাথ, কমলা ও মিনিয়া একত্রে একটা গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছিল।

কথায় কথায় কমলা গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"চল না কেন এই অবকাশে আমরা স্বদেশের পথে চলিয়া যাই!"

গোলোকনাথ কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। মিনিয়া গম্ভীর মুখে বলিল,—"আপনি কোথায় যাইবেন দেবি? আপনার অদৃষ্ট আমি ভাল করিয়া জানিয়া আসিয়াছি, এদেশ হইতে আপনার আর যাওয়া হইবে না। আপনার

গড়—আপনার সিংহাসন—আপনার রত্ন-ভাণ্ডার বহুদিন হইতে আপনার প্রতীক্ষায় আছে।”

উদাস-নয়নের উজ্জ্বল চাহনীতে একবার গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া কমলা ব্যস্তভাবে ও ঔৎসুক্যের সহিত মিনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—“তুমি কাহার নিকটে আমার অদৃষ্ট জানিতে পারিয়াছ সখি?”

মিনিয়া যেন জড়সড় হইয়া গেল। বলিল,—“দেবি, দয়া করিয়া আপনি আমাকে সখী বলিয়া সম্বোধন করেন, ইহাতে আমি লজ্জিতা হই। আমাদের সহিত আপনার বহুজন্মের সম্বন্ধ,—যখন আপনি এখানে রাজত্ব করিতেন, তখনও আমি ছিলাম,—আমি আপনার প্রধান পরিচারিকাই ছিলাম। আবার আপনি আসিয়াছেন, আমিও আসিয়াছি। আমাদের সব বিষয় গড়ের প্রধান পুরোহিতের নিকট বেশ করিয়া জানিয়া আসিয়াছি। আপনি শীঘ্রই গড়ে যাইবেন বলিয়া, তাহারাও প্রস্তুত হইতেছে।”

কমলা। গড় কোথায়?

মিনিয়া। আমি যেখানে গিয়াছিলাম।

কমলা। সেখানকার প্রধান পুরোহিত আমার অদৃষ্ট কি করিয়া গণিলেন?

মিনিয়া। দেবি, আপনি অন্তর্য্যামিনী,—সবই জানেন। তবে ছলনা করিয়া দাসীকে কেন বিড়ম্বিতা করেন? গড়ের শাস্ত্র-গ্রন্থে আপনার সকল কথাই লেখা আছে। আপনি জ্ঞানান্বেষণে গিয়াছিলেন,—নবধর্ম্মের নূতন জ্ঞানালোক আনিয়া এদেশের লোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই আপনার সেবারকার দেহত্যাগ। কত দিন—সে নাকি হাজার বৎসরেরও আগেকার কথা। তারপরে এই ফিরিয়াছেন। অতএব আপনি আর কোথায় যাইবেন! এখন আপনার স্বস্থানে পঁহুছিয়া স্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করুন। আপনার আর সে বঙ্গদেশে যাওয়া হইবে না।

কমলা গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিল। গোলোকনাথ নয়নেঙ্গিতে কমলাকে চাপিয়া যাইতে বলিলেন। কেননা, এই অসভ্যদিগের ভ্রান্তির বিরুদ্ধে বিশেষ কিছু বলিয়া কাজ নাই;—যে যেমন বুঝে, তেমনই বুঝিয়া চলুক।

তারপরে কমলা জিজ্ঞাসা করিল,—“রাজা তোমাকে যে জন্য পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কি জানিয়া আসিয়াছ? প্রধান পুরোহিত সে সম্বন্ধে কিছু বলিয়া দিয়াছেন কি?”

মিনিয়া। না বিশেষ কিছু বলেন নাই। এইমাত্র বলিলেন, দেবী যখন সেখানে স্বয়ং উপস্থিত আছেন, তখন রাজার ভয় কি? যাহা করিতে হয়, তিনি নিজে করিবেন।

কমলা। রাজার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?

মিনিয়া। হাঁ,—আমিও রাজাকে ঐ কথা বলিয়াছি।

কমলা। রাজা কি বলিলেন?

মিনিয়া। কিছু বলেন নাই,—কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইলেন মাত্র।

কমলা গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"শুনিতেছি মুসলমান সৈন্য আসিয়া লুনীর তীরে ছাউনি করিয়াছে। বোধ হয় তাহারা শীঘ্রই পার হইবে। সে সম্বন্ধেই বা আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

গোলোকনাথ গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"ভবিতব্যতা যা করে। পুরুষকার দেখিতেছি—একেবারেই দুর্ব্বল।"

ক্রমশঃ—

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

কলি গীতা।

কলি কহিলেন,—দূতপ্রবর! ইতঃপূর্ব্বে আমি শ্রুত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম যে এখনকার বঙ্গমহিলারা রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিতে সমধিক যন্ত্রণা জ্ঞান করেন। উননের ধূঁয়ায় তাঁহাদের কৃষ্ণ-তার নয়নের জ্যোতিঃ বিনষ্ট হয়, ফোড়নের গন্ধে তিলফুলসদৃশ নাসিকায় এসেন্স-গন্ধ গ্রহণের শক্তি হ্রাস হয়, উত্তপ্ত অন্ন ব্যঞ্জনের স্পর্শে কোমল করের জ্যোৎস্না-মর্দ্দনের যোগ্যশক্তির হ্রাস হয়—ইত্যাদি ইত্যাদি। এই হেতুতে বঙ্গীয় গৃহস্থগণ প্রায়শই পাচক ব্রাহ্মণ রাখিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করাইয়া ভোজন করিয়া থাকেন। যেদিন কোন কারণে ব্রাহ্মণের উপস্থিতির অভাব হয়, সে দিন 'ভাতের আড্ডায়' গিয়া সপরিবারে ভোজন করিয়া থাকেন। মনে হইয়াছিল, ইহাতে সত্বরেই জাতিভেদরূপ শক্তিশেল আমার বক্ষঃ হইতে

নামিয়া যাইবে। কেন না, এত পাচক ব্রাহ্মণ কোথায় পাওয়া যাইবে? কাজেই ক্রমে ক্রমে তখন প্রজাগণ যে সে জাতিকে পাচকরূপে নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইবে। কিন্তু হায়! এত দীর্ঘ দিবসের মধ্যেও আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। সকলের বাড়ীতেই পাচক ব্রাহ্মণে পাক করিতেছে!

আনন্দোৎফুল্ল আননে দূত কহিল,—মহারাজ! আশ্বস্ত হউন। আপনার ইচ্ছা কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। কার্য্য অতি সুন্দর ভাবেই সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

কলি কহিলেন,—না না দূত! যদিও 'ভাতের আড্ডা বা হোটেলে' ছত্রিশবর্ণে এক সঙ্গে অন্নাহার করিয়া মৎপ্রচারিত ধর্ম্ম পালন করিতেছে, তথাপিও তাহা আশানুরূপ নহে। যে দিবস সংবাদ দিতে পারিবে যে, ব্রাহ্মণের বাড়ীতে মুচি-মুর্দ্দোফরাসে রন্ধন করিতেছে, মুচি-মুর্দ্দোফরাসের পাক করা অন্নে ব্রাহ্মণের বাড়ীর নারায়ণ-শিলার ভোগ-রাগ হইতেছে এবং মুচি-মুর্দ্দোফরাসের হাতে পূর্ব্বপুরুষগণের স্থাপিত, আরাধিত ও পূজিত নারায়ণ-শিলাদির পূজাভার অর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ দাসত্ব করিতে ছুটিতেছে, সেই দিন আমি তোমাকে আমার কণ্ঠের এই হীরক-হার পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিব।

অধিকতর আনন্দভরে আরও কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে দূত কহিল—সর্ব্বধর্ম্ম-বিলোপকারী অপ্রতিহতক্ষমতাশালী মহারাজাধিরাজের সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এবং এ দাস সেরূপ অনেক সংবাদ অবগত আছে। দাস এখনই সে সংবাদ প্রদান করিবে। অবগতান্তে চিরাধীনকে পুরস্কার প্রদানে সম্মানিত করিতে আজ্ঞা হউক।

কলি কহিলেন,—যদি ঐ প্রকার সংবাদ প্রদান করিতে পার, এখনই আমার কণ্ঠের হীরক-হার তোমার কণ্ঠে প্রদান করিয়া তোমাকে উচ্চ-সম্মানে সম্মানিত করিব। সত্বর সংবাদ বল?

দূত কহিতে লাগিল—প্রভু! সেই অতিশয় গুহ্য সংবাদ অবগত হইয়া দাসের উপরে কৃপা বিতরণ করুন। বরিশাল জেলায় সেবার একটা ডাকাতি হয়, দস্যুদলের মধ্যে শিবু নামে একজন মুচী-জাতীয় বিখ্যাত লোক ছিল। সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত ছিল। পূর্ব্বে সে আর একবার দস্যুতা অপরাধে ধৃত ও কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। সেবারকার অপরাধে তাহার সঙ্গিগণ ধৃত ও

কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। সে পলায়ন করিয়াছিল, সুতরাং তাহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইল,—পুরস্কার ঘোষিত হইল। কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহার কোন সংবাদই মিলিল না।

একদিন চব্বিশ পরগণার কোন এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বরিশাল জেলা হইতে তদীয় গুরুদেব আগমন করেন, তিনি শিবুকে দেখিয়া এবং শিবুর আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমকিয়া উঠেন। শিবু গোপনে তাঁহাকে অনেক-গুলি টাকা দিয়া তাঁহার মুখবন্ধ করে ও আপন ক্রমোন্নতির কাহিনী ব্যক্ত করে। মহারাজ দাস তাহা অবগত হইয়াছে—অবধান করুন।

শিবু সেই ব্রাহ্মণের সাক্ষাতে যাহা বলিয়াছিল, তাহা অবিকল এইরূপ—

যখন শুনিলাম, সঙ্গিগণ ধৃত হইয়াছে, তখন আমি পলাইয়া কলিকাতা গমন করিলাম। সেখানে গিয়া সর্ব্বপ্রকারে আত্মগোপন করিবার জন্য 'ভিখু কানু' নাম গ্রহণ করতঃ পশ্চিম দেশীয় এক ভাজাওয়ালার দোকানে চা'ল-কড়াই ভাজার কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বে সে কাজ জানিতাম না, ক্রমে ক্রমে বেশ শিখিয়া লইলাম। তারপরে নিজে একখানা দোকান করিলাম—তখন বাঙ্গালী হইলাম। 'নিবারণ দাস' নাম গ্রহণ করিয়া মুড়ী-মুড়কী বেগুনী ও মালপো প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে লাগিলাম।

ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণের বাবুরাই আমার প্রস্তুত দ্রব্যগুলি ক্রয় করিয়া অবাধে ভোজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাজে লাভ করিতে না পারিয়া দোকান তুলিয়া দিয়া এক মিঠাইকর ব্রাহ্মণের দোকানে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে সেখানে ময়দা ঠাসিতাম, জল তুলিতাম, খরিদদারগণের বাড়ীতে বাড়ীতে মোণ্ডা-মিঠাই বহিয়া দিয়া আসিতাম। তারপরে লুচির 'নেচি' কাটিতাম, জিলাপীর ময়দা ফেটিতাম, উননের নিকট হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের টুক্‌রী বহিয়া দোকানে দিয়া আসিতাম। ক্রমে আমি লুচি-কচুরি ভাজিতে শিখিলাম—পটল আলু ভাজিতে লাগিলাম, তরকারি রাঁধিতে লাগিলাম। তারপরে মিহিদানা জিলাপী প্রভৃতি ভাল ভাল জিনিষের পাকে দক্ষ হইয়া উঠিলাম। একদিন দোকানদারের কয়েক বাড়ীতে বায়না হইল,—অনেক-গুলি ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ কাজেই আমার গলায় পৈতা দিয়া সর্ব্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় নামকরণ করিয়া এক বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন—যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, বলিও—বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। নাম সর্ব্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়, নৈকষ্য কুলীন, কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।

বাস্,—সেই হইতে ব্রাহ্মণ হইয়া গেলাম। আর গলার পৈতা ফেলিলাম না। তারপরে ঘটনাক্রমে সে দোকানের কাজ গেল,—হঠাৎ কোথাও কাজ যুটাইতে পারিলাম না, তখন পূজার সময়। এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে এক মেসে গিয়া অস্থায়ী পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া কিছু দিন কার্য্য করিলাম। তারপরে সেই মেস্ হইতে এই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে আনিয়াছেন। এখানে ঠাকুরপূজা করি, ভাত রাঁধি, আর ছেলে কোলে করিয়া বেড়াই—বৌদিদিরা আমার উপরে ঐ সকল কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে নভেল পড়েন। পূর্ব্ব স্বভাব দোষে এখনও এক এক দিন মনে হয়, কোন নিশীথে বৌদিদিদের বাক্সগুলা ভাঙিয়া অলঙ্কার ও সঞ্চিত অর্থগুলি গ্রহণ করতঃ চম্পট দেই। আবার মনে হয়, আহার বিহার প্রভৃতি কোন কাজেরই অভাব এখানে নাই,—তবে আর কোথায় যাইব ?

হে যুগপ্রধান! হে মহারাজ! দাস যাহা অবগত হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিল। এক্ষণে বুঝিয়া দেখুন, বঙ্গীয় হিন্দুগণের মধ্যে কি প্রকার পাচক ব্রাহ্মণ প্রচলিত হইয়াছে। উড়িষ্যা হইতে পাল্কী বহিতে উড়িয়া আসিয়া, পশ্চিম দেশ হইতে মেথরের কাজ করিতে মেড়ুয়া আসিয়া আর দেশ হইতে চুরি-ডাকাতি করিয়া বাগ্দী ডোম প্রভৃতি জাতি কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তারপরে ডারুইনের ক্রমবিবর্ত্তনবাদানুসারে পাচক ব্রাহ্মণরূপে বঙ্গের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতির গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছে—শালগ্রামের ভোগ রাঁধিতেছে, শালগ্রামশিলার পূজা করিতেছে,—অতএব সেজন্য কোন চিন্তা নাই।

কলি হর্ষোৎফুল্ল নয়নে দূতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তোমার মুখে আজি এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এই ধর হীরক-হার গ্রহণ কর।

অবসর

মেসার্স কে, ভি, সেন এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক 'ভাই ভাই'
নামক পুস্তকের প্রকাশার্থ মূলচিত্র হইতে অঙ্কিত

K. V. Seyne & Bros.

ডাইভোর্স

এক জন ভাল উকীল চাই,—একটা ডাইভোর্সের মোকদ্দমা রুজু করিয়া দিতে হইবে। সে আমাকে বড় জ্বালাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আর কত সহ্য করিব? এক দিন নয়—দু'দিন নয়—এক বৎসর নয়, দু'বৎসর নয়—মনে হয় না সে কত দিন!

যখন তাহাকে দেখি নাই—আলাপ ছিল না, পরিচয় ছিল না, নাম-গন্ধ কিছুই জানিতাম না, তখন হইতেই তাহার জ্বালাতন! কৈশোর-যৌবনের সন্ধি-ক্ষণে যখন আমাদের পুকুর-পাড়ে শ্যামল তৃণরাশির উপরে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিতাম,—তখন সে-ই যেন ধীরে ধীরে চাঁদের কিরণ বহিয়া নামিয়া আসিয়া প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া, তেমন যে তখনকার সতেজ প্রাণ, তাহাকেও বড় ছিন্ন ভিন্ন—এলো-মেলো করিয়া দিত। যখন ফুটন্ত মল্লিকার মধুর গন্ধে দিগন্ত আমোদিত করিত, তখন সে-ই যেন পরিমল রূপে বায়ু-পথে আসিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিত। যদি কোন দিন সাঁতার কাটিতে যাইতাম, সে-ই যেন শীতল জলরূপে বুকের তলে পড়িয়া আছাড় খাইত! কিন্তু বুঝিতাম না, কেমন সে,—কোথায় সে? মেঘদূত, শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী পড়িতাম,—তাহাদের বর্ণনীয়া সুন্দরীগুলি যেন সে হইয়া চক্ষুর সম্মুখে ঘুরিত! কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া খুঁজিয়া পাইতাম না—কে সে, কোথায় সে!

তারপরে কত রূপ দেখিলাম,—কত এক মাণিক সাতরাজার ধনের ব্যাখ্যা শুনিয়া সন্দর্শন করিলাম,—কিন্তু ঠিক তেমন দেখিলাম না। কোথাও হয়ত তেমনই চোখের মত দুটী চক্ষুর স্থির-ভাস্বর চাহনি, কোথাও বা চিবুকের কল্পনাতীত সৌন্দর্য্য, কোথাও বা গণ্ডের ভাব—কোথাও হাতের মত হাত, কোথাও বা বুকের মত বুক, কোমরের মত কোমর,—পায়ের মত পা;—কিন্তু ষোল আনা মিলিত না।

তুমি হাসিতেছ কেন? ভাবিতেছ বুঝি, আমি একটা অদ্ভুত অনির্ব্বচনীয় রূপ-কল্পনা করিয়া বসিয়াছিলাম; তেমন জগতে নাই,—আমার অদৃষ্টেও তা' মিলিল না। না গো, তা' নয়; তোমার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখ,—হয়ত তোমারও একজন তেমন প্রাণের মধ্যে বসিয়া আছে। প্রাণের কথা

খুলিয়া বলিলেই লোকে পাগল বলে। তা' পাগল বল, বলিয়ো। কিন্তু মোকদ্দামাটা রুজু করিয়া দাও। বড় জ্বালাতন হইতেছি।

হঠাৎ এক দিন জগতের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সমস্ত কেন্দ্রীভূত করিয়া সে আমায় দেখা দিল। কিন্তু বড় অসময়ে। তখন আমার জীবন-গাঙে ভাঁটা ডাকিয়াছে। যদি সময়ে দেখা পাইতাম, তবে বুঝি এত অত্যাচার করিতে সাহস করিত না।

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত শর্ম্মার প্রণয়িনী বহুল গাভী ও দধি-দুগ্ধের অধিকারিণী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী গোয়ালিনী শর্ম্মাকে দুগ্ধ দানে সুখী করিয়াছিলেন,—দুটা' কথার সন্তাড়নে যদিও মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ বিরক্তির কারণ হইতেন,—তথাপি শর্ম্মা মহাশয় পেটে খাইয়া পিঠে সহ্য করিতেন। আর আমি কিসের জন্য সহ্য করিব? শোন না,—তুমিও মানুষ—তোমারও রক্ত-মাংসের শরীর, তুমি এখনই মোকদ্দামা রুজু করিতে অবশ্যই পরামর্শ দিবে।

বলিয়াছিত সে দুষ্টু—বড় দুষ্টু। তার হাড়ে হাড়ে নষ্টামি! প্রথম দর্শনে যখন প্রাণের রত্ন-সিংহাসন লইয়া তাহাকে বসিতে বলিলাম, সে হাসিল। সে যে কি সর্ব্বনেশে হাসি—তা' বলিতে পারি না। সে মাণিক-ঝরা পাগল-করা হাসিতে আমি উদাস হইলাম। সে স্বচ্ছন্দে বলিল—"এখন কেন? প্রতীক্ষা করিতে পার নাইত?" আমি ফিরিতেছিলাম—চম্পক-কলিকা-অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিল; বলিল,—"আমি তোমারই।" আমি বাহু-প্রসারণে বাঁধিতে গেলাম—সে কুসুম-গন্ধে মিলাইয়া গেল। দেখ, গোড়া হইতেই কি দুষ্টুমি,—এর জন্যে কি শাস্তি পাবে না? ডাইভোর্সের মোকদ্দামা টিঁকিবে না?

আরও শোন। তাহাকে প্রেম-পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম। এটাত প্রেমিক-প্রেমিকার অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ? গোড়ায় বেশ উত্তর দিতে লাগিল—প্রাণের আনন্দ দিন দিন বেশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। জন্তু বিশেষকে আদর দিলে সে যেমন পাইয়া বসে, আমিও তাহাকে তেমনই পাইয়া বসিলাম। কিন্তু একদিন হঠাৎ তাহার উত্তর পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

সে লিখিল—"ওগো; সাবধান হইয়া পত্র লিখিয়ো। এমন পত্র লিখিলে লোকে কি বলিবে! জীবনে কোন কাজ গোপন করি নাই। তোমার পত্রগুলি গোপন করিতে হইতেছে। আমার নিজের জন্যে নহে,—তোমার জন্যে। আমাকে নষ্ট বলুক, দুষ্ট বলুক—তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। কিন্তু তোমার চরিত্র কেহ যদি কলুষিত মনে করে, তা'ত সহ্য করিতে পারিবনা"।

তোমরা বলিবে, এত খুব ভালবাসারই কথা--কিন্তু জান না, বোঝ না, তাই তোমাদের রাগ হইতেছে না। আমার এটা ত রক্ত-মাংসের শরীর। মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যোগশিক্ষা দিয়া যাহা করিতে পারেন নাই, নিরাহারে দীর্ঘ দিবস জ্ঞানের সাধনায় যাহা মুনি-ঋষিরা করিতে পারেন নাই,—সর্ব্বনাশী, এক আঁচড়ে যে তাহাই করিয়া গিয়াছে। এখন কত লোক প্রেমের কথা কহিতে আসে—প্রেমের চিঠি লিখিতে বসে,—আমিও অগ্রসর হইতে—উত্তর দিতে প্রস্তুত হই—কিন্তু অমনি মনে পড়ে, সে যে আমার ব্যথিত হবে---আমার কলুষ-চরিত্র তার হৃদয়ে যে বড় ব্যথা দিবে! আর পারি না। রণ-নির্জ্জিত পরাভূত সৈনিকের ন্যায় ফিরিয়া পড়ি। এটা কি অপরাধ নয়? এক জনের প্রাণের শিরায় শিরায় এমনি করিয়াই কি তুষার-স্তূপ ঢালিয়া কর্ম্ম হীন করিয়া দিতে হয় গা?

সবে তিন ঘণ্টা! আমার এই তপ্ত হৃদয়ে মাথা দিয়া তিন ঘণ্টা বসিয়াছিল! তখন সব ভুলিয়া ছিলাম,--আমি ছিলাম না, সে ছিল না, জগৎ ছিল না—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের সকল কার্য্য স্থগিত হইয়া গিয়াছিল।

তাহার স্বামী নাই, পুত্র নাই, বিশেষ বাধা দিবার কেহ নাই। তথাপি সে আমার হইল না। সে বলে, তোমায় চাই—তোমার দেহ চাহি না। তার সবই খেয়াল—সবই দুষ্টুমি।

সে দিন রাস পূর্ণিমা। শারদোৎফুল্ল মল্লিকা-গন্ধে জগৎ সুগন্ধীকৃত—জ্যোৎস্নার হেম-ধারায় সর্ব্বত্র সৌন্দর্য্য ভরা। দেখা হইয়াছিল,--সে দিনও দেখা হইয়াছিল। ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বসিল। রসে-রূপে পাষাণী সে দিন যেন ফাটিয়া পড়িতেছিল। একটু খানি বসিয়াই ধাঁ করিয়া উঠিতে যাইতেছিল,—আর একটু দেখিবার জন্যে বড় কাতরে বলিলাম—একটু ব'স, আর একটু দেখি! সে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপরে বলিল—"বসিয়া কি করিব? তোমার মাথায় পাকা চুল নাই যে, তুলিব। গায়ে ঘামাচি নাই যে, মারিব। ভগবান্ যদি তোমার গায়ে কুড়ি দেন, বড় আনন্দিত হই।"

আমি কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে তুমি সন্তুষ্ট হও? হা ভগবান,—এই কি প্রতিদান! গম্ভীর মুখে সে বলিল—"একটা কাজ পাই, বসিয়া খুঁটিতে পারি।"

শোনত কথা! একে জব্দ করাই কি উচিত নয়? কিসের জন্য কি? সম্বন্ধ ত্যাগ করিব। কিন্তু সম্বন্ধ কিসের? সে আমার কে হয়। ডাইভোর্স ত

স্ত্রী-ত্যাগের মোকদ্দামা? না, শুধু ত্যাগ? সে কিন্তু আমার কোন পুরুষেরই স্ত্রী নয়।

আর্জিতে কি কি অত্যাচারের কথা লেখাইব? সে জন্য ভাবিয়ো না,—তার দুষ্টামি অনেক বলিয়া দিতে পারিব। এ হৃদয়ের পরতে পরতে তাহার অত্যাচার-কালী জমিয়া রহিয়াছে। তবে এক বিড়ম্বনা,—আমি যাহা বলিতে চাহি, সে তাহা ভাল করিয়া গুছাইয়া বলিতে দেয় না। আমার অন্তর-মধ্যে অহরহ বসিয়া আমার মুখের ভাষা কাড়িয়া লইয়া সে-ই কথা কহে—কেবল নিজস্ব সুরটা তাহাতে বসাইয়া দেয়। আমি কি বলিতে যাই—তা' সব ভুলিয়া যাই—সে যা' বলায়, তাই বলি। যে কথা কখন ভাবি নাই, তাই বলিয়া ফেলি; যে ব্যথা কখন জাগে নাই, তাহাই জাগিয়া বসে,—সে তখন হাসিয়া উঠে!

আরও শোন,—সংসারে কি আমার কোন কাজ-কর্ম্ম নাই? সংসার-কঙ্কর-কণ্টকিত পথে চলা বড় কষ্টকর। অভাবের দারুণ দংশনে সতত অস্থির। আশে পাশে মৃত্যুর মলিন ছায়া, কিন্তু সেত তা' বুঝিবে না। সে হাসে, আর তারি মাঝে তার বাঁশরীটুকু বাজায়—পোড়া বক্ষ আমার, সে স্বরে সুখের ব্যথায় কাঁপিয়া উঠে—তীব্র তপ্ত দীপ্ত নেশায় চিত্ত মাতিয়া থাকে। কোথা হ'তে তখন ঘন সুগন্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়, বায়ু কোথা হ'তে ঘন আনন্দ টানিয়া আনে—প্রাণ যেন মৃত্যুর মুখে ছুটিতে চায়—ইহার অর্থ কি?

রাগ হয় না কি? আমি কি তাহার প'ড়ে পাওয়া বীণা যন্ত্র! তাই আমার হৃদয়ের তার এমনই ব্যথায় পীড়ন করিয়া মর্ম্ম-মাঝে মূর্চ্ছনা-স্তরে গীত-ঝঙ্কার তুলিবে? আমার মাঝে অসীম বিরহ, অপার বাসনা—আর সারা বিশ্বের বেদনা বাজাইবে? তারত ভরসা তিল মাত্র নাই—বাজায় বাজাক্, কিন্তু যে দিন তার ছিঁড়িবে, সে দিন সে আমায় ফেলিয়া হয়ত চলিয়া যাইবে। তাহাকে যে আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। কত বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি,—পাষাণী, তোমার মায়া-রথে আমায় এ কোথায় আনিলে? অর্দ্ধ নিশীথে নিভৃত-নীরবে এ দীপ যখন নির্ব্বাপিত হইবে—জীবন পোড়ানো এ হোম-অনলে সে দিন কি তুমি আসিয়া পূর্ণাহুতি দিবে? চির দিনের মর্ম্মে ব্যথা, শত জন্মের চির সফলতা—আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা, আমার বিশ্বরূপী,—বল বল, সে দিন কি তুমি নূতন বেশে আসিয়া মধুর অধরে

করুণ হাসিয়া যজ্ঞ শেষ করিবে? হতভাগী, তার কোন উত্তর দেয় না। তবে তাকে জব্দ করাই কি উচিত নয়?

এখন একটা বিষম সমস্যা দাঁড়াইবে,—তাহাকে সমন ধরাইব কোথায়? সে যে এখন মহাযোগিনী সাজিয়াছে। আগে সান্ত ছিল, এখন অনন্ত হইয়াছে। সে যে এখন সর্ব্বত্র। ফুলের গন্ধে, ফলের রসে, জলের আস্বাদে, পাখীর কলতানে, পাহাড়ের কাঠিন্যে, ঝরণার কোমলতায়, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায়, অমাবস্যার অন্ধকারে—হতভাগী নাই কোথায়? এইত কলমের মুখে হা হা হাসিয়া ফেলিল,—হা হা অক্ষর দুটীতে সেই—সেই কুন্দদন্ত দুটী স্পষ্ট দেখা গেল। সে যে সর্ব্বত্র আছে,—তবে সমন ধরান যাবে না কেন?

ইংরেজী আইনে নাকি বলে, অপরাধীর বাসস্থানের অধিকার স্থির করিয়া অধিকৃত আদালত হইতে সমন ধরাইতে হয়। তা' পারিব। সে আমার মন হইতে কোথাও যায় নাই,—সেই স্থানেই তার নিত্য নিবাস। ডাই-ভোর্সের সমন সেই স্থানেই ধরাইব।

তবে কথা উঠিতে পারে,—সে যে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়! কিন্তু আগে তাহার তত সাহস ছিল না—সে আমার শান্ত ছিল, চাহিলে চক্ষু তুলিত না,—ত্রাস-কম্পিতা হরিণীর ন্যায় গৃহের বাহির হইত না। কাছে আসিলে উঠিতে পারিত না। আমারই মনের বৃত্তি নাম্নী এক সহচরী আছে,—তাহারই সঙ্গ পাইয়া সে এত ছুটাছুটি করিয়া বিষয়ে বিষয়ে ঘুরিয়া ফিরিতেছে। মনকে তার জন্যে শাসন করিতে চেষ্টা করিয়াছি—পারি নাই।

ঠিক হইয়াছে। ঠিক ধরিয়াছি—আলোচনা না হইলে খাঁটি কথা বাহির হয় না। আমার মনকে মুকাবেলা-আসামী করিতে হইবে; মনই ত বৃত্তিনাম্নী কুচরিত্রা সহচরী দ্বারা তাহাকে এত দীর্ঘ দিবস-মাস-বরষ ধরিয়া আশ্রয় দিয়া প্রশ্রয় বাড়াইয়াছে। মন যদি আইনের বলে জব্দ হয়, সেও হইবে। মনকে ত্যাগ করিতে পারিলে, সে তার সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ পড়িয়া যাইবে। আধার না পাইলে আধেয় দাঁড়াইবে কোথায়? এখন একজন উকীল চাই—বলিয়া দাও না, ডাইভোর্সের মোকদ্দামায় পাকা উকীল কে?

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

ত্রিধারা।

দাসখত।

তোঁহারি কারণ, এদেহ ধারণ,
গোপভাবে গোপমাঝে ;
এই ব্রজধামে, জপি রাধানামে,
প্রেমিক মোহন-সাজে।
সদা নিশি দিনে, যমুনা-পুলিনে,
তমাল-কদম্ব-মূলে ;
ধরিয়ে মুরলী, "রাধা রাধা" বলি,
হৃদি প্রাণ-মন খুলে।
পিক শুক শারী, ভ্রমরা ভ্রমরী,
তরু লতা কাণে কাণে ;
বাজাইয়ে বেণু, চরাইয়ে ধেনু,
ঘুরি 'রাধা' মন্ত্র দানে।
রাধা-বিমোহন, হের বৃন্দাবন,
রাধা নাম ফুকরায় ;
রাধা নাম স্মরি, যমুনা সুন্দরী,
উজানে ছুটিয়ে যায়।
দিনরাত ধরি' বিভোলা বাঁশরী,
ডাকে রাধা উভরায় ;
অধর-পরশে, রাধাধর-রসে,
নব ছিদ্র ভেসে যায়।
তমাল বহিয়ে, বঙ্কিম হইয়ে,
যবে রাধা নাম গাই ;
হৃদি পয়োধরে, থাক তুমি ধ'রে,
তোমার পরশ পাই।
জপি 'রাধা রাধা', বহি শিরে বাধা,
রাধা নাম লেখা তায় ;

রাধা নাম আঁকা, লতাপাতা শাখা,
তমাল কদম্ব গায়।
রবি সুধাকরে, রাধা নাম করে,
করে রাধা-রূপ হাসে ;
পঞ্চভূত মাঝে, রাধা নাম রাজে,
রাধার মূরতি ভাসে।
তব শক্তিবলে, শূন্যচক্রে চলে,
রবি শশী গ্রহ তারা ;
শক্তি হীন তায়, ভেঙে চূরে যায়,
ছোটে পাগলের পারা।
রাধা নামে লেখা, অলকা তিলকা,
হের ছায়াপথ গায় ;
রাধা নাম ধরি,' দিবা বিভাবরী,
বাজে বাঁশী শূন্যে হায়।
ভূষণ শিঞ্জন, নূপুরের রণ,
শুনি সদা আশে পাশে ;
তখনি উল্লাসে, হেরি সে আকাশে,
তোমার মূরতি হাসে।
নীলনভ-মাঝে, ঘন-ঘটা সাজে,
তোঁহারি কুন্তল দোলে ;
বেঢ়ি করে আলা, মন্দারের মালা,
শুভ্র অভ্র কোলে কোলে।
পূরব আকাশে, উষাসতী হাসে,
সলাজ প্রতিমা তব ,
সায়াহ্ন গগনে, হেরি সে তপনে,
যোগিনী মূরতি নব ॥

হিমাংশুর কোলে, মৃগাঙ্ক কে বলে,
তুমি সে মানিনী রাধে ;
নীল বাস দিয়ে, বদন ঝাঁপিয়ে,
আছ বসে লো বিষাদে।
মান ভাঙ্গিবারে, সাধি বারে বারে
পায়ে দিয়ে দুটী হাত ;
হেন রূপে ঘটে, বিশ্ব-প্রেম-পটে,
নবছায়ালোক-পাত।
শুন রাধে সতী, তুমি লো প্রকৃতি,
আমি লো পুরুষ তায়,
আছি দুয়ে দুয়ে, প্রতি অণু ছুঁয়ে,
বিপুল জগৎকায়।
আমি কখনই, তোমা ছাড়া নই,
তুমি নহ আমা ছাড়া ;
তব মাঝে থাকি', তোঁহারেই ডাকি,
তোমা হয়ে দিই সাড়া।
কভু তুমি শ্যাম, কভু আমি রাধা,
কভু দোঁহে এক হই ;
কভু আধা রাধা, কভু আধা শ্যাম,
এক দেহে দোঁহে রই।
সগুণে নির্গুণে সকামে নিষ্কামে
আমি প্রেম-অবতার ;
সত্ত্ব,রজ তমে আমি লো আধেয়
তুমি লো আধার তার।
প্রেমে দীক্ষাদান, প্রেমে অধিষ্ঠান,
প্রেমে জীবে উদ্ধারিতে ;
যুগ যুগ আমি, তব শক্তি ধরি,
অবতরি অবনীতে।
তব প্রেমজালে বদ্ধ এজগৎ
তব প্রেমে ফুটে যায় ;
তব শক্তিবলে এ বিশ্ব বীণায়
সাধন-সঙ্গীত গায়।
তব আরাধনা, তোঁহারি সাধনা
ধরি চরাচরে চরি ;
রাধে তব সঙ্গে, খেলি লীলা-রঙ্গে,
সে গোলোক পরিহরি।
কভু নির্ব্বিকারে, নিত্য নিরাকারে
হয়ে থাকি দোঁহে লীন ;
কভুবা বিকারে, অনিত্য সাকারে
এক আত্মা দেহ ভিন।
তোমা বিনা রাই, কোথা আমি নাই,
তব পদে আছি বাঁধা ;
অন্তরে বাহিরে, লেখা রাধাপদ,
অলকা তিলকা রাধা।
রাধা-সূত্র দিয়ে, ব্রহ্মাণ্ডের মালা,
রচেছি শূন্যের পরে ;
ডাকিছে সদাই, রাধানাম গাই,
জগৎ জগদন্তরে।
রাধা-আকর্ষণে, গ্রহ তারাগণে,
শূন্যে করে বিচরণ ;
রাধা-প্রেমভরে, নীহারিকা তরে,
হয় গ্রহ বিগঠন।
তুমি মোর স্বর্গ, তুমি অপবর্গ,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম ;
গাও বৃন্দাবন, গাও জগজ্জন,
"রাধাশ্যাম" "রাধাশ্যাম।"
জগতের হিতে, জগতে বিলাতে
প্রেমধারা মনোমত ;
গোপী সাক্ষ্য করি, হে রাধে সুন্দরী
দিনু পদে—'দাসখত।'

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্চি।

জ্যোতিস্তত্ত্ব।

চন্দ্র।

বিশ্বজগতে চন্দ্র পৃথিবীর সন্নিহিততম এবং চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। গঠনে চন্দ্র গোল আকার। পঞ্চাশটী চন্দ্রের সমষ্টি আকারে পৃথিবীর সমান হয়। চন্দ্রের পরিবেশ দেড়কোটী বর্গমাইল। অর্থাৎ প্রায় এসিয়ার সমান। পৃথিবীর পরিবেশ চন্দ্র-পরিবেশের তের গুণ।

চন্দ্রপৃষ্ঠ মসৃণ নহে। ভূপৃষ্ঠের মত বন্ধুর। সহস্রাধিক পর্ব্বত এবং বেল ও গভীর খাদ আদিতে সমাকীর্ণ বলিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠ অতীব বন্ধুর। এই সকল পর্ব্বত আগ্নেয়গিরিরূপে প্রতিভাত হয়। তাহাদের শিখর দেশ—আগ্নেয়গিরি টেনেরিফ পর্ব্বতের শিখরের যাবতীয় লক্ষণ অবিকলরূপে ধারণ করে।

এই সকল পর্ব্বতের নামকরণ হইয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ মণ্ডলী হইতে কতক নাম গৃহীত হইয়াছে। কতক বা পার্থিব নাম ধারণ করে। যথাঃ—টাইকো, কোপার্নিকস্, কেপ্‌লার এবং আল্ পাইনস্, আল্‌প্‌স, অল্‌টাই ও ককেসস্ ইত্যাদি।

চন্দ্রমণ্ডলে সমতল ক্ষেত্রও আছে। ইহাদের সংখ্যা ১৩টী। এই সমতল ক্ষেত্রগুলি পূর্ব্বে বিস্তীর্ণ জলাশয় বলিয়া পরিগৃহীত হইত; তৎকালে তাহারা "সাগর" নাম পাইয়াছিল, যথা—পান্তসাগর, বিমল সাগর ইত্যাদি। দূরবীক্ষণের উন্নতি-বলে জানা যাইতেছে যে, এই সকল সমতল ক্ষেত্র জলাশয় নহে, অবন্ধুর ক্ষেত্র মাত্র।

পর্ব্বত ও সমতল ক্ষেত্র ব্যতীত চন্দ্রপৃষ্ঠে বেল (Valley) ও ফাটা আছে। বেলগুলি বহুযোজন দীর্ঘ এবং অনেক মাইল বিস্তৃত। ফাটা (Cleft) গুলি সুদীর্ঘ কিন্তু অতি সরু। সহজেই অনুমান হয় যে হঠাৎ ঠাণ্ডার ফলে চন্দ্রের সরভূমি ফাটিয়া ফাটিয়া গিয়াছে।

এতদ্‌ভিন্ন পূর্ণচন্দ্রপৃষ্ঠে আগ্নেয়গিরি টাইকো, কোপার্নিকস্ কেপ্‌লার আদির গহ্বর-নির্গত দ্যুতি-রেখাগুলি স্থির-সৌদামিনীর মত দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে।

দূরত্ব। পৃথিবী হইতে চন্দ্র আড়াই লক্ষ মাইল দূরে থাকে। সূর্য্যের দূরত্ব দশ লক্ষ মাইল হইলেও পুরাণে প্রকাশ যে সূর্য্যের দূরত্ব অপেক্ষা চন্দ্রের দূরত্ব দ্বিগুণ।

ভূমেঃ যোজনলক্ষে তু সৌরম্ মৈত্রেয় ! মণ্ডলম্।
লক্ষাৎ দিবাকরস্য-অপি মণ্ডলম্ শশিনঃ স্মৃতম্ ॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

সূর্য্যগ্রহণ ব্যাখ্যায় হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্গণ এক বাক্যে বলিতেছেন যে –

"ছাদকঃ ভাস্করস্য ইন্দুঃ অধস্থঃ ঘনবৎ ভবেৎ ॥"

সূর্য্যগ্রহণে চন্দ্র সূর্য্যের আচ্ছাদক হয়। সুতরাং সূর্য্যের অপেক্ষা চন্দ্রের দূরত্ব কম। কিন্তু কুসংস্কার দূর হইবার পাত্র নহে।

গতি। চন্দ্র মিনিটে ৩৮ মাইল চলে। চন্দ্রের গতির ফলে চন্দ্রের একটি নির্দ্দিষ্ট অর্দ্ধ পৃষ্ঠ সতত পৃথিবীর অভিমুখে থাকে। এবং একটি নির্দ্দিষ্ট অর্দ্ধ পৃষ্ঠ পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকে। পৃথিবীর অধিবাসিগণ প্রথমোক্ত অর্দ্ধপৃষ্ঠ মাত্র দেখিতে পায়। ইহাকে চন্দ্রের "দৃশ্য পৃষ্ঠ" বলে। শেষোক্ত অর্দ্ধপৃষ্ঠ তাহারা কখন দেখিতে পায় না। ইহাকে "অদৃশ্য পৃষ্ঠ" বলে।

২৭ দিন ৮ ঘণ্টা কালে চন্দ্র একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, কিন্তু পৃথিবীর গতির ফলে ২৯ দিন তের ঘণ্টায় এক অমা বা পূর্ণিমা হইতে পুনঃ অমা বা পূর্ণিমা উপস্থিত হয়। অর্থাৎ এক চান্দ্র মাস পূর্ণ হয়।

জ্যোতি। চন্দ্রমণ্ডল স্বয়ং আমাটে (Opaque) অর্থাৎ জ্যোতিহীন। আদিত্যের কিরণ চন্দ্রমণ্ডলে পড়িয়া প্রতিফলিত হয়। এজন্য চন্দ্রমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় দেখায়। আবার ভূপৃষ্ঠে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ অমার পূর্ব্বের ও পরের চন্দ্রমণ্ডলে পড়িয়া তাহার আমাটে ভাগের পরিধি সুদর্শনীয় করে। যে দিন চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে পড়ে, সেই দিন চন্দ্রের অদৃশ্য পৃষ্ঠ পূর্ণ আলোকিত হয় এবং দৃশ্য পৃষ্ঠ আমাটে থাকে। আবার যে দিন পৃথিবীর যে দিকে সূর্য্য থাকে, তাহার বিপরীত দিকে চন্দ্র পড়ে, সে দিন চন্দ্রের দৃশ্য পৃষ্ঠ পূর্ণ আলোকিত হয় এবং অদৃশ্য পৃষ্ঠ আমাটে থাকে।

প্রাচীন ঋষিগণের পরম গৌরবের কথা যে, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছিলেন যে—"আদিত্যতঃ অস্য দীপ্তিঃ ভবতি"

(নিরুক্তধৃর্ত্ত বচন)

এবং ঋক্ মন্ত্রেও (১০।৮৫।৯) এই সত্য প্রকাশ আছে। যথাঃ—

সোমঃ বধূয়ুঃ অভবৎ.........
সূর্য্যাম্ যৎ পত্যে সবিতা অদদাৎ॥
সোম বধূ কামনা করিলেন......।
সবিতা সূর্য্যাকে পতিহস্তে দিলেন॥

অর্থবাদের ভাষায় সূর্য্যকিরণ সূর্য্য-কন্যা "সূর্য্যা" নাম ধারণ করিল। ইতিহাসপ্রিয় ভারত বেদমন্ত্রের সদর্থ-গ্রহণে পরাঙ্‌মুখ। নিরুক্তকার ভারতে গোটেহেল।

চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্য্যকিরণ জ্যোৎস্না নামে পরিচিত। জ্যোৎস্না স্বভাবতঃ শীতল হয়। এজন্য চন্দ্রমা শীতরশ্মি ও হিমাংশু আদি নাম উপহার পাইয়াছেন।

সূর্য্যরশ্মি হইতে জীবের উৎপাদন হয় এবং চন্দ্রের জ্যোৎস্না হইতে জীবের পরিপোষণ হয়। এই সনাতন তথ্য প্রশ্ন উপনিষদে ব্যক্ত আছে। যথাঃ—

সঃ মিথুনম্ অজায়ত।
রয়িম্ চ প্রাণম্ চ
এতে মে বহুধা প্রজাঃ করিষ্যথঃ।
আদিত্যঃ এব প্রাণঃ
রয়িং এব চন্দ্রমাঃ॥

চন্দ্রমা দীর্ঘায়ু দাতা বলিয়া পুরাণে খ্যাতি আছে। জ্যোৎস্না সেবনে দেহ স্নিগ্ধ হয়, ইহা সকলেই অনুভব করিয়া থাকেন। এবং তারাদর্শক দীর্ঘায়ু হয়, একথা সিদ্ধান্ত-সম্মত।

জ্যোৎস্না উদ্ভিদগণকেও পরিপোষণ করে বলিয়া চন্দ্র "ওষধিপতি" উপাধি ধারণ করেন।

কলা। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে চন্দ্রের "দৃশ্য পৃষ্ঠ" সতত একই থাকে এবং চন্দ্রের যে অর্দ্ধপৃষ্ঠ যখন সূর্য্যের অভিমুখে থাকে, তখন সেই অর্দ্ধপৃষ্ঠ সূর্য্য-কিরণে আলোকিত হয়। অপর অর্দ্ধপৃষ্ঠ আমাটে থাকে।

চন্দ্রের গতির ফলে সূর্য্য-কিরণ চন্দ্রপৃষ্ঠে নিয়ত এরূপ ভাবে সরিয়া বেড়ায় যে, প্রতিদিন আলোকিত পৃষ্ঠের এক কলা আমাটে হয় এবং আমাটে পৃষ্ঠের এক কলা আলোকিত হয়। ১৫ দিনে আলোকিত পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ আমাটে হয়। এবং আমাটে পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ আলোকিত হয়। যথা—

পৃথিবী প্রদক্ষিণ কালে যে তিথিতে চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে উপনীত হয়; সেই তিথিতে চন্দ্রের "অদৃশ্য পৃষ্ঠ" সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয় এবং "দৃশ্য পৃষ্ঠ" আমাটে থাকে। এই তিথিকে অমা-বস্যা (সহ-বাস) বা দর্শ বলে। কারণ এই কালে আদিত্য-দেব ও তৎপত্নী স্ত্রীগ্রহ চন্দ্র পরস্পর সহবাস ও দর্শন করেন। অমা নাম অমা-বস্যা শব্দের জ্যোতিষিক সঙ্কোচ মাত্র।

অমা চন্দ্রের সৌন্দর্য্য পানে প্রাচীনগণ মহা আনন্দ অনুভব করিতেন।

অমা অতীত হইলে চন্দ্র সূর্য্য-ক্রোড় হইতে সরিয়া পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। অমনি সূর্য্যকিরণ অদৃশ্য পৃষ্ঠের পূর্ব্বতম কলা ত্যাগ করিয়া আমাটে দৃশ্য পৃষ্ঠের পশ্চিমতম কলা আশ্রয় করিতে প্রবৃত্ত হয়। এবং শুক্ল পক্ষ আরম্ভ হয়। শুক্ল প্রতিপদ তিথির অবসানে দৃশ্য পৃষ্ঠের পশ্চিমতম কলা সম্পূর্ণ আলোকিত হয় এবং অদৃশ্য পৃষ্ঠের পশ্চিমতম কলা সম্পূর্ণ আমাটে হয়।

শুক্ল-প্রতিপদ তিথি-দিনে সূর্য্য উদয়ের পরে চন্দ্র ক্ষিতিজের উপরে উত্থিত হয় এবং সূর্য্যের পিছে পিছে ল্যাং বোটের মত চলিতে থাকে। সূর্য্য অস্তগত হইবামাত্র অস্ত গিরির কিয়ৎ দূর পূর্ব্বে ধনুকাকৃতি শশিকলা পশ্চিমাকাশে দেদীপ্যমান হয়। ইহাকেই চন্দ্রের উদয় বলে। কবি-কল্পনায় রুদ্রদেবের শিরোপরে শশিকলা শোভা পায়। কলার পৃষ্ঠদেশ সূর্য্যাভিমুখে থাকে। প্রতিপৎ-চন্দ্র দুইদণ্ড কাল ক্ষিতিজের উপরে থাকিয়া দুইদণ্ড রাত্রিকালে অস্তগিরিতে সূর্য্যের অনুসরণ করে।

শুক্ল-দ্বিতীয়া তিথিতে ঐ রূপ অদৃশ্য পৃষ্ঠের পূর্ব্বতম দুই কলা হীন হয় এবং দৃশ্য পৃষ্ঠের দুই কলা সূর্য্যকিরণে আলোকিত হয়। এই দিনে সূর্য্য উদয়ের ৩ দণ্ড পরে পূর্ব্ব-আকাশে ক্ষিতিজের উপরে চন্দ্র উত্থিত হয় এবং সূর্য্যের পিছে পিছে চলিতে থাকে। সূর্য্য অস্ত হইলে শশিকলাদ্বয় পশ্চিম-আকাশে ধক্ ধক্ করিয়া দীপ্তি পায় এবং চন্দ্রের উদয় হয়। চারিদণ্ড রাত্রি গতে চন্দ্র অস্তগমন করে। এইরূপে—অষ্টমী তিথিতে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় উদয়গিরিতে অর্দ্ধচন্দ্র উত্থিত হয়,—সায়ংকালে সূর্য্য অস্তগমন করিবামাত্র মধ্য-আকাশে অর্দ্ধচন্দ্র উদিত হয়। (১) চন্দ্রের অদৃশ্য পৃষ্ঠের পূর্ব্বভাগ আমাটে হয় এবং দৃশ্য পৃষ্ঠের পশ্চিম ভাগ আলোকিত হয়। রাত্রি দ্বিপ্রহরের কালে চন্দ্র অস্তগমন করে। এইরূপে ক্রমে পনর দিনে চন্দ্রের অদৃশ্য পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ

(১) পাঠক সূর্য্য ও চন্দ্রের উদয়ের পার্থক্যের প্রতি অনুধাবন করিবেন।

আমাটে হয় এবং দৃশ্য পৃষ্ঠ সম্পূর্ণ আলোকিত হয়। সায়ংকালে পূর্ণচন্দ্র উদয়-গিরিতে উদয় হয় এবং প্রভাত কালে অস্ত-গিরিতে অস্ত হয়। প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত ১৫ দিন সায়ং সন্ধ্যাকালে চন্দ্রের উদয় হয় এবং পৃথিবী জ্যোৎস্না ময় হয় বলিয়া এই পক্ষকে শুক্ল পক্ষ বলে। পৃথিবীর যে দিকে সূর্য্য থাকে, পূর্ণচন্দ্র তাহার বিপরীত দিকে থাকে। সুতরাং দৃশ্য পৃষ্ঠ সূর্য্য অভি-মুখে থাকে এবং সম্পূর্ণ আলোকিত হয়। সায়ং কালে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে তাহাকে রাকা বলে। অপূর্ণচন্দ্র উদিত হইলে তাহাকে অনুমতি বলে।

পূর্ণিমার অন্তে চন্দ্র দিন দিন সূর্য্যের নিকটস্থ হইতে থাকে, তখন চন্দ্রের আমাটে অদৃশ্য পৃষ্ঠে ক্রমে ক্রমে সূর্য্যরশ্মির সঞ্চার হইতে থাকে এবং দৃশ্য পৃষ্ঠ কলায় কলায় আমাটে হইতে থাকে। যথাঃ—

কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে চন্দ্রের দৃশ্য পৃষ্ঠের পশ্চিমতম কলা আমাটে হয় এবং অদৃশ্য পৃষ্ঠের পূর্ব্বতম কলা সূর্য্য-কিরণে আলোকিত হয়। রাত্রি দুই দণ্ড পরে এই প্রতিপৎ-চন্দ্রের উদয় হয়। এবং পশ্চিম-আকাশে অস্তগিরির কিয়দ্দূর পূর্ব্বে চন্দ্র উপনীত হইলে রাত্রি প্রভাত হয় ও সূর্য্যোদয়ে চন্দ্র নিস্প্রভ শ্বেত-মূর্ত্তি ধারণ করে। বেলা দুই দণ্ড হইলে চন্দ্র ক্ষিতিজতলশায়ী হয়। দ্বিতীয়া তিথিতে রাত্রি চারি দণ্ডের পরে উদয়-গিরিতে ত্রয়োদশ কলা-ময় চন্দ্র উদিত হয় এবং প্রভাত কালে চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়। বেলা চারি দণ্ড অন্তে শ্বেতবর্ণ চন্দ্র ক্ষিতিজতলশায়ী হয়। সায়ংকালে আকাশ চন্দ্রহীন বলিয়া এই পক্ষের নাম কৃষ্ণপক্ষ। এইরূপে চন্দ্র কৃষ্ণপক্ষে তিথি ক্রমে ক্রমা-গত এক এক কলা হীন হয় ও দুই দুই দণ্ড পরে উদয় গিরিতে উদিত হয়। এবং প্রাতে আকাশমাঝে চন্দ্র নিস্প্রভ-মূর্ত্তি ধারণ করে। এইরূপ পর পর দুই দণ্ড অধিকতর বেলায় নিস্প্রভ চন্দ্রবিম্ব ক্ষিতিজতলশায়ী হয়। কৃষ্ণ-অষ্টমী তিথিতে মধ্য রাত্রে উদয়-গিরিতে অর্দ্ধ চন্দ্রের উদয় হয় এবং প্রভাতে মধ্য আকাশে চন্দ্র নিস্প্রভ-মূর্ত্তি ধারণ করে ও বেলা দ্বিপ্রহরের সময় শ্বেত চন্দ্র ক্ষিতিজতলশায়ী হয়।

কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর নিশার অবসানে অমা চন্দ্র সূর্য্যের ক্রোড়ে ধাবমান হয় এবং দিবাভাগে অলক্ষ্য-ভাবে আকাশ ভ্রমণ করে ও সায়ং-কালে সূর্য্যের সহিত অস্তগত হয়। নিশার অবসানে চন্দ্র দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অমা চন্দ্রের নাম কুহু বা গুহু বলে।

অমাদিনের দিবাভাগে চতুর্দ্দশী থাকিলে অমা-নিশির অবসান কালে

সূর্য্যোদয়ের প্রাক্‌কালে উদয়-গিরিতে শশিকলার উদয় হয়। এই অমা-চন্দ্রের নাম সিনীবালী। (১) সূর্য্য দিবাভাগে ১২ ঘণ্টাকাল ক্ষিতিজের উপরে থাকে। শুক্লপক্ষে চন্দ্র দিবাভাগে ও রাত্রিভাগে—মোটের উপর ১২ ঘণ্টা কাল ক্ষিতিজের উপরে থাকে। এবং কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্র রাত্রিভাগে ও তৎ-পরদিন দিবাভাগে মোটের উপর ১২ ঘণ্টা কাল ক্ষিতিজের উপরে থাকে। শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা ব্যতীত অন্য তিথিতে চন্দ্রমণ্ডলের অক্ষত ভাগ পশ্চিমে ও ক্ষত ভাগ পূর্ব্বে থাকে। কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রমণ্ডলের অক্ষত ভাগ পূর্ব্বে এবং ক্ষত ভাগ পশ্চিমে থাকে। দিবাভাগে বা রাত্রে চন্দ্রদর্শনে পক্ষ ও তিথি সহজেই অনুভূত হয়।

কলঙ্ক। চন্দ্রের দৃশ্য পৃষ্ঠ বন্ধুর বলিয়া দৃশ্য পৃষ্ঠের সর্ব্বত্র সূর্য্য-কিরণ তুল্য-রূপে প্রতিফলিত হয় না। স্থানে স্থানে অনুজ্জ্বল থাকে। উচ্চ স্থানে সূর্য্য-কিরণ যেমন সুন্দর প্রতিফলিত হয়, নিম্ন স্থলে তেমন হয় না। নিম্নস্থল ছায়া-ময় থাকে। পূর্ণিমার রাত্রে এই পার্থক্য বিশেষ-রূপে উপলব্ধি হয়। এই ছায়াময় অনুজ্জ্বল দেশ "কলঙ্ক, অঙ্ক, লাঞ্ছন, চিহ্ন, লক্ষ্ম, লক্ষণ" আদি নামে পরিচিত।

কবি কল্পনায় এই কলঙ্ক "শশ" খ্যাতি পাইয়াছে। পৃথিবীর সব্বত্র চন্দ্র "শশ" নাম ধারণ করেন। ভারতে এই শশ হইতে চন্দ্র শশী শশাঙ্ক মৃগাঙ্ক আদি নাম পাইয়াছে॥ এবং হিন্দু বাইরন্ (Byron) অতি সুললিত তানে গাহিয়াছেন :—

"কান্দেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে"।

জ্যোৎস্না। পূর্ণিমার জ্যোৎস্না বার মাস সমান হয় না। অন্তরীক্ষ শরৎ প্রসন্ন হইলে জ্যোৎস্না সুবিমল ও সুকান্তি হয়। আবার ক্রান্তি-পাতে উদিত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না অতীব মনোহারিণী। বলা বাহুল্য যে বাসন্তিক ক্রান্তিপাতে উদিত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রূপে-গুণে অতুলনীয়।

চারি হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ক্ষুরাকৃতি কৃত্তিকার পদতলে ছিল। তখন কার্ত্তিকী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় জগৎ-জন আহ্লাদে মোহিত হইত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা কৌ-মুদী আখ্যা পাইয়াছিল।

দুহাজার বৎসর পরে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত অয়নাংশের গতিফলে অশ্বিনী নক্ষত্রে অপক্রান্ত হইল। তখন আশ্বিনী পূর্ণিমা বা কো-জাগরী পূর্ণিমা

(১) তুলনা কর। বেবিলন নগরে The sin—the moon god.

কৌ-মুদী আখ্যা হরণ করিল। (১) এই কৌমুদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী দেবী। (২) আর পাঁচশত বর্ষ পরে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে অপক্রান্ত হইবে। তখন ভাদ্রী পূর্ণিমা কৌ-মুদী আখ্যা দাবি করিবে।

ওদিকে চারি হাজার বর্ষ পূর্ব্বে শারদীয় ক্রান্তিপাত বিশাখা নক্ষত্রে ছিল, বিশাখা নক্ষত্র-মধ্যে উদিত পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্রাচীন ঋষিগণের মন বিমুগ্ধ করিত। তাই পরাশর-নন্দন সুমধুর স্বরে গাহিয়াছেন ঃ—

"বিশাখয়োঃ মধ্যগতঃ সম্পূর্ণঃ ইব চন্দ্রমাঃ"

পনরশত বর্ষ পূর্ব্বে শারদীয় ক্রান্তিপাত চিত্রা নক্ষত্রে অপক্রমণ করিয়াছিল, তাই কবি গাইলেন –

"চিত্রা-চন্দ্রমসোঃ ইব"

আবার পাঁচশত বর্ষ পরে শারদীয় ক্রান্তিপাত উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে যাইবে। তখন ভারতের ভাবী কবি ফাল্গুনী পূর্ণিমার মহিমা গান করিবেন।

ক্রান্তিপাতে উদিত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার শ্রেষ্ঠত্বের কোন কারণ পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতে পারেন না।

তবে আমাদের এই অনুমানের কোন মূল্য আছে কি না জানি না। এক ক্রান্তিপাতে পূর্ণিমার উদয় হইলে অপর ক্রান্তিপাতে সূর্য্য থাকিবে এবং সূর্য্যকিরণ সরল ভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে পতিত হইবে। সরল ভাবে পতিত সূর্য্যকিরণের প্রখরতার খবর পৃথিবীবাসিগণ সকলেই রাখেন। সুতরাং সরলভাবে চন্দ্রপৃষ্ঠে পতিত সূর্য্যকিরণে জাত জ্যোৎস্নার ঘনত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

সমাগম। চন্দ্রের সহিত কোন গ্রহের বা নক্ষত্রের যুদ্ধ বাধিলে সেই যুদ্ধকে সমাগম বলে।

সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের সমাগম ঘটিলে সূর্য্য-গ্রহণ উপস্থিত হয়। চন্দ্র-গ্রহণ কালে সূর্য্যমণ্ডলস্থিত দর্শক সূর্য্যগ্রহণের প্রতিমূর্ত্তি বা ছবি দেখিতে পায়। বুধ শুক্র (সন্ধ্যাতারা ও প্রভাতীতারা) ও মঙ্গল আদি তারাগ্রহগণ শশি-সমাগমে ঢাকিয়া পড়ে। শশি-সমাগমে ক্ষুরাকৃতি কৃত্তিকা নক্ষত্রও ঢাকিয়া পড়ে। এই জ্যোতিষিক দৃশ্য অবলম্বনে বিরচিত অপূর্ব্ব হেঁয়ালী ঋক্ মন্ত্রে (১০।২৮।৯)

(১) শব্দকল্পদ্রুম দেখ।

(২) তুলনা কর। বেবিলন নগরে "Lakh mu and Lakhamu—Light male and female"

স্থান পাইয়াছে। শশঃ ক্ষুরম্ প্রত্যঞ্চম্ জগার। শশ প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষুর ভক্ষণ করিয়াছিল।

"The hare hath swallowed the opposing razor."

(Griffith)

পাশ্চাত্য বেদাধ্যায়ীর অনুবাদ প্রশংসনীয়। কিন্তু এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি পশ্চাৎপদ হইয়াছেন।

প্রভাব। উপগ্রহের প্রধান উপকারিতা দুইটী—গাছ গ্রহের গতি শাসন এবং নিশাকালে তাহার তমোদমন। সমুদ্রের জোয়ার ভাটাতে আমরা সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্রের প্রভাব অধিকতর দেখিয়া থাকি। এই জোয়ার ভাটা আকাশ-সমুদ্রেও খেলা করে। মধ্য-আকাশে চন্দ্র উপনীত হইলে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমুদ্রে প্রকাণ্ড জল-তরঙ্গ ধাবিত হয়, বার ঘণ্টা পরে আর একটি ন্যূনতর তরঙ্গ উপস্থিত হয়। তরঙ্গদ্বয়ের আগমনের ছয় ঘণ্টা পরে ভাটা পড়ে। পৃথিবীর উপর গ্রহ পঞ্চকের প্রভাব ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর। পূর্ণিমার নিশাতে আকাশ মেঘশূন্য থাকে। এজন্য পূর্ণিমা অপেক্ষা অমা-তিথিতে অধিকতর বৃষ্টিপাত হয়। অমা ও পূর্ণিমায় নদ নদীআদি জলাশয়ের তীরস্থিত উৎসগুলি অধিকতর কর্ম্মঠ হয়। মানব-দেহ সরস ও ভারযুক্ত বোধ হয়। পক্ষাঘাত, বাত, শ্লেষ্মা ও শ্লীপদ আদি রোগের বৃদ্ধি হয়। মস্তিষ্ক-রোগের প্রাবল্য হয়। এবং গো আদি পশুর দেহ সরস ও ভার বিশিষ্ট হয়; এই—উপপত্তি হইতে অমা-তিথিতে পশুস্কন্ধে যোত্রদান ও হলচালন নিষিদ্ধ। ইতিহে অমা অহল্যা নামে পরিচিত। চন্দ্রমা ও মানব-চিত্ত এই উভয়ের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। ভারতে "মনসঃ চন্দ্রমাঃ জজ্ঞে" এই ঋষিবাক্য এবং পাশ্চাত্যে চিত্ত-বিকৃতি রোগের Lunacy নাম ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

ইতিহ। পৃথিবীর সর্ব্বত্র চন্দ্রমা নারীবেশে বিভূষিত। ভারতে স্ত্রীপুংস উভয় রূপে চন্দ্রমা বিরাজিত আছেন। এবং অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যগুণে সর্ব্বদেশের জাতীয় ইতিহাসের কেন্দ্রস্থান চন্দ্রমা অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।

জন্ম। ঋক্‌বেদ মতে সোম পবমান (The Milky way) ত্রিভুবনের অতীত। তাই ইতিহে অ-ত্রি (অতীত—ত্রিভুবন) আখ্যা পাইয়াছেন। সোম পবমানের অশ্রুনীরে দেবগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। (ঋ ৯।৪২।৪) ক্রন্দন দেবান্ অজীজনৎ! অত্রির নেত্র-বারি আকাশ-সমুদ্রেপড়িয়া চন্দ্ররূপ

ধারণ করিল। আকাশ-সমুদ্র মন্থনে চন্দ্রমা আবিষ্কৃত হইয়া দ্বি—জ নাম প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রমা লক্ষ্মীদেবীর যমজ ভ্রাতা। কারণ চন্দ্রমা সুধার সহিত জন্মগ্রহণ করেন। যথা—

লক্ষ্মীভ্রাতা শীতরশ্মিঃ জাতঃ চ সুধয়া সহ। (পদ্মপুরাণ)

এই সুধা (জ্যোৎস্না) পানে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত থাকেন।

বিশ্ব কদম্ব বৃক্ষে বসিয়া যমদেব, দেবগণ ও পিতৃগণ সুধাপানে আনন্দিত। (১)

চন্দ্রমার স্ত্রীপুংস চিত্র প্রাচীনকাল হইতেই আছে। তবে ঋক্‌বেদে আমরা রাকা অনুমতি কুহু ও সিনীবালী এই চারি স্ত্রীচিত্রের আরাধনা ও প্রাধান্য দেখিতে পাই। ঋক্‌বেদ মতে (২।৩২।৫) রাকাদেবী সহস্রবিধ অন্নের দাতা। (২) সায়ংকালে রাকার উদয় হয়। সায়ংকালে লক্ষ্মী দেবীর পূজা প্রশস্ত। (৩)

বিবাহ। তৈত্তিরীয় সংহিতা মতে (২।৩।৫।১) প্রজাপতির ত্রয়ঃত্রিংশৎ দুহিতা ছিল। পিতা তাহাদিগকে সোমরাজকে সম্প্রদান করিলেন।

কালক্রমে সিদ্ধান্ত শাস্ত্রে যখন নক্ষত্র সংখ্যা ২৭টি মাত্র নির্ব্বাচিত হইল। তখন দক্ষরাজের সপ্তবিংশতি কন্যা অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি সোমরাজকে সম্প্রদানের কথা মহাভারত আদিতে উঠিল।

ক্ষয়বৃদ্ধি। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির বৈজ্ঞানিক কারণ প্রাচীন হিন্দুগণের অবিদিত ছিল না। যথা—

কলাঃ ষোড়শ সোমস্য শুক্লে বর্দ্ধয়তে রবিঃ।
তস্মাৎ সূর্য্যঃ শশাঙ্কস্য ক্ষয়বৃদ্ধিবিধেঃ বিভুঃ॥ (দেবী পুরাণ)

ইতিহাসপ্রিয় প্রাচীনগণ জ্যোতিষিক ব্যাপারে লৌকিকতার রসায়ন দিয়া সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বজন-বোধ্য করিতেন।

---

(১) যস্মিন্ বৃক্ষে সুপলাশে দেবৈঃ সংপিবতে যমঃ।
অত্র নঃ বিশ্‌পতিঃ পিতা পুরাণান্ অনুবেণতি॥

(২) "সহস্র পোষম্ সুভগে রণানা"

(৩) আমাদিগের ধারণা এই যে পৌরাণিক হিন্দু অভিনব দেব দেবীর উপাসনা করেন না। তিনি পৌরাণিক নামে বেদোক্ত দেব দেবীর উপাসনা করেন। যথাঃ—ঋক্ মন্ত্রের রাকাদেবী পুরাণে লক্ষ্মী নামে অভিহিত।

তৈত্তিরীয় সংহিতা মতে (২।৩ ঃ। ১) ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রজাপতিদুহিতা মধ্যে চন্দ্রমা রোহিণীতে কাল-ক্ষেপ করিতেন। অপর কন্যাগণ প্রজাপতিকে সমস্ত মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। চন্দ্রমা তাহাদিগের প্রত্যর্পণ প্রার্থনা করিলে প্রজাপতি চন্দ্রমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, তিনি তাহাদিগকে সমানচক্ষে দেখিবেন। চন্দ্রমা প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ফলে যক্ষ্মগ্রস্ত হইলেন। (১)

পুরাণ-আদিতে এই ইতিহ অবিকল গৃহীত ও পুনরুক্ত হইয়াছে। তবে পুরাণে প্রজাপতি দক্ষ আখ্যা গ্রহণ করিয়াছেন এবং ৩৩ দুহিতার ৬টী বর্জিত হইয়াছে। (২)

মতান্তরে বৃহস্পতিপত্নী তারার অভিসম্পাতে চন্দ্রমা যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন। যথা—

হন্তি চেৎ মে সতীত্বন্ চ যক্ষ্মগ্রস্তঃ ভবিষ্যসি।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ২।৫৮।৩০)

নষ্টচন্দ্র। ভাদ্র শুক্ল চতুর্থী তিথির রাত্রে চন্দ্রসমাগমে তারা (সন্ধ্যাতারা) অদৃশ্য হইলে তারা হরণ ঘটনা হয়। (৩) তারার অভিসম্পাতে চতুর্থীর চন্দ্র পাপদৃশ্য হইলেন।

রাহুগ্রস্তঃ ঘনগ্রস্তঃ পাপদৃশ্যঃ ভবিষ্যসি।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

ভাদ্র শুক্ল চতুর্থীর পাপদৃশ্য নষ্টচন্দ্রে দর্শনে জাত ভাবী-কলঙ্ক-বিমোচনজন্য উপনগরের ও পল্লীর ঝানু ছেলেরা প্রতিবেশিগণের বাস্তবৃক্ষের ফলমূল নষ্ট করে। রক্ষণশীল হিন্দুগণ "সিংহঃ প্রসেনম্ অবধীৎ"......আদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জল পানে ভাবী কলঙ্ক দূর করেন।

মতান্তরে গণেশ পুরাণ মতে ভাদ্র শুক্ল চতুর্থীর রাত্রে গণদেবের ক্ষুদ্র বাহন দৃষ্টে চন্দ্র উপহাসের হাসি হাসিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ গণপতির অভিসম্পাতে চন্দ্র পাপদৃশ্য হইলেন।

---

(১) এই—ইতিহের সদর্থ গ্রহণ করিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে, যে যখন রোহিণী নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ছিল, তখন সুমেরুবাসী তারাদর্শক দেখিতেন যে উদয় গিরিতে চন্দ্রমা তিথির অধিক কালক্ষেপ করিয়া উদিত হইতেন।

(২) অভিজিৎ, রাহু, ইল্‌বলা, আর্দ্রা-লুব্ধক, আদ্রা-সরমা এবং ব্যাঘ্র নক্ষত্র।

(৩) তারাহরণের মূল ইতিহ ঋক্‌সূক্তে আছে।

বৈশ্য চন্দ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণ বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে জাত বুধ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

ইতিহাসে চন্দ্র বহু নামে বহু উপাখ্যানে অভিনয় করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ সন্নিবেশিত হইল।

(১)

চন্দ্রবংশীয় রাজকুলের আদি পুরুষ পূর্ণ চন্দ্র "পুরু" নাম ধারণ করেন। পঞ্চ ভ্রাতা যদু তুর্ব্বসু দ্রুহ্যু অনু ও পুরুর বংশধরগণ বেদে "পঞ্চজন" নামে খ্যাত।

সম্পূর্ণ চন্দ্রমা জরা প্রাপ্ত হয় বলিয়া পুরু পিতার জরা গ্রহণ স্বীকার করিলেন। অনু (অনুমতি চন্দ্র) আদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় জরা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং তাহারা জরা গ্রহণ অস্বীকার করিলেন। জরা পুনঃ গ্রহণ করিয়া য-যাতি (গমন-শীল) অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিলেন।

(২)

হিরণ্য কশিপুর পুত্রদ্বয় প্রহ্লাদ ও অনুহ্রাদ। নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণে নারায়ণ "স্ফটিক স্তম্ভ হইতে বহির্গত হইয়া "ন রাত্রি ন দিবা" কালে অর্থাৎ উষা কালে হিরণ্যকশিপুর বধ সাধন করিলেন।

আমরা জানি যে নক্ষত্র-বসন বিভূষিত নিশাকালের পুত্র রাকা অনুমতি। তাহারাই—প্রহ্লাদ ও অনুহ্রাদ নামে হিরণ্য-কশিপুর পুত্র হইয়াছে। উষা-কালে সূর্য্য-নারায়ণ প্রচণ্ড মূর্ত্তিধারণে উদিত হইয়া তমোময় রাত্রি বিনাশ করেন। দিবাভাগে বা নিশাভাগে তমোময় নিশা ধ্বংস হইবার নহে। পুরা-কালে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত দেব পথের (The Milky way) মধ্যে ছিল। সুমেরুবাসী ঋষিগণ দেখিতেন যে স্ফটিক স্তম্ভাকৃতি দেবপথ ভেদ করিয়া সূর্য্য-নারায়ণের উদয় হইত। এবং তমোময় নিশার ধ্বংস হইত।

(৩)

বেদোক্ত রণদুর্ম্মদ সোমদেব মহাভারতে অভিমন্যু নামে পরিচিত। উত্তর দিক্‌পতি সোমদেব মহাভারতে বিরাটরাজদুহিতা উত্তরার পতি। "পরিতঃ বীক্ষ্যমাণঃ" ধ্রুবতারা উত্তর দিকের ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত থাকেন। পরীক্ষিত অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে জাত। ষোড়শ কলা পূর্ণ হইলে চন্দ্রের ক্ষয় উপস্থিত হয়। ষোড়শ বর্ষ বয়সে অভিমন্যু ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেন।

মঙ্গল আদি গ্রহপঞ্চকের পূর্ব্বগতি ও বক্রগতি (পশ্চিম গতি) আছে, কিন্তু চন্দ্রের বক্রগতি নাই। কুরুক্ষেত্রে কৌরব-সেনা পূর্ব্বে ও পাণ্ডব-সেনা পশ্চিমে ছিল। সুতরাং অভিমন্যু কৌরব-চক্রব্যূহ ভেদ করিতে সক্ষম, কিন্তু নির্গমনে অশক্ত ছিলেন।

ধর্ম্মরাজ তারার ধ্রুবত্ব অবসিত হইলে পরীক্ষিত ধ্রুব সিংহাসন আরোহণ করেন।

(৪)

সিনীবালী রামায়ণে বালী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। চন্দ্র বৃহস্পতি-ভার্য্যা তারাকে হরণ করেন। এবং চন্দ্রসুত বুধ "তারেয়" নামে খ্যাত। বালী সুগ্রীব ভার্য্যা তারাকে হরণ করেন। বালীসুত অঙ্গদ 'তারেয়' নামে খ্যাত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাতৃস্নেহ।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কান্নাকাটী
এই মুখে কি সাজে?
তুই যে আমার হাসির মাণিক
আঁধার কুঁড়ের মাঝে!
দুক্ষুরে তুই কর্‌বি হেলা,
হেসে খেলে কাট্‌বে বেলা,
কেন রে জল চোখের ফেলা?
কিসের অভিমান
ফুটে' উঠুক মুখ ভ'রে তোর
হাসির দেশের গান!

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস গুপ্ত।

জামাই ষষ্ঠী

(পল্লী-চিত্র)

আজ জামাই ষষ্ঠীর দিন। কি সহরে, কি পল্লিগ্রামে, সর্ব্বত্রই মেয়ে মহলে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যে সকল ভামিনীদের মেয়ে নাই, সুতরাং জামাইও নাই, তাঁহারাও এত দিনের অপূর্ণ কামনার শত ধিক্‌কার দিয়া, ভাবী জামাতার কল্যাণে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করিতেছেন।

আমাদের একটী ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম, রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে অনেক দূরে। এখানে এণ্ট্রান্স স্কুল নাই, দাতব্য চিকিৎসালয় নাই, বৈদ্যুতিক ট্রামও নাই; সুতরাং সভ্যতা-সমাজের বাহিরে গ্রামটিকে নিরাপত্তে স্থান দেওয়া চলে। গ্রামটির নাম কিন্তু দেবগ্রাম। কথিত আছে রাজা সীতারাম রায়, কিংবা তদীয় বংশধর হরিরাম রায় এই গ্রামে দ্বাদশটি শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া গ্রামটির নাম দেবগ্রাম রাখিয়াছিলেন। ইহা অতিশয় পুরাতন। জীর্ণ দেব-মন্দিরগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও ইহার প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট। সম্মুখে ভৈরব-নদ কলধ্বনি তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে বকুল, চম্পক ও কাঞ্চনফুলের দুই চারিটি বৃক্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গলের মধ্যে দন্ত প্রকাশ করিতেছে। পার্শ্বে একটী বিস্তৃত তমাল বৃক্ষ বনজ লতায় পরিবেষ্টিত হইয়া দম্পতী-প্রীতি-বন্ধনের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছে। ইহাতে মনে হয় যেন এক সময়ে ইহা প্রকৃতির রম্য উদ্যান ছিল। কিন্তু আজ সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। শ্রীযুক্ত গিরিজাকান্ত রায়চৌধুরী এখন এই পুরাতন গ্রামের নূতন ভূস্বামী। জমীদার না হইলেও তাঁহার প্রতিপত্তি এই গ্রামে কোনও প্রবল প্রতাপান্বিত জমীদার অপেক্ষা হীন নহে। তিনি স্বয়ং আইন আদালত এবং জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গিরিজাবাবু রাঢ়ীয় শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার অন্দরে আজ ষষ্ঠী পূজার বড়ই ধূমধাম! গিরিজা বাবুর সাতটি পুত্র ও দুইটী কন্যা। রায়-গৃহিণীর উপর ষষ্ঠীদেবীর কৃপা যথেষ্ট।

নানাবিধ ফলপত্রসমাযুক্ত জলপরিপূর্ণ ঘটে সিন্দূর দিয়া, পুরোহিত ঠাকুর দেবী-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যে চিত্র-বিদ্যার পরিচয় দিলেন; তাহা দেখিয়া লজ্জাবতী বধূগণ দূরে দাঁড়াইয়া ঘোমটার মধ্যে একটু না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে আমাদের গরম দেশের সর্ব্ববিধ ফলই সুপক্ক। আম, জাম, কাঁটাল, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব প্রভৃতি সুরসাল ফলের সুগন্ধে গৃহ আমোদিত। সুতরাং ষষ্ঠী দেবীর আজ "চূড়ামণি যোগ," এরূপ সৌভাগ্য আমাদের আর কোনও দেব দেবীর ভাগ্যে বড় ঘটিয়া উঠে না। তাঁহাদের গোটা কয়েক আতপ তণ্ডুল ও রম্ভার আস্বাদেই পরিতৃপ্ত হইতে হয়। একে ত গরমের দিন,—ধূপের তীব্র গন্ধে পুরোহিত ঠাকুর অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন "জয়দেবী জগন্মাতা" বলিতে বলিতে এক প্রণাম ঠুকিয়া পূজা শেষ করিলেন। সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শেষে পুরোহিত ঠাকুর বিদায় হইলেন। বলা বাহুল্য, দক্ষিণা-মুদ্রা ট্যাকে গুঁজিতে তাঁহার মোটেই ভুল হইল না।

এখন আসিল রায়-গৃহিণীর পালা। তিনি একে একে অন্দরের বধূগুলি ও তাঁহার কন্যা দুইটিকে ঘটের জল ছিটাইয়া সিক্তবসনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে ঘটের ফুলজল কিছু ঢালিয়া লইয়া একটা ফুটবলের মত গড়াইতে গড়াইতে বহির্ব্বাটীতে পুত্রগণকে ও নবাগত জামাতা বিমলেন্দু বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে চলিলেন। গৃহিণী একটু মোটা ও খর্ব্বাকৃতি, তাই চলিতে লাগিলে মনে হয়, যেন একটা ফুটবল গড়াইতেছে। বহির্ব্বাটীতে ছেলেদের ও জামাইকে ফুল জল ছিটাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেখানকার সতরঞ্চ ফরাস ভিজাইয়া, কর্ত্তা যেখানে একটা স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠে ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত ও অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে, তাম্রকূট-সেবনে মর্ত্ত্যে ইন্দ্রত্বের ধ্যান করিতেছিলেন; গৃহিণী সটান সেখানে আবির্ভূতা হইলেন। সর্ব্বত্র যিনি রিক্তহস্তে আশীর্ব্বাদ ছিটাইলেন, এক্ষেত্রে তিনি কৃপণের মত ফিরিলেন। ইহা হিন্দুর এক সমস্যা। গৃহিণীর দুটি কন্যা যেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী। সাতটি পুত্রের পর—কন্যা দুটি। গৃহিণী কন্যা দুটির নাম রাখিয়াছিলেন, কমলমণি ও উজ্জ্বলমণি। কমলমণি, উজ্জ্বলমণি অপেক্ষা দুই বৎসরের বড় এবং বিবাহিতা। কমলের বিবাহ এখনও এক বৎসর অতীত হয় নাই। বোধ হয় অতি অল্প দিনেই চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিক্রম করিবে। নধর গোল গাল গঠন, রঙ্‌টি কালো— ঠিক যেন একখানা শ্যামা প্রতিমা। সংসারের এমন কোনও প্রয়োজনীয় কার্য্য নাই, যাহা কমল শিক্ষা না করিয়াছে। শিল্পে ও চিত্রে তাহার ঐকান্তিক প্রীতি। রন্ধনেও স্বাভাবিক অনুরাগ। ভাই সকলেই বিদ্যার্থী, দুই চারিজন এম, এ, বি, এ, পাশ করিয়াছেন। কিন্তু, অধ্যয়নে বিরতি নাই। তাঁহারা জ্ঞানপিপাসুর মত অচৈতন্য হইয়া কেবল অধ্যয়ন করিতেন। কমল মনে

মনে তার দাদাদের বিষয় ভাবিত। চাকর মাথায় তৈল প্রদান না করিলে যাঁহাদের হাতের পুঁথি নামে না, তাঁহারা বোধ হয় নৈমিষারণ্যের এক একটী ঋষিতুল্য ব্যক্তি, কমলমণি সর্ব্বদা তার দাদাদের সেবা-শুশ্রূষা করিত। প্রত্যেক দিন নূতন নূতন জল খাবার প্রস্তুত করিয়া দাদাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিত।

গোলাপ ফুলের মোরব্বা, আমের বর্‌ফি, ছানার পায়স প্রভৃতি নিত্য নূতন খাবার কমল প্রস্তুত করিত। দাদারা আহার করিতেন, আর আহারীয় দ্রব্যের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতেন। কি কি আহার করিলে, আয়ু, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয় কি কি তাহার বিরোধী! কমল অবাক্ হইয়া কেবল তাহাই শুনিত; আর তাহার স্বহস্ত-প্রস্তুত খাবারগুলি দেবতার ভোগে লাগিতেছে ভাবিয়া মনে মনে একটু গর্ব্বিতা হইত। কমলমণির স্বামী বিমলেন্দু বাবুও বি, এ, পাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহার অধ্যয়ন চাকরীর চড়ে ঠেকিয়া সীমাবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি ডেপুটীর শিক্ষা নবিশির আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলেন। সামান্য কিছু কিছু মুদ্রা যাহা তিনি মাসিক পাইতেন, তাহা চাকর বামুণ ও ঝীর মাহিয়ানা দিতেই ফুরাইয়া যাইত। ভাগ্যে বড় লোক শ্বশুর এবং নিজেও কুলীন জামাতা, তাই তাঁহার, শ্বশ্রূ-প্রদত্ত ৫০৲ টাকার মাসিক বরাদ্দ হইতে বাড়ী ও বাসা উভয় কুল রক্ষা হইত। বিমলেন্দু বাবু সর্ব্বদা কেবল আড়াই শত মুদ্রার স্বপ্ন দেখিতেন, কবে একটী পাকা ডেপুটী হইবেন এবং একটী মহকুমা আলো করিয়া বসিবেন। আর কমলমণিকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া সেখানে কপোত-কপোতীর মত উচ্চবৃক্ষচূড়ে নীড় বাঁধিয়া উভয়ে সুখী হইবেন। বিবাহের পর হইতেই বিমলেন্দু বাবু বড় বড় চৌকোষ খামে কমলমণির নামে পত্র লিখিতেন। তাহাতে কত আশা, কত ভরসা, প্রেম ও সুখ দুঃখের কথা থাকিত, কিন্তু কমলমণি তাহার একছত্রও বুঝিত না। সে প্রত্যুত্তরে লিখিত, কে তাঁহাকে রাঁধিয়া দেয়। আহারের কোনও কষ্ট হয় কিনা? কমলমণি সঙ্গে থাকিলে তাঁহার আর কোনও কষ্ট হইবে না। সে তাঁহাকে দুই বেলাই রাঁধিয়া খাওয়াইবে। বিমলেন্দু বাবু পত্রের উত্তর পাইয়া বিরক্ত হইতেন। সময়ে সময়ে ভাবিতেন, কমল তাঁহার উপযুক্ত স্ত্রী হইতে পারে নাই। নাতিদীর্ঘ গৌর-বপু বিমলেন্দু বাবু যখন কালরঙের কোট্ পেন্‌টুলানে সজ্জিত হইয়া নাকের ডগার উপর সোনার ফ্রেমের চসমা আটিয়া কোর্টে যাইতেন; তখন উকীল পাড়ার পথে অনেকে তাঁহার পানে

এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। বিমলেন্দু বাবুর আরও মনে আছে, তাঁহার বিবাহের বাসরে এক বর্ষীয়সী রমণী গাহিয়াছিলেন, "কণক-পাশে শ্যামল লতা হেরে নয়ন জুড়ালরে"—ইহা মনে করিয়া তখন বিমলেন্দু বাবুর বক্ষঃস্থল স্ফীত হইত। তাঁহার রূপের কাছে কমলমণির সৌন্দর্য্য যে হীনপ্রভ, তাহা সে নবীন গ্রাজুয়েট বা ভাবী ডেপুটি বাবু মনে মনে বেশ ধারণা করিয়া রাখিয়াছিলেন। কমলমণির রূপ ছিল না,—গুণ ছিল। কিন্তু বিমলেন্দু বাবুর কি ছিল. তাহা আমার সুযোগ্য পাঠক পাঠিকাই স্থির করিবেন।

আমাদের দেশে জামাই ঠকাইবার একটা প্রথা আবহমান কাল থেকে বর্ত্তমান আছে। এক্ষেত্রেও তাহার ত্রুটি হইল না। কমলমণির ভ্রাতৃ-বধূগণ ও তাহার কনিষ্ঠা উজ্জ্বলমণি, উজ্জ্বল দিবালোকেও জামাই বাবুর চক্ষে ঠুসি পরাইয়া দিল।

প্রথমতঃ তাঁহাকে বসিবার যে আসন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নানাবিধ বর্ণের চূর্ণে কাঠাসনে চিত্রিত। দেখিলে মনে হয়, পিড়ির উপর একখানা কার্পেটের আসন পাতা। বিমলেন্দু বাবু উপবেশন করিবামাত্র তাহার পরিধেয় খানি সুরঞ্জিত হইল। কিন্তু তিনি সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া জল-যোগে মনোনিবেশ করিলেন। সুন্দর শিবঠাকুরের মত ময়দার ক্ষীরপুলি-গুলি গলাধঃকরণ করা অবশ্যই সহজ কথা নহে। বিমলেন্দু বাবু বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে চর্ব্বণ করিয়া নিরাশ হইলেন। আর বেশীক্ষণ সেখানে থাকিয়া সে প্রহসনের উপসংহার করিতে তিনি নিতান্তই নারাজ। তাই শীঘ্র শীঘ্র হস্ত প্রক্ষালন করিয়া বহির্ব্বাটীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন। মনে মনে যে বিরক্ত হইলেন, তাহা ভাষায় অবক্তব্য। পথিমধ্যে উজ্জ্বলমণি, পাণের ডিবা হাতে জামাই বাবুকে ধরিয়া বসিল, অনুরোধ ডিবা খুলিয়া অন্ততঃ একটী মাত্র পাণ তিনি নখাগ্রে তুলিয়া লয়েন। জামাইবাবু খুব নিপুণভাবে ডিবাটী খুলিবামাত্র কতকগুলি তেলাপোকা (আর্সুলা) তাঁহার বক্ষে. চক্ষে ও ইতস্ততঃ ফর ফর করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। উজ্জ্বলমণির আনন্দ তখন দেখে কে ? সে যেন একটা প্রকাণ্ড লড়াই ফতে করিয়া ফেলিয়াছে। উজ্জ্বল হাতে তালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বিমলেন্দু বাবু অধোবদনে সেইখানে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। বোধহয় তাঁহার চিন্তা অনেক দূর গিয়াছিল, যিনি ডবল অনার বি, এ, পাশ করিয়াছেন, তিনি কিনা আজ এই নারী-সমরে পরাস্ত হইলেন ? গৃহিণী সকল তত্ত্ব অবগত ছিলেন।

তিনি একখানা কালো রেসমী পেড়ে ফরাসডাঙ্গার ধূতি জামাইকে পরাইয়া সে চিত্র-বিচিত্র বেশ পরিবর্ত্তন করাইলেন। পরে নানাবিধ সুমিষ্ট ফল ও সুস্বাদু দ্রব্যে জামাইকে আপ্যায়িত করিয়া স্ফীতোদরে বহির্ব্বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। তখন উভয় কুল রক্ষা পাইল।

কর্ত্তা পুকুরে ধীবর নামাইয়া প্রকাণ্ড কনকপ্রভ একটি রোহিত মৎস্য ধরাইলেন। ধীবরেরা মৎস্যটি লইয়া বাড়ীর মধ্যে রাখিবামাত্র, গৃহিণী রান্নার ভার কমলমণির উপর দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রন্ধনে কমলমণির একটু স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। সে হৃষ্টমনে পাক-কার্য্য সমাধা করিল। মধ্যাহ্নে মাধ্যাহ্নিক ভোজনে কর্ত্তা, পুত্রগণ ও জামাতৃ-পরিবেষ্টিত হইয়া যে সময়ে আহার করিতে বসিয়াছিলেন, তখন বিমলেন্দু বাবু একটু একটু বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে প্রেমের ঔদার্য্য অপেক্ষা পলান্নের মাধুর্য্য নিতান্ত স্বাদহীন নহে। কমলমণিও তাহার প্রথম পাকস্পর্শে রন্ধনের বিদ্যা চালাইতে কিছু ত্রুটী করে নাই। যখন কর্ত্তা সকলের সম্মুখে মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন "কমলের পাক সুন্দর হইয়াছে," তখন কমলের দৃপ্ত বক্ষে অনেক আশার সঞ্চার হইয়াছিল। বিমলেন্দুবাবুও যে তাহার অংশভাগী হইয়াছিলেন না, তাহা বলা যায় না।

তার পর রাত্রির পালা। নিদাঘ দিনান্তে সন্ধ্যার গাঢ় আবরণ ভেদ করিয়া যখন ধীরে ধীরে আকাশে অসংখ্য সুবর্ণ দেউটি জ্বলিয়া উঠিল, তখন প্রকৃতির কি বিচিত্র শোভা! যেন রাজেন্দ্রাণী গজমতি হার পরিয়া চির সুন্দরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। অর্দ্ধস্ফুট বেলি, মালতী ও মল্লিকার গন্ধ বহন করিয়া সমীরণ কিছু ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল। আকাশে দুই একখানা ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ নীলবর্ণের সূক্ষ্ম চাদর উড়াইয়া ইতস্ততঃ ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ হয় বর্ষণলালসে তাহারাও উন্মত্ত; কিন্তু সুযোগ-অভাব। এমন সময়ে নবীন দম্পতীর মনে যে কি এক অব্যক্ত মধুর ভাব ভাসিয়া উঠে; তাহা কবির লেখনীতে চিত্রিত হয় না।

বিমলেন্দু বাবু মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, কমলের সঙ্গে তিনি কিরূপ ভাবে আলাপ করিবেন। কমল বরাবরই তাঁহার কাছে একটী——অবাধ্য। তিনি সেই অবাধ্যতার জন্য তাহার সুখের নিশি অদ্য আনন্দে, কলহে ও অভিমানে ভোর করিয়া দিবেন। কমলমণি ভাবিতেছিল, বিমলেন্দু বাবুকে সে আজ কেমন করিয়া জয় করিবে। তার রূপ নাই, বিমলেন্দু বাবুর রূপ আছে।

শয়ন ঘরে প্রবেশ করিয়া কমলমণি বিমলেন্দু বাবুকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। বিমলেন্দু বাবুর ধারণা অন্যরূপ ছিল। তিনি বিংশশতাব্দীর উচ্চ শিক্ষিত যুবক, অর্দ্ধাঙ্গিনীর আভিধানিক অর্থটাই মনে মনে আঁটিয়া রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীলোকে স্বামীকে যে কেন দেবতা বলিয়া পূজা করেন, এ রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করিতে তিনি বড় একটা প্রয়াস পাইতেন না। "আঃ ছি,—কর কি" বলিয়া তিনি কমলমণির কোমল কর-পল্লব দুখানি সজোরে চাপিয়া ধরিলেন। কমল ব্যথা অনুভব করিয়াছিল—কিন্তু হাতের ব্যথাটা বেশী, কি বিমলেন্দু বাবুর উপেক্ষাটা বেশী—তাহা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না। ধীরে ধীরে তাহার মস্তক অবনত হইয়া বিমলেন্দু বাবুর বক্ষে সংলগ্ন হইয়াছিল; তখন সে মনে করিতেছিল, এইখানে এইরূপ ভাবে যদি তার মৃত্যুও হয়, তবে যেন সে মরণ কত সুখের। হৃদয়ের তারে তারে ঝঙ্কার দিয়া একটা করুণাত্মক রাগিণী সেই সময়ে তার প্রাণের উপর দিয়া ঢেউ খেলাইয়া বেড়াইতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, ভেউ ভেউ করিয়া খানিকটা কাঁদিয়া সে হৃদয়ের বেগ উপশম করে, কিন্তু গুরুজনের ভয়ে সে মুখ ফুটিয়া কাঁদিতে পারিল না। তাহার অপাঙ্গ বাহিয়া গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। বিমলেন্দু বাবু বড় অপ্রতিভ হইলেন। তিনি আস্তে আস্তে কি জানি কেন, কমলমণির অশ্রুসিক্ত গণ্ডে একটী চুম্বন প্রদান করিলেন। কমলের মুখকমল আরক্তিম হইল। শিরায় শিরায় এক অভূতপূর্ব্ব অমৃত প্রবাহ ছুটিয়া গেল। শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদের মত হাসির রেখা তার অধরপ্রান্তে ফুটিয়া উঠিল। সে বালিকা-সুলভ প্রগল্ভতায় বলিয়া উঠিল—"আচ্ছা, এ কাপড়খানা কেমন?" বিমলেন্দু বাবু উত্তর করিলেন "কাপড়খানা তত ভাল নহে, কিন্তু পাড়টি বড়ই সুন্দর।" কমলমণি খিল খিল করিয়া হাসিয়া বলিল "ও যে কালো"। কালো রেসমের পাড়টি বিমলেন্দু বাবু সুন্দর বলিয়াছেন, কমলমণি তাই বলিল—"ও যে কালো"। কমলমণির জয় হইল। সে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে, তার কালো রূপ বিমলেন্দু বাবুর রূপের কাছে সৌন্দর্য্যহীন নহে। বিমলেন্দু বাবু পরাজিত হইলেন। এক নূতন সৌন্দর্য্যের দ্বার কে যেন আজ তাঁহাকে খুলিয়া দিল। তিনি দেখিলেন—উর্ব্বশী-তিলোত্তমাকে পরাজিত করিয়া আজ যেন নীলকান্ত মণির মত কমলমণি সে ঘর আলো করিয়াছে।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রাচীন স্কন্দনবীয় বীরপূজা। *

মহাজন-চরিতাবলীই এই বিশাল পৃথিবীর প্রকৃত ইতিহাস। প্রকৃত পক্ষে মহৎ ব্যক্তিগণ যে সকল বিষয় চিন্তা করেন বা কল্পনা করেন, পৃথিবীর কার্য্যসমূহ তাঁহাদের সেই চিন্তা বা কল্পনার প্রকাশ মাত্র। তাঁহাদের চিন্তা হইতেই সম্পাদিত কার্য্য সকলের উৎপত্তি। ঐ সকল মহাপুরুষ এই পৃথিবীকে জ্যোতির্ম্ময়ী করেন। সূর্য্য যেমন তাঁহার নৈসর্গিক উজ্জ্বল কিরণে চরাচর বিশ্বকে আলোকিত করেন, সেইরূপ প্রত্যেক হৃদয় ঐ মহাত্মাগণের স্বর্গীয় বিভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত। তখন এমন এক জনকে প্রয়োজন, যিনি সেই আপতিত জগৎকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহাকে না পাইলে চলিবে না। সেই মহাত্মা আবির্ভূত হইলেন, তাঁহার প্রভাবে পৃথিবীতে একটা যুগান্তর হইয়া গেল। কর্ম্মবীর কোথাও আপনার প্রভাবে আপনাকে দেবপদ বাচ্য করিলেন। কোথাও দেখি কবি, কোথাও প্রবর্ত্তক, কোথাও স্বদেশ-সেবী ; আবার কোথাও মহামহিমময় ভূপতিরূপে পতিত—বিশ্বকে উদ্ধার করিয়াছেন।

ধর্ম্মই মনুষ্য জীবনের সার বস্তু। যাহা আমি মৌখিক রূপে স্বীকার করি, অথবা কোন সমাজের আচরণ প্রথার অনুসরণ করি, তাহাই আমার ধর্ম্ম নয়। আমি বলি, আমি হিন্দু, তুমি বল, তুমি মুসলমান, কেহ খৃষ্টান—ইহাকে ধর্ম্ম বলা যায় না। আমার হৃদয় যাহা বিশ্বাস করে, আমার হৃদয়ের যে বিশ্বাস আমার কার্য্যে পথ-প্রদর্শক, তাহাই আমার ধর্ম্ম। এই বিশ্ব-বিধানের সহিত আমার কি সম্বন্ধ? এখানে আমার কর্ত্তব্য কি? কেন আমি কার্য্য করিব? যে ধ্রুব বিশ্বাস এই প্রশ্নের মীমাংসা করে, তাহাই আমার প্রকৃত ধর্ম্ম। তাহাতে আমাকে হিন্দুই বল, মুসলমানই বল, খৃষ্টান বা আর যাহা কিছু বল। কিন্তু ধর্ম্মই যে মনুষ্য জীবনের পরন্তু জাতীয় জীবনের সার পদার্থ, তাহা নিঃসন্দেহ।

কোন ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের বিষয় জানিতে হইলে দেখিতে হইবে, তাহার ধর্ম্ম কি? কি বলিব?—এ বিশ্ব-বিধানের এক একটি কার্য্যকরী

---

* টমাস্ কারলাইল হইতে লিখিত।

শক্তিকে পৃথক্ পৃথক্ দেবত্বে প্রতিপন্ন করিয়া তাঁহাদের প্রতিচিত্র পূজা—না অদৃশ্য জ্যোতির্ম্ময় সত্যে বিশ্বাস—কিম্বা নাস্তিকতা—অবিশ্বাস—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্যতীত অন্য অস্তিত্বে সন্দেহ—কোন্‌টি তাহার ধর্ম্ম ছিল, তাহাই সর্ব্ব প্রথম বিবেচ্য। মনুষ্য যাহা চিন্তা করে,—তাহা হইতেই সে কার্য্য করে এবং যাহা হৃদয়ে অনুভব করে, তাহাই তাহার চিন্তার বিষয়। ধর্ম্মই মনুষ্যের সার বস্তু।

প্রাচীন স্কন্দনবীয় ধর্ম্মের মুখ্য চরিত্র "ওডিন্"। তদানীন্তন স্কন্দনবীয়-গণের ধর্ম্ম-আলোচনায় বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। তাহারা এ বিশ্বের কার্য্যকরী শক্তিচয়কে দেবজ্ঞানে পূজা করিত। তুহিনরাশি, অগ্নি, সামুদ্রিক বাত্যা ইত্যাদি ভীষণ শক্তিচয়কে তাহারা (Jotuns) দৈত্য নামে আখ্যাত করিত। এবং গ্রীষ্মের উত্তাপ, বজ্র, সূর্য্য ইত্যাদি তাহাদের পূজার্হ দেবতা। তাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে বিবিধ মত প্রচলিত আছে ; কেহ কেহ বলেন কিছু না—কেবল মিথ্যা আড়ম্বর, প্রতারণা, প্রবঞ্চনা। মিথ্যা আড়ম্বরে কেহ মোহিত হইতে পারে না। যদি উহা কেবল মিথ্যা আড়ম্বর-পূর্ণ, তবে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা বিশাল জাতি কেমন করিয়া তাহা-কেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান ছিল? শুধু মিথ্যায়, শুধু ছলনায় অথবা শুধু বঞ্চনায় বিশ্বাস করিয়া কোন জাতি বা কোন ব্যক্তি কখনও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাই মনে হয়, ইহাতে নিশ্চয় কিঞ্চিৎ সত্য আছে। একটা যথার্থ কিছু না থাকিলে কি লইয়া এত অসংখ্য লোক সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া বর্ত্তমান ছিল? প্রতারণা, আড়ম্বর ধর্ম্মমাত্রেই হইতে পারে। যখন ধর্ম্মের গ্লানি হয়, তখনই আড়ম্বর পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর তাহার ধ্বংস। কিন্তু যখন উহা নববলে বলীয়ান্,—পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পথে অগ্রসর,—কোথায় তখন সে মিথ্যা প্রতারণা? অন্যথায় তাহা ধর্ম্ম নয় ; প্রথমেই তাহার পতন। অভ্যুত্থান কখনও হইত না। অতএব ইহার আড়ম্বর সত্ত্বেও ইহাতে তথ্য নিহিত, ইহা ধ্রুব সত্য। আবার কেহ বলেন, ইহা আর কিছু নয়, কেবল রূপক মাত্র। কিন্তু রূপক লইয়া মানুষ থাকিতে পারে না। একটা আবেগ, হৃদয়ের একটা আগ্রহ বিশ্বাস চাই। রূপক থাকিতে পারে সত্য ; কিন্তু ধর্ম্মের অস্তিত্বের পূর্ব্বে রূপক কিরূপে সম্ভব হয়? অগ্রে ধর্ম্ম, তাহার পর রূপক হইতে পারে।

শিশু যেমন তাহার উন্মুক্ত বাহ্যদৃষ্টি লইয়া একটা নূতন কিছু, দেখিলে

যুগপৎ বিস্ময়ে আহ্লাদে অভিভূত হয়, সেইরূপ সেই প্রাচীন মানব শিশুর ন্যায় সরল হৃদয় অথচ পরিণত বুদ্ধি লইয়া হঠাৎ লীলাময়ের একটা বিচিত্র লীলার বিকাশ দেখিল, তখন বাস্তবিকই তাহার হৃদয় নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল। প্রকৃতই সে তখন সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের সম্মুখে নত হইয়া তাহাকে পূজা করিয়াছিল। আজিকার মানব মহিমাময়ের সেই আশ্চর্য্য লীলাকে একটা না একটা বৈজ্ঞানিক নামের আবরণে আবৃত করে; কিন্তু আজিও তাহার জ্ঞান-গর্ব্বিত হৃদয় বিশ্বনাথের উদ্দেশে ভক্তিপূর্ণ হইয়া উঠে! মস্তক আপনিই নত হয়! এই পৃথিবী সেই যুগে, সেই সরল মনুষ্যের নিকট তাই এত মহিমামণ্ডিত মনে হইয়াছিল। তাই সে সর্ব্ব পদার্থেই সেই নিত্য ব্রহ্মের বিকাশ দেখিয়াছিল। আজিও কবি বিজ্ঞানের এই জড় পৃথিবীকে একটা মহিমায় মণ্ডিত দেখেন, তাঁহার সেই দর্শনশক্তিকে আজিও আমরা ঐশ্বরিক ক্ষমতা জ্ঞান করি। লীলাময়ের বিচিত্র লীলার বিকাশোৎপন্ন বিস্ময়ে মনুষ্যহৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তি উছলিয়া উঠে। এই বিস্ময়, এই আন্তরিক ভক্তি হইতেই সংসারে বীর-পূজার সৃষ্টি হইয়াছে। বিস্ময়কর বিকাশের মধ্যে মনুষ্য অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর আর কি হইতে পারে? ভগবানের পূর্ণ বিকাশের আবাস—অতি মহনীয় সৃষ্টি—অচিন্ত্য অগম্য গূঢ়ত্বের প্রকাশ! তুমি আমি যে জ্ঞানে—যে চক্ষে দেখি, সেই প্রাচীন মনুষ্য এ জ্ঞান লইয়া এতখানি আবরণ লইয়া কিছু দেখিত না। শিশুর ন্যায় উন্মুক্ত, উদার-দৃষ্টিতে প্রত্যেক দৃশ্য দেখিত—দেখিয়া চমৎকৃত হইত,—ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। তাই সে যুগের কর্ম্মবীর "ওডিন্" দেবপদ বাচ্য।

একটা সত্যকে তুমি যেভাবে দেখিবে. হয়ত তাহা প্রকৃত না! তুমি যাহা দেখিলে, তাহার অভ্যন্তরে একটা কিছু লুক্কায়িত আছে। তুমি তোমার মনের অনুরূপই দেখিবে। কোন পদার্থ তাহার নিজের উন্মুক্ত সত্য লইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে না। তোমার মনে যে ভাবে দেখিবে, ঠিক তেমনি তাহা প্রতিফলিত হইবে। এই পৃথিবীর প্রত্যেক পদার্থকে পুরাতন যুগের মনুষ্য তাহার নিজের মনের মতই দেখিয়াছিল। আদিদ্রষ্টা রূপক প্রবর্ত্তন করেন নাই। তিনি তাঁহার উদার দৃষ্টিতে যেমনটী দেখিয়াছেন, তেমনই অপরকে দেখাইয়াছেন। শিশুর চিন্তার ন্যায় সেই সরল মানবকুলের চিন্তাও নির্ব্বাক্ ছিল। "ওডিন" তাহাদের সেই মূক চিন্তাকে প্রকাশ

করিলেন। সেই সব চিন্তালহরীর একটা শৃঙ্খলা আনয়ন করিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাহারা দেবজ্ঞানে তাঁহাকে পূজা করিতে লাগিল। আজিও আমরা কবি বলিয়া মনীষী বলিয়া প্রতিভাবান্ ব্যক্তির পূজা করি। ঐ সম্মান কি বীরপূজা নহে ?

এই স্কন্দনবীয় দেব "ওডিনের" বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে—তিনি এসিয়ার কোন্ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য সহ উত্তর ইউরোপ জয় করিয়া তথায় বাস করিয়াছিলেন ও তত্রত্য অধিবাসিগণকে বর্ণমালা শিক্ষা দিয়া তাহাদের মধ্যে গদ্য ও পদ্যসাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এবং ক্রমে দেবরূপে পূজিত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত নানারূপ বৃত্তান্ত আছে। কিন্তু তাঁহার বৃত্তান্ত যত বিভিন্ন হউক না কেন, "ওডিনের" অস্তিত্ব-সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। যেখানেই হউক এবং যে সময়েই হউক, "ওডিন" বর্ত্তমান ছিলেন ইহা স্থিরীকৃত। প্রথমতঃ তাঁহার সমসাময়িক লোকে তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ দর্শনে তদীয় অভিনব গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তি-সহকারে পূজা করিয়াছিল। তাঁহাকে দেবজ্ঞানে আরাধনা করিত। দ্বিতীয়তঃ সম্ভবতঃ 'ওডিন' স্বয়ং জ্ঞানোন্মেষে ভাবাবিষ্ট হইয়া আপনাতে ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দেখিয়া নিজের দেবত্ব প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কার্য্যে চমৎকৃত হইয়া লোকে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত সময়ের প্রভাব এই তথ্যে অনেক কার্য্য করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যদি কোন অসাধারণ লোকের মৃত্যুর পর তাঁহার কার্য্য-কলাপের কোন লিখিত বৃত্তান্ত না থাকে, কেবল বংশানুক্রমে লোকমুখে তাঁহার কার্য্যের আলোচনা হয়,—কালক্রমে তাঁহার মহত্ত্ব অধিকতর প্রতিপন্ন হয়।* ক্রমে তিনি পৌরাণিক চরিত্রে পরিণত হন। "ওডিন" তাঁহার অসীম প্রতিভাহেতু পূজিত হইয়াছিলেন। আমরা আজিও প্রতিভার পূজা করি। স্কন্দনবীয়গণের ধর্ম্মের মুখ্যতত্ত্ব বীর-পূজা।

শ্রীরেণুপদ গঙ্গোপাধ্যায়।

পঞ্জিকা-সংস্কার।

অপিচ।

তৎ সংজ্ঞাতং পাতং ক্ষিপ্ত্বা খেটে পমঃ সাধ্যঃ।

ক্রান্তিবশাচ্চরমুদয়াশ্চরদয়লগ্নাগমে ততঃ ক্ষেপ্যাঃ॥

বাসনাভাষ্য দেখিলে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন আর্য্যগণ পূর্ব্বোপদিষ্ট শাস্ত্রানুসারে গণিত গ্রহসংস্থানাদি অপেক্ষা কালবশতঃ গ্রহাদিসংস্থানের তদানীন্তন ভেদ দর্শন করিয়াই দৃগ্‌গণিতৈক্য মতে গ্রহনক্ষত্রাদির যথাযথ সমাবেশ নির্দ্ধারণপূর্ব্বক অভিনব শাস্ত্রপ্রণয়ন করিয়াছেন এবং যখনই প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে, তখনই এই প্রকার করিতে হইবে,—ইহাও মুক্তকণ্ঠে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে অশেষপারদর্শী খ্যাতনামা গণেশ দৈবজ্ঞও ইহাই প্রমাণিত করিয়াছেন; যথা—

ব্রহ্মাচার্য্যবশিষ্ঠকশ্যপমুখৈর্যৎ খেটকর্ম্মোদিতং
তত্তৎকালজমেব তথ্যমথতদ্ ভূরিক্ষণেঽভূচ্ছ্লথম্।
প্রাপাতোঽথ ময়াসুরঃ কৃতযুগান্তেঽর্কস্ফুটং তোষিতা
তচ্চাস্তিস্ম কলৌ তু সান্তরমথাভূচ্চাত্র পারাশরম্॥
তজ্‌জ্ঞাত্বার্য্যভটঃ খিলং বহুতিথে কালেঽকরোৎ প্রস্ফুটং
তৎস্রস্তং কিল দুর্গসিংহমিহিরাদ্যৈস্তন্নিবদ্ধং স্ফুটম্।
তচ্চাভূচ্ছিথিলং তু জিষ্ণুতনয়েনাকারি বেধাৎ স্ফুটং
ব্রহ্মোক্ত্যাশ্রিতমেতদপ্যথ বহৌ কালেঽভবৎ সান্তরম্॥
শ্রীকেশবঃ স্ফুটতরং কৃতবান্‌হি সৌরা-
র্য্যাসন্নমেতদপি ষষ্টিমিতে গতেঽব্দে।
দৃষ্ট্বা শ্লথং কিমপি তত্তনয়ো গণেশঃ
স্পষ্টং যথা হ্যকৃত দৃগ্‌গণিতৈক্যমত্র॥
কথমপি যদিদং চেদ্‌ভূরিকালে শ্লথং স্যা-
ন্মুহুরপি পরিলেখ্যেন্দুগ্রহাদৃক্ষযোগাৎ।
সদমলগুরুতুল্যপ্রাপ্তবোধপ্রকাশৈঃ
কথিতসদুপপত্ত্যা শুদ্ধিকেন্দ্রে প্রচাল্যে॥

গণিতশাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অতীন্দ্রিয়দর্শী আর্য্যভট বলেন যে,—

ক্ষিতিরবিযোগাদ্দিনকৃদ্রবীন্দুযোগাৎ প্রসাধিতশ্চেন্দুঃ।
শশিতারাগ্রহযোগা স্তথৈব তারাগ্রহাঃ সর্ব্বে॥

ভটদীপিকাকারও বলিয়াছেন যে, কালবশে কৃতসংস্কারের ভেদ পরিলক্ষিত হইলেই পুনরায় দৃগ্‌গণিতৈক্যমতে স্পষ্ট স্ফুট করিতে হইবে।

ভাষ্যকার নৃসিংহগণকও এবিষয়ে বহু বহু যুক্তিপ্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া যথেষ্ট সমালোচনাপূর্ব্বক স্বীয় মন্তব্যে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রহসংস্থানাদির প্রভেদ দৃষ্ট হইলেই দৃগ্‌গণিতাগত সংস্থান নির্ণয় করিয়া লইতে হইবে।

তথাচ——

পূর্ব্বাচার্য্যমতেভ্যো যদ্‌যচ্ছ্রেষ্ঠং লঘুস্ফুটং বীজম্।
তত্তদিহাবিকলমহং রহস্যমভ্যুদ্যতো বক্তুম্॥

পঞ্চসিদ্ধান্তিকা।

বীজ—অর্থাৎ দৃগ্‌গণিতের ঐক্যার্থ—সংস্কারবিশেষকেই বীজ বলা হইয়া থাকে।

প্রাচীন আর্য্যগণ প্রাক্তন শাস্ত্রানুমোদিত গ্রহাদিসংস্থানের বৈষম্য পরিদর্শন করিলেই যে বীজানয়ন পূর্ব্বক নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং পরেও এইরূপ করিতে হইবে, এবিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, বাহুল্য ভয়ে সে সকল উদ্ধৃত হইল না। বস্তুতঃ এই সমস্ত সিদ্ধান্তবচন ও ভাষ্যাদিদর্শনে ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, শাস্ত্রবিদ্‌গণ শাস্ত্রানুসারে গণিত ফলের সহিত গ্রহনক্ষত্রাদির স্থান, গতি প্রভৃতির পার্থক্য উপলব্ধি করিয়া বীজসংস্কার বা গ্রন্থপ্রণয়নপূর্ব্বক প্রাচীন শাস্ত্রাদির ফল-বৈষম্য সংশোধন করিতেন, এমন কি তাঁহাদিগের বংশধরগণ যে ভবিষ্যতেও এই প্রকার করিবেন, ইহাও প্রকাশ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনও যুক্তি-তর্ক আছে কি?

দ্বিতীয় কথা এই যে, কেহ কেহ বলেন—"দৃষ্টকার্য্যে গণিতাগত কালের কিছু বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-কর্ম্মোপযোগী কালাদি সাধনে যে পঞ্জিকায় ভুল আছে, তাহা কদাচ নহে।" আমরা বহু চেষ্টা করিয়াও একথার মর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। কারণ, প্রথমতঃ যে সমস্ত বচন ও ভাষ্যাদির উল্লেখ করা হইয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা হইতে স্পষ্টই

দেখিতে পাইতেছেন যে, গ্রহসংস্থান ও গ্রহগতি সম্বন্ধে গণিতাগত ও দৃষ্ট ফলের পার্থক্যাবলোকনই তদানীন্তন আর্য্যদিগের বীজসংস্কার বা নূতন গ্রন্থ রচনার একমাত্র কারণ হইয়াছিল। সত্যসন্ধ প্রাক্তন পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা গ্রহদিগের প্রকৃত সংস্থান ও গতি জানিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া শাস্ত্রের সর্ব্বাংশ সংস্কার করিয়াছেন; সুতরাং সেই সর্ব্বাংশ-সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে গণিত পঞ্জিকাও পূর্ব্বতন পঞ্জিকা অপেক্ষা সংস্কৃত হইত। কোনও গ্রন্থেই এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, দৃষ্টকার্য্যের উপযোগী সংস্কার করা হয় নাই; একথা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মধ্যেও কেহই স্বীকার করিবেন না। তবে যুক্তি প্রমাণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া বা এবিষয়ের সমালোচনায় পশ্চান্মুখ হইয়া কেহ কেহ হয়ত ঐ মতের সমর্থন কি অনুমোদন করিতে পারেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের বাক্য মাত্রকেই কোনরূপ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতেছি না।

পাঠকবর্গ একটুকু গবেষণার সহিত বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন;—জ্যোতিঃশাস্ত্রের বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে কোনটিকে প্রকৃতপক্ষে অদৃষ্টকার্য্য বলা যাইতে পারে না। কারণ গ্রহগতি ও গ্রহযুতি; এই দুই অংশের মধ্যেই সমগ্র জ্যোতিঃশাস্ত্র রক্ষিত, সুতরাং জ্যোতিঃশাস্ত্র গ্রহযুতি ও গ্রহগতির উপরই নির্ভর করে। বস্তুতঃ গ্রহগতি জানা থাকিলেই বুদ্ধি দ্বারা শাস্ত্রের অবশিষ্টাংশ জানা যাইতে পারে। গ্রহগতি স্থির করাই বীজসংস্কারের মূলীভূত কারণ। কিন্তু তাহা যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতিরেকে করা অসম্ভব। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, দৃগ্‌গণিতৈক্যদ্বারা যে ফললাভ করা যায়, তাহা জ্যোতিঃশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অংশমাত্রেই সর্ব্বথা গ্রাহ্য, অতএব তাহাই ধর্ম্ম কার্য্যোপযোগী বলিয়া সর্ব্ববাদিসম্মত। গ্রহগতি দ্বারা উদয়, অস্ত, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়. এবং গ্রহযুতি হইতে গ্রহদিগের সন্নিকর্ষ, বিপ্রকর্ষ, গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়-সকলের জ্ঞান জন্মে। এক্ষণে বিচক্ষণ পাঠকগণ বিবেচনা পূর্ব্বক দেখুন যে, সংস্কার করিলে শাস্ত্রপ্রোক্ত সকল বিষয়ের সংস্কার হয়, অথবা কেবল দৃষ্টকার্য্যেরই সংস্কার হইয়া থাকে।

পঞ্জিকা গণনায় আমাদের যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহার মূল গ্রহাদির গতি প্রভৃতি নির্দ্ধারণ; ঐ স্ফুট-গতি প্রভৃতির নির্দ্ধারণে কাল-ক্রমে যে প্রভেদ ঘটিয়াছে, তাহা দেখুন;—

নাক্ষত্রিক বৎসরের দিন সংখ্যা সূর্য্য-সিদ্ধান্ত মতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৩৬·৫৬ সেকেণ্ড। পৌলিশসিদ্ধান্ত—৩৬৫|৬|১২|৩৬। পারাশর সিদ্ধান্ত—৩৬৫|৬|১২|৩১·৫০। আর্য্যসিদ্ধান্ত—৩৬৫|৬|১২|৩০·৮৪। লঘু আর্য্যসিদ্ধান্ত—৩৬৫|৬|১২|৩০। সিদ্ধান্তশিরোমণি—৩৬৫|৬|১২|৯। এই হইল বৎসরের দিন সংখ্যা। গ্রহগণের মন্দোচ্চ ও শীঘ্রোচ্চাদিসম্বন্ধেও যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, যথা—

মন্দোচ্চ	সূর্য্যসিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তশিরোমণি	সিদ্ধান্তরহস্য
	রা অ ক বি	রা অ ক বি	রা অ ক বি
রবি	২|১৭|৭|৫৮	১|১৭|৪৫|৩৬	২|১৭|১৬|৫৩
বুধ	৭|১০|১৯|১২	৭|১৪|৪৭|২	৮|৪|২৭|৪৯
শুক্র	২|১৯|৩৯|০	২|২১|২|১০	৩|১৩|৫১|৩৪
মঙ্গল	৪|৯|৫৭|৩৬	৫|৮|১৮|১৪	৫|৪|২|২৩
বৃহস্পতি	৫|২১|০|০	৫|২২ ১৫|৩৬	৬|১৫|২১.৮
শনি	৭|২৬|৩৬|৩৬	৮|২০|৫৩|৩১	৮|২০|৩৭|৩১

পাত সম্বন্ধে, যথা ;—

পাত		
বুধ	০|২০|৫২|৪৮	০|২১|২০|৫৩
শুক্র	২|০|১|৪৮	২|০|৫|২
মঙ্গল	১|১০|৮|২৪	০|২১|৫৯|৪৬
বৃহস্পতি	২|১৯|৪৪|২৪	২|২২|২|৩৮
শনি	৬|১০|৩৭|১২	৩|১৩|২৩|৩১

যোগতারার অবস্থান সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, যথা ;—

	পঞ্চসিদ্ধান্তিকা			সূর্য্যসিদ্ধান্ত		
	যোগতারার অবস্থান	ধ্রুবক	বিক্ষেপ	যোগতারার অবস্থান	ধ্রুবক	বিক্ষেপ
কৃত্তিকা	৬	৩২|৪০	৩|১০	১০|৫০	৩৭|৩০	৫
রোহিণী	৮	৪৮	৪|৫৯	৯|৩০	৪৯|৩০	৫
পুনর্ব্বসু	৮	৮৮	৭|১৫	১৩	৯৩	৩
পুষ্যা	৪	৯৭|২০	৩|১০	১২|৪০	১০৬	০
অশ্লেষা	১	১০৭|৪০	৫৪	২|১০	১০৯	৭
মঘা	৬	১২৬	০	৯	১২৯	০
চিত্রা	৭|৩০	১৮০|৫০	২|৪৩	৬|৪০	১৮০	২

গ্রহযুতি সম্বন্ধেও গ্রহলাঘব-গ্রন্থানুসারে গণনা করিয়া দেখিলে ভৌম-গুরু-যুতি-সম্বন্ধে প্রকৃত সময় হইতে কখনও ২ দুই দিন কখন বা ৮ আট দিন প্রভেদ পরিলক্ষিত হইবে। শুক্র ও শনিসম্বন্ধে প্রায় ২ দুই দিবসের, শুক্র ও ভৌম-সম্বন্ধে কখনও ৩ তিন দিন কখনও বা ৫ পাঁচ দিবসের ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মঙ্গল ও শনিসম্বন্ধে কখনও ২ দুই দিন কখনও বা ৭ সাত দিন প্রভেদ দেখা যায়। গ্রহলাঘব-গ্রন্থানুসারে গ্রহস্ফুট স্থির করিলেও দেখা যায় যে, রবি ০।৪১। চন্দ্র ০।৫০। বুধ ৩।৩৪। শুক্র ৩।১৬। মঙ্গল ১।২৯। গুরু ০।৬। শনি ৪।৪৮ প্রভেদ হইবে।

পাঠকবর্গ উপরি লিখিত পার্থক্য বিবেচনা করিয়া স্থির করুন যে, কোন গ্রন্থ মান্য বা কোন গ্রন্থ অমান্য। শাস্ত্রমধ্যে পার্থক্য পরিদর্শিত হইল, সম্প্রতি আমরা যাহাকে পুরুষানুক্রমে বেদবাক্যের ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া আসি-তেছি, কল্পনায়ও যাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করা আমাদের বাস্তবিক অভিলষিত নহে ; আমাদের বঙ্গদেশীয় সেই পঞ্জিকাগুলি (সিদ্ধান্ত-রহস্যানুসারে গণিত) যে কি বিভিন্ন, সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহার প্রতি একটীবার দৃষ্টিপাত করিবেন কি ?

১৩১৭ সালের পঞ্জিকা। ১লা বৈশাখ।

	দিবা	মু	মেষ-দণ্ডাদি	ইংঘণ্টাদি।
গুপ্তপ্রেস	৩১।১৬।৪০	২।৫।৬।৪০।	০।৫।৩০	৫।৪৫।৪৯
ভট্টপল্লী	৩১।১৫।৪৭	২।৫।৩।৮	০।৫।৫৭	৫।৪৬।০
আর্য্য-পঞ্জিকা	৩১।১৬।০	২।৫।৪।০	০।৫।৫৫	৫।৪৫।৫৩

তিথি।

গুপ্তপ্রেস	পঞ্চমী	২৬।৪১।১০।	ইংঘণ্টা	৪।২৬।১৭
ভট্টপল্লী	„	২৬।৪০।৫৯।	„	৪।২৬।২৩
আর্য্য-পঞ্জিকা	„	২৬।৪১।০	„	৪।২৬।০

স্ফুট।

	গুপ্তপ্রেস (ঔদয়িক)	ভট্টপল্লী (ঔদয়িক)	আর্য্য— (আৰ্দ্ধরাত্রিক)
রবি	০।০।৪৩।২২	০।০।৪৩।২০	০।০।৪৩।০
চন্দ্র	১।২৪।৫৩।৫৩	১।২৪।৫৩।৪০	১।২৪।৪৮।০
মঙ্গল	১।২৫।২৯।৭	১।২৫।২৯।২৮	১।২৫।২৯।০

বুধ	০।১১।২৪।২৭	০।১১।২১।৩৪	০।১১।২৪।০
বৃহস্পতি	৫।১৬।৪৭।২৬	৫।১৬।৪৭।১৪	৫।১৬।৪৭।০
শুক্র	১০।১৪।০।২৫	১০।১৪।২।৫২	১০।১৪।১।০
শনি	০।২।৫৪।৭	০।২।৫৪।১০	০।২।৫৪।০
রাহু	১।৯।৪১।১৫	১।৯।৪১।১৫	১।৯।৪১।০
কেতু	৭।৯।৪১।১৫	৭।৯।৪১।১৫	৭।৯।৪১।০

গুপ্তপ্রেস ও ভট্টপল্লা উভয়ই সূর্য্যসিদ্ধান্তমতানুযায়ী সিদ্ধান্তরহস্যমতে গণিত এবং উভয়ই ঔদয়িক স্ফুট কিন্তু উভয়ের মধ্যেই বিশেষ প্রভেদ। ইহার কারণ কি? ভিন্ন নিয়ম ত দূরের কথা, একটী অঙ্ক একই নিয়মে দুইজনে সমাধান করিলে তাহার ফল-বৈষম্য সম্ভবপর হইতে পারে কি? আমরা ইহাকে পুরুষান্তরের স্পর্শদোষ ব্যতীত আর কি বলিব। প্রকৃতপক্ষে জ্যোতি-গণনা করিতে হইলে কোন একটী বিশেষ বিষয় দৃক্‌সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, যাহাতে ক্ষণমাত্র কালেরও বৈষম্য ঘটিতে না পারে। ইহা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ একবাক্যে স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই। প্রাচীন শাস্ত্রমতে সেই বিষয়টী শঙ্কুচ্ছায়া নিরূপণ।

ক্রমশঃ—

শ্রীকালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ।

বন-ফুল।

নীরবে ফুটিয়া ফুল বনের মাঝারে।
নীরবে ঝরিয়া পড়ে সে বন-প্রান্তরে॥
রচে না মোহন-মালা কেহ সে ফুলেতে।
আনন্দে দোলাতে হায়! প্রেয়সী-গলেতে॥
অথবা সুবাস তার কেহ নাহি লয়।
স্বভাবে আপনি ফুটে হইতে বিলয়॥
সমীরণ কভু তারে দোলায়-নাচায়।
মধুপ আসিয়া গীতি বিদ্রূপের গায়॥

আবদুল গনি।

দেবীগড়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সাহায্য প্রার্থনা।

মুসলমান সৈন্যগণ গোলোকনাথের নিকট হইতে সংবাদ প্রাপ্তির আশায় কয়েক দিন অতিবাহিত করিয়াও যখন কোন সংবাদ প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহারা মনে করিল, নিশ্চয়ই সে কোনপ্রকার বিপদে পড়িয়াছে। হয় ত বা ধৃত হইয়া অসভ্যগণের বর্শাগ্রে জীবনাহুতি প্রদান করিয়াছে। তখন তাহারা আর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিল না,—সদলবলে নগরপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া একেবারে রাজ্য আক্রমণ করাই স্থির করিল। কিন্তু এক প্রধান অন্তরায় লুনী নদী।

আঁকিয়া বাঁকিয়া লুনী নদী এমন ভাবেই নগরটিকে নিজ বাহু-বেষ্টনে রক্ষা করিতেছে যে, সহসা কোন প্রকারেই বহিঃশত্রু নগর আক্রমণে সমর্থ হয় না। নগরের পশ্চিমদিকে বিরাট পর্ব্বত—দক্ষিণেও তাহাই। সুতরাং লুনী পার না হইয়া যাইবার উপায় নাই।

যাহা হউক, সম্মুখে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। বর্ষা উপস্থিত হইলে তখন কিছুতেই এ জঙ্গলে অবস্থান করা যাইবে না,—এক এক দিনের প্লাবনে যে কি ভীষণ কাণ্ড ঘটায়, তাহা বলা যায় না। যাহারা চিরকাল এদেশে থাকে, তাহারাই সে প্লাবনে সকল সময় আত্ম-রক্ষা করিতে পারে না, বিদেশীয়গণের ত কথাই নাই।

মুসলমানগণ তখন সদলবলে নগর আক্রমণ জন্য শুভ যাত্রা করিল।

রাজা যখন চরমুখে শুনিতে পাইলেন যে, মুসলমানগণ লুনী নদীর অপরপারে আসিয়া ছাউনি করিয়াছে—তখন তিনি বিপদ গণিলেন। এই মহাসমরে তাঁহার ভবিষ্যৎ কি, তাহা গণা পড়া হইল না,—দেবীকে এত করিয়া সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি ত স্পষ্ট কিছু বলিলেন না,—মিনিয়াকে উচ্চপর্ব্বতে পাঠান হইয়াছিল,—দেবীর উত্তরের মীমাংসা করিয়া আনিবার জন্যে—সেও তাহা আনিল না—যদিও আসিয়া পঁহুছিল, কিন্তু সে বিষয়ে

কিছুই না বলিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে চলিয়া গেল! অতএব রাজা এখন কি করেন? না জানিয়া শুনিয়া কি সমর-সাগরে ঝাঁপ দেওয়া কর্ত্তব্য?

রাজা তখন অনন্যোপায় হইয়া পুনঃপুনঃ মন্ত্রী ও সামরিক কর্ম্মচারিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যেমন রাজা তেমনি মন্ত্রী, তেমনি কর্ম্মচারিগণ—সকলেই কি করিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারে না। জ্যোতিষিগণ গণিয়া দেখিতে লাগিল.—কিন্তু ফলে একই। নানা মুনির নানামত—যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যায় কি না, তাহার কোন মীমাংসাই হইল না।

এদিকে মুসলমানগণ লুনী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল,—কিন্তু তাহাদেরও চেষ্টা সম্যক্ ফলবতী হয় না। লুনী তখন জোয়ারে ভরা—স্ফীতা গর্ব্বিতা। তথাপি তাহারা ঝটিতি লুনী পার হইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল।

গোলোকনাথ, কমলা ও মিনিয়া কমলার পিতার আশ্রমেই অবস্থান করিতেছিল। সিংহ যে, সেই দিন হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহারা আর তাহার সন্ধান পায় নাই। যে সকল লোক সেখানে পূর্ব্বে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং সিংহের সেদিনকার অত্যাচার-ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা ক্রমে ক্রমে আবার আসিয়া তাহাদের পরিত্যক্ত শূন্য কুটীর যুড়িয়া বসিতে লাগিল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে,—আকাশ সে দিন মেঘ-মালায় সমাচ্ছন্ন ছিল,—একটু একটু বাতাস বহিতেছিল। মেঘ-বায়ুর স্পর্শে স্ফীতা গর্ব্বিতা লুনী আরও ফুলিয়া উঠিয়া তুফান তুলিয়া বসিয়াছিল। লুনীর তীরে বস্ত্রাবাসে বসিয়া মুসলমান-সেনাপতি মহম্মদ খাঁ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময় ভৃত্য গিয়া সংবাদ দিল,—"একজন লোক সাক্ষাৎ করিতে চায়।"

মহম্মদ খাঁ চিন্তাক্লিষ্ট মুখে গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"কে লোক?"

ভৃত্য। চিনি না,—বলিল, বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মহ। এই দেশের লোক কি?

ভৃত্য। চেহেরা দেখিয়া বঙ্গদেশবাসী বলিয়া জ্ঞান হয়,—পরিচয় দিল না। বলিল,—খাঁ সাহেবের সম্মুখেই সকল কথা বলিব।

মহ। অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে না থাকে,—পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া লইয়া আইস।

ভৃত্য চলিয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই সিংহকে লইয়া আসিল। সিংহ আসিয়া যথারীতি অভিবাদন করিয়া মহম্মদ খাঁর সম্মুখে দাঁড়াইল।

খাঁ সাহেব চাহিয়া দেখিয়া বুঝিলেন, লোকটা নিতান্ত যে সে নহে। কর্ম্ম-শক্তি ও ক্রুরতা তাহার মুখ-দ্যুতিতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে। প্রত্যভিবাদন করিয়া পার্শ্বপতিত শূন্য চৌকিতে বসিতে অনুরোধ করিলেন। সিংহ আসন গ্রহণ করিয়া বলিল,—"খাঁ সাহেব, আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও বিশেষ একটা কাজে আসিয়াছি। যদি বিশ্বাস করেন, আর অভয় দেন,—আমার কথা বলিতে পারি। আর যদি আমাকে দয়া করিয়া কিছু সাহায্য করেন, তবে আমি আপনাদের এতদূর সাহায্য করিতে পারি যে, আপনারা নির্ব্বিঘ্নে এ দেশ জয় ও লুণ্ঠন করিতে পারেন।"

মহ। আপনার কি কথা আগে বলুন। যদি আমরা আপনার কথা সঙ্গত বিবেচনা করি এবং আপনার কথিত কার্য্য নিরাপদ ও সুবিধা জ্ঞান করি, অবশ্যই করিব।

সিংহ। আপনারা বঙ্গদেশীয় কোন যুবককে গুপ্তচর করিয়া রাজ্য-মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন?

মহ। সে কথা কেন?

সিংহ। আমি তাহার সম্বন্ধে বিশেষ সংবাদ দিতে পারিব।

মহ। হাঁ।

সিংহ। সে মহা অবিশ্বাসী।

মহ। কি করিয়াছে?

সিংহ। আপনাদের আগমনের কথা রাজাকে বলিয়া দিয়াছে।

মহ। তাহাতে তাহার কি স্বার্থ আছে?

সিংহ। স্বার্থ আছে,—এ দেশে একটি বাঙ্গালীর মেয়ে ছিল,—রাজা ঐ মেয়েটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তার পিতা মাতা আসিয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিতেছিল.—কোনরূপ যুদ্ধাদি না করে, তাহারই প্রতিভূস্বরূপে ঐ মেয়েটিকে রাজসরকারে রাখিয়াছিল—সেই মেয়েটার সঙ্গে ঐ যুবকের প্রথম সাক্ষাতেই ভালবাসা হয়, রাজার নিকটে আপনাদের সমস্ত গুপ্ত সংবাদ বলিয়া দিয়া তদ্বিনিময়ে যুবক সেই যুবতীকে লাভ করিয়াছে।

মহ। সেই যুবক এখন কোথায়?

সিংহ। লুনীর ওপারেই—সেই মেয়েটার পিতার আশ্রমে উভয়ে বাস করিতেছে।

মহ। সেখানে কি রাজার সৈন্য-সামন্ত আছে?

সিংহ। না।

মহম্মদ খাঁ কি চিন্তা করিলেন। তারপরে বলিলেন,—"আপনার কি কাজ করিলে, আপনি আমাদিগকে এ রাজ্য আক্রমণের সুবিধাজনক উপায় বলিয়া দিবেন, বলিতেছিলেন?"

সিংহ। আমিও বাঙ্গালী—বঙ্গদেশ আমারও জন্মভূমি। তবে এ দেশে অনেক দিন আছি—এ দেশে অনেক বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছি,—এ দেশের রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত আমায় জানে। আমিও দেশের সমস্ত পথ-ঘাট আচার-বিচার জানি।

মহ। বলুন, আপনার কি কাজ?

সিংহ। সেই বিশ্বাসহন্তা বাঙ্গালী যুবককে যদি বন্দী করিয়া নিহত করেন।

মহ। আপনার লাভ?

সিংহ। সে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী—আমি সেই যুবতীকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতাম। সেই নরাধম আসিয়া না যুটিলে যুবতী আমাকেই বিবাহ করিত।

মহ। আপনি বলিলেন, এ দেশে আপনার সম্পত্তি ও সহায় আছে। কিন্তু যুবক এ দেশে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অসহায়—আপনি তাহাকে নিহত করিতে অপারগ কেন?

সিংহ। যুবতী তাহাকে ভালবাসে—যুবতীর সাহায্যে সে আমার অপরাজেয়।

মহ। আমরা যদি তাহাকে ধৃত ও বন্দী করিয়া দেই, আপনি আমাদের কি সাহায্য করিতে পারেন?

সিংহ। কি প্রকারে কোন্ পথ দিয়া রাজ্য আক্রমণ করা সহজ—রাজার গুপ্ত ধনাগার কোথায়—সমস্ত বলিয়া দিতে পারিব।

মহম্মদ খাঁ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"কল্য প্রত্যূষে কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য যুবককে ধৃত করিতে যাইবে; আপনি তাহাদের পথপ্রদর্শক হইবেন। কিন্তু সাবধান,—বিশ্বাসঘাতকতার দণ্ড মৃত্যু,—ইহা যেন স্মরণ থাকে।"

সিংহ মৃদু হাসিয়া বলিল—"সামরিক নিয়ম আমি অবগত আছি।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরাজয়।

রাজা কিন্তু তখনও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না. যুদ্ধ করিবেন কি মুসলমানদিগের সহিত সন্ধি করিবেন, তাহার যুক্তিই স্থির হইয়া উঠিল না।

সে দেশের প্রজাগণ প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত-পালিত,—তাহারা পশু-পক্ষীর ন্যায় প্রকৃতির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত,—উচ্চ শিক্ষা ও উচ্চ জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। তাহারা কোন বিষয়ে ধীর-স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া কাজ করিতে জানে না। লুনীর তীরে বিপক্ষগণ আসিয়া ছাউনি করিয়াছে.—অথচ রাজা কি করিবেন, তাহা স্থির করিয়াই উঠিতে পারিতেছেন না। নগরবাসিগণ কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়াও যখন রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইল না, তখন তাহারা ক্রমেই যুদ্ধার্থে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। নগরের সর্ব্বত্রই উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। স্ত্রী-পুরুষে দলে দলে সর্ব্বত্র জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিল।

তারপরে সেদিন রাত্রে নগরে যুদ্ধের সাঙ্কেতিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল। রাজা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,—সে বাদ্য-কোলাহলে রাজা ও রাজমন্ত্রি-গণ বুঝিতে পারিলেন, নগরবাসিগণ তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই বিদেশীয়গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছে। তিনি নিষেধ করিলেও আর কেহ শুনিবে না। এখন তাহারা স্বাধীনভাবেই কাজ করিবে—রাজ-শক্তি উল্লঙ্ঘন করিয়াই তাহারা কাজ করিতে আরম্ভ করিল। রাজার কিন্তু তখনও কোন বিষয়ে যুক্তি স্থির হইল না।

নগরবাসিগণ দলে দলে বর্শা-বল্লম প্রভৃতি তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও কুক্কুরাদি লইয়া স্ত্রীপুরুষে একত্রে মিলিয়া যুদ্ধ করিতে ধাবিত হইল।

তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, কতক লুনীর বাঁক ঘুরিয়া মুসলমান ছাউনির পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবে, কতক দুই পার্শ্ব হইতে এবং কতক সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিবে। যাহারা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবে,—তাহারা লুনীর বাঁকে পার হইয়া কমলার পিতার আশ্রমের পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া আসিবে।

নগরবাসিগণ সেই রাত্রেই নগর ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল।

তখনও ভাল করিয়া প্রভাত হয় নাই,—প্রভাতের পরিষ্কার আলোক

ধরাতল আলোকিত করে নাই,—উষার আবিল-আলোকে পৃথিবী হইতে নিশার আঁধার কেবল সরিতেছিল।

মহম্মদ খাঁর আদেশে একদল মুসলমান সৈন্য সিংহের সহিত সেই সময় গোলোকনাথকে ধৃত করিবার জন্য কমলার পিতার আশ্রম অভিমুখে গমন করিতেছিল।

যখন তাহারা আশ্রমের প্রায় সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, সেই সময় যুদ্ধার্থী নগরবাসিগণের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল।

নগরবাসিগণ তাহাদিগকে দেখিবামাত্র পার্শ্ববর্তী জঙ্গল মধ্যে লুকাইয়া পড়িল।

মুসলমানগণ তাহাদিগকে দেখিতে না পাইলেও সিংহ দেখিতে পাইয়াছিল,—কিন্তু সে অনেক চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিল না যে, নগরবাসিগণ যুদ্ধবেশে কেন এদিকে আসিতেছিল! রাজাজ্ঞা প্রচারিত না হইলে কেহই যুদ্ধ করিতে আসিবে না—তবে ইহারা কোথায় যাইতেছে? শেষে স্থির করিল, হয়ত ইহারা অন্য কোন স্থানে পশু-হনন কার্য্যে গমন করিতেছে। বিশেষতঃ তখন যদি মুসলমান-সেনাপতিকে সে কথা বলে, তাহা হইলে যুবককে ধৃত করিতে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে পারে,—সুতরাং নগরবাসী-সৈন্যগণের নিকটে কথা সে আর উল্লেখই করিল না।

কিন্তু ইহাতে মুসলমান সৈন্যগণের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। যখন তাহারা সেই জঙ্গলের ভিতর ভাগে উপস্থিত হইল, তখন নগরবাসীদল অতর্কিত-ভাবে সিংহ-বিক্রমে তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু মুসলমানগণ তখন সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিল, অধিকন্তু নগরবাসিগণ বনান্তরাল হইতে বর্শা চালাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। কাজেই তাহারা দাঁড়াইয়া মরিতে লাগিল, অল্পক্ষণ মধ্যেই মুসলমান সৈন্যগণ হাতে অস্ত্র করিয়া প্রাণত্যাগ করিল। কারণ শত্রুগণকে তাহারা দেখিতেই পাইল না—কাহার উপর অস্ত্রত্যাগ করিবে? সম্মুখে পলাইবার উপায় ছিল না। নগরবাসিগণ জঙ্গলমধ্যে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একেবারে সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। উভয়পার্শ্বে দুরধিগম্য জঙ্গল।

সিংহ বিপদ দেখিয়া জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া প্রাণ বাঁচাইল। শতাধিক মুসলমান সৈন্য নিহত করিয়া নগরবাসিগণ জয়োল্লাসে মুসলমান-শিবির আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল।

চারিদিক্ হইতে নিষ্ঠুর আক্রমণে মুসলমান-সেনাপতি মহম্মদ খাঁ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কয়েকদিন পর্য্যন্ত অমিততেজে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় বর্ষা নামিয়া পড়িল। বর্ষার সঙ্গে প্লাবন দেখা দিল,--কাজেই মহম্মদ খাঁ বিপদ গণিলেন। তাঁহার যুদ্ধ-পশু-গণ প্লাবনে ভাসিয়া যাইতে লাগিল, খাদ্য-সম্ভার বিনষ্ট হইয়া গেল। অনেক লোক প্লাবনে আত্মরক্ষা করিতে পারিল না।

মহম্মদ খাঁ কয়েকজন মাত্র সঙ্গীর সহিত কোন প্রকারে সে দেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন।

সিংহ ফিরিয়া রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পথে।

সেই অবধি রাজ্য মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল। প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাজা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও দেবীর বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল।

কমলার নিকটে দলে দলে প্রজাগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল এবং তাহাকেই সিংহাসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিল।

কমলা প্রজাগণকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমলা রাজাকে আশ্রমে ডাকাইয়া প্রজাগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলিল এবং প্রজাগণকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিল। প্রজাগণ শান্ত হইল।

কমলা তখন সেই আশ্রমে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিল এবং প্রজাগণকে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত মধুর ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিল। রাজাও সে ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেই বর্ষাধারী নিষ্ঠুর পার্ব্বত্যজাতি হরিপ্রেমের মধুরতা উপলব্ধি করিয়া খোল করতাল সহযোগে নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। পশুহত্যা পরিত্যাগ করিয়া জীবে দয়া করিতে শিক্ষা করিল।

কমলা এই সকল দর্শন করিয়া বড় সুখী হইল। তাহার পিতা যাহা

করিবার জন্য এই অসভ্যদেশে আগমন করতঃ অসভ্যগণের হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন, সে যে অল্পদিনের মধ্যে সেই কার্য্যে সাফল্য-লাভ করিতে পারিল, ইহাতে তাহার আর আনন্দ ধরিত না। তাহার মনে হইত, তাহার পিতার আত্মা স্বর্গলোকে থাকিয়া এই ব্যাপার দর্শনে নিশ্চয়ই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাহার পিতা যে কার্য্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন. সে কেবল তাহাতে চেষ্টারূপ সামান্য বারিদানে ফললাভ করিয়াছে মাত্র।

গোলোকনাথ এই ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে তাহার সমস্ত শক্তি সংযোজিত করিয়াছিল। সে দল বাঁধিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিত। সুমধুর পদাবলী রচনা করিয়া গাহিয়া গাহিয়া সে দেশের লোকদিগকে শিক্ষা দিত, মাদল ভাঙ্গিয়া মৃদঙ্গ প্রস্তুত করিয়া তাহা বাজাইয়া সাধারণকে শিক্ষা দিত।

এইরূপে সেখানে তাহাদিগের প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যার পরে গোলোকনাথ, কমলা ও মিনিয়া বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল। কথায় কথায় মিনিয়া বলিল,—"দেবি, আর কেন? এখন তোমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হও। তারপরে গড়ে চল। আর বিলম্ব করা উচিত নয়।"

কমলা মৃদু হাসিয়া বলিল,—"বিবাহ না করিলে গড়ে যাইবার অধিকার হইবে না কি?

মিনিয়া। না দেবি, সে কথা বলিতেছি না। তবে শুভকাজে আর বিলম্ব করা কেন?

কমলা। মিনিয়া, তুমি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তমা,—

বাধা দিয়া মিনিয়া বলিল—"সে কথা আপনি বলিবেন কেন,—আমি গড়ের প্রধান পুরোহিতের নিকটেও সে কথা শুনিয়া আসিয়াছি—আপনি জন্মে জন্মেই আমাকে এইরূপ কৃপা করিয়া থাকেন। সে জন্মেও আমি আপনার প্রধান সেবিকা ছিলাম।"

কমলা বিস্ময়-চকিত নয়নে গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিল। গোলোকনাথ মৃদু হাসিয়া মিনিয়ার দিকে চাহিয়া বলিল,—"তোমাদের পুরোহিত আমার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কি? তোমাদের দেবীর সহিত আমার কত জন্মের সম্বন্ধ?"

মিনিয়া। হাঁ, তিনি আপনার কথাও বলিয়াছেন। আপনি জন্মে জন্মেই দেবীর সঙ্গে আছেন। আপনিই দেবীর যুগ্মাত্মা,—আপনিই দেবীর স্বামী। যে জন্মে দেবী গড়ে ছিলেন,—সে জন্মেও আপনি গড়ে ছিলেন। আপনার সে জন্মের দেহ গড়ের মধ্যে দেবীর দেহের পার্শ্বেই অবস্থিত আছে। এ দেহে আর সে দেহে কোন পার্থক্য নাই—আমি নিজ চক্ষে তাহা দর্শন করিয়াছি।

গোলোক। সে দিন তুমি বলিয়াছিলে,—তোমাদের দেবী প্রায় হাজার বৎসর গড় পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন,—সম্ভবতঃ আমারও সে দেহ ত্যাগ সেই সময়েই ঘটিয়াছিল,—তবে কি প্রকারে সেই রক্ত মাংসের শরীর এতদিন না পচিয়া অবিকৃত রহিয়াছে ?

মিনিয়া। কি প্রকারে অবিকৃত থাকে, তাহা আপনি না জানিলেও দেবী জানেন ;—দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।

গোলোকনাথ হাসিতে হাসিতে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"বল গো, তুমিই বল, কি প্রকারে রক্ত-মাংসের দেহ হাজার বৎসর অবিকৃত থাকে ?"

কমলা তরল অথচ কুটীল-বক্র চাহনিতে গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া বলিল,—"আমি দেবতা, সব কথা কি মানুষের সঙ্গে বলি !"

গোলোকনাথও হাসিল। হাসিয়া বলিল—"জন্মে জন্মে দেবতার লেজে ঘুরিয়াও কি এতটুকু অধিকার পাই নাই ?"

কমলা। আরও দু' দশ জন্ম ঘোর—তারপরে সে সব জানিতে পারিবে।

গোলোক। তাই হোক—ঠাকুর-দেবতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহা অন্যায়। এখন মিনিয়া যে কথা বলিতেছিল, তার কি ?

কমলা। কি কথা ?

গোলোক। বিবাহের ?

কমলা। আত্মিক বিবাহ অনেক দিনই সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। দৈহিক মিলনের বিশেষ প্রয়োজনও দেখি না।

গোলোক। তবে কি সাগরকূলে বসিয়া তৃষ্ণায় বুক ফাটাইব ?

কমলা। কিসের তৃষ্ণা ?

গোলোক। প্রাণের একটা আকাঙ্ক্ষা নাই কি ?

কমলা। সত্য কথা—আমি তোমার কথা বুঝিতে পারি না। এ আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই বলিয়াই আমার ধারণা। বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—'জনম ভরিয়া পেখনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।' দেখিয়া দেখিয়া দেখার সাধ মিটে না,—তবে আকাঙ্ক্ষা যাইবে কেন? আমার বিবেচনায় এই আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিই আনন্দ। আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করিবার জন্যই সংযম সাধনা,—সংযমে এ আকাঙ্ক্ষা বাড়ে—সংযমেই প্রেমের আনন্দ—চোখে চোখে খেলে।

গোলোক। হা'র মানিলাম! তবে তাই হোক,—জনম ভরিয়া নয়নে নয়নে থাকি,—

কমলা। আমি বুঝি, সেই প্রেম।

গোলোক। এ প্রেমের সাধনা কোথায়?

কমলা। কেন? বৃন্দাবনে—গোপীভাবে।

গোলোক। তবে আমরা এইরূপেই প্রেমের সাধনা করিব।

কমলা। মহাজনেরাও তাই বলিয়া গিয়াছেন—'জলেতে নামিবে কিন্তু না ভিজিবে পা।' এইরূপ প্রেমেই মাধুর্য্যরসের সংপ্রাপ্তি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

উজ্জ্বলে মধুরে।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

প্রেমের রাজ্যের একটা বিধান আছে, 'যে যাহারে চায়, সে তাহারে পায়।' কেন পায়, এ যাবৎকাল তাহার কোন উত্তর হয় নাই! অনেকে অনেক প্রকারে সে তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তথাপি বুঝি সর্ব্ববাদিসম্মত 'মনের মত', উত্তর মিলে নাই। না মিলুক, মিলন যে হয়, তাহা সকলেই জানেন। এখন উজ্জ্বলে মধুরের কবির প্রথম নায়কের নায়িকা মাধুরীর প্রাণের গোপনপুরে কে অদৃশ্যভাবে প্রেমের প্রথম মিলনের শুভবার্ত্তা পঁহুছাইয়া দিল। মাধুরী তাই সে গোপন-সংবাদে বিচলিত হইয়া গাহিল—

"খেলি আ'জ ধ'রে চাঁদের কর।
মন ভাসে কি উল্লাসে, শুনেছে কার স্বর।
তুলে তান পাখীর সনে, গা'ব আ'জ আপন মনে,
বাজে বাঁশী প্রাণবিলাসী প্রাণে নিরন্তর—
সাজি আ'জ ফুলের হারে, করি প্রাণ সুধার ধারে,
সাজাব সুরভি দিয়ে হৃদয়-বাসর।"

যিনি মাধুরীর ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিয়াছিলেন, তাঁহার গলার স্বর সুললিত ও মধুর, কিন্তু বয়সটা যেন পীরিতি-রোগে ধরার চেয়ে অনেক অধিক। আর দৈহিক আয়তনটাও কিছু অমানান গোছের। তবে 'না হইলে বয়োধিকে রসিকে প্রেম জানে না?' নিধুবাবুর এ মতে বয়সের পরিপাকে রসাধিক্য হইতে পারে। যাক্, মাধুরীর গানে রঙ্গমঞ্চ মঞ্জকুল হইয়াছিল।

এদিকে যখন প্রেমের পূর্ব্বরাগে কার স্বর শুনিয়া উল্লাসে নায়িকার মন ভাসিতেছিল, সেই সময় নাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অভীপ্সিত রূপ দেখিয়া মদন মুগ্ধ হইলেন,—সমস্ত প্রাণখানি লইয়া তাহার পদতলে সমর্পণ করিতে ব্যস্ত হইলেন। মাধুরী কিন্তু হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণভাবে চাপিয়া গেলেন,—সহজে ধরা দিতে স্বীকৃতা নহেন। বুঝি মনে করিলেন, ধরা দিলেই মারা পড়িব—এমন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে হয়। বিশেষতঃ রমণীর ধারাই এইরূপ। রমণী বুঝি মনে ভাবেন, মোল্লা সাহেবের মত প্রণয়ী-কুক্কুটের গলায় ছুরিকা বসাইয়া ছাড়িয়া দিব,—সে ছটফট করিয়া মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে পদতলে লুঠিয়া ফিরিবে। মাধুরী সরিয়া পড়িলেন,—মদন প্রেমের দাগা বুকে লইয়া হাহারবে হৃদয়ের প্রত্যেক তন্ত্রীতে ব্যথা তুলিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

উজ্জ্বলে মধুরের কবি এই প্রেমের দুইটী ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন। এক-দিকে মদন ও মাধুরী, আর একদিকে মোহন ও মহিমা।

মহিমা বড় সরলা। সে মোহনকে পাইয়া হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ভালবাসার কথা জ্ঞাপন করিল। বুঝি প্রেমের একটা বেয়াড়া ধরণ এই যে, যাচিলে প্রেম মিলে না। চাহিলে দিতে চায় না। উজ্জ্বলে মধুরের কবি সেই ভাবটা অতি স্পষ্টরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন।

মোহন যখন পেত্নী তাড়াইবার ঔষধ অন্বেষণে ব্যস্ত, সেই সময় মহিমার সহিত সাক্ষাদর্শন ঘটিল। কেমন একটু সূক্ষ্ম কৌশল এ স্থলে নিহিত;—

মোহন তাহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুভবের তন্ত্রী হইতে ভালবাসার সিংহাসন-খানি দূরে ফেলিয়া দিতে সচেষ্ট,—কবি তাই স্থূল কথায় পেত্নী তাড়াইবার ঔষধ অন্বেষণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চেষ্টাই অন্বেষণ।

যে অভিনেত্রী মহিমা সাজিয়াছিল, সে বড় সুন্দরী এবং বয়সে কিশোরী। এমন স্বাভাবিক ভাবে অভিনয় করিয়াছিল যে, দর্শকের মনে হইয়াছিল—ছুঁড়ীটা প্রেমের হাঁপানীরোগে একান্তই মারা যায়। মোহন যখন পেত্নী তাড়াবার ঔষধ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন হঠাৎ মহিমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ওগো, শুন্‌ছো, এ বনে পেত্নী তাড়াবার একটা গাছের শেকড় দেখিয়ে দিতে পার? আমার ভারি দরকার। আমি তোমায় উত্তম বক্‌শিশ্‌ দিব।"

সে পেত্নী কিন্তু তাহার হৃদয়-সিংহাসন যুড়িয়া চিরদিন বসিয়া আছে। আ'জ বুঝি প্রকট হইয়া দেখা দিল। সে বলিল,—

মহিমা। "কি রতন আশে, এ বিজন বাসে,
এসেছ একাকী কে তুমি বল না?"

মোহন। কি জ্বালাতনেই পড়লুম। আরে রতন ফতন নয়—সেই পেত্নী তাড়াবার শেকড়টা—এই যে বিশবার বল্‌লেম!

মহিমা। হৃদয়ের ধন, লহ প্রাণ মন,
তোমা তরে দেখ মরে এ ললনা।

আর একবার বলিয়াছি,—সাধিলে প্রেম মিলে না। মোহন পিছাইয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। সে গাহিল—

চেপে যাও প্রেমের আদর।
মাথা খাও—ফিরে যাও, কেন চাও সাজাতে বাঁদর?
ছাড় ভাণ উপাসনা,
মিছে ঠকাবার বাসনা,
চিন্‌তে পারি রাঙ কি সোণা,
প্রাণটা আমার কষ্টিপাথর॥

মোহনের কিন্তু এ কথার সার্থকতা আমরা ঘটনার কোথাও অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। মোহন যাহাকে রাঙ্‌ বলিয়া এখন পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, সময়ে তাহাকেই কষিত কাঞ্চন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। তবে ইহাতে গ্রন্থকারের সূক্ষ্ম দর্শনের পরিচয় বড় স্ফুটতর ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রেমের যখন প্রথম অনুরাগ, তখন অনেক স্থলেই এমন হয়। সকলের হয় না,—যাহারা 'ঘা' খাইয়াছে—যাহারা জাল ছিঁড়িবার চেষ্টা করে, তাহারা প্রথমে মনকে বুঝাইতে যায়—এর কত দোষ—দোষগুলির বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া মনকে দেখাইয়া দেয়, কিন্তু মনের মত বস্তু পাইলে মন প্রবোধ মানে না—ক্ষুব্ধ লুব্ধ পতঙ্গের মত সে সে বহ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

মদন ও মাধুরী, মোহন ও মহিমার যখন এইরূপ ভাবে পূর্ব্বরাগের অভিনয় চলিতেছে, তখন সখ ও শোভা আসিয়া দর্শন দিলেন। উদ্দেশ্য, উভয়ের এই প্রেমের গাঙে বানের বল আনয়ন করা।

সখ ও শোভা সুন্দর ভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গানে তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য আমরা বুঝিয়া লইতে পারিয়াছিলাম। সখ ও শোভার সেই সংগীতটি এই—

সখ। I am a Cuckoo.
Spring Harbinger ডাকি কুঃ কু; কুহু কুহু কু।
শোভা। I am a Butterfly,
উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে ফুলের মধু খাই;
উভয়ে। Lulla ra ra ra cling clung cling clung clung.
সখ। যখন Lovers বিরহেতে করে হা হা হু,
আমি কানের কাছে করি কুহু কুহু কু।
শোভা। যখন Lovers বিরহেতে ফেলে খালি Sigh,
তাদের কাছে, আমি উড়ে গিয়ে বলি fie fie fie.
উভয়ে। Lulla ra ra ra cling clung cling clung clung.
যখন Lovers বিরহেতে ফেলে খালি tears,
তাঁর আঁখিজল মুছে দিয়ে, হাসিমুখ করে দিই, দিয়ে কত cheers,
Lulla ra ra ra cling clung cling clung clung.

এ সখ ও শোভা বাবুদের—কাজেই ইঁহারা ইংরেজী বিদ্যার পরিচয় না দিবেন কেন? প্রেমটা যে প্রকারে ঘটিতেছে, তাও বুঝি ইংরেজী হিসাবে—নতুবা হঠাৎ এতকাল পরে স্বর্গের পুরাতন চাঁদের মর্ত্ত্যের প্রেম দেখিতে সাধই বা হইবে কেন?

বারান্তে প্রকাশ্য।

সিংহাসনারোহণ। ৫২৬ পৃষ্ঠা।

ড্যামেজ-সুট।

যে শুনিল সে-ই হাসিয়া উড়াইয়া দিল ;—ডাইভোর্সের মোকদ্দামা হইতেই পারে না। বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদের মোকদ্দামার নাম নাকি ডাইভোর্স। যখন তাহার সহিত আমার সাতপুরুষের মধ্যে কোন ব্যক্তিরই বিবাহ হয় নাই, তখন বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছেদ হইবে কি প্রকারে ? মাথা না থাকিলে, মাথা ব্যথার সম্ভাবনা কোথায় ?

একটা মোকদ্দামা করিয়া তাহাকে জব্দ করিতেই হইবে। বলিয়াছি ত, তাহার জ্বালায় কত দীর্ঘ দিন আর জ্বলিয়া মরিব ? কেহ কেহ বলিলেন, ড্যামেজ-সুট চলিতে পারে।

তবে তাই হোক্, ড্যামেজ-সুটই করি। এখন একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্, ড্যামেজ-সুটের আর্জ্জিতে কি লিখাইব। নতুবা উকীলের নিকট গিয়া টীটকারি সহ্য করা পোষাইবে না।

ড্যামেজ-সুট মোকদ্দামার বোধহয় এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, কেহ জোর করিয়া কোন ব্যক্তির দ্রব্য বা বস্তুবিশেষের ক্ষতি করিলে—বিনষ্ট করিলে—ব্যবহারের অনুপযুক্ত করিলে—সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লওয়া ? কেমন,—আমি যাহা বলিলাম, ইহাই ঠিক কি ?

ইহা যদি ঠিক হয়,তবে এখন দেখিতে হইবে,সেই হতভাগা—সেই আমার দেবতা, আমার চিরানন্দদায়িনী, আমার বক্ষ-পঞ্জরে চিরব্যথাপ্রদায়িণী, আমার কোন্ বস্তুটা অকর্ম্মণ্য বা রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছে।

সবই নষ্ট করিয়াছে। কিছুই নাই—আমার বলিতে কিছুই নাই। যকৃৎ-পীড়াগ্রস্ত মানুষ যেমন সর্ব্বত্রই হরিদ্রাবর্ণ দেখে, সেই পাষাণী-প্রাপ্ত আমি,—আমি সবই বিভিন্ন প্রকারে দেখিতেছি। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আস্বাদন প্রভৃতি সবই আমি ভিন্ন রকমে করিয়া থাকি। রজ্জু দেখিয়া যে কারণে মানুষের সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, মরীচিকা দেখিয়া যে কারণে জল বলিয়া মিথ্যা জ্ঞান জন্মে, সেই কারণে—তাহারই মধুর বাঁশরী-নিক্বণে—তাহার রূপোজ্জ্বল হাস্যস্ফুরণে আমার দর্শনাদি সমস্তই বিভিন্ন রকমের হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এমন বলিলে ত আর মোকদ্দামার আর্জ্জি লেখা চলিবে না।

আসল কথা বলিতে হইলে বলিতে হইবে, আমার প্রাণটাই সে ড্যামেজ

করিয়া দিয়াছে। সে রাক্ষসীর—সে পাষাণীর—সে আমার সর্ব্বস্বধনের সহিত আমার কি বাদ ছিল গো.—কেন আমার প্রাণটাকে এমন ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিয়া গেল।

তোমরা হাসিতেছ,—হাসিয়ো না। আপন আপন প্রাণের দিকে চাহিয়া দেখ, সকলেই আমার মত বিকলপ্রাণ—বৈকল্য শক্তি লইয়া 'কলুর চোখ' বাঁধা বলদের মত' তার নিয়োগেই ঘুরিয়া মরিতেছ। তবে বুঝিতেছ না—স্থির হইয়া ভাবিতেছ না—তাই যা শান্তি। যার সর্ব্বস্ব চুরি গিয়াছে, সে যদি জানিতে না পারে, তবে তাহার কিছুই চুরি যায় নাই।

যাক্, নিজের জ্বালায় নিজে অস্থির—পরচর্চ্চায় প্রয়োজন কি? এখন আমাকে ঠিক করিতে হইবে, যে প্রাণকে ড্যামেজ করিয়া দিয়া সয়তানী ব্রজ-ধামে চলিয়া গিয়া মহাযোগিনী সাজিতে বসিয়াছে,—আমাকে পাগল করিয়া দিয়া—আমার অস্থি-মজ্জায় তপ্ত ইক্ষুরস ঢালিয়া দিয়া বংশী শিক্ষা করিতে বসিয়াছে—সেই প্রাণ কি?

এখন কেন ঠিক করিয়া রাখিব, তাও বলি শোন। বিচারক যখন জিজ্ঞাসা করিবেন, সে তোমার প্রাণকে ড্যামেজ করিয়া দিয়া পলায়ন করি-য়াছে বলিতেছ—এখন বল ত সে প্রাণ কি এবং তাহার মূল্য কত? তখন কি বলিব? ঠিক কথা বলিতে না পারিলে, মোকদ্দমা টিকিবে না,—লাভে হইতে 'হাতের কড়ি' বিনাশ হইবে, আর সেই পাগলকারিণী প্রলয়সাধিনী আসিয়া উল্টা খরচার ডিক্রী লইয়া আমাকে দেশছাড়া করিবে। হয় ত দেনার দায়ে 'দাসখত' লেখাইয়া লইয়া তবে ছাড়িয়া দিবে।

অনেকে বলেন, এই যে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে—ইহাই প্রাণ। শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হইলেই প্রাণ যায়। না না, আমি সে কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। সে কি শুধু আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের উপরই কার্য্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে? অনেক যোগী এবং ভেক প্রভৃতি অনেক জীব শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে পারে। যদি শ্বাস-প্রশ্বাসই প্রাণ হইত, তবে কি আমাকে সে এত কাতর—এত উন্মাদ—এত অকর্ম্মণ্য করিতে পারিত! তার সেই বিশ্ববিমোহন সৌন্দর্য্য লইয়া কুম্ভক করিয়া বসিয়া থাকিতাম। সমস্ত বৃত্তি-গুলি তদভিমুখী হইত না। তবে প্রাণ কি?

দার্শনিকগণ বলেন—"জগদুৎপত্তির কারণীভূতা অনন্তসঙ্গব্যাপিনী বিকা-শিনী শক্তিকে প্রাণ বলে। এই প্রাণই সৃষ্টি করেন, স্থিতি করেন

ও লয় করেন। প্রাণই গতিরূপে প্রকাশ পাইয়াছেন,—এই প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ অথবা চৌম্বুকাকর্ষণ শক্তি রূপে বিকাশ পাইতেছেন। এই প্রাণই স্নায়বীয় শক্তি-প্রবাহ অথবা চিন্তা-শক্তিরূপ, দৈহিক সমুদায় ক্রিয়ারূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। চিন্তাশক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সামান্য দৈহিক শক্তি পর্য্যন্ত সমুদায়ই প্রাণের বিকাশ মাত্র। বাহ্ ও অন্তর্জ্জগতের সমুদায় শক্তি যখন তাহাদের মূলাবস্থায় গমন করে, তখন তাহাকেই প্রাণ বলে। শ্বাস-প্রশ্বাস তাহার একটু স্ফুরণ মাত্র।"

তোমরা শুনিয়াছ, সকল দেশের সকল লোকেই বলিয়া থাকেন, 'যাহার প্রাণ ভাল, তাহার সব ভাল।' প্রাণের একাগ্রতাই সাধনা—প্রাণ জয়ই সাধনার উত্তম উপায়। ইহার কারণ, আর কিছুই নয়, প্রাণই আমাদের সর্ব্বস্ব। যাহা সর্ব্বস্ব—তাহা যদি স্থির না হয়, তবে কাজ হইবে কি প্রকারে?

এখন বিচারক কি বুঝিতে পারিবেন না, আমার জ্বালা কত? পাষাণী যে আমার সেই প্রাণকেই ড্যামেজ করিয়া দিয়াছে। আমার সাধনা গিয়াছে, ভজনা গিয়াছে,—ইহলোকের সুখ-শান্তি সব গিয়াছে। শুধু আছে তার ব্যবহার করা—পদদলিত ভগ্ন প্রাণ। তবে বল দেখি,—ড্যামেজের দাবি করিতে পারি কি না?

বেদে সমুদয় জগৎকে এক সত্তা-সামান্যে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে,—সেই সত্তা-জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনিই জগত্তত্ব অবগত হইতে পারিয়াছেন। সেই সত্তা-সামান্যকেই এক প্রাণরূপ সামান্য শক্তিতে পর্য্যবসিত করা হইয়াছে। সুতরাং যাঁহার প্রাণ পরিষ্কার—প্রাণ অক্ষত, অবেদনাযুক্ত—তিনি জীবন্মুক্ত। তিনি জগত্তত্ব ও জগতের আদি কারণ এবং আপনাকে জানিয়াছেন। তিনি জানিয়াছেন,—আমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী অজর ও অমর। তিনি জলে ডুবেন না, আগুণে পোড়েন না, অস্ত্রে ছিন্ন হন না। শীত-গ্রীষ্ম সুখ-দুঃখ অনুভব করেন না—ইন্দ্রিয়-সন্তাড়নে বিচলিত হন না।—পাষাণী যে আমার প্রাণ লইয়া খেলা করে—তাই ত বলিতেছিলাম, যে জিনিষ যেমন দেখা উচিত, আমি তার বিপরীত দেখি। যাহা নাই—তাহাই আছে বলিয়া অনুভব করি, যাহা আছে—তাহার খোঁজ পাই না।

তবে কি সত্যই সে আমার শত্রু? শত্রু-মিত্র বুঝি না,—তবে সেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী—সেই আমার শতজন্মের ধ্রুবতারা, সে-ই ভ্রম জন্মাইয়া শুক্তিতে মুক্তা জ্ঞান আনিয়া দেয়। সে মহামায়া।

কিন্তু আমার একটা আশ্বাসের কথা আছে,—সে যোগমায়া সাজিয়াছে। আমাকে উদ্ধার করিবে বলিয়া—আমার ভ্রম ঘুচাইবে বলিয়া—আমার হৃদয়ের গাঢ় অমানিশার কৃষ্ণ-যবনিকা সরাইবে বলিয়া সে ফাঁকি প্রেমের সাধনা করিতে বসিয়াছে।

কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছি। এইরূপেই আমার মোকদ্দমাটা যাবে। যাকে জব্দ করিব—যাঁর নামে মোকদ্দমা চালাইব, তাকে যদি এমন ভাল বলি, তবে মোকদ্দমা টিকিবে কেন?

তবে বুঝি আর মোকদ্দমা করা হয় না। সে যে আমার প্রাণের মধু-বিন্দু!

এক দেশের এক ভদ্রলোকের রাজদণ্ড হয়, তাহাকে পথবিহীন এক পর্ব্বত-চূড়ায় রাখিয়া আসে। একদিন রাত্রে সেই নির্ব্বাসিত ভদ্রলোকের এক বন্ধু পর্ব্বতের তলদেশে গিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "বন্ধু! কি প্রকারে তোমাকে উদ্ধার করিতে পারি?" নির্ব্বাসিত ভদ্রলোক বলিলেন,—"এ পর্ব্বত হইতে নামিবার পথ নাই। তুমি যদি এক কাজ করিতে পার, তবে উদ্ধার হইতে পারি।" বন্ধু বলিলেন—"তোমার উদ্ধারের জন্য জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারি, কি করিতে হইবে বল?" নির্ব্বাসিত ব্যক্তি বলিলেন,—"আগামী রাত্রে এক গাছা লম্বা মোটা দড়া, দীর্ঘ লম্বা সূতা খানিক ও খানিক লম্বা সূক্ষ্ম রেশমের সূতা এবং একটু মধু ও একটি গুব্‌রে পোকা লইয়া আসিয়ো,—সম্ভবতঃ তদ্দ্বারাই আমি উদ্ধার হইতে পারিব।" বন্ধু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু তৎপর দিবস রাত্রে দ্রব্যগুলি লইয়া তথায় আগমন করিলেন।

নির্ব্বাসিত ব্যক্তি—ঐ গুব্‌রে পোকার হুলে সূক্ষ্ম রেশমের অগ্রভাগ সংযুক্ত করিয়া তাহার মুখে একবিন্দু মধু লাগাইয়া ঊর্দ্ধমুখ করিয়া ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশ পালিত হইল। মধু-গন্ধে আকুল হইয়া পোকাটি মধু পাইবার আশায় দীর্ঘ-পথ-যাত্রা করিল—ক্রমে নির্ব্বাসিত ব্যক্তির নিকট পঁহুছিল। তখন তিনি রেশমের সূতাটি ধরিয়া তাহার অপর দিকে মোটা সূতা গাছটি বাঁধিয়া দিতে বলিলেন.—বাঁধা হইলে সূক্ষ্ম রেশমের সূতার সাহায্যে অপেক্ষাকৃত মোটা সূতাটি তুলিয়া লইয়া তাহার নিম্নভাগে মোটা কাছির অগ্রভাগ বাঁধিয়া দিতে বলিলেন। তারপরে সূতার সাহায্যে মোটা কাছির অগ্রভাগ তুলিয়া লইয়া পর্ব্বত-গাত্রে বাঁধিলেন এবং তাহা ধরিয়া নামিয়া আসিয়া পলায়ন করিলেন।

মহামায়া-বদ্ধ জীবাত্মার উদ্ধারের জন্য শ্রীভগবান্ বুঝি প্রত্যেকের জন্য এক এক বিন্দু মধু দিয়াছেন—সেই মধুকে জীবের যুগ্মাত্মা বলা যায়। যদি হৃদয়রূপ গুব্‌রে পোকার মুখে সেই মধু-বিন্দু লাগাইয়া ঊর্দ্ধমুখে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, —তবে সে জীবনের পথ-চিহ্নবিহীন দুরধিগম্য নির্ব্বাসনস্থানের পথ করিয়া লইতে পারে। কিন্তু ছাড়িবার কৌশলাদি মনে থাকা চাই,—নিম্নমুখ করিয়া ছাড়িয়া দিলে, কার্য্যোদ্ধার হয় না। এই মধু-গমনকেই তান্ত্রিকগণ শ্রী-সাধনা ও বৈষ্ণবগণ মাধুর্য্যরসের সাধনা বলিয়া থাকেন।

আমার মধুবিন্দু আমার হৃদয়-গুব্‌রে পোকাকে লইয়া ঊর্দ্ধমুখে ছুটিয়াছে। তবে কি মোকদ্দামা করিব না? কিন্তু প্রাণ যে স্থির হয় না,—শত সংযমেও যে তাহার স্বাভাবিকতা আসিতেছে না। তোমরা আমার শান্তি-সুহৃৎ;—আমায় বলিয়া দাও, এখন আমি কি করি?

যদি আমার মনের কথা সম্পূর্ণ না বুঝিয়া থাক, তাহার সহিত সম্বন্ধের কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়া লও। সে কথা বুঝাইতে হইলে তন্ত্রের সাহায্য লইতে হইবে—তন্ত্রের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

তবে তাই হোক। বিবেচনা করিয়া কাজ করাই ভাল। কাজ করিয়া ঠকা ভাল নয়।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

দিবাকর ও ধারাধর।

বিস্তারি বিশালকায়া নব জলধর,
আবরিছে সবিতার খরতর কর।
কহে রবি "মেঘ, তোর বিবেক অপার,
জন্মিয়া আমার করে কর অপকার।"
করুণ ক্রন্দনে মেঘ কহে, দিনকরে,
"সতত ঝরিছে অশ্রু তব অনাদরে;
দেখ পিতঃ! ফিরে যাই জননীর পাশে,
আদরে সে লয়ে কোলে কত ভালবাসে।"

শ্রীপ্রাণবন্ধু ভট্টাচার্য্য কবিশেখর সরস্বতী।

প্রাচীন-ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট। *

নিখিল বিশ্বজগতের মধ্যে একদিন যাঁহার বিজয়-বৈজয়ন্তী সগর্ব্বে উড্ডীয়মান ছিল, একদিন যাঁহার ক্রোড়ে প্রতাপের স্থায় দেশভক্ত, লীলাবতী, খনার স্থায় গণিত-শাস্ত্রবিৎ,রামের স্থায় পিতৃভক্ত ও লক্ষ্মণের স্থায় ভ্রাতৃপ্রেমিক সন্তানবর্গ শোভা পাইতেন এবং একদা যাঁহার অর্ণব-পোত "ভারত সাগর" পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিল, সেই অপরিমেয় ধনরত্নের অধিকারিণী, নৈসর্গিক শোভাসম্পদের প্রসূতি, কালিদাস, ভবভূতি, চণ্ডীদাসের গর্ভধারিণী ভারতমাতা "চির কাঙ্গালিনী" ; এ কথা বলিয়া যাঁহারা সুখী হইতে চাহেন, তাঁহারা সুখী হউন ; আমরা তাঁহাদের সুখের প্রতিবন্ধক হইতে চাহি না। তবে এই বলিতে চাই যে, ভারতমাতা চিরদরিদ্রা অথবা চিরভিখারিণী নহেন। একদিন ইঁহার ঐশ্বর্য্যের দিকে জগৎ বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে তাকাইয়া থাকিত, একদিন ইঁহার জ্ঞান-ভাণ্ডারের প্রতি অনেকেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিত। সেদিন আর্য্যসন্তান "সপ্তডিঙ্গায়" ফেনিল সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়া সুদূর মিশরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন,† সেদিন আর্য্যসন্তান জগতের দ্বারে দ্বারে জ্ঞান-বর্ত্তিকা লইয়া অজ্ঞান তমোরাশি দূরীভূত করিতেন—সেদিন আর্য্যসন্তান প্রভাতে কলকণ্ঠের সুস্বন স্বরে স্বর মিশাইয়া সাম-ঝঙ্কার করিতেন। তখন কি করিয়া অর্ণবযান প্রস্তুত করিতে হয়, তাঁহারা তাহা জগৎকে শিখাইতেন ; গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা তখন বৎসরের ভবিষ্যৎ ফলাফলের নির্দ্দেশ করিতেন। যোগবলে আপন যৌবন প্রদান করিয়া পলিত-কেশ, লোল-গণ্ড পিতাকে যুবকে পরিণত করিতেন। ‡

কিন্তু হায়! আজ সে সব কথা অতি দূর অতীতের স্বপ্নের স্থায় বোধ হয়! মন কোনমতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না যে, এই "অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ" আর্য্যসন্তানের পূর্ব্বপুরুষগণ আবার আধুনিক সুসভ্যজাতির স্থায় বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প, কলা, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে সুনিপুণ

---

* প্রসিদ্ধ East and West নামক পত্রে প্রকাশিত The Government in anciant India নামক প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ।—অনুবাদক।

† দুর্গাদাস বাবুর পৃথিবীর ইতিহাস অথবা রাধাকুমুদ বাবুর The shipping in ancient India নামক পুস্তকদ্বয় দ্রষ্টব্য।

‡ রাজা যযাতির যৌবন প্রাপ্তিবিষয়ক উপাখ্যান দ্রষ্টব্য।

ছিলেন! সত্যই কি তবে আর্য্য সন্তানগণ আধুনিক সুসভ্যজাতির ন্যায় এমনই ভাবে ব্যোমপথে চলিতে পারিতেন? সত্যই কি তবে আর্য্যসন্তান এই ভাবে আকাশের বিদ্যুৎ আনিয়া ভৃত্যভাবে নিয়োজিত করিতে পারিতেন? সত্যই কি তবে আর্য্যসন্তান মুহূর্ত্তের মধ্যে দেশ দেশান্তরে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারিতেন? সত্যই কি তবে আর্য্যসন্তান এমনই ভাবে লাট, ম্যাজিষ্ট্রেট, আদালত, চাপ্‌ড়াসী রাখিয়া দেশশাসন করিতেন? হাঁ—করিতেন বৈ কি। এমনই ভাবে আর্য্যসন্তানেরা তখন দেশশাসন করিতেন—ঠিক্ এমনই ভাবে তাঁহারা দোষীর শাস্তি ও নির্দ্দোষীর অব্যাহতি দিতেন। যদি শুনিতে চাও তবে শুন। *

আর্য্যগণ কিরূপে দেশশাসন করিতেন এবং তাঁহাদের শাসন প্রণালীই বা কিরূপ ছিল, তাহা অন্যের কথা দূরে থাকুক, মিঃ ভিনেসণ্ট্ স্মিথের ন্যায় ঐতিহাসিকও নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। ইতিহাস অধ্যয়ন ও গল্পাবলী শ্রবণ করিয়া আমরা উত্তর ভারতের প্রাচীন অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারি বটে, কিন্তু দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না। কারণ উত্তর ভারতের সহিত সে সময়ে দক্ষিণ ভারতের বড় বিশেষ কিছু সম্বন্ধ ছিল না। তখন উত্তর ভারতীয় রাজন্যবর্গ দক্ষিণ ভারতবাসীর নিকট হইতে কেবলমাত্র নির্দ্দিষ্ট কর পাইলেই আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেন; বস্তুতঃ তাঁহারা দক্ষিণ ভারতের উপর কোনও রূপ আধিপত্য প্রদর্শন করিতেন না।

ভারতবর্ষ ভৌগোলিক বিবরণানুসারে একটি দেশ বলিয়া অভিহিত হইলেও, ইহাকে একটি মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই সেণ্ট্রাল গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অতি দূরতম প্রদেশ সমূহের উপর সাক্ষাৎ শাসন পরিচালনা করা তখন কতদূর কঠিন কার্য্য ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। পাঠক জানেন, মোগল সম্রাট্‌গণের মধ্যে আওরেঙ্গজেবই অতি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত সম্রাট্ ছিলেন। এই আওরেঙ্গজেবের মত অসাধারণ শক্তিশালী সম্রাট্ কখনও ভারতের সমস্ত সুশৃঙ্খলায় রাখিতে পারেন নাই।

প্রাচীন ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা রাজতন্ত্র ছিলেন। সমগ্র দেশ তখন কতিপয় অংশে বিভক্ত ছিল, প্রত্যেক অংশে ন্যূনকল্পে এক সহস্র গ্রাম

* ৺কাশী হইতে প্রকাশিত "ধর্ম্ম প্রচারক" নামক মাসিক পত্রে মল্লিখিত "ভারত-মহিমা" নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

থাকিত। একজন গবর্ণর যে প্রদেশটী শাসন করিতেন, সেই প্রদেশটী দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত হইত, প্রত্যেক ভাগে এক একজন ম্যাজিষ্ট্রেট্ শাসন করিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্-শাসিত গ্রামগুলি আবার কতিপয় গ্রামে বিভক্ত হইত; এক একজন গ্রাম্যপতি সেই গ্রামসমূহ শাসন করিতেন। গবর্ণর ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ কর আদায়ই করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি তখন সেণ্ট্রাল গবর্ণমেণ্ট বড় দুর্ব্বল ছিলেন। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসন কর্ত্তাগণ মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহাবলম্বন করিত। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত অথবা হর্ষবর্দ্ধনাদির পূর্ব্বে দেশের অবস্থা উল্লিখিত প্রকার ছিল। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত এইরূপ শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করেন। তাঁহার সময়ে প্রজাবর্গের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়—প্রজাবর্গ আপন গ্রামের গণ্ডী ছাড়িয়া পরকীয় গ্রামের কথা ভাবিতে শেখে—তাহাদের হৃদয়ে প্রজাতন্ত্র—গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। লেফ্টন্যাণ্ট মার্ক উইল্ক্স্ এর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—"Each Hindu town-ship is, and indeed always was, a particular community or pretty re-public by itself. * * * The whole of India is nothing more than one vast congeries of such republics." অর্থাৎ যে সহরে হিন্দু বাস করে, সেই সহর প্রজাতন্ত্রের ছোট খাট একটি সভা। * * সমস্ত ভারতবর্ষ সমস্ত প্রজাতন্ত্রবাদীর সম্মিলন স্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মিঃ জেমস্ উইল সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে প্রজাবর্গের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে,—"In examining the spirint of these anci-ent constitutions and laws, we discover evident traces of a germ of republicanism" অর্থাৎ প্রাচীন আইনাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে প্রজাতন্ত্রের ভাব পরিস্ফুট দেখা যায়।

গ্রাম্যপতি গ্রামশাসন ব্যাপারে বয়োজ্যেষ্ঠ কয়েকজন লোকের দ্বারা গঠিত পরামর্শ-সভার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই সভা সাধারণতঃ গ্রামের মধ্যে বসিত; গ্রাম্যপতির পরেই গ্রাম্য পঞ্চায়েতের স্থান ছিল। এই গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রথা এখনও বঙ্গের সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়; অবশ্য পূর্ব্বের পঞ্চায়েতী প্রথায় ও এখনকার পঞ্চায়েতী প্রথায় আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। গ্রামের শান্তিরক্ষার্থ তখন "কোতয়াল" নামে এক প্রকারের পুলিশ ছিল, এখনকার চৌকিদার ও দফাদার সেই কোতয়ালের

শূন্য স্থান পূর্ণ করিতেছে। সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সময় চৌর্য্যবৃত্তি কাহাকে বলে, লোকে তাহা জানিত না ; ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, তখন পুলিশের যথেষ্ট কার্য্যদক্ষতা ও কৃতিত্ব ছিল। তাঁহার শাসনসময়ে দেশ ধনধান্যে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ছিল, অবশ্য দুর্ভিক্ষের নাম যে একেবারে অশ্রুতপূর্ব্ব ছিল, তাহা নহে। কতিপয় গ্রীক্‌লেখকের লিখিত বিবরণীতে দেখিতে পাই, তখন "ওভার-সিয়ার" নামে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল। তাহারা কতকটা আধুনিক গোয়েন্দা বা ডিটেক্‌টিভ পুলিশের ন্যায় রাজ্যে ঘটিত সন্দেহ-জনক সংবাদাবলী গুপ্তভাবে রাজার কর্ণগোচর করাইত। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও রাজা নিরাপদ ছিলেন না। অনেক প্রাচীন বংশ ষড়যন্ত্রকারীদিগের দ্বারা ধনে প্রাণে ধ্বংস হইয়াছে।

প্রাচীন ভারতীয় রাজন্যবৃন্দের সৈন্যবল বড় প্রধান বলরূপে পরিগণিত ছিল। যুদ্ধকালে সৈন্যাধ্যক্ষ নিপতিত বা পরাজিত হইলে সমস্ত সৈন্য পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত। গ্রীক্‌পর্য্যটক মিগাস্থিনিশের বিবরণীতে দেখিতে পাই, তখন যুদ্ধসম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণের সেবা, শুশ্রূষা প্রভৃতি করিবার জন্য যুদ্ধ কার্য্যালয় নামে (war office) একটি স্বতন্ত্র কার্য্যালয় ছিল। তখন জলযুদ্ধের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। তবে দেশবাসী কৃষিজীবী বলিয়া যাহাতে দেশের সর্ব্বত্র জল সঞ্চারিত হয়, তজ্জন্য প্রতিকূলাচরণ করিলে কৃষককুলকে যাহাতে শিরে করাঘাত করিতে না হয়, সে জন্য চন্দ্রগুপ্ত দেশের সর্ব্বত্রই পয়ঃপ্রণালী, জলাশয়াদি-খনন প্রভৃতি করাইবার ব্যবস্থা করেন। সম্ভবতঃ তদবধি এদেশে "জলকরের" সৃষ্টি হইয়াছে।

মিগাস্থিনিশ পাটলিপুত্র বা বর্ত্তমান পাটনা সহরের অবস্থা বর্ণন প্রসঙ্গে মিউনিসিপালিটীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাটলিপুত্র সহরে একটি মিউনিসিপাল কমিশন ছিল। সেই কমিশন কর্তৃক বাজারে বিক্রেয় পদার্থের দোষগুণাদি দেখিবার জন্য লোক নিযুক্ত হইত। বাজারে আগত বৈদেশিকগণের যাহাতে কোন অভাব না হয়, এই কমিশন তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। ইহা ভিন্ন এই কমিশন জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা স্থির করিতেন।

শুধু ইহাই নহে। সম্রাট্ অশোকের সময়ে "সেনসর" নামে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী ছিল, তাহারা লোক সাধারণের নৈতিক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিত। রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় করিয়া দুঃস্থরোগীর নিমিত্ত হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদাহরণ সম্রাট্ অশোকই সর্ব্বাগ্রে সভ্য জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত

করেন। সম্রাট্ অশোক স্বয়ং বৌদ্ধ ছিলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের "অহিংসাবাদ" তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, কাজেই দয়ার সাগর অশোক পীড়িত পশু-দিগের জন্য কয়েকটী হাঁসপাতালের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

তখন কিরূপে দেশ শাসিত হইত, তাহা নির্ণয় করিতে গেলে মনুসংহিতার শরণাপন্ন হইতে হয়। মনুর অনুশাসনই তখনকার সময়ের আইন ছিল। বলা বাহুল্য, সে সমস্ত তৎকালের দেশকাল-পাত্রোপযোগী ছিল। এ সম্বন্ধে মান্দ্রাজ হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যার থমাস্ ষ্ট্রেঞ্জের অভিমত এই—The Hindu law evidence will be read by English lawyer with a mixture of administration and delight as it may be studied by him to advantage. অর্থাৎ প্রত্যেক ইংরেজের একবার হিন্দু আইন পড়া কর্ত্তব্য। পড়িলে তাঁহারা আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

আমি এইখানেই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিয়া পাঠকগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। প্রাচীন ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে যাঁহারা আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবসর পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় মল্লিখিত "প্রাচীন ভারতে শাসন-প্রথা" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিবেন।

শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী।

পিরীতি-মদিরা।

ধর ধর প্রিয়ে স্বচ্ছ স্ফটিক-আধার
কাঞ্চন-বরণা ইথে পিরীতি-মদিরা
হের ঢল ঢল নাচে—অমৃতের সার!
স্পর্শমাত্র ও অধরে করিবে অধীরা
তোমারে পলকে প্রিয়ে! সোনার স্বপনে
আবৃত হেরিবে বিশ্ব-মরি কি মধুর
হাসিবে সোনার হাসি ও তব নয়নে!
নামিয়া আসিবে স্বর্গ—আছে যাহা দূর—
প্রেমে আলিঙ্গন দান করিতে তোমায়!
কিন্তু ইহা তীব্র—অতি তীব্র হলাহল
হবে—যদি কর পান শুধুই ইহার—
ঘটাইবে মৃত্যু—হায় হবে অমঙ্গল!
তাই বলি, হবে সুধা এই হলাহল—
পিও মিশাইয়া ইথে তব অশ্রুজল!

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

ভগ্নাঙ্গুরী।

(স্কচ্ গল্প হইতে অনূদিত)

"আর কাঁদিস নি ; কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টোয় ছানি পড়াবি পোড়ারমুখি! মিষ্টার বিংক্স এই সময় এসে পড়্‌লে কি ব'ল্‌বে বল্ দেখি! যা চোখ্ ধুয়ে ফেল্‌গে ; আর একবার চুলটায় চিরুণী দে ; বাস্, তা হ'লে তোর মত সুন্দরী সারা সহরটায় আর দু'টী থাক্‌বে না ; কেঁদে কেঁদে অমন সোণার রূপ মাটী ক'ত্তে ব'সেচিস্!"

কন্যা মেরী অশ্রু-ছল-ছল নয়নে বলিল,—"উইলি যখন চ'লে গেছে, তখন আর আমার এ পোড়া রূপে দরকার কি মা? তোমার পায়ে পড়ি, বে'র জন্যে এত তাড়াতাড়ি ক'র না ; আমায় ভাব্‌তে একটু সময় দাও। সে যে আবার ফিরে আস্‌বে তা' আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি ; সে আমায় কথা দিয়ে গেছে, একবার ফিরে এলে আমায় বে' ক'র্‌বেই। আমার মনের ভেতর থেকে কে যেন কেবল ব'ল্‌চে,—উইলি মরে নি।"

"ওসব বাজে ভাবনা ছেড়ে দে ; যে জাহাজে ক'রে উইলি বিদেশ গিয়েছিল, সেখানা দক্ষিণ সমুদ্রে ডুবে গেছে ; তুই ছাড়া একথা সবাই জানে, সবাই মানে। আচ্ছা, তুই যে ব'ল্‌চিস্ সে বেঁচে আছে, তার কি প্রমাণ পেয়েছিস্ তুই বল্ দেখি।"

"একটু পেয়েছি মা। আমাদের দেশে একটা চল্‌তি কথা আছে যে যতদিন কোন লোক বেঁচে থাকে, ততদিন তার কাপড় কখনও 'মোথ' পোকায় কাটে না ; উইলি যাবার সময় এক সিন্দুক ভাল পোষাক আমার কাছে রেখে গেছে,—ব'লে গেছে যদি কখনো সে ফেরে, তবে সেইগুলো আমাদের বিয়ের পোষাক হবে। আমি রোজ সে সিন্দুকটি খুলে দেখি ; এখনও তাতে একটি পোকাও ধরেনি কিন্তু।"

"মরা মানুষের কাপড়ের ভেতর ডুবে থেকে আর কি ফল হবে? তা' উইলি কিন্তু তার ভাবী পত্নীকে বেশ কাজ দিয়ে গেছে!"

"তা'র পত্নী হবার মত আমার যোগ্যতা কই? কিন্তু মা তুমি কোন্ প্রাণে আমায় তার কথা ভুলতে ব'ল্‌চ? সেই সে দিন, যে দিন সে সোনার আংটী ভেঙে আমায় আধখানা দিলে, সে দিনের কথা যে এখনও আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি! সে দিন সেই ভাঙা আংটীর আধখানা নিয়ে আমরা প্রতিজ্ঞা

ক'রেছিলুম, জীবনে আর কাকেও স্বামী ক'রব না। সেই থেকে সে আংটী আমার বুকে গাঁথা র'য়েছে ; আর উইলি যদি এ পৃথিবীতে থাকে, তবে সেও নিশ্চয় এমনি ভাবে তার অংশ বুকে রেখেছে।"

জননী একটি কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"বেচারা এতদিনে পৃথিবীর চেয়ে ভাল জায়গায় স্থান পেয়েচে। তার কথা আর ভাবা মিথ্যা। আমি মিঃ বিংক্লকে কথা দিয়েচি, তুই আমার মুখ রক্ষে কর্, শান্ত হ'য়ে তাকে বে কর্। সে যে ধনী, তার হাতে পড়লে আর তোর কিছুরই অভাব হবে না।"

"টাকা দিয়ে ত মানুষ প্রণয় কিন্তে পারে না মা!"

"তা' না পারুক, টাকায় তার চেয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী ঢের ভাল জিনিষ পাওয়া যায় ; আমার মর্বার বয়স হ'য়েচে ; আজ বাদে কাল ম'রে যাব, তাও কি তুই সুখে মোত্তে দিবি না। আমি ম'রে গেলে তোর চ'লবে কিসে ; যা কিছু আছে সব তোর দাদা আর বৌ'দ' দখল ক'রে ব'সবে ; তখন বুঝ্‌বি সংসার কি ঠাই! তাই ব'লচি, যদি আপনার মঙ্গল চাস্ তবে ওসব ছেলে মানুষী ছেড়ে দিয়ে সময় থাকতে বে-থা ক'রে ফেল।"

"যা ক'ত্তে হয় আর একবছর বাদে ক'রবো। জাহাজটি যে কোন চরে আটকে প'ড়ে নেই, তারই বা প্রমাণ কি ?"

"যতদূর বুঝ্‌চি, তাতে বোধ হয় ভাল কথায় কিছুতেই তোকে রাজি ক'ত্তে পার্‌বো না ; বেশ এবার আমি মা'র মতনই কর্ত্তব্যপরায়ণা হব ; জোর ক'রে তোকে ধর্ম্মমন্দিরে নিয়ে গিয়ে বে দিয়ে দেবো। তা' নইলে ভাল কথায় ত' তুই বে-থা ক'র্‌বি না।"

রোরুদ্যমানা মেরী শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"মা—মা তার চেয়ে আমায় ম'ত্তে দাও ; বে' করার চেয়ে মরণ ভাল আমার।'

জননী সিটন কিন্তু একথার অন্য অর্থ গ্রহণ করিলেন। তিনি ভাবিলেন,—কন্যা বিবাহে কতকটা সম্মতা হইয়াছে। সুতরাং আনন্দিত মনে ভাবী জামাতা বিংক্লকে একটা দিন স্থির করিতে বলিতে গেলেন। কুমারীর শোক-সন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা দিবার জন্য মেরীর খুল্লতাত ভ্রাতা এনট কেমি-রণকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। বিবাহের আয়োজনও যথাসম্ভব চলিতে লাগিল।

৯

বিবাহের পূর্ব্বদিনে ভ্রাতা-ভগিনী একত্রে বসিয়াছিল। এনট পর দিবস ভগিনী যে সকল গহনা-পত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া বিবাহ করিতে যাইবে, সেইগুলি গুছাইয়া রাখিতেছিল আর মেরী অশ্রু-ছলছল নেত্রে তাহাই দেখিতেছিল। ক্রমে সে আর অশ্রু-সম্বরণ করিতে পারিল না;—তাহার দুই গণ্ড প্রবাহিত হইয়া তপ্ত অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

"মেরী! বোন্‌টী আমার! পুরাণ কথা আর ভেবে কি ক'র্‌বে, বল। মন থেকে ও দুশ্চিন্তা দূর কর; চোখের জলে যে তোমার নূতন পোষাকটা ভিজে গেল মেরী!"

এরূপ সময়ে জননী আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, কন্যাকে কাঁদিতে দেখিয়া তিনি এনটকে বলিলেন,—"বাবা! মেরীর মনটা ভাল নেই. একটা গান টান গেয়ে ওকে সান্ত্বনা দাও।"

মেরী বলিল,—"না দাদা থাক. গান এখন আমার মোটেই ভাল লাগ্‌বে না; এখন আমার মনের মধ্যে সেই অতীতের একদিনের ঘটনা জেগে উঠেচে. সেদিন আমরা ঐ রোয়ান গাছের তলায় ব'সে কত সুখ-কল্পনায় সময় কাটিয়েছি, কল্পনায় দেখেছি—আমরা দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে সংসারে প্রবেশ ক'রেছি............।"

এই সময় একটী কৃষ্ণাঙ্গী দীর্ঘকায়া রমণী "গৃহস্থের জয় হোক" বলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বরাবর অগ্নি-কুণ্ডের নিকট গিয়া উপবেশন করিল। তাহার পর একটী সিগার ধরাইয়া নীরবে ধূমপান করিতে লাগিল।

সিটন বলিলেন,—"ওগো গণৎকার ঠাকরুণ! ওখানে ব'সে সিগারেট খাচ্চ, কুমারীর পোষাকটা যে একেবারে ঝুল হ'য়ে গেল দেখ্‌তে পাচ্চ না? এই বেলা পথ দেখ,আজ আমাদের তোমায় নিয়ে সময় কাটাবার অবসর নেই।"

"হাঁ তোমরা আজ উৎসব আয়োজনে ব্যস্ত আছ, তা' আমি দেখ্‌তে পাচ্চি; কিন্তু আজই ত' ভাগ্য-গণনার উপযুক্ত দিন!"

"যাও, যাও, আর অত বক্তৃতা দিতে হবে না; তোমার মতন অমন ভণ্ড আমরা ঢের দেখেচি; এখনও ব'ল্‌চি ভালয় ভালয় বিদেয় হও।"

রমণী সিটনের বাক্যে দৃক্‌পাত না করিয়া কুমারী মেরীর হস্তখানি আপন হস্তের মধ্যে ধরিয়া বলিল,—"কি গো সুন্দরি! ভাগ্যের ফল শুন্‌বে?"

সচকিতে মেয়ী বলিয়া উঠিল,—"না মা আমার আর জান্‌তে কিছু বাকি নেই; অনেকদিন আগেই ভাগ্যের ফল শুনেচি।"

রমণী তাহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিল,—"তোমার শীঘ্রই বে' হ'বে।"

সিটন ঘৃণা ও ক্রোধপূর্ণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"মাগী দেখ্‌চি পাজীর পাঝাড়া; কার কাছে কথাটা শুনে এসে এখানে বিদ্যে জাহির ক'চ্চে! বের' ব'ল্‌চি এখুনি! নতুন কথা কিছু আছে?"

রমণী অবিকৃত ভাবে বলিল,—"হ্যাঁ আছে বই কি; কুমারীর বুকের কাছে সেই পূর্ব্ব প্রণয়ীর দেওয়া একটা ভাঙ্গা আংটী আছে।"

"আরে যোল,বেটার যত বড় মুখ তত বড় কথা, বেরো,বেরো ব'ল্‌চি এখুনি।"

রমণী আবার বলিল,—"হ্যাঁ; আর এই দেখ্‌চ হাতে একটা ত্রিশূলের মতন চিহ্ন র'য়েছে, এর ফল কি জান? মিঃ কিংস্লের সঙ্গে তোমার বে' হবে না, এটা এই কথাই ব'ল্‌চে।"

সিটন ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"তবে নারে বদমাইস্ মাগী! আমার কাছে বিদ্যা ফলাতে এসেচ; রোস একবার পুরস্কারটা নিয়ে যাও। ওরে! কে আছিস্? মাগীকে ঘা কতক জুতো দিয়ে বের ক'রে দে ত।"

রমণী মৃদু হাসিয়া বলিল,—"জুতো দেবার দরকার হবেনা; আমার বক্তব্য শেষ হ'য়েচে, এখন আমি চল্লুম।" চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে রমণী অদৃশ্য হইয়া গেল।

কুমারী কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল,—"মা, কিংস্লেকে খবর পাঠাও, আমার সঙ্গে তার বে হবে না, হ'তে পারে না।"

জননী স্নেহ-আর্দ্রস্বরে বলিলেন,—"মা! তোর প্রাণে আবার পূর্ব্বের কথা জেগে উঠেছে। কিন্তু একবার ভেবে দেখ্ দেখি, একটা ভণ্ড মাগীর কথা শুনে তুই কি ক'ত্তে যাচ্ছিস্। দেশময় যে ঢি ঢি প'ড়ে যাবে মা! তোর জন্যে আমাদের এত বড় পরিবারটা যে একেবারে মাথা হেঁট করে থাক্‌বে; লোকের কাছে মুখ দেখাব কি করে?"

"মা! মা! রক্ষে কর। একবার যখন একজনের পায়ে মন প্রাণ স'পে দিয়েচি, তখন আর একজনের হাত ধ'রে কি ক'রে সংসারে ঢুক্‌বো মা আমি! অভাগিনীকে দয়া কর, রক্ষে কর মা!"

"তোমার ওসব বাজে কথা আর আমি শুন্‌বো না, এতদিন ঢের শুনেচি, কাণ ঝালাপালা হ'য়ে গেছে, আর শুন্‌তে পারিনা। ও যে মড়া প্রণয়ীর চেয়ে জ্যান্ত প্রণয়ী লক্ষ গুণে ভাল। আর উইলি বেঁচেই থাক আর ম'রেই যা'ক, কাল তুমি জগতের কাছে জেমী বিংস্লের পত্নী ব'লে পরিচিত হবে। তোমাদের পোষাকে এনট স্বহস্তে গাঁট বেঁধে দেবে।"

(৩)

আজ কুমারীর বিবাহের দিন। আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিতে করিতে গৃহিণী সিটন একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বাটীতেই বিবাহ হইবে, কাজেই গৃহিণীর আজ আর শ্বাসত্যাগেরও সময় নাই।

ঠিক এই সময়ে একখানি সুন্দর গাড়ী সিটনের গৃহের দিকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাতে মাত্র দুইজন আরোহী ছিল। একটীর বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, দেহের গঠন দোহারা, বর্ণ সাধারণ স্কচের ন্যায়। অপরটী তরুণবয়স্ক নাবিক যুবক। যুবক পথে জাহাজ ডুবি, বন্দী অবস্থা প্রভৃতির বিষয় লইয়া গল্প করিতেছিল; প্রৌঢ় নীরবে তাহা শুনিয়া যাইতেছিল।

কতক্ষণ পরে শকটচালক বলিল,—"আজকে হঠাৎ সিটমদের বাড়ী যাবার কারণ কি ম'শাই ?"

"সেখানে একটা বে' আছে আজ; আমার খুড়তুত ভাই জেমি বিংস্লের আজ সেখানে বে হবে।"

"তিনি শুনেছিলুম অনেকদিন থেকেই এই বিয়েটা করবার জন্যে ঝুঁকে ছিলেন।"

"হ্যাঁ, এতদিন কোন্‌কালেই বে' হ'য়ে যেত' কেবল মেয়ের অমতের জন্যেই এত দেরী হ'ল। শুন্‌লুম মেরীর এখনও এ প্রণয়ীর উপর তেমন মন পড়েনি।"

নাবিক যুবক জিজ্ঞাসা করিল,—"এ আপনারা কোন মেরীর কথা ব'লছেন ?"

প্রৌঢ় বলিল—"এই যে হে, মেরী সিটন, আজ রাত্রে যার বে' হবে!

যুবক একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"ওঃ!"

প্রৌঢ় আবার বলিতে লাগিলেন,—"আমার কিন্তু বাবু এ বিয়েয় আদৌ মত নেই; শুন্‌লুম মেরী এখনও পূর্ব্বপ্রণয়ীকে ভুল্‌তে পারে নি। সে হত-

তাগারও ত' ফেরবার কোন আশা দেখি না। মা'টাই এই অনর্থ ঘটাচ্চে; দিনরাত সে কেবল বিংহ্যাককে বে' করবার জন্যে কুমারীকে তিতি-বিরক্ত ক'রে তুলেছিল ; কাজেই নিরুপায় কুমারী অবশেষে মা'র কথায় মত দিয়েচে। মা' হ'য়ে মেয়ের এমন সর্ব্বনাশটা করা তার কিন্তু কোন-মতেই উচিত হয় নি ; আইনতঃ সে এ রকম ক'ত্তে পারে না।"

বক বলিয়া উঠিল,—"মাগী আচ্ছা ধড়িবাজ দেখ্‌চি ত' !"

"চুপ চুপ! এখুনি কে শুনে ফেল্‌বে। ওকি—ওকি! যাও কোথা হে?" যুবক সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল।

শকটচালক অশ্বকে কশাঘাত করিয়া বলিল,—"বোধ হয় গলি-পথে শীগ্‌গির পৌঁছিবার মৎলবে গেল।"

শকট দ্রুততরবেগে অগ্রসর হইয়া ক্রমে সিটনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। সে স্থানে সমস্ত কন্যাযাত্রী সমবেত হইয়া মন্ত্রী মহাশয়ের অপেক্ষা করিতেছিল।

গৃহিণী বলিলেন,—"আমি মন্ত্রী ম'শাইকে অনেক ক'রে ব'লে এসেচি, তিনি আসবেন বোধ হয়।"

এনট বলিল,—"মেরীর বড় গরম হ'চ্চে,রাস্তার ধারের জানালাটা খুলে দি।

মেরী খোলা জানালার সম্মুখে বসিয়া বায়ু সেবন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটী অদৃশ্যব্যক্তির হস্ত মেরীর ক্রোড়ে কি একটা ক্ষুদ্র প্যাকেট ছুড়িয়া দিল।

মেরীর জননী বলিলেন,—"ওটা কি খুলে দেখ্ দেখি মেরী ! বোধ হয় তোমার কাকা স্যাণ্ডী তোমার বে'র উপহার পাঠিয়েচেন ; চিরকালই তিনি অদ্ভুত লোক, কোন কাজই সাধারণ লোকের মত করেন না।"

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ মেরীকে ঘিরিয়া উপহার দেখিবার জন্য দাঁড়াইল। সিটন্ বলিলেন,—"জিনিষটা যখন অত ছোট, তখন নিশ্চয়ই খুব দামী।" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্যাকেটটী হইতে ভগ্নাঙ্গুরীর অপরার্দ্ধ বাহির হইয়া পড়িল।

মেরী উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল,—"কে এটী এনেচে? মৃত মহাত্মার প্রেতাত্মা নাকি?"

"না মেরি! জ্যান্তই আমি তোমার করপ্রার্থী হ'য়ে এসেচি।" বলিয়া সেই নাবিক যুবক জানালা-পথে গৃহে প্রবেশ করিয়া সাগ্রহে মেরীকে বক্ষে ধারণ করিল।

"ওঃ, উইলি! উইলি! এতদিন আমায় ভুলে কোথায় ছিলে তুমি?" সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া প্রবলবেগে অশ্রুস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

"সে গল্প আর একদিন ব'ল্‌বো মেরি! এখন তোমায় বুকে পেয়ে আমি যে আনন্দে ভাস্‌চি, তার সীমা নেই,—আমার মত আজ সুখী কে?"

গৃহিণী সিটন কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"বল কি গো রসিক পুরুষ? এখন স'রে দাঁড়াও, তোমার সুখটা আমি সম্পূর্ণ ক'রে দি। আজ এই ভদ্র লোকটীর সঙ্গে মেরীর বে হবে, তোমার আর ওকে স্পর্শ ক'র্‌বার অধিকার নেই।"

বর বলিয়া উঠিল,—"না না, আমি মেরীকে বে ক'রব না;—উইলি মেরীর হৃদয় জয় ক'রেচে, সে-ই ওকে বে করুক। আমি পরস্ত্রী গ্রহণ ক'ত্তে রাজী নই।"

প্রৌঢ় লোকটী উইলির স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া বলিল,—"এ কথাটা আগে আমায় ব'ল্‌তে হয়; অমন বে-রসিক নাবিক-দেহের ভেতর যে এমন একটী রসিক প্রাণ লুকোন আছে, তা' আর আমি কি ক'রে জান্‌ব বল! এখন ঈশ্বর তোমাদের দু'টিকে সুখী করুন, এই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।"

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বলিয়া উঠিল,—"আহা! তাই হো'ক, তাই হো'ক!"

গৃহিণী সিটন যখন দেখিলেন যে, কেহই তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিল না; তখন অনিচ্ছায় তিনি সম্মতি প্রদান করিলেন। সেই দিবসই উইলির সহিত মেরীর বিবাহ হইয়া গেল।

শ্রীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেবীগড়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

রবি-করোজ্জ্বল নৈদাঘী প্রভাত। মিনিয়া ভারি ব্যস্ত,—সে, সেদিন শেষ রাত্রি হইতে জিনিষ পত্র গুছাইতেছে,—ইহাকে উহাকে ডাকিয়া প্রস্তুত হইতে আদেশ করিতেছে। তাহার মনে যেন বড় আনন্দ,—সে যেন কি একটা মহৎ কার্য্য সমাধা করিয়া স্বদেশে চলিয়াছে।

সত্যই মিনিয়া আ'জ অভীপ্সিত স্থানে গমন করিবে। কমলা ও গোলোকনাথও যাইবে। তাহাদের সঙ্গে অনেক শরীর-রক্ষী সৈন্য যাইবে,—গাড়ী-পাল্কী যাইবে,—আহারীয় যাইবে।

তাহারা কোথায় যাইবে? সে অজানা দেশের সংবাদ কমলা ও গোলোকনাথ জানিত না। মিনিয়ার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহারা গমনে ইচ্ছুক হইয়াছে।

মিনিয়া যখন সমস্ত কাজের বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন কমলা ও গোলোকনাথে কথোপকথন হইতেছিল। কমলা বলিল—"আমরা কোথায় যাইতেছি?"

গোলোকনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার আবাস স্থানে—দেবীগড়ে।"

কমলাও মৃদু হাসিল। হাসিয়া বলিল,—"মিনিয়া যাহা যাহা বলে, তোমার কি তাহা বিশ্বাস হয়?"

গোলোক। সত্য বলিতেছি কমলা,—সে বর্ণনার সত্য-মিথ্যা আমি কিছুই স্থির করিতে পারি না। একবৎসরের উপর ধরিয়া মিনিয়া ঐ সকল কথা বলিতেছে—আমরাও উহা শুনিয়া আসিতেছি,—ঐ বিষয়ে অনেক চিন্তাও করিতেছি,—কিন্তু উহাতে সত্যের সংস্পর্শ আছে কি না, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না। যুক্তি-তর্ক বিচার-বিজ্ঞান ওখানে নতশির।

কমলা। তবে যাইতেছ কেন?

গোলোক। মনে হয়, মিনিয়া কেন মিথ্যা কথা বলিবে? মিনিয়া যেরূপ প্রকারের মানুষ—সে যে মিথ্যা কথা বলিবে, এমন ধারণাই হয় না।

কমলা। তবে বল, সে সকল সত্য?

গোলোক। তাই ত একটা কৌতূহল জাগিয়া বসিয়াছে। চল, দেখিয়া আসিগে—ব্যাপার কি?

কমলা। আমার বিশ্বাস হয়, কোন যাদুকর, যাদুবিদ্যা দ্বারা ঐরূপ করিয়া রাখিয়াছেন।

গোলোক। তোমার অনুমান ভুল হইতে পারে।

কমলা। কেন?

গোলোক। মিনিয়া যে যে কথা বলে, তার মধ্যে চারিটি বিষয়ে আমার অত্যন্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে, এবং দেখিবার জন্য মন নিতান্ত কৌতূহলী হইয়াছে।

কমলা। তাহার বর্ণিত সব কথাগুলিই অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক,—তার মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে তোমার অধিকতর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে?

গোলোক। উহাদের গণনামতে তুমি হাজার বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করিয়া নবধর্ম্মের নূতন জ্ঞানান্বেষণে চলিয়া গিয়াছ—অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হইয়াছে। আর সেই হাজার বৎসর তোমার দেহ অবিকৃত আছে। পুরোহিতের পর পুরোহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে,—অর্থাৎ একের মৃত্যুর পরে অপরে তাহার স্থান অধিকার করিতেছে—কিন্তু তোমার দেহ তোমার আগমনের অপেক্ষায় অবিকৃত আছে,—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক নহে কি? তার পরে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, মিনিয়া বলে, সে দেহ সে নিজে চক্ষে দেখিয়াছে—তোমার এই বয়স, আর এই দেহের সহিত, তাহার বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই।

কমলা। বিস্ময়ের কথা বটে।

গোলোক। ইহা কোন যাদুকরের কার্য্য বলিয়াও জ্ঞান হয় না। কারণ, তোমার বয়স বড় জোর কুড়ি বাইশ বৎসর হইবে—তোমার দেহের প্রতিকৃতি হাজার বৎসর আগে কোথায় পাইবে?

কমলা। অপর তিনটি কি কি?

গোলোক। আমার দেহও নাকি তোমার দেহের নিকটে আছে,—আমি নাকি জন্মে জন্মেই তোমার কাছে প্রেম ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছি।

কমলা। আর দুইটি ?

গোলোক। সেখানে নাকি অনেক বিদেহী মানব আছে। তাহাদের মৃত্যু বহুকাল হইয়াছে, কিন্তু গড়েই তাহারা থাকে।

কমলা। আর ?

গোলোক। সেখানে নাকি তোমার অনেক স্বর্ণ মুদ্রা সঞ্চিত আছে। তুমি ব্যতীত নাকি আর কাহারও সে ধন স্পর্শ করিবারও সাধ্য নাই।

কমলা। বাস্তবিক সব কথাগুলিই যেন রূপকথা বলিয়া জ্ঞান হয়।

গোলোক। সেই জন্যই ত জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে লইয়া সেই অজানা দেশে যাইতেছি।

কমলা। কি জন্য ?

গোলোক। ঐ আশ্চর্য্য ব্যাপার গুলি প্রত্যক্ষ দর্শন করিব বলিয়া।

কমলা। উহা দেখিলে কি হইবে ? ধরিয়া লও, ঐ কথাগুলি সব সত্য।

গোলোক। ঐ গুলি প্রত্যক্ষ করিলে, জীবাত্মা, জীবাত্মার কর্ম্মফল, পরলোক ও জন্মান্তরবাদ—এই সকল বিষয় প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রমাণীকৃত হইবে।

কমলা। তুমি কি ওসকল বিশ্বাস কর না ?

গোলোক। বিশ্বাস করি, তবে উহাতে আরও দৃঢ় প্রত্যয় হয়।

কমলা। যদি না দেখিলে দৃঢ় প্রত্যয় না হয়, তবে তোমার এখনকার বিশ্বাস, বিশ্বাসই নয়।

এই সময় মিনিয়া গৃহ-প্রবেশ করিয়া বলিল,—"আহারাদি প্রস্তুত হইয়াছে। বেলাও অনেক হইয়া উঠিল,—এখন বাহির না হইলে, বৈতরণীর একূলেই আমাদের সন্ধ্যা হইয়া যাইবে।"

গোলোকনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বৈতরণী কোথায় ? মিনিয়া, তুমি বৈতরণী কাহাকে বলিতেছ ?"

মিনিয়া। দেবীগড়ের পথে একটি নদী আছে,—সেই নদীর নাম বৈতরণী। উহা পার হইয়া তবে পর্ব্বতে উঠিতে হয়।

গোলোক। বৈতরণী কি খুব বড় নদী ? উহার জল কি সদা উত্তপ্ত ?

মিনিয়া। নদী বড় নহে—পর্ব্বত হইতে ঐ নদী বহিয়া আসিয়াছে। না না, উহার জল উত্তপ্ত নয়, তবে স্রোত খুব প্রবল।

গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া কমলা বলিল,—"কেন, তুমি যমদ্বারে অবস্থিত উত্তপ্তা বৈতরণীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে নাকি ?"

গোলোকনাথও হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—"এই যাত্রাতেই হয় ত আমাদের সে বৈতরণীও পার হইতে হইবে।"

তারপরে তাহারা উঠিয়া আহারাদি করিতে গেল। আহারাদির পরে যখন তাহারা যাত্রা করিতেছিল, তখন একজন দূত আসিয়া বলিল,—"রাজা, মন্ত্রী ও পুরোহিত আসিয়া দেবীর দর্শন জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন।"

কমলা বলিল,—"তাঁহাদিগকে এই স্থানে ডাকিয়া আন।" দূত চলিয়া গেল। কমলা একখানা কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিত আসিয়া কমলাকে অভিবাদন করিলেন।

কমলা তাঁহাদিগের স্বাগত-কুশল জিজ্ঞাসা করিল।

রাজা বলিলেন,—"আপনি আপনার স্বস্থানে যাইবেন, তাই দর্শন করিতে আসিয়াছি।"

কমলা। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। আমি আবার আসিব।

রাজা। আপনি ইচ্ছাময়ী, ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন, কিন্তু শাস্ত্রে আছে, আর আসিবেন না।

কমলা। কোন্ শাস্ত্রে আছে ?

রাজা। আপনার ইতিবৃত্ত যাহাতে লেখা আছে, তাহাকে আমাদের দেশের লোকে "দেবীর বিবরণ" বলে। তাহাতেই লেখা আছে।

কমলা। তাহাতে কি লেখা আছে ?

রাজা পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিলেন। পুরোহিত বুঝিলেন, যাহা লেখা আছে, তাহা বলিবার জন্য রাজা তাঁহাকে অনুজ্ঞা করিতেছেন।

পুরোহিত বলিলেন,—"দেবি, দেবীর-বিবরণ গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা আমি সম্পূর্ণ জানি।"

কমলা। তবে আপনিই বলুন।

পুরো। আপনি আর আসিবেন না।

কমলা। কেন ?

পুরো। আপনি আমাদিগকে যে ধর্ম্মের বীজ প্রদান করিয়া গেলেন, এই ধর্ম্মে এদেশ উন্নত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর নামে এদেশের লোক হিংসাবৃত্তি পরিত্যাগ করিবে—উন্নত হইবে।

কমলা। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমার সম্বন্ধে কি লেখা আছে ?

পুরো। আপনি আপনার স্থানে গিয়া আপনার সঞ্চিত রত্নরাশি গ্রহণ করিবেন।

কমলা। তারপর ?

পুরো। তারপর সেই রত্নরাশি লইয়া পার্ব্বত্যজাতিগণকে উন্নত ধর্ম্মে আনিবার জন্য—হরিনামে মাতাইবার জন্য দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচারক নিযুক্ত করিবেন। সকলদেশে এক ধর্ম্ম—এক নাম প্রচার করিবেন।

কমলা। আপনার কথা সত্য হউক। শাস্ত্রে কি লেখা আছে,—আমি ঐ কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে পারিব ?

পুরো। হাঁ, আপনার দ্বারা ঐ নবধর্ম্মে সমস্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশের মানব দীক্ষিত হইবে।

কমলা। তারপর ?

পুরো। তারপরে আপনি দেহ রাখিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিবেন।

কমলা। এ দেহে যাওয়া হইবে না ?

পুরো। না।

কমলা। আমরা এখনই গড়ে যাত্রা করিব।

রাজা করযোড় করিয়া বলিলেন,—"আমি লোকজন এবং যান-বাহনের সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি, সম্ভবতঃ পথে কোন কষ্ট বা অভাব হইবে না। এক্ষণে অনুমতি হয় ত আমি নগরে চলিয়া যাই।"

কমলা। তবে যাও—কিন্তু যে ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছ, কায়মনোবাক্যে তাহার প্রচার ও আচারে যত্নবান্ থাকিয়ো। ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করিবেন।

রাজা, মন্ত্রী ও পুরোহিত কমলার চরণে প্রণত হইয়া বিদায় হইলেন। তাঁহাদের গমনের অল্পক্ষণ পরেই কমলা, গোলোকনাথ ও মিনিয়া লোকজনের সহিত দেবীগড়ের পথে যাত্রা করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আত্মিক পরিচয়।

মিনিয়া যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। ঠিক সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাহারা বৈতরণী নদী-কূলে উপস্থিত হইল।

তখন নাতি দূরস্থ পাহাড়ের উপর দিয়া লোহিত সূর্য্য অস্ত যাইতেছিলেন। প্রায়াগতা সন্ধ্যার শীতলবায়ূ বৈতরণীর স্বচ্ছজলের উপর আপতিত অস্তগমনোন্মুখ লোহিত সূর্য্যকর কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিল। পার্ব্বতীয় পক্ষিকুল কলরব করিতে করিতে পর্ব্বত-গৃহে গমন করিতেছিল।

নদীকূলে তরণী ছিল,—মিনিয়া কমলাকে বলিল,—"দেবি, আপনি অবগত আছেন, সাধারণ লোকের বৈতরণীর অপর পারে যাইবার ক্ষমতা নাই।

কমলা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

মিনিয়া। কেন, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন কি? আপনি ত সমস্তই অবগত আছেন। বৈতরণীর ওপারে ধার্ম্মিকগণের আত্মা অবস্থিত আছেন—এত লোক লইয়া পার হইলে তাঁহাদের আশ্রম-পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

কমলা। লোকজন সঙ্গে না থাকিলে আমাদের অনিষ্ট হইতে পারে।

মিনিয়া। ওপারে এসকল লোকের কোন ক্ষমতাই নাই। সূক্ষ্মের কাছে স্থূলে কি করিবে?

কমলা। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

মিনিয়া। অসম্ভব দেবি,—আপনার কথা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আপনি যদি বুঝিতে না পারেন, তবে কে বুঝিবে! আপনি ওপারের সর্ব্বময়ী দেবী।

কমলা। সে সকল কথা পরে হইবে। এখন তোমার উপরে আত্মসমর্পণ করিয়াছি,—যাহা করিতে বলিবে, তাহাই করিব। কে কে আমাদের সঙ্গে পার হইবে?

মিনিয়া। আপনি, আপনার যুগ্মাত্মা আর আমি।

কমলা। আর একজনও না?

মিনিয়া। না, আর কাহারও যাইবার প্রয়োজন নাই।

কমলা গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিল। গোলোকনাথ বলিলেন,—"মিনিয়ার কথায় এই অজানা দেশের অজানা পথে যাত্রা করিয়াছি,—মিনিয়া যাহা বলে, সেইমতই কার্য্য করিতে হইবে, ইহাতে অদৃষ্টে যাহা থাকে, তাহাই ঘটিবে। জীবনের মমতা রাখিয়া এ যাত্রা করি নাই।"

মিনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"দেবি, আপনি কি আমায় চিরদিনই ছলনা করিবেন? আমি আপনার নিকটে এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আমাকে এত ছলনা করিতেছেন?"

কমলা সে কথায় কোন উত্তর করিল না। কি উত্তর করিবে? যদি বলে আমি দেবী নহি, সামান্য মানবী মাত্র,—দূরদর্শিতা বা অলৌকিক দৃষ্টি আমার কোথায়? সে কথা মিনিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। আর আমি সব জানি, সব চিনি,—বলিলেই বা সে তাহার অজ্ঞতা নিবারণ করে কি দিয়া? যাহা হউক,—তখন গোলোকনাথের কথার উপরে নির্ভর করিয়া মিনিয়াকে বলিল,—"তবে লোকজনকে বিদায় দিয়া চল আমরা পার হই গে। এর পরে সন্ধ্যা হইলে অন্ধকারে কোন্ পথে যাইব স্থির হইবে না।"

মিনিয়া তখন দেবীর আজ্ঞা জানাইয়া লোকজনকে সেইস্থান হইতে ফিরিয়া যাইতে বলিল।

তাহারা বলিল,—"দেবী আমাদিগকে নিজমুখে বিদায় না দিলে, পথিমধ্যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা যাইতে পারিব না।"

তখন কমলা অতি মধুর স্বরে বলিল,—"তোমরা এইস্থান হইতে ফিরিয়া যাও। আমরা দেবদেশে যাইতেছি, সে দেশে যাইতে তোমাদের ক্ষমতা নাই,—অতএব তোমরা দেশে গিয়া ছেলেপুলে লইয়া সুখে কালযাপন করগে।"

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল,—"মা, আর কি তুমি আসিবে না? আর কি দেখিতে পাইব না?"

কমলা। যদি আসি, দেখা হইবে। কিন্তু আমি যে তোমাদের দেশে হরিনাম প্রচার করিয়াছি, তাহাই তোমাদের উন্নতির মূল। হরিনাম করিলে জীবের ইহকালের সকল জ্বালা দূর হয় এবং পরকালে শমন ভয় থাকে না। তোমরা যেন সে নাম ভুলিয়ো না।

তাহারা সকলে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। তারপরে দেবীকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কমলা বলিল,—"এখন তোমরা ফিরিয়া যাও।"

তাহারা বলিল,—"আগে তুমি পার হইয়া ওপারে যাও। আমরা দেখিয়া তবে যাইব।"

তখন কমলা, গোলোকনাথ ও মিনিয়া গিয়া নৌকায় আরোহণ করিল।

নৌকায় নাবিক ছিল না। কমলা বলিল,—"কে নৌকা বাহিবে?"

মিনিয়া সকলের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় একটা ছড়ার আবৃত্তি করিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরেই নৌকার নোঙর উঠিল। নৌকা ধীর-মন্থর-গমনে নদীর অপর পারে চলিতে লাগিল।

তীরে দাঁড়াইয়া লোকজনে হরিধ্বনি করিতে লাগিল। কমলা বিস্ময়-চকিত নেত্রে গোলোকনাথের মুখের দিকে চাহিয়া অপরের অশ্রুতস্বরে বলিল—"একি?"

গোলোকনাথও তদ্রূপ মৃদুস্বরে বলিলেন,—"তাই ত। বোধ হয়, মিনিয়া যত কথা বলিয়াছে, সবই সত্য হইতে পারে। নৌকাও বোধ হয় কোন আত্মিক পুরুষে চালনা করিতেছে।

ক্রমে নৌকা পরপারে উপস্থিত হইল। কমলা, মিনিয়া ও গোলোক-নাথ তীরে নামিল।

সেই পারেই কোন অদৃশ্যহস্তে নৌকায় নোঙর করা হইল। তীরে দাঁড়াইয়া কমলা চাহিয়া দেখিল, পর পারের লোকজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালকের ন্যায় দেখা যাইতেছে। আরও খানিক পরে দেখিল,—তাহারা ফিরিয়া চলিয়া গেল।

কমলা ও গোলোকনাথ অতিশয় বিস্মিত ও স্তম্ভিতভাবে সেখানে দাঁড়া-ইয়া ছিল। মিনিয়া একটু দূরে গিয়া তাহাদিগের দুর্ব্বোধ্য ভাষায় ছড়ার মত সুরে কি বলিতেছিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। মিনিয়ার সে ছড়া বা মন্ত্র বলা শেষ হয় না—আসেও না।

কমলা গোলোকনাথকে বলিল,—"কি বুঝিতেছ?"

গোলোকনাথ একটু পশ্চাতে হটিয়া গিয়া দূর্ব্বাদলাচ্ছাদিত একটা সমতল স্থানে উপবেশন করিলেন। কমলাকেও সেস্থানে আসিয়া বসিতে বলিলেন। কমলা কথামত কার্য্য করিল।

তখন গোলোকনাথ বলিলেন,—"কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না কমলা।"

কমলা। কিসের কি বুঝিতে পারিতেছ না?

গোলোক। মিনিয়ার সমস্ত কার্য্যই আমার নিকট যেন ধাঁ ধাঁ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে।

কমলা। ধাঁ ধাঁ নহে—ইহার মধ্যে অনেক সত্যও দেখা যাইতেছে। মিনিয়া মন্ত্র পাঠ করিল—আর নৌকার নোঙর উঠিল,—আমাদিগকে কাঠের নৌকা আপনি পারে লইয়া আসিল। কি ভয়ানক ও আশ্চর্য্য কথা! তোমার কি জ্ঞান হয়?

গোলোক। ইহা আমার সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য।

কমলা। মিনিয়া বলে, বিদেহী আত্মিকগণ এখানে থাকে। তাহারাই প্রার্থনা দ্বারা বশীভূত হইয়া পথিকের পথ দেখাইয়া দেয়।

গোলোক। জগতের রহস্য কিছুই বুঝিতে পারা যায় না,—মনুষ্যের ক্ষুদ্র জ্ঞানে সকল তত্ত্বের মীমাংসা হইতে পারে না। নৌকার কাণ্ড দেখিয়া মিনিয়ার কথা আর হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।

কমলা। সন্ধ্যা হইয়া আসিল,—ঐ দেখ, সূর্য্যদেব সম্পূর্ণভাবে অস্তাচলগত হইলেন,—সন্ধ্যার ধূসর ছায়া সমগ্র বনভূমিতে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল,—এখন কোথায় যাইব, কি করিব, তাহার স্থিরতা নাই। ভগবানই জানেন—ভাগ্যে কি আছে!

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছিল,—সেই সময় মিনিয়া তথায় ফিরিয়া আসিল এবং গম্ভীরমুখে বলিল,—"হাঁ, আমার প্রার্থনায় তাঁহারা পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন,—এবং আলোক দানে স্বীকৃত হইয়াছেন; চলুন দেবি,—আমরা পর্ব্বতারোহণ করি।"

যদিও কমলা বা গোলোকনাথ সে কথার কোনপ্রকার অর্থ বোধ করিতে পারিল না, তথাপি তাহারা উঠিয়া মিনিয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

গড়-প্রবেশ।

সু-উচ্চ পর্ব্বতশিখরে উচ্চ নীচু ঢালু বন্ধুর পথ—পথে মধ্যে মধ্যে অলৌকিক আলো—তিনজনে নিস্তব্ধে সেই পথ বহিয়া চলিয়াছে।

সমস্ত রাত্রি পথ চলিয়া চলিয়া কমলা নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। সে আর পারে না।

কমলা মিনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল,—"দেবীগড় আর কত দূর?"

মিনিয়া বলিল,—"আর দূর নাই; ঐ শুনুন,—গড়ে প্রভাতী বাদ্য হইতেছে। রাত্রিও আর নাই—উষার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে।"

তাহারা সুমধুর বাদ্যধ্বনি শুনিতে পাইল।

গোলোকনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভাতে বাদ্যধ্বনি হয় কেন?"

মিনিয়া। দেবীর সেই দেহের নিকটে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় ঐরূপ বাদ্য হয়।

গোলোক। ওখানে মানুষ আছে?

মিনিয়া। আছে বৈ কি। উহা একটা ক্ষুদ্র নগর। বহুলোকের বসতি আছে।

গোলোক। এখান হইতে আর কতদূর আছে?

মিনিয়া। এইরূপ ভাবে চলিয়া গেলে, বেলা চারিদণ্ডের মধ্যে আমরা গড়ে পঁহুছিতে পারিব।

গোলোক। তোমাদের দেবী বোধ হয় অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন,—হাঁটিতে পারিতেছেন না, একটু বিশ্রাম করিলে হইত।

মিনিয়া। আর একটু—এই মোড়টা ঘুরিলেই দেবীর যান-বাহন পাওয়া যাইবে।

গোলোক। কে দেবীর যান-বাহন লইয়া আসিবে?

মিনিয়া। গড়ে সংবাদ গিয়াছে—গড়ের পুরোহিত গড়ের সীমানায় বাদ্যভাণ্ড—ও যান-বাহন লইয়া উপস্থিত থাকিবেন।

গোলোক। কে সংবাদ লইয়া গিয়াছিল?

মিনিয়া। কেন,—যিনি নৌকায় আমাদিগকে পার করিয়াছিলেন, যিনি অলৌকিক আলো লইয়া আমাদিগের সঙ্গে যাইতেছেন—তিনিই সংবাদ পাঠাইয়াছেন।

গোলোক। তিনি কে মিনিয়া?

মিনিয়া। তিনি এই দেবীগড়ের দ্বাররক্ষক।

গোলোক। তাঁহাকে আমরা দেখিতে পাইতেছি না কেন?

মিনিয়া। তাঁহার স্থূল দেহ নাই বহু দিন তাঁহার স্থূলদেহ ত্যাগ হইয়াছে। সূক্ষ্মদেহে এই পথে অবস্থান করেন।

গোলোক। ঐরূপ দেহকে আমাদের শাস্ত্রে ভৌতিক দেহ বলে, এবং শাস্ত্রমতে উহা অধোগতি।

মিনিয়া। ঐরূপ দেহ ধরিয়া এখানকার অনেক লোক অবস্থান করিতেছে। তাহারা আশা করে,—আমাদের শাস্ত্রেও লেখা আছে,—দেবীর আগমনে উহাদের ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্তি ঘটিবে।

গোলোক। কি প্রকারে ঘটিবে,—তাহা কিছু লেখা আছে?

মিনিয়া। না—বিশেষভাবে কিছু লেখা নাই। তবে আভাষ কিছু আছে।

গোলোক। কি আছে?

মিনিয়া। দেবী দেবীগড়ের সঞ্চিত রত্নরাশি লইয়া বঙ্গদেশে যখন চলিয়া যাইবেন, তখন কোনও তীর্থবিশেষে গিয়া উহাদিগকে উদ্ধার করিবেন।

কমলা হাসিয়া বলিল,—"বোধ হয় গয়ায় পিণ্ড দিয়া।"

মিনিয়া সেকথার অর্থ কিছুই বুঝিল না। গোলোকনাথ বলিলেন,—"তাহাতে ভৌতিকদেহ প্রাপ্ত আত্মিককুলের নাম জানা চাই।"

মিনিয়া একথা বুঝিতে পারিল। বলিল,—"হাঁ উঁহাদের নামের খাতা গড়ের পুরোহিতের নিকট আছে।"

এই সময় তাহারা মোড় ঘুরিল। তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া কতকগুলি লোক আসিয়া অভিবাদন করতঃ "দেবীর জয় হউক" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য বাজিল।

পুরোহিত আসিয়া করযোড়ে বলিল,—"দেবীর পাল্কী প্রস্তুত, তাহাতে আরোহণ করুন।"

মিনিয়া কমলাকে পাল্কীতে তুলিয়া দিল,—বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল,—পতাকা উড়াইয়া লোকশ্রেণী অগ্রগামী হইল। দেবী গড়ে প্রবেশ করিল,—তখন সূর্য্য উঠিয়াছিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সিংহাসনে।

যথা সময়ে পাল্কী গড়ের মধ্যে দেবী-গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল।

বাহকগণ পাল্কী নামাইলে পুরোনারীগণ আসিয়া মাঙ্গল্যপুষ্প বর্ষণ করিল। আরও বিবিধ প্রকারে বাদ্য বাজিতে লাগিল। নর্ত্তকীগণ সেই পার্ব্বত্য-দেশের প্রথানুযায়ী নৃত্য করিতে লাগিল। পুরোহিতগণ সেই দেশীয় ভাষায় দেবীর স্তোত্রগাথা পাঠ করিতে লাগিল।

প্রধান পুরোহিত আসিয়া করযোড়ে কমলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"দেবি, সহস্র বৎসর ধরিয়া আপনার সিংহাসন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, যদি অনুমতি করেন, তবে আপনাকে এখনই আপনার সিংহাসনে সংস্থাপন করা যায়।"

কমলা বলিল,—"হাঁ, আমি সিংহাসনে উপবেশন করিব। কিন্তু পবিত্র-জলে স্নানাদি করিয়া তবে আরোহণ করিব।"

"দেবি, সে কার্য্য আমাদের" এই কথা বলিয়া, পুরোহিত মিনিয়ার মুখের দিকে চাহিলেন। মিনিয়া কমলাকে লইয়া একটা প্রকোষ্ঠে গমন করিল। সেখানে উষ্ণজলাদি ছিল,—কমলাকে সে জলে স্নান করাইল। পট্টবস্ত্র পরিধান করাইল,—তারপরে বিবিধ সুগন্ধি পুষ্পের মাল্যাদি দ্বারা তাহাকে সজ্জীভূত করিল। কমলার রূপ উথলিয়া উঠিল।

মিনিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া পুরোহিতের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কমলা দেখিল, গোলোকনাথকেও স্নান করাইয়া পট্টবস্ত্র পরাইয়া পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করিয়া আনিয়াছে।

তখন বিবিধ প্রকারে বাজনা বাজিতে লাগিল। পুরোহিত বলিলেন,—"দেবি, আপনার যুগ্ম আত্মাকে লইয়া সিংহাসন আরোহণ করিতে চলুন।"

কমলা ও গোলোকনাথ—পুরোহিতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল,—মিনিয়াও সে সঙ্গে গেল।

প্রকাণ্ড পর্ব্বতগৃহ—গৃহের চতুর্দ্দিকে অগণ্য স্তম্ভ, স্তম্ভগাত্রে স্বর্ণাদির পত্রপুষ্পশোভিত—মণিমাণিক্যাদি খচিত। মধ্যস্থলে—পাশাপাশি দুইখানি সুন্দর সিংহাসন,—পুরোহিত বলিলেন, "আপনারা আরোহণ করুন।"

কমলা ও গোলোকনাথ দুইজনে দুই খানিতে উঠিয়া বসিল। পুরোহিত পুষ্প বর্ষণ করিলেন—দর্শকগণ জয়োচ্চারণ করিল।

* * *

ইহার পরে গোলোকনাথ ও কমলা সেই গৃহে অনেক আশ্চর্য্য দ্রব্য সকল দর্শন করিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের দেহের ঠিক অনুরূপ দেহ বাস্তবিকই সেখানে রক্ষিত ছিল।

ইহার কয়েকদিবস পরে সে দুইটী দেহ অগ্নি-দগ্ধ করিয়া সৎকার করা হইয়াছিল।

কথিত আছে, কমলা ও গোলোকনাথ সেখানে তিনবৎসর থাকিয়া অনেক মণি-কাঞ্চন সংগ্রহ করিয়া লইয়া বঙ্গদেশে চলিয়া গিয়াছিল। সে দেশের লোকদিগের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসিয়াছিল। মিনিয়াকে সেই দেবীগড়ের ভার অর্পণ করিয়াছিল।

দেশে আসিয়া কমলা ও গোলোকনাথ সেই অর্থে দেবালয় ও সেবাশ্রম সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিল। এবং একজন লোক গয়ায় পাঠাইয়া দেবীগড়ের প্রেতযোনিদিগের নামে পিণ্ড প্রদান করাইয়াছিল।

সম্পূর্ণ।

পঞ্জিকা-সংস্কার।

সময় নিরূপণ করিতে হইলে পদচ্ছায়া ঘটীযন্ত্র প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটী যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়; ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। জ্যোতিঃশাস্ত্রাভিজ্ঞ মহানুভব জনগণের মধ্যে কেহই বোধ হয়, এবিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশে কদাচ সমুৎসুক নহেন। আমরা সাধারণের অবগতির জন্য উক্ত যন্ত্রাদির বিষয় নিয়ে যথাকথঞ্চিৎ বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

ঘটদলরূপা ঘটিতা ঘটিকা তাম্রীতলে পৃথুচ্ছিদ্রা।
দ্যুনিশনিমজ্জনমিত্যাভক্তং দ্যুনিশং ঘটীমানম্॥
সমতলমস্তকপরিধির্ভ্রমসিদ্ধো দন্তিদন্তজোশঙ্কুঃ।
তচ্ছায়াতঃ প্রোক্তং জ্ঞানং দিগ্‌দেশকালানাম্।

জ্যোতির্গণনায় শঙ্কুচ্ছায়া নিরূপণই জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণের প্রধান অবলম্বন, ইহা নিঃসন্দেহ। বস্তুতঃ শঙ্কুর বিশেষ বিবরণ এই—

অর্কাঙ্গুলাতু সূচ্যগ্রা কাষ্ঠী দ্ব্যঙ্গুলমূলিকা।
শঙ্কুসংজ্ঞা ভবেচ্চৈব তচ্ছায়াং পরিকল্পয়েৎ॥
মধ্যাহ্নহীনৈরাদিত্যযুক্তৈশ্ছায়াঙ্গুলৈর্হরেৎ।
ষট্‌পূরিতদিবাদণ্ডং লব্ধং দণ্ডাদিকং ভবেৎ॥
পূর্ব্বাহ্নছায়য়াতীতং পরাহ্নছায়য়ৈষ্যকম্।
শূন্যৈকরামবাণেভদিশোরুদ্রাঃ (০।১।৩।৫।৮।১০।১১ ক্রমোৎক্রমৈঃ॥
আষাঢ়াদিষু মাসেষু ছায়া মাধ্যাহ্নিকী মতা।
অয়নাংশজমাসান্তে ব্যুৎক্রমেণোদিতো বুধৈঃ॥
সংখ্যোক্তান্যদিনে ভাগহারৈর্বৃদ্ধীতরে তথা॥

শঙ্কুর মূলদেশ দুই অঙ্গুলি স্থূল হইয়া সূচির ন্যায় অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইবে এবং দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত লম্বা হইবে। এই শঙ্কুর ছায়া যত অঙ্গুলি পরিমিত হইবে, তাহা হইতে সেই দিবসের ছায়া বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে ১২ বার যোগ করিয়া রাখিবে। পরে দিবা দণ্ডকে ছয় দ্বারা গুণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত অঙ্কদ্বারা ভাগ করিবে, ভাগফল যাহা হইবে, তাহাই সেই সময়ের দণ্ড পল প্রভৃতি জানিবে। পূর্ব্বাহ্নে ঐ দণ্ড পলাদি সূর্য্যোদয়াবধি অতীত হইয়াছে বিবেচনা করিতে হইবে এবং অপরাহ্নে

সূর্য্যাস্তকালের পূর্ব্বে এই পরিমিত দণ্ডাদি আছে, ইহা বিবেচিত হইবে। মধ্যাহ্নচ্ছায়ার সংখ্যা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা—আষাঢ় মাসের শূন্য। শ্রাবণ মাসের এক অঙ্গুলী এবং ভাদ্রমাসের তিন, আশ্বিনমাসের পাঁচ, কার্ত্তিক মাসের আট, অগ্রহায়ণ মাসের দশ এবং পৌষমাসের এগার অঙ্গুলী। অপর মাসাদিতে ইহার উৎক্রম অর্থাৎ বিপরীত নিয়মানুসারে মধ্যাহ্ন ছায়ার সংখ্যা জানিতে হইবে। এই ছায়া অয়নাংশজনিত মাসের শেষ দিবসে—সংক্রমণ দিবসে ব্যুৎক্রম অর্থাৎ ক্রমবিপর্য্যয় অনুসারে ধরিতে হইবে। অন্য দিনাদিতে ভাগহার দ্বারা হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে সংখ্যা জানিবে।

এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবর্গ অবলোকন করুন যে, শাস্ত্রীয় শঙ্কুচ্ছায়া পরিমাণ যথাকথিত কালের সহিত মিলিত হয় কি না? অতি অল্পায়াসেই বুঝিতে পারিবেন—অনেক পার্থক্য হইয়াছে। অতএব সুধীগণ বিবেচনা করুন যে, বাস্তবিক সংস্কারের আবশ্যক কি না? নিম্নের উদাহরণটি পরিদর্শন করিলেই পার্থক্য ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাবিষয় অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

১৭ই পৌষ ইং ১লা জানুয়ারী ১৯১১ সাল। ইং ঘণ্টা ৯৷৩০ মিনিট সময়ে শঙ্কুচ্ছায়া ১৪ চৌদ্দ অঙ্গুলি হয়। ১৪ হইতে পৌষমাসের মাধ্যাহ্নিকী ছায়া ১১ এগার হীন করিলে ৩ তিন বাকী থাকে; তাহাতে ১২ বার যোগ করিলে ১৫ পনর হইল। দিন মান (ভট্টপল্লী অনুসারে) ২৬৷২৮৷৪৪ কে ৬ ছয় গুণিত করিয়া ১৫৮৷৫২৷২৪ হইল। ইহাকে ১৫ পনর দ্বারা ভাগ করিলে ভাগ ফল ১০৷৩৫৷২৮ হইল। কিন্তু সূর্য্যাস্ত কাল যদি পঞ্জিকায় ঠিক থাকে, তাহা হইলে যে সময়ে ১৪ অঙ্গুলি ছায়া হয়, সেই সময়ে দিবা দং ৯৷৩৮৷১০ অবশিষ্ট থাকে। ইহার মধ্যে কোনটি ঠিক অর্থাৎ ১০৷৩৫৷২৮ ঠিক ধরিবেন, অথবা ৯৷৩৮৷১০ ঠিক ধরিবেন? পরন্তু ঐ দিবস ইং ঘণ্টা ৩৷৷০ সময় পঞ্জিকার হিসাবে ১৷৫১৷১৬ দিবা দং ৪৷৩৮৷১০ বেলা বাকী থাকে। কিন্তু শঙ্কুচ্ছায়া হিসাবে ঐ সময় শঙ্কুচ্ছায়া ২৭ অঙ্গুলি হয়, সুতরাং কথিত প্রণালী অনুসারে দিবাবশিষ্ট কাল দণ্ড ৫৷৪০৷২৬। ইহার মধ্যে কোন্‌টী ঠিক? প্রভেদও নিতান্ত কম নহে।

প্রকৃতপক্ষে যে কোন পঞ্জিকাকারই এ বিষয়ে মনোযোগী নহেন। তাহার প্রমাণ স্বরূপ এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দুই খানি পঞ্জিকায় সমানাঙ্গুলি-পরিমিত শঙ্কুচ্ছায়া হইতে পৃথক্ লগ্নমান স্থির করিয়াছেন।

ইহা ত হইল দিনমানের কথা, রাত্রিমান সম্বন্ধেও সকল শাস্ত্রের যে সমান মত, তাহা কেহই বলিতে পারিবেন না। সাধারণতঃ যদি কালিদাসকৃত জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে যে নক্ষত্রোদয় কালের কত প্রভেদ হয়, তাহা একবার অবলোকন করুন।

তন্বি ঘোটকমুখাকৃতি ত্রিতে মস্তকোর্দ্ধপথভাজি বাজিনি।
চারুচন্দ্রমুখি কর্কটোদয়াৎ নির্গতা গগননন্দলিপ্তিকাঃ॥

ঘোটকমুখাকৃতি ত্রিতারা (অশ্বিনী নক্ষত্র) মস্তকের উপর আসিলে-কর্কটরাশির ১ একদণ্ড ৩০ ত্রিশ পল অতীত হয়।

অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে অশ্বিনী নক্ষত্র সন্ধ্যার কিছু পরেই মস্তকোপরি উপস্থিত হইয়া থাকেন, সুতরাং তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তদানীন্তন সুধীবর্গের এই বিষয় সহজবোধ্য হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাসে বৃশ্চিক রাশিতে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে, অতএব সূর্য্যাস্তকালে বৃষরাশির উদয় অর্থাৎ পূর্ব্ব চক্রবালে আগমন হয়। বস্তুতঃ অগ্রহায়ণ মাসেই এই ব্যাপার নিরীক্ষণ ও পরীক্ষা করা অতি সহজ। কিন্তু প্রথম কথাটি এই যে, উক্ত তারাত্রয় সমসূত্র-পাতে অবস্থিত না থাকাতে প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মস্তকোপরি উপস্থিত হইয়া থাকেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ তারাটী মস্তকোপরি উপস্থিত হইলে কর্কটরাশির ১ দণ্ড ৩০ পল অতীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে? যদি প্রথমোপস্থিত তারাটী সম্বন্ধে এই বচন প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে সেই তারাটী যে সময়ে মস্তকের উপরিভাগে আগমন করিবেন, তখনই কর্কটরাশির এক দণ্ড ত্রিশ পল অতীত হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে। ১৩১৭ সালের ১০ই অগ্রহায়ণ ইংরাজী ২৬এ নভেম্বর ১৯১০ সাল রাত্রি ৯॥০ সাড়ে নয় ঘণ্টার সময় দেখা যায় যে, অশ্বিনী নক্ষত্রস্থিত প্রথম তারকাটি মস্তকের উপরিস্থ হইয়াছেন। কত প্রভেদ দেখিলেন? অধুনা বিচার্য্য বিষয় এই যে,—শাস্ত্রবচন ঠিক কিম্বা কিছু সংশোধন আবশ্যক। ভট্টপল্লী পঞ্জিকানুসারে উক্ত দিবস বৃষ রাশির ১।৪৩।২ গতে সূর্য্যাস্ত অর্থাৎ ইংরাজী ৫।১২।৫ সেকেণ্ড গতে অস্ত। বৃষ লগ্নমানের অবশিষ্ট ৩।৯।৬ মিথুন লগ্নমান ৫।২৯।৩৬ ও কর্কটের ১।৩০ মোট ১০ দণ্ড ৮ পল ৪২ বিপল অর্থাৎ ইং ঘণ্টা প্রায় ৪।৩।৫২। সুতরাং ভট্টপল্লী মতে উক্ত দিবসে অশ্বিনী নক্ষত্র যখন মস্তকোপরিস্থ হইবেন, তখন ইং ঘণ্টা ৯।১২।৫৭ হইল। পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় গণনায় যে ফল হইল, তাহার সহিত ১৭ মিনিট ৩ সেকেণ্ডের প্রভেদ হইল।

অপর ১৭ই পৌষ ইংরাজী ১৯১১ সাল ১লা জানুয়ারী তারিখে গুপ্তপ্রেস অনুসারে মিথুন ২।৫৯।২০ গতে ইং ঘণ্টা ৫।২১।১৯ গতে সূর্য্যাস্ত। যদি কর্কটের ১।৩০ গতে অশ্বিনী নক্ষত্র মস্তকোপরিস্থিত হয়েন, তাহা হইলে মিথুনের অবশিষ্টাংশ (গুপ্তপ্রেস দেখুন) ২।৩০।৩৩ এবং কর্কট ১।৩০ মোট ৪।০।৩৩ অর্থাৎ সূর্য্যাস্ত হইতে দং ৪।০।৩৩ বিপল ত্যাগ করিয়া ইং ঘণ্টা ১।৩৬ অর্থাৎ ৬।৫৭ পলে দৃষ্ট হওয়া উচিত, কিন্তু অশ্বিনী নক্ষত্র মধ্যে অগ্রগামিতারকা ইং ঘণ্টা ৭।৬।২০ এবং দ্বিতীয় তারকা ৬।১৯ মিনিটের সময় দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

লগ্নমান সম্বন্ধেও পরস্পর মতদ্বৈধ দেখা যায়, পাঠক বর্গের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা ঘটিলেও আমরা মনের আবেগে তিতিক্ষাপরায়ণ পাঠকবর্গের সম্মুখে তাহা লইয়া একবার উপস্থিত না হইয়া পারিতেছি না, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

	গুপ্তপ্রেস ও আর্য্য পঞ্জিকা।	ভট্টপল্লী পঞ্জিকা।
মেষ	৪।৮।১৬	৪।৯।৫১
বৃষ	৪।৫১।২১	৪।৫২।৮
মিথুন	৫।২৯।৫৩	৫।২৯।৩৬
কর্কট	৫।৪০।১৮	৫।৩৯।১২
সিংহ	৫।৩২।৫২	৫।৩১।১৫
কন্যা	৫।২৯।৪০	৫।২৮।০
তুলা	৫।৩৭।৮	৫।৩৫।৪৫
বৃশ্চিক	৫।৪০।১	৫।৩৯।২৮
ধনুঃ	৫।১৬।৭	৫।১৬।২৩
মকর	৪।৩২।৬	৪।৩৩।১২
কুম্ভ	৩।৫৫।৪৪	৩।৫৭।১০
মীন	৩।৪৬।২০	৩।৪৮।০

দেখিলেন, একটির সঙ্গেও মিল আছে কি? ইহার মধ্যে কোন্‌টি মান্য বা কোন্‌টি অমান্য, তাহা স্থির করা কি সর্ব্বতোভাবে বিধেয় নহে। যদি রাশিমানই স্থির না হইল, তবে গ্রহাদির রাশি-সংস্থান বা রাশ্যন্তর গমন-কাল নির্ণয় হইবে কি প্রকারে?

পণ্ডিতগণ গ্রহণ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন মতে গণনা করিলে

গ্রহণের ভিন্ন ভিন্ন সময় প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং বিভিন্ন মতগুলির মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন্ মতটি ঠিক, তাহা অবধারণ করা একান্ত আবশ্যক। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গ্রন্থনিচয়ের পাঠ-বৈষম্য হেতু একই গ্রন্থের পাঠান্তর দ্বারা গণিত ফল দুইটি ভিন্ন একটি কদাপি দৃষ্ট হয় না, সুতরাং ফলদ্বয়ের, অনৈক্য স্বতঃসিদ্ধ। যদি আমাদের ধর্ম্মের প্রতি কণামাত্রও বিশ্বাস থাকে, তাহা হইলে কি এ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য নহে ?

সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতানুসারে ইংরাজী ১৮৬০ সালের চন্দ্রগ্রহণ গণনা করিয়া দেখা যায়,—ইংরাত্রি ঘণ্টা ৯।৫৭।৩৫ সেকেণ্ড গতে স্পর্শ, কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইং ঘণ্টা ৯।২৭।১০ সেকেণ্ড গতে স্পর্শ হয়। গ্রহণস্থিতি গণিত মতে—ইং ঘণ্টা ৩।৩৭।৪৪ সেকেণ্ড, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইং ঘণ্টা ২।৫২।২৪ সেকেণ্ড স্থিতি হয়। ইংরাজী ১৮৫৪ সালের ২৬এ মে তারিখে আমেরিকাস্থিত উইলিয়ম্‌স্-টাউন নামক নগরে সূর্য্য গ্রহণ হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তমতে গণনা করিলে নিম্ন-লিখিত ফল পাওয়া যায় ; যথা—স্পর্শ ইং দিবা ঘণ্টা ২।২০ মিনিট সময়ে, মোক্ষ ৪।৫০ মিনিটের সময়, স্থিতি ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। কিন্তু বস্তুতঃ যাহা হইয়াছে, তাহা এই ঃ—স্পর্শ ইং দিবা ঘণ্টা ৪।১৫ মিনিট, মোক্ষ ইং ঘণ্টা ৬।৩৮ মিনিট, স্থিতি ইং ঘণ্টা ২।২৩ মিনিট। উপরিউক্ত গণনাগুলি সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থানুসারে সাধনকরা হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থানুসারে গণনা করিয়া দেখিলে কি প্রকার ফল-বৈষম্য হয়, তাহাও দেখুন। কল্যব্দ—৪৮৯১ চন্দ্রগ্রহণ স্থিতি—

	দণ্ড পল বিপল	ঘঃ মিঃ সেঃ
সূর্য্যসিদ্ধান্তনুসারে	৩ । ১২ । ৫০	১ । ১৭ । ৮
মকরন্দকৃত সারণী	৪ । ৫০ । ০	১ । ৪৬ । ২০
গ্রহলাঘব	৫ । ১৮ । ০	১ । ৫৬ । ৩৬
সিদ্ধান্তরহস্য	৪ । ৫৮ । ০	১ । ৪৯ । ১৬
গ্রহণ মালা	৫ । ২৬ । ০	২ । ১০ । ২৪

কিন্তু বাস্তব ঘটনা ৫।২২।২।৩০ ইং ঘণ্টা ২।৯।০

সম্প্রতি ৩০এ কার্ত্তিক যে চন্দ্রগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, তৎসম্বন্ধেও ফল-বৈষম্য দৃষ্ট হয়, যথা—

১৩১৭ সাল ৩০এ কার্ত্তিক চন্দ্রগ্রহণ।

	স্পর্শ	মোক্ষ
গুপ্তপ্রেস	৪।৩৭।৩১	৭।৫১।৭
	(ঐশাস্যাং)	(বায়ব্যাং)
ভট্টপল্লী	৪।৩৭।২৫	৭।৫১।৭
	(আগ্নেয্যাং)	(নৈর্ঋত্যাং)
আর্য্য	৫।২২	৮।৫৮
	(আগ্নেয্যাং)	(নৈর্ঋত্যাং)

বঙ্গদেশে সর্ব্বগ্রাস-দর্শনাভাবঃ এবং কাশ্যাস্ত।

ফলিত বা গণিত জ্যোতিঃশাস্ত্রের এতাদৃশ ফল-বৈষম্য পর্য্যালোচনা করিলে কোন্ ব্যক্তি না শাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইবেন? যাঁহাদের প্রতি শাস্ত্র রক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া সাংসারিক মানবগণ স্থিরচিত্তে ধর্ম্মপালনে উদ্যোগী হয়েন, সেই শাস্ত্ররক্ষায় ব্রতী জ্যোতিঃশাস্ত্রে পারদর্শী চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করুন। আমাদের ধর্ম্মকর্ম্মাদি সমস্তের মূল জ্যোতিঃশাস্ত্রেই যদি ভুল থাকে, তাহা হইলে উক্ত শাস্ত্রানুযায়ী গণিত ফল—যাহা পঞ্জিকায় নিবদ্ধ হয়, তাহা সকলই ভুল। এবং পঞ্জিকোল্লিখিত কালাদি যদি ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী কালাদিরও ভুল—অনিবার্য্য। সুতরাং ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রকৃত কালে ধর্ম্ম কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করায় আমরা উক্ত কর্ম্মাদির ফলভোগী হইতে পারিতেছি না। অতএব কালবশে অবশ্য কর্ত্তব্য সংস্কাররূপ কার্য্যটী না করাই ইহার প্রধানতম কারণ, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

আমাদের এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য রীতি বা পাশ্চাত্য সারণীর সহিত কোন সংস্রব নাই। আমাদেরই শাস্ত্রীয় বচন-প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া তদনুসারেই যে আর্য্যঋষিগণ সময়ে সময়ে নূতন শাস্ত্র প্রণয়ন বা সংস্কার করিয়া গিয়াছেন, এবং ভবিষ্যতেও করিতে হইবে, ইহা তাঁহাদেরই অভিমত, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাদের কেবল এইমাত্র আবশ্যক—আমাদের জ্যোতিঃশাস্ত্র ঠিক থাকে, কোনও প্রকারে দূষিত না হয়; সুতরাং পঞ্জিকাও ঠিক থাকে। যে জ্যোতিঃশাস্ত্রের ক্রিয়া-কলাপে আশ্চর্য্যান্বিত বিশ্বসংসার বিমুগ্ধ, যাহার ভূয়সী প্রশংসায় আর্য্যগণ একসময়ে গৌরবান্বিত

হইয়া জগতের শীর্ষ স্থান অধিকারে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই শাস্ত্রের—আমাদিগের ধর্ম্মকর্ম্মোপযোগী সেই শাস্ত্রের—আর্য্যের আর্য্যত্বের মূলীভূত কারণ সেই শাস্ত্রের এতাদৃশ অবস্থাবিশেষ পরিদর্শন করিয়া এমন আর্য্য সন্তান কে আছেন, যাঁহার মনে প্রকৃত ক্ষোভের সঞ্চার না হইবে? এমন কেহ আছেন কি, যিনি অবসন্ন হইয়া বিষাদ-সাগরে পতিত না হইবেন? অতএব আর্য্য-সন্তানগণ! আপনাদের উপরেই ধর্ম্মরক্ষার ভার, প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ভাবন করিতে হইলে আপনারাই তাহার অধিকারী; আসুন,সকলে একত্রিত হইয়া আত্মাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমনে সত্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হই।

শ্রীকালীকণ্ঠ কাব্যতীর্থ।

আমরা।

"আমরা" বল্লে "তুই আর আমি"
আর বুঝিস্ নে ভাই!
তেমন বোঝার দিন গিয়েছে
আর ত সে দিন নাই!
"আমরা" বল্লে বুঝিস্ এখন
হিন্দু, মুসলমান,
জৈন, পার্শী, নিগ্রো, কাফ্রি,
ব্রাহ্ম, খৃষ্টিয়ান;—
কোল, সাঁওতাল, গারো, কুকী,
আরব, মিস্‌মী, মীন,
শিখ, বৌদ্ধ, কবীরপন্থী,
রামাত' নয়গো ভিন্;—
ভিন্ন রীতি, ভিন্ন নীতি
থাকুনা রাশি রাশি,
"আমরা" বল্লেই বুঝ্‌তে হ'বে
"সারা জগত-বাসী।"

শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরকার।

উজ্জ্বলে-মধুরে।

—○○—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, প্রেমের পথে বাধা না পড়িলে, তার আবেগ বৃদ্ধি হয় না,—নদীর জল বাঁধ পাইলে সেখানে ফুলিয়া ফুলিয়া বর্দ্ধিতবেগ হয়।

যখন মদনের মাধুরী ও মহিমার মোহন প্রেমের আহ্বান উপেক্ষা করিয়া দূরে থাকিতেছিল,—তাহাদের প্রেমের আবেগ প্রাণে চাপিয়া যাইতেছিল,—প্রণয়ীকে নিরাশ-প্রণয়ের ব্যর্থ-বেদনায় জ্বালাতন করিতেছিল, তখন সখ ও শোভা আসিয়া তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিল এবং যাহাতে তাহাদের বাঞ্ছিত লাভ হয়, কৌশলে তাহার উপায় করিয়া দিল। শোভা মদন ও মাধুরীর এবং সখ মোহন ও মহিমার মিলনের ভার গ্রহণ করিল।

শোভা গিয়া মদনের কাছে দর্শন দিল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি হ'য়েছে?" মদন সরল ভাবে আপনার প্রাণের বেদনা জানাইল। শোভা জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি পিরীতের কি গোড়াপত্তন দিয়েছ, আমায় আগে খুলে বল দেখি?"

মদন। আর কি ক'রব বলুন, তাঁর পায়ে প্রাণ সপেঁছি, তাঁকে দেখ্‌লে কাতর হ'য়ে কত বলি—তিনি সে কথা কানেও করেন না।

শোভা তখন ভার লইল, তাহাকে বিবাহে সম্মত করাইবে। শোভা মাধুরীর মনের ভাব জানিতে গেল,—কিন্তু মাধুরী ঠিক মদনের অনুরাগিণী কি না জানিবার জন্য ভারি একটা কৌশল করিল। সেখানে সখীগণের সহিত মাধুরী গাহিতেছিল।

হারায়ে কি ধনে, এই ফুল-বনে,
হে বিহগ তুমি করিছ রোদন?
বুকে হেনে ছুরি, কে করেছে চুরি,
বল বল পাখী, তব প্রাণ ধন!
কেন ফুল-কলি, পড় ঢলি ঢলি,
ফুটিবারে আর নাহিক যতন,—
প্রাণের মাঝারে, হেরিতে যাহারে,
ভেঙে দেছে সে কি সুখের স্বপন?

গান শুনিয়া শোভা বুঝিল, সে হৃদয় রাগের আগুণে পোড় ধরিয়াছে। কিন্তু সেটা মদনের জন্য কি না, জানিবার জন্য সে ছল পাতিল। কাঁদিতে কাঁদিতে উপস্থিত হইল—"মা গো, বাবা গো,—আমার কি হ'লো গো—আমি কোথা যাব গো।"

মাধুরী। আহা! তোমার কি হ'য়েছে গা, বল না শুনি।

শোভা। সে আর কি ব'লব বল, সে সর্ব্বনেশে কথা!

মাধুরী। সে কি কথা গো?

শোভা। তবে শুনবে? আমার দাদা হ'চ্চেন গদিঘেনেধা রাজ্যের রাজা—

মাধুরী। সে আবার কোথা?

শোভা। বেশী দূর নয়—সে রাজ্য গিরিগোবর্দ্ধনের পূর্ব্ব-পশ্চিম কোণে। সেই রাজার নাম ধিনিকেষ্টো, আর তাঁর মন্ত্রীর নাম তিনিতাক্। রাজা ধিনিকেষ্টোর ছেলের নাম মন্টিকেষ্টো। সেই আমার ভাইপো। মন্ত্রী তিনিতাকের ছেলের নাম তেরেকিটিতাক্। এই দুইজনে মৃগয়া করতে এসেছিল, আমিও তাদের সঙ্গে এসেছিলাম। এসে এই বনে ঢুকেছিলাম। আমার ভাইপো তোমাদেরই কাকে দেখে প্রণয়ে প'ড়ে, তাকে কত সাধ্য-সাধনা ক'রেছিল, তা সে মেয়েটি তা'কে ভালবাসে নি। তাই সে মনের দুঃখে গলায় দড়ী দিয়েছে।

মাধুরী। সখী, সখী,—কোথায় কোথায়? দেখি দেখি—

শোভা। যাও যাও—শীগ্‌গির যাও! ঐ বনটার ভিতর গলায় দড়ী দিয়ে ব'সে আছে গো বাবা!

[মাধুরীর প্রস্থান]

শোভা। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! রোগ ঠিক ধ'রেছি—আর যাবে কোথায়?

এই সময় সখীগণ রঙ্গমঞ্চ মুখরিত করিয়া, শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করিয়া প্রেমের বিশদ ব্যাখার একটা গীত গান করিয়াছিল,—

পিয়াস-কাতর পাখী জলদে চায়।
পাখী শূন্য প্রাণে, চাহে শূন্য পানে, তার বারি নয়নে,
করি বারিদে মিনতি কত বারি-কণা চায়।
পাখী অভয় চিতে, হায় বক্ষ পেতে, চাহে বজ্র নিতে,
বিজলী করাল-হাসি হেরে না ডরায়—

দে ফটিকজল, দে ফটিকজল, দে ফটিকজল, চাহে অবিরল,
কাতর-করুণ-গীতে জগত মাতায়।
পাখী উধাও উধাও উড়ে জলদে লুকায়—
মেঘ-মন্দ্র-সনে, মগ্ন মনে, কত ব্যথিত প্রাণে, হায় পিয়াসা বাড়ায়—
হেরি চাঁদে কাঁদে—এ বিষাদে—সুধা নিয়ে সাধে—
মিটা'তে ক্ষুধা, নেত' চাহে না সুধা।
ঘন-বারি-পানে পাখী পরাণ বাঁচায়।

এদিকে সখ গিয়া মহিমাকে পাকড়াও করিল। প্রথমে কত ভাল ভাল বর দেখাইল, সে তাহাতে ভোলে কি না। যখন মোহন ব্যতীত সে আর কাহাতেও অনুরক্ত হইল না, তখন বলিয়া দিল—"জেলের হাঁড়ী হ'য়ে ওর পাছে পাছে ঘুরচো—মেয়ে মানুষ হ'য়ে তোমার একটু আক্কেল নেই।" তারপরে সখের আনারস বিদারণে মানুষ বাহির করা প্রভৃতি অলৌকিক কাণ্ড দেখিয়া সে যে একজন অদ্ভুত ক্ষমতা-সম্পন্ন লোক, মহিমা তাহা বুঝিল, —এবং তখনই তাহার শরণাপন্ন হইয়া পড়িল। তখন সখ পরামর্শ দিল,— আমার কথা শোন, অমন করিয়া পিছু পিছু ছুটিলে প্রেম মিলে না। একটু তফাৎ তফাৎ থাক—একটু গুমোর কর। প্রিয় পাইবার যদি ইহাই পন্থা হয়, তবে মহিমা তাহাতে অস্বীকৃতা হইবে কেন? মহিমা সখের শিক্ষামত বাহিরে দেখাইতে লাগিল—সে আর মোহনকে চায় না। মোহন-মহিমার সাক্ষাতে উভয়ের গীত—

মোহন। প্রাণেশ্বরি, বদন তুলে দেখ তোমার কে এসেছে।
মহিমা। যাও যাও, সরে পড়, আমার ঘাড়ের ভূত ছেড়েছে।
মোহন। (ওমা বলে কি গো!)
কেন এত নিঠুর হ'লে, মুখ তুলে চাও একটি বার।
মহিমা। পিরীতে ডগমগ রসের সাগর নাগর আমার।
মোহন। (ওমা যাব কোথায়!)
পায়ে ধরি, বিনয় করি, পায়ে রাখ প্রাণেশ্বরি।
মহিমা। অন্য কোথায় চেষ্টা দেখ, প্রেমের যাদু—প্রাণের হরি।
মোহন। (ওমা কাঁপুনি ধ'রল যে!)
তোমার পায়ে মাথাকুটি—কেন আর দিচ্চ দমক?
মহিমা। আমি আর নই সে আমি, ভেঙ্গে গেছে প্রেমের চমক॥

সখের শিক্ষামত মহিমা স্পষ্ট জবাব দিয়া চলিয়া গেল, মোহন ছুটিয়া

তার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছিল, এমন সময় সখ আসিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কি হে, ব্যাপার কি ?" মোহন কাঁদিয়া ফেলিল।

যিনি মোহনের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতেছিলেন, তাঁহার এই দ্বৈতগানের হাব-ভাবে বড়ই স্বাভাবিকতা বিদ্যমান ছিল, তাঁহার মুখ-ভঙ্গীতে হাস্যরস যেন উথলিয়া উঠিতেছিল। দ্বৈতগীতটি এই—

মোহন। ডেস্‌পেয়ার, ডেস্‌পেয়ার, ডেস্‌পেয়ার।

সখ। ডুবে ডুবে তুমি খেয়েছিলে জল,
এখন ভোগ কর তার প্রতিফল।
যখন পায়ে ধ'রে কত ব'লেছিল,
কত সেধেছিল, কত কেঁদেছিল,
তখন করেছিলে তুমি ডোণ্টকেয়ার্‌।
এখন নিতে হবে তোমায় তার যাতনার শেয়ার্‌।

মোহন। যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই।
এটা কি রকমে সই ?

সখ। তোমায় বলেছি ত পই পই, করো নাক হৈ চৈ।
এখন এপ্রোচ্‌ করলে রিপ্রোচ্‌ পাবে—বলচি তোমায় ফেয়ার্‌।
বেগে তীর না মার্‌তে পারলে সক্‌সিড হয় কে আর।

মোহন। সে ত কর্‌লে নাকো কেয়ার—সেতো কর্‌লে নাকো পেয়ার।

সখ। তুমি কেঁদনা,—আমি তোমার উপায় ক'রে দিচ্ছি। আমার বোধ হয়, তোমার সখাই তোমার হবু প্রাণেশ্বরীকে বাগিয়ে নিয়েছে।

মোহন। আমার সখা! না—না—তা' কি সম্ভব ? তা' হ'লেও হতে পারে! অসম্ভব কি ? নিশ্চয়ই তাই! আপনি ব্যতীত এখানে আমার সখা বই আর ত কেউ নাই—ও, ঠিক কথা!

সখ। তুমি তোমার সখাকে একবার খুঁজে, তার কাছে গিয়ে দেখ দেখি, সে কি ক'রছে!

মোহন। ওঃ! বন্ধুর এমন কাজ! আমি এজন্মে তার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করতে একেবারে পরাঙ্মুখ। আমি তার কাছে যাবও না—তার মুখও দেখ্‌বো না।

এইরূপ প্রতিহিংসাই প্রেমের গতিবর্দ্ধক। তবে এই সকল প্রেম পাশ্চাত্য প্রেম—এ প্রেম বুঝি জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধের গুণে নহে।

যাক্‌, তারপরে অনেক কাণ্ড ঘটিল—মহিমাকে পাথর-প্রতিমা করিয়া

সথ অনেক ব্যাপার দেখাইল। প্রেমের পরীক্ষায় মোহন উত্তীর্ণ হইল। ওদিকে মদন ও মাধুরীও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। তখন দুই যোড়েই মাণিক-যোড় হইয়া গেল।

এ সকল এক রাত্রিরই ঘটনা,—রঙ্গমঞ্চে যতক্ষণ অভিনয়, ঘটনাও ততটুকু কালের। ফল কথা—উজ্জ্বলে-মধুরে দু'যোড়া নায়ক-নায়িকার প্রেম-বৈচিত্র আর প্রেম-অভিনয়ের স্বপ্ন-কল্পনার বেশ একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান। এমন রস-রচনা, এমন সরল-সুন্দর বাক্য বিন্যাস আ'জ কা'লকার দিনে বড় একটা দেখা যায় না—প্রায়ই প্রাণশূন্য, ভাবশূন্য বাক্যের ঝঙ্কৃতি! গ্রন্থকার প্রেমের তত্ত্ব যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা একটি গানেই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। গানটি এই——

প্রেমে যত দুখ, প্রেমে তত সুখ,
দুখে সুখে প্রেম ভাসে।
যে সইতে পারে সয় গো তারে—
নয় তো মরে পিয়াসে!
যেচে মন পরকে দিয়ে, নয়ন-সলিলে ধারা বয়,
প্রেম ভেল্কি জানে—হয়কে করে নয়,
প্রেমে সদাই ভয়, লুকিয়ে সইতে হয়,
তবেই জানবে জয়,—
নহে জ্যোছনা-মুগ্ধা যামিনী শিহরে, মরম দহন-শ্বাসে।
প্রেমে সয়না সরম ধরম করম—ভরম ভেসে যায়,
প্রেম লুঠিয়ে পড়ে পায়,
প্রাণে প্রাণে মিশা-মিশি, প্রাণে প্রাণে কান্না-হাসি
শেষ দুটী'তে একটি হ'য়ে—
গৌরব-বিভা ছড়াইয়া কিবা
নব রাকা-শশী হাসে।

উজ্জ্বলে-মধুরের দৃশ্য পটাদি অতি মনোজ্ঞ হইয়াছে এবং অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্ব্বাচন সমধিক প্রশংসার যোগ্য।

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীভগবানের কৃপায় আর অনুগ্রাহক গ্রাহকমহোদয়গণের অনুগ্রহে ও সহৃদয় পৃষ্ঠপোষক ও লেখক মহাশয়দিগের করুণায় নয় বৎসর অবসর প্রকাশ করিয়া আসিলাম। সুখে দুঃখে ত্রুটি-মার্জ্জনায়, সাফল্য-বৈফল্যে—যেমন করিয়া হউক বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে নয় বৎসর একখানি মাসিক পত্রকে জীবিত রাখা, গৌরবের কথা না হইলেও আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

কেবল জীবিত রাখা নহে—অবসরের গ্রাহক সংখ্যা মাসিক পত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। অবসরের যত গ্রাহক, এত গ্রাহক কোন মাসিক পত্রেরই নাই। ইহার কারণ, অবসর বড় সুলভ এবং অবসর বড় সোজা কথা লইয়া আলোচনা করে।

অবসর বাস্তবিক অবসরের বিশ্রাম—অবসর কালীন চিত্তরঞ্জন জন্য সরল ও সহজবোধ্য তত্ত্ব কথায় পূর্ণ থাকে। জটিল হ য ব র ল দিয়া ইহার পৃষ্ঠা পূর্ণ করা হয় না। কাজেই ইহার প্রতি অনুগ্রহ অনেকের।

দুই একজন সমালোচক নামধারী অবসরকে সে জন্য দুই একবার আক্রমণ করিতেও ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের অভিযোগ, অবসরে দন্তস্ফুট করা যায় না,—এমন ভাষায় অতি জটিল বিষয়ের প্রবন্ধ থাকে না। আমরা ইচ্ছা করিয়াই তাহা দেই না। অন্নপ্রাশনের ক্রিয়াকালে বিরাট পাঠ হয় নাই, বিবাহ-বাসরে ভগবদ্গীতা পাঠ হয় নাই বলিয়া ত্রুটী ধরা অন্যায় কথা। আমাদের স্মরণ হয়, থিয়েটারের মুখপত্র নাট্যমন্দিরের অভিনেত্রীর ছবি প্রকাশ হয় বলিয়া কোন কোন সমালোচক নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন,—কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, তাহা থিয়েটারের কাগজ, তাহা ঐ সকল প্রকাশ করার জন্যই প্রচারিত। উদ্দেশ্য বুঝিয়া ত্রুটী ধরিতে হয়। অবসর অবসর-রঞ্জনের জন্য সৃষ্ট, সুতরাং ইহাতে গল্প কবিতা গান সমালোচনা এবং সহজ ও সরল ভাষায় দর্শন বিজ্ঞান ও ধর্ম্মকথার আলোচনা হয়। দুর্ব্বোধ্য জটিল বিষয় কখনই ইহাতে থাকে নাই ও থাকিবে না।

কিন্তু আমরা অনেকের নিকট লজ্জিত। আ'জ কা'ল প্রায় সকল মাসিক কাগজেই ছবি প্রদান করিতেছেন,—অবসরে তেমন অধিক ছবি দিতে পারিতেছি না।

পারিব কোথা হইতে! মাসিক ছয় ফর্ম্মা কাগজ—তারপরে ৩৪।৩৫ ফর্ম্মা উৎকৃষ্ট পুস্তক সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উপহার। বার্ষিক মূল্য সবে একটি টাকা মাত্র। সেই এক টাকার মধ্যে আবার বার মাসে বার পয়সা ডাক মাশুল বাদ যায়।

অনেক শুভানুধ্যায়ী—অবসরের প্রায় সকল অনুগ্রাহক গ্রাহকমহোদয় এবার আদেশ করিয়াছেন, অবসরের মূল্য কিছু বৃদ্ধি করিয়া ছবি ও কাগজের বন্দোবস্ত করুন।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা চারি আনা মূল্য বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। অর্থাৎ অবসরের মূল্য বার্ষিক সডাক ১৲ এক টাকা স্থলে এবার ১।০ এক টাকা চারি আনা ধার্য্য করিলাম। এই চারি আনার বিনিময়ে অবসরে এবার যেরূপ সুমসৃণ কাগজ দিবার ও ছবি প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহা দেখিয়া সকলেই প্রীত ও মুগ্ধ হইবেন। ভাদ্র মাসের কাগজ দেখিলেই আমাদের কার্য্য প্রণালীর নমুনা বুঝিতে পারিবেন। তখন সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া বলিবেন—হাঁ, আমাদের স্নেহের অবসর আমাদের মনের মত হইয়াছে।

লেখা প্রভৃতির বিষয়ে এবার সমধিক যত্ন করা হইবে। অবসরের গ্রাহকগণই অবসরের বল-বুদ্ধি। আমরা লাভের জন্য অবসর প্রকাশ করি না—লাভ ইহাতে কিছুই থাকে না। পুস্তকাদির ব্যবসায়ই আমাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায়, কাগজখানি কেবল সুলভ সাহিত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করা। অতএব এই নব আয়োজনে অবসরের চিরহিতৈষী পুরাতন গ্রাহক মহোদয়গণ স্নেহ-করুণ-নয়নে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, ইহাই প্রার্থনা।

ক্ষুদ্রতা।

স্রষ্টা যার সীমা-হীন মুক্ত, শুদ্ধ, নিত্য,
অসীম সৌন্দর্য্যে হয় পুলকিত চিত্ত;
অপূর্ব্ব অধ্যেয় এই ব্রহ্মাণ্ডের মাঝ—
ক্ষুদ্র বলি ধরিবার নাহি কোন কাজ।
অসীম এ বিশ্বে নর শুভ লগ্ন লভি—
ক্ষুদ্রতায় আবরিত কেন বল সবি!

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।